ারদীয়
৪১৩

পরিচয়

৭৬

সম্প্রতি প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাসিক মুখপত্র "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকার কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা

১. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ-২৫ টাকা
২. কবি কৃত্তিবাস-৩০ টাকা
৩. বীরভূম জেলা সংখ্যা-৬০ টাকা
৪. বাংলা সঙ্গীত সংখ্যা ২০০৬-২০ টাকা
৫. রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র-৩০ টাকা
৬. পরিকাঠামো-১-বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত শক্তি উৎস-১০ টাকা
৭. পরিকাঠামো-২-আবাসন-১০ টাকা
৮. পরিকাঠামো-৩-সড়ক ও সেতু-১০ টাকা
৯. পরিকাঠামো-৪-শিক্ষা-১০ টাকা

শিক্ষাদর্পণ (শিক্ষা বিভাগ সমূহের ত্রৈমাসিক মুখপত্র)-৫ টাকা

এছাড়া পূর্ব-প্রকাশিত কয়েকটি সংখ্যা এখনও পাওয়া যাচ্ছে-
১. রামমোহন-২০ টাকা
২. অমর্ত্য সেন-৫ টাকা
৩. বর্ধমান জেলা-১৫ টাকা
৪. জলপাইগুড়ি জেলা-৫০ টাকা
৫. মেদিনীপুর জেলা-৬০ টাকা
৬. শিবনাথ শাস্ত্রী-১০ টাকা
৭. তেভাগা আন্দোলন-১০ টাকা
৮. প্রফুল্ল চন্দ্র রায়-২০ টাকা
৯. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-২০ টাকা
১০. রবীন্দ্র সংখ্যা ২০০৫ (রক্তকরবী)-৪০ টাকা
১১. বামফ্রন্ট সরকারের ২৫ বছর-৫০ টাকা
১২. বাংলা সঙ্গীত সংখ্যা ২০০৫-৫০ টাকা

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার গ্রাহক করা হচ্ছে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা। আগ্রহী গ্রাহক, ক্রেতা ও এজেন্টরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

১. বিতরণশাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ৬নং কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০০১, দূরভাষ-২২৪৩-৬২৯৫
২. বিকাশভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১
৩. গিরিশ মঞ্চ, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ২৯৪৬/২০০৬

শহর ও নগর জীবনের
দর্পণ

[বিধাননগর পৌরসভার ত্রৈমাসিক মুখপত্র]

প্রকাশের সময়

জানুয়ারী/এপ্রিল/জুলাই/অক্টোবর

পত্রিকা পড়ুন ও পত্রিকায় লিখুন

বিধাননগর পৌরসভা

নির্মাণে

ম্যাকিনটস বার্ণ লিমিটেড

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান

ডি ১/১ গিলেন্ডার হাউস, ৮, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা-১

ফোন : ২১২০-৭৮০৫, ২২১০-২১৭৫
ডিডি ১৮/৮, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা-৬৪
২৩৫৮-১৪১৮, ২৩৫৮-১৪২০, ২৩৩৭-১৬৫৪

পরিচয়

আগস্ট-অক্টোবর ২০০৬
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪১৩
১-২ সংখ্যা ৭৬ বর্ষ

[illegible]

সেকালের কথা □ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ১
ধূলির আখর □ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯

[illegible]

আহিযুবের ধর্ম □ শঙ্খ ঘোষ ২১
বাস্তবের প্রতিফলন : স্মৃতিকথায় ও কথাসাহিত্যে □ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৩১
চরিত্রের নৈতিকতা ও রামকিঙ্কর □ মৃণাল ঘোষ ৪১
থিয়েটারের সংযোগ—স্রষ্টার অবস্থান □ তীর্থঙ্কর চন্দ ৫৮
একুশ শতক ও মার্কসবাদ : আগামী দিনের কিছু ভাবনা □ শোভনলাল দত্তগুপ্ত ৮৫
সন্ত্রাসের দ্বৈবতন্ত্র □ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১
'নিয়তির অভিসারে' ষাট বছর : ফিরে দেখা □ বাসব সরকার ৯৮
পুঁজি যার জমি তার অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ১১৫
শহীদ ভগৎ সিং : জন্মশতবর্ষের তাৎপর্য □ গৌতম নিয়োগী ২০৫
বাংলাদেশে শিল্পচর্চা □ মতলুব আলী ২১৫
রুশ ভাষার দুই কবির কবিতার বাংলা অনুবাদ □ সঞ্জয় চন্দ্র ২৩৫
ফিরে এল 'লেনিন শতাব্দী' কবি ও কবিতায় □ সুপ্রান্ত দাশ ২৪৮

[illegible]

বড়দিন □ কার্তিক লাহিড়ী ১২৫
অনধিকারে ভূমিস্বত্ব □ অমলেন্দু চক্রবর্তী ১৩০
কেন রাগ হয় না? □ জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ১৫২
মহিমা হালদার ও কিস্‌সা বুড়ির আনাগোনারা □ জ্যোৎস্নাময় ঘোষ ১৬৪
ফোরেন মাষ্টার □ সাধন চট্টোপাধ্যায় ১৭৬
সামনে সমুদ্র □ আশিস ঘোষ ২৫৪
দ্বীপবাস □ অভিজিৎ তরফদার ২৬২
সীমান্ত রেখা □ শচীন দাশ ২৭১
ছিন্নভিন্ন □ অজয় চট্টোপাধ্যায় ২৮২
তানিয়ার সঞ্চিত নীরবতা □ পার্থপ্রতিম কুণ্ডু ২৯৪
ঈশ্বরী মায়েব থান □ নীনা গঙ্গোপাধ্যায় ৩১৭
জঁযোপোকা □ প্রদীপ দাশশর্মা ৩২৬
শবের পাশে শুয়ে □ মলয় দাশগুপ্ত ৩২৮
ধ্বংসধূলির বাজার □ অনিল ঘোষ ৩৩৭

[illegible]—১ ৭০–৮২

রাম বসু □ সিদ্ধেশ্বর সেন □ মৃগাঙ্ক রায় □ যুগান্তর চক্রবর্তী □ তরুণ সান্যাল □ অমিতাভ দাশগুপ্ত □ মণিভূষণ ভট্টাচার্য □ শ্যামসুন্দর দে □ প্রণব চট্টোপাধ্যায় □ সত্য গুহ □ জয়া মিত্র □ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

[illegible] ৮৩

হীরেন ভট্টাচার্য

[illegible]—২ ১৮৭–২০৪

রত্নেশ্বর হাজরা □ পবিত্র মুখোপাধ্যায় □ পার্থ রাহা □ নন্দদুলাল আচার্য □ মৃণাল বসুচৌধুরী উৎপলকুমার গুপ্ত □ নীরদ রায় □ পঙ্কজ সাহা □ দীপা বিশ্বাস □ দীপেন রায় □ গোবিন্দ ভট্টাচার্য □ শ্যামল সেন □ প্রবীর ভৌমিক □ অনন্ত দাশ □ ব্রত চক্রবর্তী □ শুভ বসু গণেশ বসু □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় □ অনির্বাণ দত্ত □ জিয়াদ আলী □ রাণা চট্টোপাধ্যায় সুশান্ত বসু □ অরুণাভ দাশগুপ্ত □ রমা সিমলাই

[illegible]—৩ ৩০১–৩১৬

সৌম্যা দাশগুপ্ত □ অরবিন্দ দাশগুপ্ত □ নাসের হোসেন □ রেণুকা পাত্র □ মোনালিসা চট্টোপাধ্যায় □ মেঘ মুখোপাধ্যায় □ আবদুস সামাদ □ বীথি চট্টোপাধ্যায় □ শ্রাবণী ঘোষ ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায় □ সৌগত চট্টোপাধ্যায় □ রিমি দে □ ঋত্বিক ঠাকুর □ বিশ্বজিৎ রায় তাপস রায় □ অমিতাভ চক্রবর্তী □ কালিদাস সমাজদার □ রজতশুভ্র মজুমদার □ সুনন্দ অধিকারী □ অগ্নি ভৌমিক □ অলোক সেন

প্রচ্ছদ

দীপ্ত দাশগুপ্ত

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক

বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী

কার্তিক লাহিড়ী

শুভ বসু অমিয় ধর

সম্পাদনা সহায়তা — **অজয় চট্টোপাধ্যায়**

দপ্তর সচিব — **দুলাল ঘোষ**

উপদেষ্টামণ্ডলী

রাম বসু সিদ্ধেশ্বর সেন শঙ্খ ঘোষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোবাবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সেকালের কথা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

দিল্লীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যান্য কিছু স্মৃতি কথা

শিশিরকুমার দাশের কথা বলিয়াছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার একটা প্রতিষ্ঠা আছে। সেই প্রতিষ্ঠার মূলে বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান। আমি তাঁহার বক্তৃতাও শুনিয়াছি। এমন বক্তৃতা আমি কলিকাতায় কোনোদিন শুনি নাই। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ডাঃ স্বরূপ সিং-কে বলিয়াছিলাম Sir it is embarrasing for me to be a professor in a department where a distinguished scholar like Dr Sisir Kumar Das is only a Reader. উপাচার্য মহাশয় ইহা শুনিয়া বলিলেন—এ বিষয়ে তুমি আমাকে কী করিতে বলো? তোমাকে professcr হইতে Readership-এ demot করিয়া শিশিরকুমার দাশকে ওই মূল্যাভিষিক্ত করিব, সেটা কি সম্ভব? আমি বলিলাম সে কথা বলিতেছি না, আমি কেবল শিশিরকুমার দাশের পাণ্ডিত্যের কথাই আপনাকে জানাইতেছি। আমি যখন ন্যাশানাল লাইব্রেরির ডিরেক্টার নিযুক্ত হইলাম, তখন আমি উক্তপদের জন্য যোগ্য বলিয়া মনে করি নাই। তথাপি আমি ওই পদ গ্রহণ করিলাম, ইহা ভাবিয়া যে আমি কলিকাতা চলিয়া গেলে শিশিরকুমার দাশ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার প্রফেসর হইবেন এবং আমার অস্বস্তি দূর হইবে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় শিশিরকুমার দাশের মাহাত্ম্য বুঝিবেন। আমার পরে দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিশিরকুমার দাশ প্রফেসর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সিলেকশন কমিটিতে ছিলেন সুনীতি চট্টোপাধ্যায় আর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, তৃতীয় জন ছিলেন বিশ্বভারতীর বহুশ্রুত বাংলার অধ্যাপক প্রবোধকুমার সেন। ন্যাশানাল লাইব্রেরির ডিরেক্টার হইয়া আমি সুনাম অর্জন করিতে পারি নাই, পারিবার কথাও নহে। কিন্তু ডাঃ শিশিরকুমার দাশ 'Tagore Professor of Bengali' নিযুক্ত হইলেন বলিয়া আমি বিশেষ শান্তি লাভ করিয়াছিলাম।

এখন আমার দিল্লীর জীবন সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতে পারি। পুরাতন দিল্লী ও নতুন দিল্লী লইয়া তখন ভারতের রাজধানী প্রাচীন শহর। ওই শহরে অবশ্যই আমার কোনো প্রতিষ্ঠা ছিল না, তবে শহরটিকে আমি বড় ভালবাসিতাম। দিল্লীর বাঙালিরাও ছিলেন সজ্জন ও বন্ধু বৎসল। দিল্লীর একটি সাহিত্য সভায় আমাকে সভাপতি করা হইয়াছিল। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখি, সভার উদ্যোক্তারা আমাকে চিনিলেন না। উহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—ইনিই এই সভার সভাপতি, ইনি দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলার রবীন্দ্র অধ্যাপক। আমি যে এই সভার সভাপতি ইহা উদ্যোক্তাদের বুঝাইতে কিছু সময় লাগিল। যাহা হউক আমি সভাপতির আসনে বসিতে পারিলাম।

এরকম একটি অস্বস্তিকর অবস্থা আরও একবার হইয়াছিল। দিল্লীর এক সাহিত্য সভায় আমি সভাপতি হইয়াছিলাম কিন্তু সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বুঝিলাম আমি যে সভাপতি ইহা

সভার উদ্যোক্তারা অনেকেই জানেন না। এই রকম অবস্থায় আমি অবশ্যই অস্বস্তিবোধ করিয়াছিলাম কিন্তু বিরক্ত হই নাই। তাহার কারণ এই যে বাংলা সাহিত্যবিদ্ হিসাবে আমার কোন খ্যাতি নাই। একবার একটু বিশেষ মুস্কিলেই পড়িয়াছিলাম। দিল্লী শহরে এক সাহিত্য সভায় আমি একজন বক্তা ছিলাম এবং সভাপতি ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত। তিনি আমাকে চিনিতেন না, আমারও তাঁহার সহিত কোনো পরিচয় ছিল না। বক্তা হিসাবে তিনি যখন আমাকে ডাকিলেন, তখন আমার নাম উল্লেখ করিতে একটি ভুল করিলেন। তিনি আমাব নাম বলিলেন রবীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। আমি এই ডাক শুনিয়া মঞ্চে উপস্থিত হইতে ইতস্তত করিলাম। একজন বলিলেন—আপনি যান, উনি আপনার নাম উল্লেখ করিতে ভুল করিয়াছেন, অগত্যা আমি মঞ্চে উপস্থিত হইলাম। পাঠক বুঝিতেছেন যে বাংলা সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমার কোনো প্রতিষ্ঠা ছিল না। তবে এই জন্য এম.এ. ক্লাসের ছাত্রীরা আমাকে তুচ্ছ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। আমি পড়াইতে পারি না—এমন কথা কোনো ছাত্রীই কখনও বলেন নাই। তবে আমি জানিতাম আমি সুবক্তা নই।

এই সময় আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎ-লেকচারার নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু আমি এই পদ গ্রহণ করি নাই। আরো মুস্কিল হইল এই যে, বাংলা সাহিত্যে গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সরোজিনী স্বর্ণপদকের জন্য নির্বাচিত করিলেন। আমি উক্ত স্বর্ণপদক গ্রহণ করিবার জন্য কলিকাতায় যাই নাই। আমি যখন জাতীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ তখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলর সদস্য নির্বাচিত হইলাম। প্রত্যেক সভাতেই আমি উপস্থিত হইতাম। এই সময়ে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মচারী পদকটি আমার হাতে দিয়া গেলেন। পদকটি আমি কেন পাইলাম, তাহা বুঝিলাম না। একদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পদকটি আমাকে কেন দেওয়া হইল, তিনি বলিলেন—দেশ পত্রিকায় মাইকেল সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির জন্য পদকটি দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবন্ধের জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক পাওয়া যায় তাহা আমি জানিতাম না। আমি ভাবিতাম, আমি ফোকটে এইসব সম্মান লাভ করিতেছি। অবশ্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ফোকটে পাইয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ডি.ফিল ডিগ্রী আমি অর্জন করিয়াছিলাম, তাহা বাংলা সাহিত্যে গবেষণার জন্য নহে। সেখানে যে থিসিস্ লিখিয়াছিলাম তাহা ছিল মিলটনের কাব্যতত্ত্ব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে রীডার ছিলাম তাহা উক্ত বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে নয়, ইংরাজি বিভাগে। ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে আমার কোনো খ্যাতি ছিল না, তবে অখ্যাতির কথাও কানে আসে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বড় ভদ্র। আমি আমার ক্লাসে কোনো অমনোযোগিতা লক্ষ করি নাই। কলিকাতায় আমি প্রথম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির রীডার নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এই পদের জন্য একটি সিলেকশন কমিটি অবশ্যই ছিল, তবে আমাকে কোনো interview দিতে হয় নাই। বোধ হয় interview-এর রীতি ছিল না। কমিটির একজন সদস্য ছিলেন সুবোধ সেনগুপ্ত। Interview হইলে তিনি আমাকে ধরাশায়ী করিতেন। সেই বিপর্যয় আমি

এড়াইলাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হিসাবে আমি ওই পদের সর্বোচ্চ মাহিনা পাইতাম। যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার নিযুক্ত হইলাম, তখন আমার মাহিনা ধার্য হইয়াছিল সাতশত টাকা। কারণ তখন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীচন্দ সেন। তিনি আটশত টাকা মাহিনা পাইতেন। শ্রীচন্দ সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির পি.এইচ.ডি ছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের M. Litt উপাধিও অর্জন করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

যাহা হউক সাধের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিল্লীতে গেলাম। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়িবার দুঃখ দূর হইল দিল্লীতে শিশিরকুমার দাশের সান্নিধ্য লাভ করিয়া। তবে একটু অস্বস্তি ছিল। যে ডিপার্টমেন্ট-এ ডাঃ শিশিরকুমার দাশ রীডার আর আমি প্রফেসর, সেখানে এই অস্বস্তি স্বাভাবিক। ডিপার্টমেন্টের প্রশাসনিক কাজ আমি মন দিয়া করিতাম। এই কাজে আমার উৎসাহের অভাব ছিল না। আমি ন্যাশানাল লাইব্রেরির ডিরেক্টারের পদ লইয়া কলিকাতা আসার অল্প পরেই, ডাঃ শিশিরকুমার দাশ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার রবীন্দ্র অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তবে শিশিরকুমার দাশের মতন বাংলায় এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার প্রফেসর হইয়া কতখানি খুশি হইয়াছিলেন জানি না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে আমি খুব খুশি হইতাম। ওই পদের জন্য যোগ্যতর বাংলার কোনো পণ্ডিত আছেন বলিয়া জানি না। শিশিরকুমার দাশ ৬৭ বৎসর বয়সে দিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এইজন্য যে শোক পাইয়াছিলাম তাহা এখনও দূর হয় নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাহাকে শরৎ-লেকচার নিযুক্ত করিয়াছিল। উনি যদি আরও সম্মান লাভ করিতেন, আমি শান্তি পাইতাম। আমার মনে হইত দিল্লী বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য সি.ডি. দেশমুখ আমাদের বাংলা বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। আমরা যত সাহিত্য সভার ব্যবস্থা করিতাম সেইসব সভার সভাপতি হইতে সম্মত হইতেন। সহ-উপাচার্য বীরেন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ও বাংলা বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন এবং আমাদের অনেক সভার সভাপতিত্ব করিতেন। বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিশেষ সহযোগিতা ছাড়া আমি বাংলা বিষয়ে এত কাজ করিতে পারিতাম না। আমার মুশকিল ছিল এই যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ বলিয়া কোনো বিভাগ ছিল না। বিভাগের নাম ছিল—Department of Modern Indian Language.' পাঞ্জাবী এই ডিপার্টমেন্ট-এর অন্তর্গত ছিল এবং পাঞ্জাবীও এম.এ. পর্যন্ত পড়ানো হইত। তবে এই ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত দক্ষিণ ভারতের চারটি ভাষা এবং মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষা এম.এ. পর্যন্ত পড়ানো হইত না। বিভিন্ন কলেজে বি.এ. পাশ ক্লাসে এইসব ভাষার অধ্যাপনা হইত।

আমার একটি সুবিধা ছিল এই যে দিল্লীর বাঙালিরা তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। আমাদের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সভায় তাঁহারা আসিতেন। এখন শুনি দিল্লীর বাঙালি বাংলা সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তবে

দিল্লীর বাঙালিদের কলোনি কালকাজীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সভা হইয়া থাকে। তাঁহারা বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকার কয়েক খণ্ড পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা সম্বন্ধে বড় কম বলিলাম না। তবে এই চর্চার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয় না। যে ভাষা লইয়া জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না, সেই ভাষার মূল্য কমিতে থাকে। মনে হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এখন পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল। বোধহয় এই বিষয়ে উৎসাহ ও আগ্রহ বাংলাদেশেই বেশি। ওই দেশে বাংলা রাষ্ট্রভাষা। ভারতবর্ষে বাংলার সে প্রতিষ্ঠা নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গেই এই ভাষার বিশেষ প্রতিষ্ঠা এবং কলিকাতায় এই ভাষার চর্চা ইহাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়াছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে প্রতিষ্ঠা তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভাষা যদি কোনোদিন পৃথিবীর একটি মহৎ ভাষা বলিয়া গণ্য হয়, তাহা কলিকাতার বাঙালির জন্যই সম্ভব হইবে।

দিল্লীতে আমি বাঙালি সমাজের সাথে খুব নিবিড়ভাবে মিশিবার সুযোগ পাই না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কাজে আমাকে খুবই ব্যস্ত থাকিতে হইত। উপচার্য সি.ডি.দেশমুখ আমাকে দিল্লীর নানা প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে পাঠাইতেন। দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গাড়িতে যাতায়াত করিতাম। আমার গাড়ি ছিল না। দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে যে সব কাজে পাঠাইতেন তার সাথে বাংলার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর আমি নিজে লেখক নই বলিয়া দিল্লীর সাহিত্যিকদের সাথে মিশিবার সুযোগ পাই নাই। তবে আমি নিজে দিল্লীকে পরবাস বলিয়া মনে করি নাই। কর্মত্যাগের পর আমি আমার জন্মভূমি কলিকাতায় চলিয়া আসি। তখন আমার বয়স ৬৫ বৎসর।

জাতীয় গ্রন্থাগার

আমার দিল্লীর জীবন সম্বন্ধে বোধহয় আর কিছু বলিবার নাই। কলিকাতায় আসিয়া জাতীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ হইলাম। জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো এক বিরাট প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধ বিশেষ কিছু করি এমন সাধ্যবোধ হয় আমার ছিল না। এ তবে এ বিষয়ে আমার নূতন চিন্তা ছিল। প্রথমেই বলি ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে যোগ দিয়া আমি আবিষ্কার করিলাম যে ইহা যথার্থ ন্যাশানাল লাইব্রেরি নহে। যথার্থ ন্যাশানাল লাইব্রেরি কী সে বিষয়ে আমার একটি বোধ ছিল। আমার মনে হয় এই বোধ খুব স্পষ্ট ছিল। আমি বিদেশের লাইব্রেরি দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে একটি লাইব্রেরিতে আমি পুরা দুই বৎসর পড়াশোনা করিয়াছি। সেই লাইব্রেরিটি হইল অক্সফোর্ডের Bodlein লাইব্রেরি। ন্যাশানাল লাইব্রেরি হইল Library of last resort. এই লাইব্রেরিতে দেশ বিদেশের বড় বড় পণ্ডিতের সমারোহ। আমি কলিকাতার ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে ইস্কুলের ছেলেও দেখিয়াছি। যথার্থ পণ্ডিতের সংখ্যা কম। যে কোনো ভারতীয় এই লাইব্রেরির কার্ড করিতে পারিত। আমি একদিন দেখিলাম একজন ইস্কুলের ছাত্র এই লাইব্রেরিতে পড়িতেছে। আমি মাঝে মধ্যে রিডিং রুমে যাইতাম। দেখিতাম কে কী পড়িতেছে।

দেখিতাম অধিকাংশই স্কুলের ছাত্র। একজন দেখিলাম পাগলের মতো ঘুরিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কী চান? তিনি বলিলেন—আমার জামায় লাল রঙ লাগিয়াছে, ইহা কী করিয়া উঠাইতে পারি, তাহা জানিবার জন্য একখানি বই চাই। আমি বলিলাম সেরকম বই এখানে পাওয়া যাইবে না। একদিন দেখিলাম একজন এ্যানাটমি পড়িতেছেন, প্রশ্ন করিয়া জানিলাম তিনি মেডিকেলের ছাত্র। আমাদের সময় মেডিকেল ছাত্ররা এ্যানাটমির বই কিনিয়া পড়িত।

পাঠক মহাশয় বলিলেন ওই বই কিনিবার সঙ্গতি তাঁহার নাই। আরও একদিন দেখিলাম, একখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ টেবিলের উপর রহিয়াছে। মুস্কিল ছিল এই যে লাইব্রেরির নিয়ম অনুসারে যে কোনো ভারতীয় নাগরিক এই লাইব্রেরির মেম্বার হইতে পারেন। আমি এমন পাঠক দেখিয়াছি যাহারা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ধারে কাছে যাইতে পারিত না। অর্থাৎ আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি দেশের সকলের লাইব্রেরি। যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোনো প্রশ্ন ছিল না। আমি যখন অক্সফোর্ডে Bodlein লাইব্রেরির কার্ড করিলাম, তখন আমার লেখাপড়ার একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করিতে হইয়াছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Exseter কলেজের ছাত্র তাহাও প্রমাণ করিতে হইয়াছে। আমি যে ডি.ফিল করিতেছি তাহাও প্রমাণ করিতে হইয়াছে। ন্যাশানাল লাইব্রেরির ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়া আমি দুইজনের সঙ্গে পত্রালাপ করিয়াছিলাম। সেই দুইজনের মধ্যে একজন হইলেন ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান আর একজন অক্সফোর্ডের Bodlein-এর লাইব্রেরিয়ান। কিন্তু আমার পক্ষে ঐ দুই লাইব্রেরির নিয়মাবলী অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিককে কার্ড দিতে আমি বাধ্য।

আমি বুঝিলাম এই লাইব্রেরির উন্নতিকল্পে আমার কোনো কাজ করা সম্ভব হইবে না। প্রথম কথা এই যে, এই লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরির Supreme Authority নন। এই লাইব্রেরি ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধীন।

এইখানে একটি কাহিনী উপস্থিত করি। ন্যাশানাল লাইব্রেরির উদ্যানে প্রতিদিন অনেক মানুষ প্রাতঃভ্রমণ করিতেন। আমি ইহা বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি ভাবিলাম ন্যাশানাল লাইব্রেরি একটি Public Park-এ পরিণত হইতে পারে না। যাঁহারা ভ্রমণ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার বিরুদ্ধে দিল্লীর শিক্ষা বিভাগে নালিশ করিলেন। শিক্ষা বিভাগ আমার কাছে চিঠি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কেন এই কাজ করিয়াছি? আমি কাজে ইস্তফা দিয়া এই চিঠির উত্তর দিলাম। ভারত সরকারের এক জয়েন্ট সেক্রেটারি কলিকাতায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। তিনি বলিলেন আমি একটি সামান্য ব্যাপারকে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া একটি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছি। আমি তাঁহাকে আমার দিকটা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি নীরব রহিলেন। ইহা লইয়া ভারত সরকার আর কোনো প্রশ্ন তোলেন নাই। এইসব সমস্যায় প্রমাণ হইল যে ন্যাশানাল লাইব্রেরির ডিরেক্টার ভারত সরকারের স্বাধীন কর্তা নহেন। যা হউক এই ব্যাপার লইয়া আর কোনো কথা উঠিল না।

ন্যাশানাল লাইব্রেরি সম্বন্ধে আমার কিছু চিন্তা ছিল। সেই চিন্তা যে একেবারে অন্তঃসার-

শূন্য চিন্তা ছিল, তাহা আমি মনে করিতাম না। যাহা হউক ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র আমাকে পদত্যাগ পত্রখানি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিলাম। এইসব সমস্যার মূলে হইল যে ন্যাশানাল লাইব্রেরি একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল না। ইহা ভারত সরকারের একটি বিভাগ।

ন্যাশানাল লাইব্রেরির পাঠকদের সঙ্গে এবং কর্মচারীদের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল। তাহাদের সঙ্গে আমার কখন কোনো বিরোধ হয় নাই। আমি মনে করি ন্যাশানাল লাইব্রেরির উন্নতি করিতে হইলে ইহাকে একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে। ভারত সরকার আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। অবশ্য আমাদের দেশে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় স্বয়ংশাসিত। কিন্তু কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয়ই জাতীয় জীবনে দাগ কাটিতে পারে নাই। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানের গৌরবের অন্ত নাই। আমরা একত্র হইতে পারি না বলিয়া আমাদের সরকারমুখী হইতে হয়। আমরা যেন কাহারো ব্যক্তিত্ব মানিয়া লইতে পারি না। যেখানে ব্যক্তিত্বের আদর নাই সেখানে সকলেরই সরকার নির্ভর হইতে হয়। এই জন্য সরকার আমাদের গ্রাস করিতে পারিয়াছে।

আমাদের কোনো প্রতিষ্ঠানই যে উজ্জ্বল হইয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে নাই।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

জাতীয় গ্রন্থাগার হইতে অবসর লইয়া রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ যোগ দিলাম।

এখন আমি রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলি। আমি বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের মতো স্বয়ংশাসিত সুন্দর প্রতিষ্ঠান কোথাও দেখি নাই। ইহার পরিচালনা সার্থক পরিচালনা। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে ইহার পরিচালকেরা ইহার কর্মচারীদের ব্যক্তিত্বকে কখনও ক্ষুন্ন করে না। আমি ১৯৮০ জাতীয় গ্রন্থাগার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে যোগ দিলাম। তখন জানিতাম না আমার পদের নাম কী। আমাকে একটি প্রকোষ্ঠ দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে আসবাবপত্রের অভাব ছিল না। টেবিল, চেয়ার, আলমারি তো ছিলই, একজন personal secretary দেওয়া হইয়াছিল। আমার পদের নাম ছিল 'বিবেকানন্দ প্রফেসার অব ইন্ডলজি'। বিবেকানন্দ হলে মাসে একটি ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতাম। উহা Institute-এর মাসিক বুলেটিন ছাপা হইত। পরে উহা গ্রন্থাকারে ছাপা হইত। এ পর্যন্ত চারখানি গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে। এই সম্মান আমি কোনো প্রতিষ্ঠানে পাই নাই। আমার মাসিক অনরেনিয়াম চারি হাজার টাকা। স্বামী প্রভানন্দজী সেক্রেটারি হইয়া আসিলে এই অনারেনিয়াম বর্ধিত হইয়া পাঁচ হাজার টাকা হইল। আমি বিশেষ সম্মানিত বোধ করিলাম। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে আমি যে রকম আদৃত হইয়াছি সে রকম আর কোনো প্রতিষ্ঠানে হই নাই। আমাকে একটি well-furnished ঘর দেওয়া হইয়াছিল। মিশনে কাজ করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি তাহা বোধহয় অন্য

কোনো প্রতিষ্ঠানে পাই নাই। রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনা দেখিয়া মঠ ও মিশনের সুন্দর পরিচালনার সম্বন্ধে আমার একটি ধারণা হইয়াছে। এমন একটি সুপরিচালিত সংগঠন সারা দেশে আর একটি নাই।

রামকৃষ্ণ মিশন-এ আমার একটি মাত্র কাজ ছিল। সেই কাজটি প্রতিমাসের বক্তৃতার একটি খসড়া প্রস্তুত করা। এই বক্তৃতা দিতাম মিশনের বিবেকানন্দ হলে। শ্রোতার সংখ্যা আমাকে অবশ্যই উৎসাহিত করিত। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে লাইব্রেরিটি একটি সুপরিচালিত লাইব্রেরি। ইহার গ্রন্থসংগ্রহ আমাকে বিস্মিত করিত। ভারতীয় ধর্মদর্শন সম্বন্ধে এই লাইব্রেরির সংগ্রহ ছিল বিশাল। এখন এই লাইব্রেরি আরও অনেক বড় হইয়াছে। ইহার সংগ্রহের বিশালতা এবং বৈচিত্র্য সত্যই আকর্ষণীয়। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রায় সকল গ্রন্থই আমি এখানে পাইতাম। এই সংগ্রহ আমার মাসিক বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিতে বিশেষ সাহায্য করিত।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা শহরটিকে আমি বড় ভালোবাসি। এই শহরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক বড় বড় পণ্ডিত বাস করেন। তাহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমার দুর্ভাগ্য এই যে জাতীয় গ্রন্থাগারে যোগ দিবার অল্প পরেই সুনীতিকুমার চলিয়া গেলেন। লোকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার রচিত এবং দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'Orgin and Development of the Bengali Language' আজ দেশে বিদেশে আদৃত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সুনীতিকুমারকে আমরা ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তিনি ছিলেন সর্ববিদ্যা বিশারদ। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাও জানিতেন। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া ভাবিতাম, তিনি না জানেন এমন বিষয় নাই। আমি যখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি, তখন আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সি.ডি.দেশমুখ মহাশয়কে বলিলাম—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় সুনীতিকুমারকে 'অনারারি ডি.লিট' প্রদান করিতে পারে কিনা। তিনি বলিলেন অবশ্যই পারে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম ছিল যে কাহাকেও 'অনারারি ডি. লিট' দিতে হইলে একাডেমি কাউনসিলের সকলের সম্মতির প্রয়োজন। দেশমুখ বলিলেন আমি এই প্রস্তাব কাউনসিলে উপস্থিত করিব। যে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপস্থিত করেন, সেই প্রস্তাব সব সদস্যের সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। প্রস্তাবটি ডাঃ দেশমুখ একাডেমি কাউনসিলে উপস্থিত করিলেন। ইহা কাউনসিলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ইহার পর ডাঃ দেশমুখ citation-টি আমাকে রচনা করিতে বলিলেন। কনভোকেশনে সেই citation উপস্থিত করিলেন উপাচার্য স্বয়ং। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন ডাঃ জাকির হোসেন। কনভোকেশনে উপাচার্য citationটি পাঠ করিলেন এবং আচার্য মঞ্চে উপবিষ্ট সুনীতিকুমারকে প্রদান করিলেন। আমি সেই দিন সুনীতিকুমারকে আমাদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করিলাম। তিনি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সেই

দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয়-দিন। আমার স্ত্রী অণিমা সুনীতিকুমারের জন্য রান্না করিয়া ধন্য হইলেন। ইহা ১৯৬৫ সালের কথা। সুনীতিকুমার ইহলোক ত্যাগ করেন ইহার ১২ বৎসর পর ১৯৭৭ সালে, তখন তাঁহার বয়স ৮৭। ওই বৎসরেই আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যোগ দিই, তবে লাইব্রেরির পক্ষ হইতে সংবর্ধনা করিবার সুযোগ পাইলাম না। আমি যোগ দিবার অল্পদিনের মধ্যেই সুনীতিকুমার ইহলোক ত্যাগ করেন।

সুনীতিকুমারের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৩৮ সালে। তখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউটর। সুনীতিকুমার সকলকেই আপন করিয়া লইতেন। আমিও অচিরেই আপনজন হইলাম। সুনীতিকুমারের জ্ঞান ছিল অপরিসীম। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে একজন নিরভিমান মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। হিন্দুস্থান পার্কে তাঁহার বাড়িতে আমি প্রায়ই যাইতাম। তবে অল্পক্ষণই তাঁহার বাড়ীর বৈঠকখানায় থাকিতাম। এই রকম এক বিরাট পণ্ডিতের সময় নষ্ট করিতাম না। সুনীতিকুমার 'National Professor' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁর দপ্তর ছিল ন্যাশানাল লাইব্রেরির একটি ঘরে। সুনীতিকুমার বঙ্গদেশে তথা সারা ভারতবর্ষে একজন জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি কাহাকেও তুচ্ছ করিতেন না। সকলের সঙ্গেই মিশিতেন।

সুনীতিকুমারের পাণ্ডিত্যে সকলেই অভিভূত। কিন্তু তাঁহার সরল বাক্যালাপেও সকলকে মুগ্ধ করিত। আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইতাম ১৯৩৮-৪৫ সাল পর্যন্ত, তখন আমি সুনীতিকুমারের সাথে অনেক গল্প করিতাম। তিনি যে কতরকম কাহিনী উপস্থিত করিতেন তাহা আমাদের বিস্মিত করিত। এমন আলাপচারী আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আর একজন ছিলেন না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম। আমরাও তো কত কথা বলি, কিন্তু আমরা সুনীতিকুমারের মতো কথাবার্তায় কাহিনী উপস্থিত করিতে পারি না। অথচ তাঁহার বাক্যালাপে কোনো pedantry-র চিহ্নমাত্র থাকিত না। অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম।

ধূলির আখর

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

It is very difficult to speak about oneself without indulging to vanity.

এবার একটু অন্য চালে কথা বলতে হয়। আমি যে মফস্বল শহরের মানুষ সেখানকার কথা তো বলাই হয়নি। অথচ ওদিকে কলকাতাকেও শুধু আলগোছে ছুঁয়েছি মাত্র। খুব ছোটবেলায় মা বাবার সঙ্গে কলকাতায় মাস কতক ছিলাম। বড়বেলায় এম এ. পরীক্ষার কালে পনের দিন একটানা কলকাতায় ছিলাম। বি. এ. পরীক্ষার সময় টুকরো টুকরো ভাবে কয়েকদিন। তিনটে অভিজ্ঞতাই আমার আজও মনে আছে। খুব ছোটবেলার কথাটি বলতে গেলে আমার দাদামশাইয়ের কথা মনে পড়ে। তিনি ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষক। ভিক্টোরিয়ান মেজাজের মানুষ। বাড়ির মেয়েদের বাইরে বেরুনোর পক্ষপাতী ছিলেন না। মেয়েরা মানে মা এবং তাঁর বড় বৌদি বেলা চারটের সময় কোনো কোনোদিন বেরিয়ে পড়তেন। না, পায়ে হেঁটে নয়, রিক্শয়—তাঁরা দুজনে পাশাপাশি বসতেন। শাড়ি কুঁচকে যাবে বলে আমাকে বসতে হত তাদের পায়ের কাছে। খেয়াল ছিল না সেদিন শনিবার। দাদামশাই সকাল সকাল স্কুল থেকে ফিরবেন। হঠাৎ দেখি মা ও বড়মামিমা আমাকে পর্দা চাপা দিচ্ছেন। আমি এতক্ষণ দুপাশ দেখতে দেখতে বেশ যাচ্ছিলাম। মায়েরা ছিলেন পর্দার মধ্যে। হঠাৎ চমকে দিয়ে আমাকেও পর্দানশিন করে ফেলায় আমি রীতিমতো বিরক্ত। আমার বিরক্ত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে সন্দিগ্ধ দাদামশাই বারবার ছুটন্ত ঘন্টিদার রিক্শার দিকে তাকাচ্ছেন। দুই আরোহিণীর চাপা হাসি বাঁধ মানছিল না। আমাদের গন্তব্যস্থল শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার মঞ্চ। বাসায় ফিরে এলে আমার অভিজ্ঞ মাতামহ সাবালিকা দুজনকে কোনো জেরা করলেন না। জেরা করলেন এই একান্ত নাবালকটিকে। সে দাদামশাইয়ের কাছেই পড়ে 'সদা সত্য কথা বলিবে।' সে সত্য গোপন করেনি। সে সবই বলেছিল এমনকি শিশিরবাবুর মাতালের ভূমিকায় সকলের হাততালির কথাও। তার পরের ঘটনা আমার মনে নেই। আমার দাদামশাই এক চরিত্র। আমার মা তাঁর একমাত্র মেয়ে। মেয়ে খুব পিতৃগরবিণী ছিলেন। কিন্তু মেয়ের বাসায় দাদামশাই কোনোদিন আসেননি। এলেন একেবারে শেষবেলায়। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে মেয়ের দীর্ঘকালের অনুযোগকে মর্যাদা দিয়ে তিনি আমাদের নৈহাটির কাঁটালপাড়ার বাসায় এসে দিন তিনেক ছিলেন। দ্বিতীয় দিন বিকেলে তিনি আমাকে বললেন, দাদুভাই আমাকে একবার তীর্থদর্শন করাও। কাঁটালপাড়ায় যদিবা এলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িটা একবার দেখে যাব। তখনকার ইংরেজ সরকারের সেই অবহেলিত ভগ্নপ্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানার সিঁড়িতে দাদামশাই মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তিনি কিছু সময়ের জন্য স্মৃতিনিমগ্ন হলেন। তিনি বলতেন 'টৌন হল' তিনি বলতেন 'কালেজ'। টৌন হলে তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনেছেন তখন তিনি কলেজের ছাত্র। কী বিষয়ে বক্তৃতা তা তাঁর মনে নেই। শুধু মনে আছে

তাঁরা এবং তার সহপাঠীরা সকলেই দাবি করছে—রবিবাবু, একখানা গান। দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ—তাঁর ভাষায় রবিবাবু এ সম্ভাবনার কথা আগে থেকেই অবগত। তিনি বললেন, আজ গলাটা তেমন ভাল নেই তার পরেই একটা কাগজ বের করে গান শুরু করলেন। দাদামশাই বলেছিলেন—অতবড় টৌন হল একেবারে স্তব্ধ। তিনি বলেছিলেন, বীণা নিন্দিত কণ্ঠস্বরে রবিবাবু যখন 'নানা' শব্দটি উচ্চারণ করছিলেন মনে হচ্ছিল যেন মৃদঙ্গধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমি কথায় কথায় দাদামশাই প্রসঙ্গ ধরে মধ্যকলকাতা থেকে—তথা আমার ছোটবেলা থেকে আমার প্রথম যুবকবেলার নৈহাটিতে চলে এসেছি। আবার সেখান থেকে আমার স্বল্পকালীন কলকাতা বাসের আর দুটি স্মৃতির কথা বলতে হয়। ইন্টারমিডিয়েট, বি. এ. এবং এম. এ এই তিনটি পরীক্ষাই আমাকে দিতে হয়েছিল কলকাতায় থেকে। প্রথম দুটির বেলায় আমি ছিলাম বৌবাজারে কোলে মার্কেটের একেবারে উপরতলায় একটি মেসে বাবার অফিসের এক সহকর্মীর পেয়িংগেস্ট হিসাবে। নিচের কোলে মার্কেটের দিন শুরু হত শেষরাতে সাড়ে তিনটা-চারটে থেকে—দিন শেষ হত রাত বারোটায়। সে কী কলরব। সেই বাজারের মাঝখানে বসে আমাকে মুখস্থ করতে হত লজিকের সিলোজিস্‌ম্‌ অথবা ভারতীয় অর্থনীতি। বিরক্তিজনিত অবসাদে কোনো কোনো দিন নিকটবর্তী ছবিঘরে চলে যেতাম। একদিন 'আলিবাবা ও চল্লিশটি দস্যু' দেখে ফিরে এসে বাবার সামনে পড়লাম। অফিস ফেরত বাবা দেখতে শুনতে এসেছেন ছেলে ঠিক ঠিক পড়াশুনা করছে কিনা। আদ্দির পাঞ্জাবির বুক পকেটে সিনেমার নীল টিকিটের কাউন্টার ফয়েল আমার বৈকালিক বিনোদনের কথা বাবার কাছে ফাঁস করে দিল। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাবার বহুকাল পোষিত দুর্ভাবনা সেদিন বোধ হয় আরো বদ্ধমূল হল। এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলাম হিদারাম ব্যানার্জি লেনে এক গৃহস্থ বাড়ি থেকে। সেই ভদ্রলোকও ছিলেন বাবার সহকর্মী। খুব আদর যত্নে এ বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে ছিলাম। কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়ার দৈনিক জীবনযাপনের আঁচ পেতাম এই বাড়ি থেকে। তখনো কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবন থেকে যৌথ সংসারের পালা একেবারে চুকে যায়নি। মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম মোটা ভারিক্কি গৃহিণীর শাসক কণ্ঠস্বর—'ছোট বৌমার বাসি পাট কি এখনো সারা হল না? ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে গলা শুকিয়ে ফেলল।' অথবা শুনতে পেতাম বড় কর্তা হাঁকছেন—'ঠাকুরমশাই আমার ভাত দিয়ে যান।' পাচক ব্রাহ্মণকে 'আপনি' বলার প্রথা তখনো উঠে যায়নি। কলকাতাকে ভিতর থেকে জানা এই আমার শেষ। এক আধদিন বা রাত উত্তর কলকাতায় বা দক্ষিণ কলকাতায় কাটিয়েছি বটে, তা নইলে—

তা নইলে, কলকাতা আমার কাছে থেকে গেল দূর অস্তু। গর্বিতা প্রেমিকার মতো সে আমাকে এড়িয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও সহাস্য অভ্যর্থনায় তৎপর হয়নি। আমার সংকল্প আর সিদ্ধির মাঝখানে সে তার ছায়া ফেলে রেখেছিল অনেক দিন। সে আমার জেয় কিনা আমি জানিনি—কিন্তু ধ্যেয় কোনোদিন ছিল না, আজও নয়। এ কেমন প্রেমিকা যার কাছে হাত না পাতলে কিছু মেলে না—যার দরজায় ধাক্কা না দিলে সে দরজাটুকু একটু খুলে ধরবে না। তখনকার কালের হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত এক দীর্ঘকায় সটান চেহারার ভিক্ষুক। যত দূর কালো হতে হয় তত্দূর কালো। খুব

ময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, ছেঁড়া মলিন ধুতি পরণে, চোখে নিকেলের ডাঁটি ভাঙা চশম—নগ্নপদ। গম্ভীর গলায় সে একমিনিট অন্তর অন্তর হাঁকত—'একটা পয়সা দিয়ে যাবেন'। অনুনয় নয়, আদেশ। একটা কলম সারাইয়ের এক ফালি দোকান ছিল কাছেই। দোকানটির কোনো নাম ছিল বলে মনে পড়ছে না। দোকানের সঙ্গে লাগানো থাকত একটা বিশাল—অতি বিশাল কলম—ফাউন্টেন পেন। সেখান থেকে শোনা যেত কলকাতার আত্মার গম্ভীর নির্দেশ—একটা পয়সা দিয়ে যাবেন। ট্রামের ঘর্ঘর, বাসের সহিসের গন্তব্যস্থল ঘোষণা, রিক্‌শার ঘন্টি ছাপিয়ে সে অমোঘ নিয়তি নির্দেশ জলদগম্ভীর নির্ঘোষে উচ্চারিত হত একটা পয়সা দিয়ে যাবেন। ভেবে দেখতাম আমি, এই অতিকায় শহরে তো দাতা কেউ নেই। কেউ ভাবছে অন্তত 'হতাম যদি কেরানি কি ইস্কুল মাস্টার', কেউ বা ভাবছে 'কত বসন্ত ব্যর্থ হয়ে যে যায় এখন বন্ধু পাত্রী যে কেউ হোক।' 'যত বড় রাজধানি তত বিখ্যাত নয় এ হৃদয়পুর'। 'ভালবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ দীনের'। হয়তো কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে—হয়তো হবে, যতদিন না হয় ততদিন কলকাতার আত্মা ডেকেই চলবে একটা পয়সা দিয়ে যাবেন। মনে পড়তেই হবে জীবনানন্দের 'ভিখিরী' কবিতাটিকে, আরো মনে পড়বে 'এইসব দিনরাত্রি' কবিতার এই অংশটিকে যেখানে কুষ্ঠ কলঙ্কিত নারী আশ্চর্য সুন্দর গান গায়, বোবা কালা পাগল মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায়'—সকলেই একা একা বলছে একটা পয়সা দিয়ে যাবেন। উৎসুক অনিশ্চয়তা নিয়ে নয়, এক প্রত্যয়ী সুনিশ্চয়তায় প্রত্যেক করণিক, ছাত্র, লেখক প্রকাশক কন্ট্র্যাক্টর, বণিক বড়বাজার অথবা ডালহৌসি স্কয়ার নির্দেশ দিয়ে চলেছে, আপাত উদাসীনতায় তারা দাতাকে ডাকছে। এর মধ্যেই একজন কবি খুঁজে নিলেন কলকাতার বিত্তকে—একমাত্র সেই কারো দানের প্রত্যাশী নয়, বিরাট হিংস্র ট্র্যাফিক কলরোলের কর্কশতার মাঝখান দিয়ে নির্ভীক পা ফেলে সে এগিয়ে চলে।

তবু কলকাতা আছে কলকাতাতেই। একটি বিদেশী কোষগ্রন্থে পৃথিবীর প্রধান প্রধান শহর সম্বন্ধে আলাদা বিস্তৃত প্রবন্ধ আছে। সেখানে টোকিও, লণ্ডন, প্যারিস ইত্যাদির সঙ্গে কলকাতাও এক বিষয় বলে পরিগণিত হয়েছে। জোব চার্ণকের হঠাৎ লব্ধ কোনো এক ক্লান্ত দ্বিপ্রহরের বিরামস্থল থেকে গজিয়ে ওঠা এই প্রাসাদনগরীর গায়ে গায়ে ঘিঞ্জি নোংরা বস্তি বাস যেখানে 'খ্যামটা খানকির খাসা বাড়ি ভগ্নভাগ্যে গোলপাতা' সেই আজব শহর কলকাতার ভূরি ভোজনাগারের সামনের ফুটপাথে কঙ্কালভুক শীর্ণা ভিখারিণী, যেখানে ঝুপড়ি এবং খাটালের জড়াজড়ি—যেখানে সেই কোষ প্রবন্ধ লেখক আবিষ্কার করেছেন এই শহরের পরমায়ুর গোপন মন্ত্রটি কোথায়। তাঁর আবিষ্কার, উপলব্ধি এবং উচ্চারণ তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি—The avant garde theatre on the other end deals with complex political and sociological themes with a sophistry that would not disgrace London's Westend or Newyorks Broadway. In India the Bengalis have an unsurpassed artistic traditions in which they increasingly seek refuge as the city sinks into greater decline—আমিও এই পথেই আমার কাঙ্ক্ষিত কলকাতাকে খুঁজতে শুরু করলাম। আমি নিজেই দেখলাম, এই শহরকে যাঁরা বিশ্বসংস্কৃতির মানচিত্রে অমোচনীয় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, ঊনবিংশ শতাব্দের সেই সব জ্যোতিষ্কদের মধ্যে মাত্র দুজন কলকাতার ছেলে।

একজন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছেলে, আর একজন সিমলার দত্তদের ছেলে। বাকি সবাই বহিরাগত—একজন এসেছেন রাধানগর থেকে, আরেকজন মেদিনীপুরের বীরসিংহ থেকে, অন্যজন কাঁচড়াপাড়া থেকে, অপরজন যশোরের সাগরদাঁড়ি থেকে—বাকি মানুষটি এলেন নৈহাটি কাঁটালপাড়া থেকে। না, আমি নই, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলছি। তবে আমার এই তথ্য উদ্‌ঘাটন আমাকে আশ্বাস দিল, অভয় দিল। কলম চালিয়ে যাও, খুঁজতে থাকো, খুদকুঁড়ো কিছু মিলে যেতেও পারে। পারে কি—যাই হোক এর মধ্যে একদিন শক্তি চট্টোপাধ্যায় আনন্দবাজার থেকে একগুচ্ছ কবিতার বই পাঠিয়ে দিলেন আনন্দবাজারে গ্রন্থ সমালোচনার জন্য। যথাসময়ে লিখে পাঠিয়ে দিলাম। ছাপাও হয়ে গেল। লেখা বাবদে প্রাপ্য টাকাও পেয়ে গেলাম। কিছুকাল বাদে শক্তির কড়া তাগিদ—বইগুলোর কী হল। বুঝলাম শক্তি বড় ভাল ছেলে, তিনি আনন্দবাজার পড়েন না। শক্তিকে জানালাম, সে তো ছাপা হয়ে গেছে। শক্তি মোটেই অপ্রস্তুত হলেন না, আর একপ্রস্থ বই পাঠিয়ে দিলেন। এখানে একটা কথা বলে রাখি, শক্তিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না। শক্তির পরে যিনি বিভাগীয় দায়িত্বে এলেন 'শ্রীপান্থ'—নিখিল সরকার মহাশয় তাঁকেও আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না। আরো বলি, এবং সেটাই সব থেকে হাসির কথা, আমি আনন্দবাজার হাউসই কোনোদিন চিনিনি। আনন্দবাজার অফিস তো দূরের কথা কোন্ রাস্তায় তা অবস্থিত তা শুধু আমার কাছে শোনা কথা, সে চৌহদ্দির মধ্যেই আমাকে কেউ কোনোদিন দেখেনি। সেখানে 'দেশ' সম্পাদকের কাছে কেমন করে পৌছতে হয় তা আমার কোনোদিন জানা হয়নি। আনন্দবাজারের জন্য লেখা অথবা দেশের জন্য লেখা কারো হাত দিয়ে পাঠিয়েছি। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ফোনেই সেরেছি। একবার, তখন সাধারণ নির্বাচন সমাসন্ন, আনন্দবাজারের একটা পুরো পাতা হবে সাধারণ নির্বাচন সংক্রান্ত বিশেষ পাতা। নিখিল আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন—'একটা লেখা আপনি লিখবেন', আমি নিখিল সরকারকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলাম—বললাম—'আপনি আমাকে বিপদে ফেলছেন না। নিজে বিপদে পড়ছেন।' 'কেন'? 'আপনি জানেন কিনা জানি না, আমার একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে এবং তা আনন্দবাজারের সম্পূর্ণ বিপরীত। আনন্দবাজার যতটা দক্ষিণে, আমি ওতটাই বামে।' নিখিল সরকার বললেন—'তাতে কিছু যাচ্ছে আসছে না। শুধু দেখবেন আনন্দবাজারের পাতাতেই যেন আনন্দবাজারকেই গালমন্দ করবেন না।' তার পরে বোধহয় নিখিল সরকারের কিছু একটা মনে হয়েছে তিনি জানতে চাইলেন—'কী আপনার মাথায় আছে বলুন তো'। বললাম—'আমি জানাবো ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচনে চোরা ভোট বা ফল্‌স ভোটিং কংগ্রেসই প্রথম প্রবর্তন করেছে।' শ্রীসরকার কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—'তথ্য প্রমাণ কিছু আছে?' এবার তাঁর গলার স্বর বেশ বদলে গেছে। আমি উত্তর করলাম—হ্যাঁ আছে, আপনার কাছেও আছে।' 'কোথায়'? বলে দিলাম—'সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানসের দ্বিতীয় চরণে আছে কংগ্রেসের 'কল্যাণ্টিয়রদী' ঢোঁড়াইকে দিয়ে ফল্‌স ভোট দেওয়াচ্ছেন'। এবার নিখিল সরকার হেসে ফেলেছেন। লেখাটিতে আর একটি হাস্যকর তথ্য ছিল। ছোটদের পূজাবার্ষিকীতে গল্পটি বেরিয়েছিল। গল্পের নাম লেখকের নাম কিছুই আজ আর মনে নেই। শুধু মূল ঘটনাটি

মনে আছে। পুর নির্বাচনে রসিকলালবাবু ভোটে দাঁড়িয়েছেন। প্রচার কৌশলে কিছুতেই আর প্রতিপক্ষের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। টাকাকড়ি হু হু করে জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে শেষ বেলায় রসিকবাবু দেওয়াল দখলের লড়াইয়ে হটে এসে এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। তাঁর বাড়িতে একটি অতি দুরন্ত শাদা গরু ছিল। রসিকবাবু শাদা গরুর গায়ের দুদিকে আলকাতরা দিয়ে মোটা বড়ো হরফে লিখে দিলেন রসিকলালবাবুকে ভোট দিন। এবার গরুটিকে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে তার দড়ি খুলে দিলেন। ছাড়াপাওয়া গরু লাফাতে লাফাতে এদিক ওদিক সেদিক সারা ওয়ার্ডে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিল। সেটা বি. জে. পি-র আমল নয়। তথাপি এই অভিনব গব্য কৌশল কাজ দিল। রসিকলালবাবু বিপুল ভোটে জিতে গেলেন।

নিখিল সরকার মহাশয় আমাকে দিয়ে আনন্দবাজারে তাঁর পাতায় অনেক রকমের লেখা লিখিয়েছিলেন। এক ডাক্তারবাবুর কবিতার বই আলোচনা করতে গিয়ে লিখে ফেলেছিলাম— এখানে ডাক্তার জাগ্রত, কবি নিদ্রিত। সেই ক্রুদ্ধ ডাক্তারবাবু আমার উদ্দেশ্যে আনন্দবাজারের ঠিকানায় একটি কঠিন পোস্টকার্ড নিক্ষেপ করলেন। নিখিল সেটা রি-ডাইরেক্ট করে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। এই পাতায় আমি যত লেখা লিখেছি তাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধে একটি স্নিগ্ধ স্মৃতি আমার মনে অমোচনীয় হয়ে আছে। সুকুমার সেনের প্রয়াণের পর নিখিলবাবু আমাকে আনন্দবাজারের বিয়োগপঞ্জীতে আচার্য প্রণাম হিসাবে একটা লেখা লিখতে বললেন। আমি বললাম, ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য সুকুমার সেন সম্বন্ধে লেখার যোগ্যতম ব্যক্তি পবিত্র সরকার—সেখানে আমি কী লিখব? নিখিলবাবু বললেন পবিত্র সরকার অবশ্যই লিখবেন, আপনি আপনার দিক থেকে লিখুন। অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যখন পবিত্র সরকারের সম্পাদনায় সুকুমার সেন স্মারক সংখ্যা বের করলেন, তখন দেখলাম পবিত্র আনন্দবাজারের লেখাটির কথা ভোলেননি। তিনি আমাকে ওই লেখাটিকে বাড়িয়ে আরো গুছিয়ে একটি লেখা লিখতে বললেন। লিখলাম। লেখাটি প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরে একটি কিশোর হাতে লেখা পোস্টকার্ড পেলাম। পত্রলেখক জানাচ্ছেন, আমি তাঁর পিতামহের যে লেখচিত্রটি রচনা করেছি তা তাঁদের খুব প্রীত করেছে। পরে খবর নিয়ে জানলাম, পত্রলেখক সুকুমার সেনের নামসার্থক স্বনামধন্য পুত্রের পুত্র। লেখক জীবনে মাঝে মাঝে দু একটা চিঠি পেতেই হয়। এই আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠিটির কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে।

'দেশ'-সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে আমার একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য তা 'দেশ'-পত্রিকার অফিসে নয়। কয়েক মিনিটের জন্য একটি সভাস্থলে আলাপ হয়ে আমরা পরস্পরের প্রীতিবদ্ধ হয়েছিলাম। সাগরদা আমাকে দরাজ আমন্ত্রণ জানালেন 'দেশ' পত্রিকায় লেখার জন্য। এ প্রসঙ্গে আরো দু কথা পরে বলছি। এখনই যে কথাটা বলব তা প্রীতিকর নয়—'দেশ'-এর পক্ষেও নয়, 'পরিচয়'-এর পক্ষেও নয়। পঁচিশে বৈশাখ নাগাদ 'দেশ' বার করতেন একটি মোটাসোটা সাহিত্য সংখ্যা। সম্পাদকের নিজস্ব উদ্ভাবনায় তা এক এক বছর এক এক রকমের হত। সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যাটিতে মূল্যবান প্রবন্ধ তো থাকতই তার সঙ্গে পরিশিষ্টে থাকত একবছরের বাছাই কবিতার বই গল্পের বই, উপন্যাস ইত্যাদির একটা হদিস। আর 'পরিচয়'-এর শ্রাবণ সংখ্যাটি হত যে কারণে 'পরিচয়' বরাবর বিশিষ্ট

এবং খ্যাত সেই নির্বাচিত পুস্তকের গভীর সমালোচনার সংখ্যা। দুটি সংখ্যাই বই এবং লেখকের ব্যাপারে যাঁরা আগ্রহী কেবল তাঁদের দিকে লক্ষ করে সংকলিত হত। হেটো বাজারি সাফল্য নয়, রীতিমতো অভিজাত পাঠকরা ছিল সংখ্যা দুটির উদ্দিষ্ট। আজ বহুকাল হল 'দেশ'-এর সেই সাহিত্য সংখ্যা আর 'পরিচয়'-এর সেই সমালোচনা সংখ্যা বেরোয় না। কেন বেরোয় না তার কারণ সম্বন্ধে উড়ো গুজব শুনতে পাই এ ধরনের সংখ্যা ব্যবসারিক দিক থেকে কেবলই মার খাচ্ছিল। স্টলে নাকি এরা পড়েই থাকে। কেউ হাতে করে ছুঁয়েও দেখে না। এ যদি সত্যি হয়ও তাহলেও বলতে হয় এতে ব্যবসায়ের দিক থেকে কী সুরাহা হল জানি না, তবে মননের দিক থেকে অবশ্যই ক্ষতি হল। এমনিতেই তো এলোমেলো আবহাওয়া, তার উপর যদি এমন ধারা রাশ্ ছাড়া অবস্থাকে আমরা প্রশ্রয় দিই তাহলে অধঃপতনকে ডেকে আনা হবে। এই আবহাওয়া প্রশ্রয় পাচ্ছে বলেই প্রকাশ্য সেমিনারে দাঁড়িয়ে বেস্টসেলার দর্পিত লেখক এই কথা বলে হাততালি কুড়োন যে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র অঙ্কনে খাটো ছিলেন। বিষবৃক্ষের হীরা চরিত্রের সংলাপ শুনলে তাকে তাঁর কলেজ গার্ল বলে মনে হয়। মূর্খস্য নানা ভঙ্গি। বক্তা ভাল করে বই না পড়ে সমালোচনায় নেমেছেন বলেই এই বিচার বিভ্রম ঘটিয়েছেন। আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর অধ্যাপনা করেছি, কোনোদিন কোনো কলেজ গার্লকে 'গতর' শব্দ ব্যবহার করতে শুনিনি। উক্ত লেখক মহাশয়ের জ্ঞানগম্যি থাকলে হীরার কথার বাঁধুনি থেকে তার শ্রেণী নির্ণয় অবশ্যই তিনি করতে পারতেন। তবে কাকস্য পরিবেদনা— এইসব আপসে পণ্ডিতেরা বোঝেন না বৃহৎ বাণিজ্যিক পত্রিকায় ঠাঁই না পেলে খুঁজে পেতে কেউ এঁদের গল্প পড়তেন না।

বলা দরকার আমি 'পরিচয়' আর 'নতুন সাহিত্য' ছাড়া কোনো পত্রিকার অফিসই চিনতাম না—না 'এক্ষণ' না অনুষ্টুপ, না 'চতুরঙ্গ' না 'সাহিত্যপত্র'। আমার হীনাহং ভাবই আমাকে এসব আড্ডা থেকে দূরে রাখত। 'দেশ' পত্রিকায় না গেলেও 'দেশ' আমার জন্য দরজা খুলে দিয়েছিলেন সাদরে। বর্তমান সম্পাদক হর্ষ দত্ত আমাকে বলেই রেখেছেন—দরজা খোলাই রইল, আপনার মনোমতো লেখা হলেই পাঠিয়ে দেবেন। আমি বিনা নিমন্ত্রণে কোথাও কোনো লেখা লিখিনি। কেবল একখানি লেখা 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছিলাম—বাংলা কথাসাহিত্যে সাহেব চরিত্র। 'দেশ'-এ এই আমার শেষ লেখা। তার পরে একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছিলাম—সুভাষ চৌধুরীর গীতবিতানের জগৎ। এইভাবে লিখতে লিখতে যাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল তাঁদের সঙ্গমাধুর্য এবং চারুভাষণ মনে থেকে গেছে স্বর্ণাক্ষরে। একদিন দুপুরবেলায় এলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। তাঁকে নিয়ে এসেছেন নৈহাটিরই পূর্বতম প্রান্তের অধিবাসী স্বনামধ্যাত স্বকীর্তিপ্রথিত কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী এবং তাঁর ভগিনী অর্চনা আচার্য চৌধুরী। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই খুব খুশি প্রণবেন্দুকে পেয়ে। একে একে আলাপ করিয়ে দিলাম আমার ভাই, ভ্রাতৃবধূ, পুত্র এবং পুত্রবধূর সঙ্গে। বলা হল এঁরা সকলে শিক্ষক। কেবল আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় আমি বললাম—ইনি শিক্ষকতা করেন না। প্রণবেন্দু চেয়ার ছেড়ে সটান উঠে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রীকে বললেন—'হে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী দেবী, আপনাকে নমস্কার।' হাস্যরোলে ঘরখানি পূর্ণ হয়ে গেল। আমার স্ত্রীর কথা উঠল

বলে দুটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা না বলে পারছি না—অবশ্যই দুটি ঘটনা আমার এই অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমার হাতের লেখা খারাপ বলে আমার স্ত্রী আমার লেখার প্রেস কপি তৈরি করে দিতেন। আশ্চর্য হবেন একথা শুনলে যে গোটা 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' তিনি কপি করে দিয়েছিলেন। সংসারের শতেক কর্তব্য পালন করে, দুটো দামাল ছেলে মেয়েকে সামলে এ কাজ তিনি করেছিলেন। একবার 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা থেকে আতাউর রহমান 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'—বিমল মিত্রের এই প্রসিদ্ধ উপন্যাস আলোচনার জন্য আমাকে পাঠালেন। বইটি আমার ভাল লাগেনি। সে কথা জানাতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি। লেখাটি দুখণ্ড বইয়ের অনুপাতেই বেশ বড়ো সড়ো হল। আমার স্ত্রী কপি করে দিলেন। তিনি এত সতর্কতার সঙ্গে কপি করতেন যে আমাকে আর দ্বিতীয়বার পড়তে হত না। আমি আর পড়িনি। রহমান সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়েছি। লেখা ছাপা হলে দেখি, লেখাটির শেষ দুটি বাক্য—কঠিনতম ব্যঙ্গাত্মক বাক্য বাদ পড়েছে। রহমান সাহেবকে ফোন করে আমার ক্ষোভের কথা জানালাম। রহমান সাহেব দেখে শুনে জানালেন তাঁরা কিছু কাট ছাট করেন নি। এবার আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জানালেন, তিনিই বাদ দিয়েছেন। জ্ঞানগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, কারো মনে ব্যথা দিতে নেই। নিজস্ব এই সদাশয়তার জন্য তিনি খুব বিখ্যাত। তিনি একটা কাককেও হুস্ বলতে পারেন না পাছে তার মনে ব্যথা লাগে।

কিন্তু তাঁর উল্টো পরিচয়ও আছে। ত্রৈমাসিক 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার জন্য অনিলকুমার একটি 'নভেলেট' ফরমাস করলেন। এবার আর কপি করতে দিলাম না। নিজেই ধীরে ধীরে লিখে ফেললাম। লেখাটি পেয়ে রুচিবান সম্পাদক মোটেই সুখী হলেন না। তিনি বললেন—এ কী বিশ্রী ব্যাপার। আপনি বিমল মিত্রকে এত সমালোচনা করেন আর নিজেই একটা অতি 'বিমলীয়' লেখা লিখে বসেছেন। ছোট উপন্যাসটির নাম ছিল 'নিবারণের জবানবন্দি'। অনিলকুমার আমাকে আরো কিছু বললেন—আপনার খুব বদনাম হয়ে যাবে। আমি বললাম থাক। বাদ দিয়ে দিন। তিনি বললেন। এখন আর বাদ দেবার উপায় নেই। ম্যাটার কোথায়, প্রেসকে খাওয়াব কী। আমি নৈহাটিতে থাকি। 'নতুন সাহিত্য' যে বেরিয়ে গেছে সে খবর রাখি না। কলকাতা থেকে দু একজন বন্ধু—দীপেন্দ্রনাথ তার মধ্যে অন্যতম আমাকে জানালেন এবারের 'নতুন সাহিত্য' একজন নতুন লেখিকাকে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। শক্তি আছে ভদ্রমহিলার। 'নতুন সাহিত্য' সংগ্রহ করে দেখি ছাপা হয়েছে আমার লেখাটিই। কেবল লেখকের নামটি উড়িয়ে দিয়ে সে জায়গায় বসানো হয়েছে আমার স্ত্রীর নাম—মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি হতবাক। কিন্তু বিস্ময়ের তখনো আরেকটু বাকি আছে। দিন কয়েক বাদে নতুন সাহিত্য ভবন থেকে মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একটি মানি অর্ডার এল। 'নিবারণের জবানবন্দি'র পারিশ্রমিক বাবদ পঞ্চাশটি টাকা। মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে গিয়ে ডাকপিওনের কাছ থেকে ফর্মে সই করে টাকাটা নিয়ে নিজের আঁচলে বাঁধলেন। আমি আর হতবাক নই—বিমূঢ়। ব্যাখ্যা করে দিলেন আমার স্ত্রী—বদনামটা যখন আমার হল, টাকাটাও আমার।

ধীরে ধীরে এবার কলকাতাকে চিনে নিচ্ছি আরো গভীর ভাবে। কলেজস্ট্রীটের ফুটপাথে দেখছি সুকুমার সেন তরুণ গ্রন্থকারকে পরামর্শ দিচ্ছেন এই ভাষায়, বই তো বেরিয়েছে,

বিক্রি কেমন হচ্ছে খবর রাখবেন। আমাকে বলছেন, আপনি যে পত্রিকাগুলির উল্লেখ করেছেন আপনার প্রবন্ধে তার মধ্যে পাঁচ নম্বর পত্রিকাটি এ প্রসঙ্গে আসে না। আপনার কোনো দোষ নেই। যে ইংরাজ লেখকের গ্রন্থ থেকে আপনি তালিকাটি সংগ্রহ করেছেন, সেই সাহেবই মূল ভুলটি করে রেখেছেন। আপনি আর যাচাই করে দেখেন নি। কলেজস্ট্রীট বিখ্যাত তার রেলিঙ-এ ঝোলানো পুরাতন বইয়ের জন্য। আমি নানা ধরণের বই সেখান থেকে কিনতাম। একদিন একটা বই পেয়ে গেলাম যার মলাট নেই, টাইটেল পেজ নেই—একেবারে তেরো পাতা থেকে বইয়ের বাকি অংশটা রয়েছে। পড়ে বুঝলাম বইখানি কলকাতার আগেকার কালের যৌনকর্মী মেয়েদের তাঁদের কাছে আগত বিনোদন বিলাসীদের জন্য ব্যবহৃত গানের সংকলন। ইংরাজি বাংলা মেশানো বেশ কিছু অশ্লীল গানও আছে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখি খান ছয়েক রবীন্দ্রনাথের গানও রয়েছে। একটা গানের কথা মনে আছে 'সে যে পাশে এসে বসেছিল',—বুঝলাম খরিদ্দারের চাহিদা মেটানোর জন্য মেয়েগুলিকে সব রকম গানের জন্যই প্রস্তুত থাকতে হত।

কলেজস্ট্রীটের ওই রেলিঙে ঝোলানো বই দেখতে দেখতে একদিন একটা থাপ্পড় খেলাম। পেয়ে গেলাম একখানি বই—নাম 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'। লেখকের নাম—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন বই। নামমাত্র মূল্যে বইটি কিনে নিলাম। মলাট উল্টে দেখি 'শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-কে। শ্রদ্ধাবনত সরোজ'। মর্মাহত আমি বইখানিতে আমার উৎসর্গপত্রের তলায় লিখলাম 'পুনরায় সরোজ'। বইটি বিষ্ণু দে-কে আবার পাঠিয়ে দিলাম। কয়েকদিন বাদে বিষ্ণু দের চিঠি পেলাম—এক গৃহভৃত্য চাকরি ছেড়ে পলায়নের কালে অনেকগুলি বইই না বলে নিয়ে গেছে। আমার বইটিও তাদের মধ্যে একটি। শুনলাম বটে তবে আমার মর্মপীড়া প্রশমিত হল একথা বলতে পারলাম না। এর মধ্যে বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুর মনোমালিন্য ঘনীভূত—ব্যঙ্গের শরসন্ধানে সিদ্ধহস্ত বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকাতেই লিখলেন 'রাজনীতি নয়, নীতি নয়, শুধু সংস্কৃতি! 'আমরা খুঁজেছি বিলিতি বইতে আপন দেশ/থেকে থেকে বই হারিয়েছে দেশ নিরুদ্দেশ'। তারাশঙ্করের কংগ্রেস-আশ্লেষকে বিদ্রুপ করতে বিষ্ণু দে ছাড়েন নি—'একটি পত্রে আমাকে 'উল্টোরথ'-এ প্রকাশিত একটি তারাশঙ্করের মাপকাঠিতে খেলো উপন্যাস সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'উল্টোরথারূঢ় তারাশঙ্কর'। চিমটি কেটে কথা বলতে এমন দক্ষ বোধ হয় আর কেউ ছিলেন না। তখন কলকাতায় কবিপক্ষে একটি সংস্কৃতি সম্মেলন হত। অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ ছিল কোনো একজন প্রতিষ্ঠিত কবিকে সংবর্ধনাদান উপলক্ষ্যে কিছু অর্থ সম্মান দক্ষিণা বাবদ দেওয়া। বোধ হয় তৃতীয় বর্ষে উদ্যোক্তারা বিষ্ণু দের কাছে গেলেন। তিনি বললেন—কীভাবে আপনারা সংবর্ধনা পাত্র স্থির করছেন? যদি বর্ণক্রম ধরে কবিদের নাম স্থির করেন তাহলে 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' পেরিয়ে 'ব'-এ পৌঁছতে তো অনেক দেরি। আর যদি বয়ঃক্রম অনুসারে কবিনাম নির্বাচন করেন, তাহলে কালিদাস রায় থেকে শুরু করুন। কবিতার প্রতি নিষ্ঠা তাঁরও কিছু কম নয়তো। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বিষ্ণু দের ব্যবধান ক্রমশই বাড়ছে। পাস্তেরনাককে বুদ্ধদেব মনে করতেন মহাকবি। বিষ্ণু দে পাস্তেরনাককে মনে করতেন সেই জাতীয় মানুষ যাঁরা দেশের মধ্যে থেকেই

'এমিগার' হতে পারেন। কোথায় তিনি একথা বলেছেন আমি জানি না—কিন্তু বিষ্ণু দে-র‍ই এক পার্ষদ উষ্মা সহকারে কথাটি প্রচার করতে লাগলেন। আসলে আমরা ছোটরা বড়দের ঝগড়া খুব উপভোগ করতে পারি। বুদ্ধদেব একবার প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্বন্ধে এই অভিযোগ তুললেন যে প্রেমেন্দ্র মিত্র নাকি তাঁর একটি কিশোরভোগ্য উপন্যাসের বিষয় বুদ্ধদেব বসুর একটি উপন্যাস থেকে না বলে গ্রহণ করেছেন। দুদিন অপেক্ষা করে প্রেমেন্দ্র মিত্র জানালেন প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে এই, যে-ইংরেজি বই থেকে বুদ্ধদেব বিষয়টি সংগ্রহ করেছেন, সেই বইটি থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রও বিষয়টি নিয়েছেন। তাই দুটি লেখায় এই মিল ঘটে গেছে। আমরা সকলেই খুব মজা পেলাম। অচিন্ত্যকুমার এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ঠোকাঠুকির গল্পটা বোধ হয় ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেছে—অনেকেই শুনেছেন। আমাকে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নৈহাটির এক রেস্তোরায় বসে বলেছিলেন। তখন অচিন্ত্যকুমারের 'পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণে'র খুব নামডাক। অচিন্ত্যকুমার পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কেমন লাগছে? পবিত্রদার উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে দেখে একটু বিরক্ত হয়ে অচিন্ত্যকুমার ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বোধ হয় কোনো পরম রমণী হলে ভাল লাগত। পবিত্রদা উত্তর দিলেন—'রমণী বা পুরুষ কিছুতেই আমার আপত্তি নেই, আমার আপত্তি ওই 'পরমে'।

কথায় কথায় কলকাতার কথা বেশি হয়ে যাচ্ছে। এবার একটু আমার নৈহাটি-ভাটপাড়ার কথা বলা দরকার। নৈহাটি-ভাটপাড়ার যে তিন ব্যক্তি আমার স্মৃতিতে আজও অম্লান হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে কেউই আর বেঁচে নেই। প্রথমজন ভাটপাড়ার মানুষ—আমার অগ্রজস্থানীয়। এঁর নাম চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য। আমার জীবনে চন্দ্রশেখর-পর্ব উনিশশো বিয়াল্লিশ থেকে কয়েক বছর মাত্র। ইতিহাসের দেদীপ্যমান ছাত্র ছিলেন তিনি। অনার্সে এবং এম.এ-তে দুটোতেই প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। এম.এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। ভাটপাড়া যদিও নৈহাটির পার্শ্ববর্তী তথাপি ভাটপাড়ার সঙ্গে আমার তেমন সম্পর্ক কিছু ছিল না। আমার কাছে ভাটপাড়া মানে চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য। সবে কৈশোর অতিক্রান্ত আমি চন্দ্রশেখরের বৈদগ্ধ্যের উজ্জ্বল আলোকে অভিভূত এবং প্রভাবিত হয়ে পড়লাম। তিনিই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন বিষ্ণু দের কবিতা দুর্বোধ্য এ শুধু একটা অলীক অপবাদ। চমৎকার গম্ভীর গলায় তিনি বিষ্ণু দের কবিতা মুখস্থ বলে যেতেন। 'ঘোড়সোয়ার' শুনতে শুনতে আমি মন্ত্রার্পিত হয়ে যেতাম। সপ্তাহে অন্তত দুদিন আমার বাসা থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। শাদা হাফ সার্ট, কালো পাড় ধুতি, পায়ে কালো চামড়ার চকচকে চটি, হাতে রোলকরা ছাতা, বগলে কবিতার খাতা। আমাকে নিয়ে গঙ্গার ধারের একটা খালি বেঞ্চে বসে তিনি পশ্চিমে মেঘের রংরেঙ্গিনীর খেলা দেখতে দেখতে স্মরণ করতেন কোনো টুকরো মেঘের লীলাবিভঙ্গে লুপ্তনাসা স্ফিংক্স্‌কে। কোনো মেঘের বিলীয়মান মুহূর্তে তিনি পেয়ে যেতেন হয়তো কালিদাসের শ্রোণিভারাদলস গমনা নায়িকার সাদৃশ্য। তারপর শুরু হত তাঁর কবিতা পড়া। খাতা খুলে নিজের লেখা কবিতা তিনি সেদিনের সেই অকিঞ্চিৎকর যুবকের কাছে পড়ে যেতেন। তখন জাপানী আক্রমণ ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে প্রায় সমাসন্ন। তিনি লিখেছিলেন 'লৌহিত্যের জলে পড়ে পীত কুশ্রী বামনের ছায়া'—মনে পড়ে যেত বিষ্ণু দে-র অরণিতে প্রকাশিত কবিতার

পংক্তি 'মুমূর্ষু পীতের বক্ষে হেনো শ্যাম উদ্ধত অঙ্গুলি।' তিনি পড়ে শোনাতেন একটি সদ্যলেখা দীর্ঘ কবিতা—বিরাট গৃহে বৃহন্নলা। ছদ্মবেশ বর্জনের প্রান্ত মুহূর্তে যখন 'জীবনের কুরুক্ষেত্র' বৃহন্নলাকে ডাক দিচ্ছে, এবার যুদ্ধ—কবিতাটি সেই রূপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে মধ্যবিত্তের পেটি বুর্জোয়া অভিমান বর্জনের সংকল্প, পরিশেষে ঘোষিত হচ্ছে এই যুগান্তের ঘোষণা—'জীবনের মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই অজস্র মৃত্যুর। তিনি সুদূর রাজপুতানায় পিলানি কলেজে অধ্যাপনা পেয়ে কিছুকালের জন্য এখান থেকে চলে গেলেন। এখানে দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় বেশ কিছুকাল সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন। সেই সূত্রে এবং 'অরণি'-তে লেখালিখির ভিতর দিয়ে অরুণ মিত্রের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা হয়েছে। কিন্তু কোথাও চন্দ্রশেখরের সাহিত্য-প্রাসঙ্গিক রচনা প্রকাশিত হতে দেখিনি। তিনি যখন অনার্স ছাত্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় তাঁর একটি সাহিত্য বিষয়ক মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। অরণিতে এবং স্বাধীনতায় তিনি ছিলেন মাত্র রাজনৈতিক ভাষ্যকার। সেখানেও তাঁর গদ্যশৈলী সাধারণ-ভোগ্য ছিল না। 'বিপ্রলব্ধা মানিনীর মতো চার্চিল চলেছে রুজভেল্ট সন্নিধানে'—এ গদ্য বৈদগ্ধ্যে সমৃদ্ধ—কিন্তু সকল পাঠক এর নাগাল পাবে না। আমি বিস্মিত হলাম পিলানি প্রত্যাগত চন্দ্রশেখরকে দেখে। চোখের সে উজ্জ্বলতা নেই, মনের সেই চলিষ্ণু স্ফূর্তি নেই। সেই খাতাটা নিয়ে আর একদিন অর্ধমনস্কভাবে বসেছিলেন। খাতার এক জায়গায় দেখলাম এক জটিল নদীর বাঁকের কথা—মৃত্যুর কালো লোমশ হাতছানির কথা রয়েছে সেখানে। তিনি কিসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন? মৃত্যু মুহূর্তে গৃহচিকিৎসকের কাছে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন একটি শব্দ 'ফ্রাসট্রেশন'। কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্যত্র, সেই খাতাখানি গেল কোথায়? সেই খাতার কবিতাগুলি এদিকে ওদিকে প্রকাশিত চন্দ্রশেখরের প্রবন্ধগুলি নিয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারত। তাঁর নিকট বন্ধুরা—তাঁরাও কেউ কম কৃতবিদ্য নয়—এ কাজ কেন করলেন না তা আমি জানি না। বইটি প্রকাশিত হলে আমরা জানতে পারতাম সেদিনের এক যুবকের আবেগ এবং চেতনার আলোড়নকে, হয়তো জানতে পারতাম নিয়তির সঙ্গে করমর্দনে উদ্যত এক বিপর্যস্ত পুরুষকারকে—যাঁর জীবন এবং মৃত্যু দুইই আমার কাছে থেকে গেল অব্যাখ্যাত। তবু সেই খাতাখানাকে খুঁজে পেতে একটা কোনো সংকলন বার করার সময় কিন্তু আজও যায়নি। এর পর সব স্মৃতিই ধূসর হতে হতে একদিন কালের দিগন্তে মিলিয়ে যাবে—রেখামাত্র চিহ্ন কোথাও থাকবে না।

আমি নৈহাটি প্রসঙ্গে তিনজন ব্যক্তির কথা বলব বলেছিলাম। এবার দ্বিতীয় জনের কথা বলি। ইনি হলেন সমরেশ বসু। এঁর কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে আমি কিছু বলেছি। সেগুলি ছিল ঘটনা পরিচয়। ব্যক্তির ভিতরের কথাটি তখন বলা হয় নি। সমরেশ আমাকে শিখিয়েছিলেন দুটি বিষয়। এক হল ভালোবাসা কখনও সুখ বহন করে আনে না, বেদনার বাটখারায় চাপিয়ে ভালোবাসাকে বুঝতে হয়। সতেরো বছরের সেদিনের যুবক তার থেকে বয়সে বড় স্বামী পরিত্যক্ত এক নারীকে নিয়ে যেদিন নৈহাটি ত্যাগ করেছিল, গিয়ে বাসা বেঁধেছিল আতপুরের বস্তিতে সেদিন আকাশের মেঘ ঝড় সবই তার মাথার উপর নেমে এসেছে। কিন্তু সে জেনেছিল যাতনাময় ভালোবাসাকে পথের ধূলায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায় না। উনিশশো সাতষট্টি

সালে সে যখন দ্বিতীয় বিবাহ করল তখনও তার মনের মধ্যে ভালোবাসার সংকট-ই তীব্র হয়ে উঠেছিল। আমি দেখতাম সমরেশ কোথাও শান্তি পাচ্ছে না। নৈহাটিতে তার পুরাতন জীবনে বা কলকাতায় তার নতুন জীবনে সে সর্বত্রই বহন করেছে এক অন্তর্গত অশান্তি। তাই প্রতি সন্ধ্যায় মদের স্রোতে সে সেই অশান্তিকে ডোবাতে চেয়েছে। দ্বিতীয় যে বিষয় সে আমায় শিখিয়েছিল তা হল নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বলিষ্ঠ উদ্দামতা, অপরাজেয়তা। তার মুখে সানা বাউরীর কথকতা শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে যেতে হত। জীবনের অতলান্ত রহস্য সে খুঁজেছিল পোষমানা ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিসরে নয়—তা সে খুঁজেছিল সেই সব মানুষের মধ্যে, শ্রমে, স্বেদে, প্রেমে, সংগ্রামে যারা অবিচল তাদের মধ্যে। রামকিঙ্করের জীবনী উপন্যাস লেখবার সময় আমি দেখেছি তার আর এক মূর্তি। সে ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, বাঁকুড়া থেকে শান্তিনিকেতন এবং আরো নানা স্থল সে ঘুরে বেড়িয়েছে তথ্য সন্ধানে। এই উপন্যাসটিই হতে পারত তার ম্যাগনাম ওপাস। সে একটা চিঠিতে আমায় বলেছিল, সরোজ, তুমি তো আমাকে বলোনি যে [illegible] আসল লেখা এখনও বাকি আছে—নাকি, বলেছিলে আমি বধির শুনতে পাই নি। তার অন্তর্গত অশান্তি এবার আরো তীব্র হয়ে উঠল। সে মাঝে মাঝে আমাকে বলেই যেত সরোজ তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, যেন আমি আমার 'রামকিঙ্কর' শেষ করে যেতে পারি। সে ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারছিল যে তার সময় হয়ে এসেছে। সে আমাকে বলেছিল, জানিস সরোজ রামকিঙ্কর-কথা শেষ না করে আমার মরেও শান্তি নেই, অথচ ওষুধ আর কাজ করছে না। আমার সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎ যেমন করুণ তেমনি মর্মস্পর্শী। সে নৈহাটিতে থাকলে দিনে দুবার করে আমার বাড়ি আসত। বেলা দশটা এগারোটার সময় একবার আর সন্ধ্যা সাড়ে ছটা সাতটায় একবার। সন্ধ্যার আড্ডাটা কেবলই আড্ডা। সকালের আড্ডাটায় নিরিবিলিতে দুজনে বসে সাহিত্য আলোচনা হত। এই সকালবেলাতেই সে আমায় জানিয়ে যেত সে কতটা লিখল, কী লিখল এবং পরে কতটা লিখবে। শেষ যেদিন এল তখন আমি তাকে তিরস্কার করে বললাম, তুমি এলে কেন? আমাকে খবর দিলে আমি নিজেই তো যেতাম। সমরেশ উত্তর দিল, নৈহাটিতে এলাম আর তোমার এখানে এলাম না এ হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আবার কবে আসছ? সে উত্তর করল, "সেটাই কথা"। এই তার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। আমি সেদিন তাকে বলেছিলাম "সমরেশ, আমি তোমার একটা লম্বা সাক্ষাৎকার নেব"। বিদায়ের মুখে ম্লান হেসে সমরেশ বলেছিল, "এবার তুমি আমার সম্বন্ধে সাক্ষাৎকার দেবে।" কে জানত অত দ্রুত তার সেই ভবিষ্যৎবাণী নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হয়ে যাবে। উনিশশো সাতষট্টির মার্চ মাসে তার দ্বিতীয় বিবাহ—উনিশশো অষ্টআশি সালের মার্চ মাসে তার জীবনাবসান। এই একুশ বছর তার জীবনের বিলম্বিত ট্র্যাজিক ক্যাটাস্ট্রোফি। সে যে অশান্তিতে ভুগছিল সে অশান্তি তার স্বকৃত নিয়তির লাঞ্ছনা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কী হল সবটা মিলিয়ে? সে বলেছিল, 'সেটাই তো বুঝে উঠতে পারলাম না।' এর মধ্যে সে রাশিয়া ঘুরে এসেছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় গিয়েছে। কিন্তু আগে যেমন দেখতাম কোথাও থেকে ঘুরে এলে সে দিন কতক সেই ভ্রমণ স্মৃতি নিয়ে বিভোর থাকত। এবারে তার কিছু দেখলাম না।

প্রবন্ধ

আইয়ুবের ধর্ম

শঙ্খ ঘোষ

P31644

চব্বিশ বছর আগে আবু সয়ীদ আইয়ুবের দেহাবসানের পরে তাঁকে নিয়ে লেখা ছোটো একটি শোকলিপির নাম দিয়েছিলাম 'ধর্মহীন এক ধার্মিক'। আজ এতদিন পরেও, আইয়ুবের কথা ভাবতে গেলে এই অভিধাটাই প্রথমে মনে পড়ে। তিনি একজন দার্শনিক, একজন সাহিত্যভাবুক, রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং ভাবনার মধ্যে আমর্ম নিমগ্ন এক জীবনসন্ধানী মানুষ, এমন অনেকরকম পরিচয়েই আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই তো তাঁর বোধজীবনের সূচনাশেষ বাঁধা, 'রবীন্দ্রনাথে পৌঁছলে অন্যত্র চলে যেতে সরে না মন', গালিবের প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে একবার যেমন বলেওছিলেন তিনি নিজে, কিংবা যেমন "পথের শেষ কোথায়" নিবন্ধে লিখেছিলেন যে 'রবীন্দ্রপ্রেমিক বলেই নিজের পরিচয় দিতে চাই'। ঠিকই, এই সবই তাঁর সংগত পরিচয়। তবুও, আমার কাছে তাঁর ভিতরকার গোটা রূপটা যেন ফুটে ওঠে ব্যবহৃত পুরোনো ওই শব্দগুচ্ছে, বলতে ইচ্ছে করে যে আইয়ুব ছিলেন ধর্মহীন এক ধার্মিক মানুষ। এটা-যে কোনো-একটা কথার খেলা হিসেবে এসে পৌঁছয় তা নয়, আসে একটা প্রত্যয় হিসেবেই।

P31644

২.

যে বিশেষ একটা ধর্মসমাজ আর ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়ে জন্ম হয়েছিল আইয়ুবের, 'পান্থজনের সখা'র ভূমিকায় লিখেছেন যে 'তাতে একপ্রকার শান্তি, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ছিল।' কিন্তু সেই নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে ব্যক্তিজিজ্ঞাসা মেটেনি তাঁর, আর সেইজন্য 'সেই আরামের ভিটেবাড়ি ছেড়ে' নিজের মতো করে একটা পথ খুঁজে নিতে হয়েছে তাঁকে। চলার সেই পথে, জীবনবোধের সেই খোঁজে, ধর্ম ধর্মনীতি ধর্মবোধ বিষয়ে তাঁকে ভাবতে হয়েছে আর কথা বলতে হয়েছে বারে বারেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান-নাটকের বিচারে সে-প্রসঙ্গ তো থেকে থেকেই দেখা দেবে, কিন্তু তার বাইরেও ধারণাটিকে তিনি উত্থাপন এবং বিশ্লেষণ করেন অনেকবার। কীভাবে এলিয়ট সাহিত্যের সঙ্গে মেলান ধর্মকে, কীভাবে নেহরু দাঁড়ান ধর্মসমস্যার মুখোমুখি, কীভাবে ভিন্ন হয়ে যায় গান্ধী আর নেহরুর ধর্মচিন্তা, গালিব বা ইকবালের ধর্মবোধেরই-বা স্বরূপ কী, এর সব প্রসঙ্গই চলে আসে তাঁর ভাবনার বৃত্তের মধ্যে এবং সর্বত্রই তিনি দেখান কীভাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের স্বাধীন আর ক্রমিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়। মহান যে ধর্মপ্রবক্তারা এক-একটি ধর্মের সূচনা করেছিলেন একদিন, তাঁরা সেটা করেছিলেন অনুভবের উত্তরণ আর নৈতিক উদ্ভাসনের একটা জায়গা থেকে ঠিকই। কিন্তু তার পরের স্তর থেকেই দেখা দিতে থাকে অনুগামীদের আবেগান্ধ বিশ্বাসের প্রবাহ, ধর্ম ব্যাপারটাকে ভিতর থেকে পাবার বা উপলব্ধি

করবার আর কোনো দরকার হয় না তখন। আর তারও পরে তৈরি হয়ে ওঠে মানবিক সম্পর্ক রহিত কিছু আচার-অনুষ্ঠান, শুকনো অনুশাসন বা কিছু গোঁড়ামি। ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এইভাবে। এইসব আচারের, অন্ধ এইসব আবেগের মধ্যে বন্দী হয়ে যায় ধর্ম, ধর্মই তৈরি করে তোলে কোনো মানুষের চারপাশে জটিল একটা বেড়াজাল। প্রাতিষ্ঠানিক সব ধর্মেই সেটা ঘটে, তফাত কেবল মাত্রায়। আর, মানুষের চিত্তবিকাশকে যা প্রতিহত করে; মুক্ত চিন্তার যা পরিপন্থী, তার পক্ষে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলা সম্ভব নয় স্পিনোজাভক্ত আইয়ুবের পক্ষে। তাই, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই তাঁর কাছে আপন হতে পারে না। এ অর্থে তিনি একেবারেই ধর্মহীন।

তা যদি হয়, তবে তো তাঁকে ধার্মিক বলবার আর কোনো মানে হয় না। ধর্মে বিশ্বাস যাঁর আছে, তিনিই তো ধার্মিক। আর সেই ধার্মিক-ভাবনাপদ্ধতির পরিচয়টা ঠিক কী-রকম? আইয়ুবের বিবেচনায়, 'ধার্মিক বলতে সেই ব্যক্তিকেই বুঝব যাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক সর্বশক্তিমান পরম মঙ্গলময় সত্তার অস্তিত্বে অবিচল আস্থা।' তাঁর 'পান্থজনের সখা' বইটির বিচার করেত গিয়ে অম্লান দত্ত একবার যখন (২১ অগ্রহায়ণ ১৩৮০) প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'ইতিহাস জুড়ে কি আমরা অকারণ অকারুণ্য ও অমার্জনীয় অন্যায়ের ছড়াছড়ি দেখি না? এর পরও কি কোনো করুণাময় ও সর্বশক্তিমান বিধাতায় বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব?' তার উত্তরে অব্যর্থ ভাষায় আইয়ুব তখন (২৪ পৌষ ১৩৮০) লিখেছিলেন : 'কোনো সর্বশক্তিমান সর্বকরুণাময় ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়—বস্তুতপক্ষে এটাই আমার ধর্মভাবনার অন্যতম মূল।' তাহলে, ধার্মিকের কাছে প্রত্যাশিত আস্থা আইয়ুবের নয়, তাই তাঁর স্থিরীকৃত অর্থে তিনি ধার্মিক নন। আইয়ুব মনে করেন যে কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা বিশ্বে এক অর্থহীন যন্ত্রণা অবধারিত, এর প্রশমনের জন্য অলক্ষ্য কোনো শক্তি কাজ করছে না কোথাও, কাজ করছে না কোনো মঙ্গলচিন্তাও। যাঁরা মনে করেন যে তা করছে, তাঁরা যে-ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করেন, সে-কল্পনাটা আইয়ুবের কাছে বিস্ময়কর লাগে। কিন্তু এরও চেয়ে তাঁর বিস্ময়কর লাগে মানুষের এই বিশ্বাস যে, কোনো ধর্ম বা ঈশ্বর প্রশ্নহীনভাবে অব্যর্থভাবে পরমভাবে কারো কাছে সত্য বলে গণ্য হতে পারে; বা, তা শেষ কথা বলে দিচ্ছে বলে কারো মনে হতে পারে। প্রসঙ্গত ইকবালের ভাবনারও একটা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করেন আইয়ুব। ইসলামের পুনর্গঠন বিষয়ক আলোচনায় ইকবাল দেখাতে চেয়েছেন, হজরত মহম্মদকে যে শেষ পয়গম্বর বলা হয়, সেকথার তাৎপর্য শুধু এই যে তাঁর পর থেকে আর কোনো দিব্য উদ্ভাসনের সম্ভাবনা রইল না; প্রত্যাদেশের দরকার হবে না আর। সভ্যতা তখন যুক্তিবোধের এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেছে যে ধর্ম তার অনেক সমস্যার মীমাংসা খুঁজে নিতে পারবে কেবল যুক্তিরই ভিত্তিতে।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলতে পেরেছিলেন বলে জওয়াহরলাল নেহরুর প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করতেন আইয়ুব। অন্যমত বিষয়ে অসহিষ্ণুতা, স্বাধীন চিন্তার বিরোধিতা, কায়েমি স্বার্থের পোষকতা—এসব ছাড়াও চলতি ধর্মগুলির বিরুদ্ধে নেহরুর অন্য একটা আপত্তি ছিল এই যে এখানে কেবল ব্যক্তিগত সিদ্ধির পথ খোঁজা হয়। অর্থাৎ,

যিনি ধার্মিক তিনি চান তাঁর নিজস্ব মুক্তি। আইয়ুব অবশ্য তা ভাবেন না। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, সব ধর্মচারীরই সেটা পথ নয়, অনেকেই কাজ করেন সমাজের জন্য, সামাজিক মুক্তির জন্য। কিন্তু কোন্ অর্থে সামাজিক মুক্তি সেটা? আইয়ুব বলবেন, একটা ভিন্নরকম আধ্যাত্মিক অর্থে। সমাজের বদল নয়, তাঁরা চান সামাজিক মানুষদের নিজস্ব ব্যক্তিমনের বদল শুধু। ধার্মিক যদি ভাবেন যে ঈশ্বর সর্বশক্তিময় এবং মঙ্গলময়, তাহলে সমাজে শক্তি বা মঙ্গলের প্রসারণ তো ঈশ্বরেরই দায়, তাঁরই কাজ, মানুষের সেখানে আর করণীয় কিছু থাকে না, থাকতে পারে না। সেইজন্য, সর্বমানবের জন্য গান্ধী হয়ে দাঁড়ান—আইয়ুবের ভাষায়—'a spiritual healer', আর নেহরুর পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় 'a social engineer'। অবশ্য, গান্ধী বিষয়ে নেহরুর বক্তব্যেও যে শুধু ব্যক্তিমুক্তিরই কথা ছিল তা নয়। তাঁরও আপত্তি এইখানে যে এইসব ধার্মিকেরা ভাবেন যে আমাদের কাজ শুধু 'to change the people's hearts'. এছাড়া ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে আর সবকিছুই যেন ঠিকমতো চলছে, তাঁর অভিপ্রায়মতো। এই হলো এক ধর্মীয় দৃষ্টি। এই ধর্মীয় দৃষ্টি দিয়ে জগৎ-জীবনকে দেখেন না আইয়ুব, এই অর্থে তিনি ধর্মহীন।

৩.

কিন্তু ধর্ম শব্দটাকে অন্য ভাবেও ব্যবহার করি আমরা। পদার্থের ধর্ম, জীবের ধর্ম, পশুর ধর্ম—কেবলমাত্র এইসব ব্যবহারের কথা বলছি না এখানে। "সাধু এবং সজ্জন" প্রবন্ধে আইয়ুব লিখেছিলেন : '...বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় "ধর্ম" শব্দটা বড়ো আচারভ্রষ্ট—অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী। ...লক্ষ্মীর স্বভাবধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম, ধর্মাধর্ম, বায়ুর ধর্ম—ইত্যাদি ব্যবহার।' ধর্ম নামের এই 'অনভিজাত শব্দটাকে জাতে তুলবার জন্য, আইয়ুবের মনে হয়েছিল, এর কিছু 'অর্থশুদ্ধি প্রয়োজন'। সেই প্রয়োজনেই ধর্ম বা ধার্মিক শব্দটিকে তিনি সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন এই অর্থে যে ধর্মে আস্থাবান ধার্মিক হচ্ছেন সেই মানুষ 'যাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক সর্বশক্তিমান পরম মঙ্গলময় সত্তার অস্তিত্বে অবিচল আস্থা', যে-কথার একবার উল্লেখ করেছি আগে।

'সীমাবদ্ধ' শব্দটাকে সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছি এখানে। অর্থাৎ, এই প্রশ্নটা তুলতে হবে, অর্থশুদ্ধি ঘটাতে গিয়ে 'ধার্মিক' শব্দের যে বিশিষ্টতার কথা বলছেন আইয়ুব, তাতে কি সবসময়ে আমাদের কাজ চলবে? পদার্থের ধর্ম বায়ুর ধর্ম জীবের ধর্ম ধর্মাধর্ম ইত্যাদির বেলায় এদের বিশেষিত করবার জন্য ধার্মিক শব্দের দরকার হয় না। ধার্মিক শব্দের প্রয়োগে যেসব ধর্মাচারীদের আমরা বুঝতে চাই বা দেখতে পাই প্রাত্যহিক জীবনে, তাঁরা কি সকলেই সর্বশক্তিমান পরম মঙ্গলময় এক সত্তার অস্তিত্বে আস্থাবান? বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী সাধকদের কি তবে আমরা ধার্মিক বলব না, বলি না? তা না বললে অর্থশুদ্ধিটাকে একটু কি বেশিমাত্রায় শুদ্ধিবাদী হয়ে উঠতে হয় না?

মনে হয় এই একটি বিশেষ লেখার জন্যই—অর্থশুদ্ধি নয়—ধার্মিক শব্দের একটা অর্থসংকোচন তৈরি করে নিয়েছেন আইয়ুব। জীবন বিষয়ে দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর

আলোচ্য এখানে, এই "সাধু এবং সজ্জন" প্রবন্ধে। একদিকে, যাঁরা মনে করেন যা-কিছু আছে তার সম্যক উপলব্ধিটুকুই আমাদের কাজ; অন্যদিকে, যাঁরা ভাবেন, বর্তমান অবস্থানটাকে পালটাবার অনেক সম্ভাবনা আর দায়িত্ব পড়ে আছে আমাদের সামনে। এর প্রথম মানসিকতাটাকে বুঝবার জন্য 'ধার্মিক' শব্দটা যে খুব জরুরি ছিল তা হয়তো নয়, কিন্তু আইয়ুব তা-ই করছেন। তবে, সর্বত্রই যে সেটা তিনি করেন এমন নয়। 'পথের শেষ কোথায়' বইটিতে "সাধু এবং সজ্জন" প্রবন্ধের ঠিক পরেই যে লেখাটি বিন্যস্ত আছে, সেই "সেকুলারিজম্ ও জওয়াহরলাল নেহরু"তেই 'ধর্মের শাস্ত্রমানা দলবদ্ধ রূপের' উলটোদিকে তার আরেকরূপের কথা লিখতেই হয়েছে তাঁকে : 'ধর্মভাবের একটি অর্থ অনন্তের প্রতি রহস্য, বিস্ময়, আনন্দ ও শ্রদ্ধার ভাব।' এই ভাবটা আছে বলে নেহরুকে কি আমরা ধার্মিক বলতে পারি? এর উত্তরে কেউ কেউ হয়তো একটু ইতস্তত করবেন। কিন্তু আইয়ুব তা করেন না, সরাসরিই বলেন : 'এই অর্থে নেহরুকে ধার্মিক না বলে উপায় নেই', এবং এও বলেন যে 'নেহরুর মনের এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।' আকর্ষণ করে, কেননা এখানে তিনি নিশ্চয় তাঁর নিজস্ব মনেরও একটা সাযুজ্য পেয়ে যান।

প্রতিষ্ঠানগত বা সম্প্রদায়গত ধর্মের বোধ থেকে নিজেকে যখন বিযুক্ত করে নিতে পারেন কেউ, তখন তাঁকে এগোতে হয় কিছু ব্যক্তিগত সন্ধানের দিকে, কয়েকটি প্রশ্নের দিকে। কোনো ধর্ম মানি বা না মানি, এই একটি সমস্যার মুখোমুখি না হয়ে আমরা পারি না যে আমাদের এ জীবনটার আদি-অন্ত কী। যে-বিশ্বজগতের মধ্যে আমাদের বসবাস, তার ঠিক-ঠিক পরিচয় কী? তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটাই-বা কী-রকম? প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে না এগিয়েও আমি হয়তো কল্পনা করতে পারি যে আমাদের জীবনের কোনো-এক অলৌকিক নিয়ন্তা আছেন, ভাবতে পারি যে সেই নিয়ন্তার সদিচ্ছায় বা পরিচালনায় আমার এবং আমাদের জীবন চলছে। এসব ভেবে আমি একরকম আশ্বাসময় শান্তি পেতে পারি। আবার এও হতে পারে যে এমন-কোনো অস্তিত্বে আমি কোনো আস্থা রাখতে পারছি না, অবিরাম উদ্দেশ্যহীন এবং ব্যাখ্যাতীত ধ্বংসকাণ্ড দেখতে দেখতে আমি ভাবতে পারি যে আমাদের এই জীবন একটা বিরাট অপচয় ছাড়া কিছু নয়। ভাবতে পারি, কিছুরই কোনো মানে নেই। একটা অনির্ণেয় বিপুল শূন্যের ভিতরে আমাদের আকস্মিক অস্তিত্ব আর বিলয়। জীবন বিষয়ে একটা বিতৃষ্ণার বোধ হতে পারে তখন।

কিন্তু এই দুই বিপরীতের বাইরে আরো নানা রকমের বোধের অস্তিত্ব সম্ভব। এ জগৎ আমার কাছে ব্যাখ্যার অতীত, আমার বা আমাদের দুঃখ বা অপচয়েরও কোনো সীমা নেই, কিছু-যে মানে নেই সেটাই এ-জীবনের একটামাত্র মানে—একথা বুঝে নেবার পর নিজেদেরই মধ্যে জীবনের কিছু সম্পর্কমুহূর্ত আনন্দমুহূর্ত নিজেরই চেষ্টায় তৈরি করে তুলতে পারি আমরা, আর সেইসঙ্গে চারপাশের বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে গড়ে নিতে পারি এক সংযোগ। তখনই দেখা দেয় ভঙ্গুরতার মধ্যেও একটা ভালোবাসার বোধ : বন্ধুর জন্য, প্রেমের পাত্র বা পাত্রীর জন্য, প্রকৃতির জন্য। বিনাশ অনিবার্য জেনেও বিকীর্ণ

প্রাকৃতিক অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হতে থাকি তখন। এ মুগ্ধতা আছে তুচ্ছের মধ্যে, আছে বিশালের মধ্যে : ছোটো একটি ফুলের বিকাশে কিংবা উদাত্ত কোনো পার্বত্য মহিমায়। ভয়ংকরের মুহূর্তেও তখন দেখা দিতে পারে সুন্দর। আমাদের কারো কারো মনে পড়তে পারে, পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ব্রহ্মপুত্রের বিধ্বংসী প্লাবনে বিপর্যস্ত মানুষজনকে আশ্বাস দেবার জন্য আকাশপথে যখন এসেছিলেন নেহরু তাঁর প্রশাসনিক এবং সামাজিক কর্তব্যবোধে, মত্ত জলপ্রবাহের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মহারা বিস্ময়ে তখন তিনি বলে ফেলেছিলেন : কী অনির্বচনীয় এই দৃশ্য! প্রত্যাশিতভাবেই পরের দিনের প্রভাতী কাগজগুলিতে অনেক ধিক্কারবাক্য ছাপা হয়, দুর্গত মানুষদের কথা ভুলে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কবিত্ব করছেন বলে বিদ্রূপের বন্যা বয়ে যায়। ঠিকই, সে-মুহূর্তে নেহরু হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী বা একজন সামাজিক মানুষ। প্রত্যক্ষবর্তী অসহায় মানুষজনের বিপন্নতার কথা ভুলে যাওয়া যে তখন সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও, তার বিনাশী শক্তি নিয়েও প্রকৃতি যে এমন অপরিসীম রহস্যবিধুরতায় তাঁর সামনে দেখা দিচ্ছে তাকে স্বীকার না করা বা সেই বিস্ময়বোধ প্রকাশ না করাও তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব।

ধ্বংসকে পটভূমিতে রেখেও সৃষ্টির এই রহস্যবোধের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আইয়ুব। এই 'অনন্তের প্রতি রহস্য, বিস্ময়, আনন্দ ও শ্রদ্ধার ভাব' এবং তার সঙ্গে মেশানো অপার এক দুঃখের উপলব্ধি, এই নিয়ে গড়ে ওঠে বিশ্ব বা জীবন বিষয়ে তাঁর ধারণা। আর তখন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জাত তাঁর এই বোধকেই বলা যায় তাঁর ধর্ম। জিজ্ঞাসায় এবং বিস্ময়ে, দুঃখে আর আনন্দে, যখন আমার পরিপার্শ্বের সঙ্গে বা গোটা বিশ্বের সঙ্গে কোনো যোগ অনুভব করি আমরা, তখনই বলা যায় যে আমাদের মধ্যে যেন কোনো এক অন্তরাত্মার বিকাশ ঘটছে, নিজের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে তখন আরো চিনতে পারি আমরা। যতটাই আমরা জানি বহির্জগৎকে, ততটাই বুঝতে পারি আমাকে। আর এই বুঝে যাওয়ার কোনো ক্লান্তি নেই, এ কেবলই চলতে থাকে, কেবলই একটা সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে আমাদের মধ্যে, নেহরু যাকে বলেছিলেন 'the inner development of an individual, the evolution of his consciousness in a certain direction which is considered good', আর রাধাকৃষ্ণনের ভাষায় যাকে বলা যায় এক 'transforming experience'। এ-রকম পরিবর্তন ঘটাতে পারে আমার ভিতরকার যে শক্তি, তাকেই তখন বলতে পারি আমার ধর্ম। ধর্ম শব্দ তখন স্বতন্ত্র একটা মাত্রা পেয়ে যায়। আর সেই ধর্মের পরিচয়ে, ক্রম-উদ্ভিদ্যমান সেই ধর্মের নিরিখে, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত becoming বা হয়ে ওঠায়, আইয়ুবকে অবশ্যই বলা যায় ধার্মিক।

অম্লান দত্তের বিচারের উত্তরে আইয়ুবের যে লেখাটির কথা আগে বলেছি, তাতে ওঁর নিজের ভাষাতেই একটা কথা ছিল : '..এটাই আমার ধর্মভাবনার মূল।' কোন্‌টা? তার না-এর দিকটা হলো কোনো সর্বশক্তিমান সর্বকরুণাময় ঈশ্বরে বিশ্বাস না করা। আর তার হাঁ-এর দিকটা ব্যক্ত ছিল এই কথাগুলিতে :

কয়েক কোটি বৎসর পূর্বে এককোষী জীবাণু থেকে প্রাণবিবর্তনধারা চলে

> আসছে পাইথেকাস অ্যানথ্রোপাস পর্যন্ত, সেটা বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্য; সেখানে সন্দেহের অবকাশ নেই। এমন আশ্চর্য বিবর্তন ঘটেছে প্রাকৃতিক নিয়মেই, যখন একথা ভাবি, এবং ভাবি যে এরই মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন এমন কতিপয় মহামানব যাঁরা মর্ত্যের সীমানা প্রায় ছাড়িয়ে গিয়েছেন, তখন আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই, মনে হয় যেন এক অপার মহিমান্বিত রহস্যের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি। প্রাণী-বিবর্তনের যেটুকু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি পড়েছি তা আমার কাছে সন্তোষজনক ঠেকে না, তাতে chance-এর আসন বড় প্রশস্ত। এই রহস্যবোধকে একপ্রকার ধর্মভাবনা বলা যায়,...

কথাটা শেষ হয়েছে এই বলে যে, ধর্মভাবনা বলা গেলেও একে 'ঈশ্বরে বিশ্বাস বলা যায় না।' তাহলে, তাঁর নিজেরই স্বীকৃতিমতো, বিশ্ববিধানের মঙ্গলশক্তিতে আস্থাহীন এবং ঈশ্বরবিশ্বাসহীন এক রহস্যপ্রাণ ধর্মভাবনায় অধিষ্ঠিত ছিলেন আইয়ুব। এই অর্থে তিনি ছিলেন এক ধার্মিক। সে-ধার্মিকতা গড়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম (উইলিয়ম জেম্‌স-বর্ণিত personal religion-কে স্মরণ করেন আইয়ুব) থেকে। ধর্মসম্প্রদায়ের অবসান চান আইয়ুব। কিন্তু চান না এই ব্যক্তিগত ধর্মের 'অবক্ষয়'। লিখেছেন তিনি : 'হোয়াইটহেডের সংজ্ঞানুযায়ী "Religion is what the individual does with his own solitariness." সেই নিভৃত ধর্মের আসন পাতা থাক আমাদের মনে-মনে।' মানবসমাজে ওই মনটির বিস্তার চান আইয়ুব।

৪.

প্রতিষ্ঠানলব্ধ এবং অতিস্থিরীকৃত ধর্ম থেকে দূরে এসে যদি এমন-কোনো ব্যক্তিগত ধর্মের দিকে আমাদের পৌঁছতে হয়, মনের মধ্যে এমন কোনো নিভৃত আসন পাততে হয়, তবে তার পথ পাওয়া যাবে কোথায়? এ-প্রশ্নটারও মুখোমুখি হয়েছেন আইয়ুব। বিবেকানন্দের একটি আশ্চর্য মন্তব্যের উল্লেখ করেন তিনি, যেখানে বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে পৃথিবীতে যতজন মানুষ ঠিক ততগুলিই হোক ধর্ম, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তৈরি হয়ে উঠুক তাঁদের নিজস্ব ধর্মচিন্তা আর সাধনপদ্ধতি। কিন্তু ব্যক্তিগত এই ধর্মচিন্তা গড়ে তুলবার দিশা পাওয়া যাবে কোথায়? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে তার একটা পথ হতে পারে বলে আইয়ুবের বিশ্বাস। ইস্কুলজীবনে এমন কোনো ধর্মের শিক্ষা ছোটোদের দেওয়া উচিত নয় যার থেকে সম্প্রদায়বোধ তৈরি হতে পারে, অর্থাৎ কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কথাই সে-স্তরে আলোচ্য নয়। কিন্তু উলটোদিকে, ব্যক্তিধর্মের মূল যে উপাদান, সেই 'মানবপ্রেম এবং অনন্ত বিশ্বের প্রতি গভীর রহস্যবোধ' তাদের মধ্যে সঞ্চার করে দেওয়া চাই, আর সেটা সম্ভব হতে পারে শুধু 'শ্রেষ্ঠ শিল্প সাহিত্য সংগীত'-এর আস্বাদন থেকে।

আইয়ুবের ভাবনায় এইভাবে ধর্মের সঙ্গে এক নান্দনিক চেতনার সংযোগ ঘটে যায়। 'স্পিনোজা শান্তিলাভ করেছিলেন নান্দনিক উপলব্ধিতে পৌঁছবার সফল সাধনায়' বলেন

আইয়ুব। আর বিশ্ব বিষয়ে এই নান্দনিক উপলব্ধির পথে শিল্পসাহিত্যকে পাথেয় করেন আইয়ুব, তিনি বিশ্বাস করেন যে মহৎ শিল্পের অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে এক প্রগাঢ় বিষাদমাখানো শান্তি এনে দিতে পারে, এনে দিতে পারে কাঙ্ক্ষণীয় পরিবর্তন। শিল্পরচনা বা শিল্প-আস্বাদনটাই তখন হয়ে ওঠে এক আধ্যাত্মিক সাধনা। খেয়াল রাখতে হবে যে "বন্ধুবরেষু" নামের আশীর্বাণীটিতে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে আধ্যাত্মিক সাধনা বলতে তিনি বোঝেন 'সাহিত্য-সংগীত-দর্শন-ইতিহাস-জনসেবা ইত্যাদির সাধনা, পর্বতগুহায় নিশ্চল বসে তপস্যা নয়।' এসব সাহিত্য বা শিল্প কি আমাদের কাছে নিছক সুখদায়ক বা তৃপ্তিদায়ক হয়ে দেখা দেয়? সেইজন্যই তার সাধনা? সে কি আমাদের কোনো নীতিবোধে ভরিয়ে দেয়? তা কিন্তু নয়। মহৎ শিল্প এনে দেয় পরম প্রশান্তি আর পরম বিষাদবোধের মধ্য দিয়ে প্রসারিত এক জীবনবোধ, বিশ্ব আর ব্যক্তিকে নিয়ে যে-জীবন। জীবনজগৎকে যেভাবে আমি দেখতাম আগে, মহৎ শিল্পে অভিজ্ঞতার পর তার থেকে একটু হয়তো ভিন্নভাবে দেখতে শিখি তাকে। উলটোদিকে থেকে বলা যায়, সেই শিল্পই হয়ে ওঠে মহৎ, যা আমাদের এভাবে দেখতে শেখায়, যা আমাদের এভাবে পালটে দিতে পারে। শিল্পকে সেই মহিমায় পৌঁছে দিতে হলে শিল্পীর চাই সর্বধারণক্ষম এক বিশ্ববীক্ষা (আইয়ুবের ভাষায় 'বিশ্বনিরীক্ষা')। তাই আইয়ুবের ধর্ম তাঁকে কাব্যবিচারে বা শিল্পবিচারে নিয়ে আসে যখন, স্বভাবতই তখন তাঁর বিচার্য হয়ে ওঠে কবির বা শিল্পীর সেই বিশ্ববীক্ষার সামগ্রিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা।

রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা বিষয়ে অরুণকুমার সরকারের সঙ্গে তর্কসূত্রে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন আইয়ুব। বোদলেয়রের কবিতায় যে বিশ্বনিরীক্ষাটা আছে তার মূল কথা হলো 'শূন্যতা, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বিবমিষা, একঘেয়েমি এবং অর্থহীনতার বোধ।' অরুণকুমার প্রশ্ন তুলেছিলেন, এছাড়া আর 'কী আছে এ-যুগের মানুষের সামনে?' বোদলেয়রের কবিতা আধুনিক পাঠকের ভালো লাগে এই কারণে যে 'সেখানেই সে অভিশপ্ত আধুনিক জীবনকে ঘৃণা করতে পারছে।' এই ঘৃণাটাই তবে বিশ্বজগৎ বিষয়ে আমাদের একমাত্র অভিব্যক্তি? আইয়ুব বিশ্লেষণ করে বোঝান যে জীবনকে এইভাবে দেখাটা তাকে নিতান্ত খণ্ডিত করে দেখা, "আধুনিক কাব্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও যেভাবে বলেছিলেন। দেশ আর কাল দুদিক থেকেই ও-দেখাটা খণ্ড দেখা। আইয়ুব বলেন :

> জড়জগৎ, প্রাণীলোক এবং মানুষ—প্রকৃতির এই তিনটে বিভাগ, কিন্তু বিচ্ছেদ নেই তাদের মধ্যে; জড় থেকে জীব, জীব থেকে মানুষ—বিবর্তনধারা নিরবচ্ছিন্ন। কেমন করে মানুষ একদিকে জড়প্রকৃতির সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ, অন্যদিকে পরমাত্মার সঙ্গে? অথচ পরমাত্মা তো বিশুদ্ধ সাক্ষী, যেন প্রকৃতির বাইরে থেকে যাবতীয় প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করছেন। এইসব রহস্যের কথা কি বোদলেয়র বা কামু কখনো ভাবেননি? ভাবলে কি তার কোনো তল, কোনো শেষ পেতেন? শুধু জড়প্রকৃতির স্ফুরণের, শুধু প্রাণী-বিবর্তনের ইতিবৃত্ত কি অফুরন্ত রোমাঞ্চ ও বিস্ময় জাগায় না?

অন্যদিকে, যাঁর মনে এই বিস্ময় আর রোমাঞ্চের অফুরন্ত বোধ আছে, তিনি যে বিশ্বজগতের নিস্পৃহ বা অ-মাঙ্গলিক দিকটাকে দেখতেই পাবেন না, এমনটা না-ও হতে পারে। 'সমস্ত জাগতিক দুঃখ ও পাপের কথা মনে রেখেও জীবনকে ভালোবাসেন' কোনো কবি, ভালোবাসতে পারেন—এটা কিছু অসম্ভব নয়। আর, কেউ যখন তা পারেন, তখন তাঁর সৃষ্ট শিল্পজগতের মধ্য দিয়ে আমরা ব্যাপ্ততর গভীরতর সত্যতর ভাবে বিশ্বকে এবং নিজেকে বুঝতে পারি। আর বুঝতে পারার সেই পথেই আইয়ুব পৌঁছে যান তাঁর রবীন্দ্রনাথে, কেননা রবীন্দ্রনাথে তিনি সেই সামগ্রিকের অভিজ্ঞতা খুঁজে পান, কিংবা খুঁজে পান সন্ধানের তীব্র আকুতি। 'বিশ্বজগতের দোষত্রুটি অপূর্ণতা কি দেখতে পাই না আমরা? তবু তা অসীম রহস্যাবৃত এক চিরবিস্ময়—দর্শনের উৎস সেখানে, কবিতারও উৎস সেখানে।...সামনে রয়েছে ছোটো বড়ো মহলের পর মহল; আর অন্তঃপুরের গোপন কথার, নীরব ইশারা-ইঙ্গিতের কি কোনো অন্ত আছে? অন্তবান কবি আছেন, তাঁদের সার্থক সৃষ্টি সশ্রদ্ধ হৃদয়ে স্বীকার করি আমি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই অত্যল্প সংখ্যক অন্তবিহীন কবিদের এ-জন যাঁদের কাব্যরচনার গূঢ় ব্যঞ্জনা ভূতল ছাপিয়ে কোন পারিজাত-সুরভিত লোকে নিয়ে যায় রসিক হৃদয়কে...।'

এই রসিক হৃদয়ই জাগিয়ে তোলে আইয়ুবের ধর্মকে। মহৎ কবির কাছে—কোনো নীতিশিক্ষা নয়—নান্দনিক দিক থেকে যদি 'অনুভূতির সূক্ষ্মতা, প্রশস্ততা, উদারতা' পেয়ে যাই (ভূমিকা : 'পান্থজনের সখা'), তবে সেটাই গড়ে তুলতে পারে আমার ধর্ম। গড়ে তুলবার সেই পথে আইয়ুব এক পান্থজন। আর তাঁর সখা? না, ঈশ্বর নন, এ পথে তাঁর চিরসখা হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ।

৫.

একটা প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথের যে-বিশ্ববীক্ষাকে পাথেয় করে নেন আইয়ুব, যার কথা পরতে পরতে তিনি উদ্‌ঘাটন করে দেখান তাঁর বহুতর রবীন্দ্রবিচারে, তা কি সম্পূর্ণতই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি থেকে উদ্‌গত? না কি তার সঙ্গে আইয়ুবের স্বনির্ভর নিজস্ব বীক্ষারও অনুরঞ্জন লেগে আছে কোথাও কোথাও? রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সঙ্গে তাঁর নিজের ভাবনা মিলেমিশে গিয়ে কখনো কখনো একটা মিশ্রবোধ তৈরি হয়ে ওঠে কি না, সেটা বিচার করবার বোধ হয় অবকাশ আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের কাছে সেটা প্রাসঙ্গিক নয়। প্রাসঙ্গিক কেবল এইটুকু বুঝে নেওয়া যে এই মিলেমিশে যাওয়ার জন্য অনেকসময়ে আইয়ুবের নিজস্ব দৃষ্টিটাকে বুঝতে কোথাও অসুবিধে হচ্ছে কি না, রাবীন্দ্রিক বিশ্বাসটাকেই সর্বতোভাবে তাঁর বিশ্বাস বলে কারো কখনো মনে হচ্ছে কি না। প্রশ্নটা জরুরি মনে হয়, কেননা একাধিকবার তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবুকজনেরাই এমন ভাবায় তাঁর ভাবনাকে পেশ করেছেন যে নাচার হয়ে বারেবারেই তার প্রতিবাদ করতে হয়েছে আইয়ুবকে। কিন্তু সে তো যখন তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর?

আইয়ুবকে যাঁরা সবচেয়ে বেশি বুঝতেন আর ভালোবাসতেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান

একজন শিবনারায়ণ রায়। আইয়ুবকে তাঁর সংগত ভাবেই মনে হয় 'সৌম্য প্রমিথিউস', তাঁর 'তুল্য সুসংস্কৃত পুরুষ' জীবনে কচিৎ দেখেছেন তিনি, তাঁর চরিত্রের 'সৌন্দর্য ও নির্মলতা, তাঁর নির্মৎসর আভিজাত্য এবং অনুশীলিত সুবেদিতা, কৌতূহলের ব্যাপ্তি এবং বুদ্ধির অন্তর্দীপন, যন্ত্রণাবিজয়ী প্রজ্ঞা এবং কল্যাণকামী ঔদার্য'কে অভিবাদন জানান শিবনারায়ণ। কিন্তু সেইসঙ্গে আরো দু-একটি কথা তিনি বলেন, বেঁচে থাকলে যার হয়তো প্রশান্ত একটা প্রতিবাদই করতে হতো আইয়ুবকে। '...শুধু মানবীয় নয়, বৈশ্বিক অস্তিত্বের কেন্দ্রে এক অক্ষয় মঙ্গলময়তায় আস্থাবান ছিলেন' আইয়ুব, তাঁর সমস্ত ধর্মবোধের মধ্যে এইটেই কি শেষ পর্যন্ত হতে পারে তাঁর পরিচয়? রবীন্দ্রনাথ-আইয়ুব কি একাঙ্গ হয়ে আছেন এখানে? ওই একই পরিচয় তো ছিল আইয়ুবের জীবনকালে প্রকাশিত অম্লান দত্তের লেখাতেও যে সাময়িক নানা 'অধঃপতন সত্ত্বেও মানবযাত্রী এগিয়ে চলেছে মঙ্গলের দিকে, এ বিশ্বাস ছাড়া আইয়ুব নাস্তিগহ্বর পার হয়ে জগৎকে আস্তিক্যের আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন না।' কিন্তু আইয়ুব নিজে মনে করেছিলেন যে অক্ষয় মঙ্গলময়তা বা মঙ্গলের দিকে চিরপ্রবহমানতায় বিশ্বাস ছাড়াই জগৎকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন, তবে তা কোনো 'আস্তিক্যের আনন্দে নয়', 'একপ্রকার ট্র্যাজিক উপলব্ধিতে'। তিনি জানেন যে সৌরমণ্ডলের তথা সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডলের তাপমৃত্যু অনিবার্য, তিনি জানেন যে 'প্রাকৃতিক জগৎকে আমরা কসমস বলি, কিন্তু তার গতি কেঅসের দিকেই', তিনি জানেন যে প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা বিশ্বে এক অর্থহীন যন্ত্রণা অবধারিত, তিনি জানেন যে 'আমরা মঙ্গলবিধানের (moral order) আশ্রয়ে বাস করছি না, কোনো মঙ্গলবিধাতার অস্তিত্বে আস্থা রাখতে পারি না', যদিও বিস্ময়কর ভাবে এরই মধ্যে 'যুক্তিনির্ভর ধর্মজিজ্ঞাসা সম্পন্ন মানুষের' অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। অম্লান দত্তের উত্তরে নিজের যে 'একপ্রকার ট্র্যাজিক উপলব্ধি'র কথা আইয়ুব লিখেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বার কথা "পান্থজনের সখা" প্রবন্ধের এই উচ্চারণ :

> ...কে না জানে যে, ট্র্যাজিক উপলব্ধি সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে যিনি প্রচলিত অর্থে ভগবানে, সর্বশক্তিমান সর্বকল্যাণময় বিধাতার অমোঘ নৈতিক বিধানে, এবং প্রধানত নৈতিক বিধান রক্ষা করবার জন্যই মানবাত্মার অমরতায়, পরকালে বা জন্মান্তরে, দৃঢ় বিশ্বাসী।

দৃঢ় এই বিশ্বাসটা ছিল না বলেই আইয়ুব এমন কী এতটাও বলতে পেরেছিলেন যে জীবনের দুঃখকষ্টকে বিধাতার নিষ্ঠুরতা বলবার মধ্যেও একটা সচেতন সম্পর্কের ধারণা কাজ করে, তার মধ্যে খানিকটা যেন আবদারের ভাব আছে। নিষ্ঠুরতা নয়, 'আমাদের মুখোমুখি আছে কেবল উদাসীনতা, বধিরতা, নিরুত্তরতা।'

তা সত্ত্বেও কি জীবনকে ভালোবাসা যায়? আইয়ুবের ধর্ম বলবে, যায়। তাঁর প্রিয়তম দার্শনিক স্পিনোজাও বলবেন. যায়। কেননা তখনই, সেই বধির উদাসীনতার মুখোমুখি হয়েই, আমাদের এই খণ্ড জীবনটুকুকে সাজিয়ে তুলতে পারি অক্ষয় ভালোবাসায়। সখ্যে প্রেমে সে-ভালোবাসা সঞ্চারিত হয়ে যায় মানুষ থেকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতি থেকে

জ্যোতির্লোকে। আর এই ভালোবাসার বোধই ব্যক্তিচরিত্রে এনে দেয় এমন এক বিভা, চিন্তা বা বিবেচনার ভিন্নতাতেও কখনোই যা কোনো সম্পর্ককে রুদ্রতায় পৌঁছতে দেয় না। স্পিনোজার বিষয়ে রাসেল লিখেছিলেন : 'I do not know of any occasion, in spite of great provocation, in which he was betrayed into the kind of heat or anger that his ethic condemned. In controversy he was courteous and reasonable, never denouncing, but doing his utmost to pursuade'। জীবনব্যাপী অনেক যে বিতর্ক তুলতে হয়েছে আইয়ুবকে, সেগুলির সম্পর্কে একেবারে আক্ষরিকভাবেই ওই কথাগুলি বলতে পারি আমরা। বলতে পারি এও যে 'he not only believed his own doctrine, but practised them'। বিশ্বাস আর যাপনের এই একাত্মতার মধ্য দিয়েই আমাদের চোখে তিনি হয়ে ওঠেন এক ধার্মিক; ধর্মহীন এক ধার্মিক, কেননা এ-যাপন নিছক ব্যক্তিগত থাকে না তাঁর কাছে, মুক্ত চিন্তায় প্রতিমুহূর্তেই একে তিনি ছড়িয়ে দিতে চান ইতিহাসের মধ্যে, কিংবা অন্তবিহীন এক কালপ্রবাহে। বিশ্ববিস্তারশ্রিত সর্বমানবিকতার দিকে ছড়িয়ে যাওয়া এর চেয়ে বড়ো ধর্ম আর কীই-বা হতে পারে।

বাস্তবের প্রতিফলন : স্মৃতিকথায় ও কথাসাহিত্যে

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

এক ধরনের উপন্যাসকে ফরাসিতে বলে *রোমঁ আ ক্লে*, *roman à clef*, আক্ষরিক অর্থে : চাবিসমেত উপন্যাস।[১] অবশ্য নাম থেকে ঠিক বোঝা যায় না ব্যাপারটা কী। চাবি ছাড়াও ইংরিজি 'কী' (key) শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। সেটি হলো : যা দিয়ে কোনো কিছুতে ঢোকার বা বোঝার সুযোগ হয়। এখন যাকে পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য নোটবই বলা হয়, তাকে আগে বলা হতো 'কী'। কোনো কোনো *রোমঁ আ ক্লে*-র গোড়ায় বা শেষে তাই বলা থাকে কোন্ চরিত্রটি কোন্ বাস্তব মানুষের ছদ্মরূপ।

যে-উপন্যাসে সমকালের বাস্তব মানুষজনকে নামধাম পালটে হাজির করা হয়, তারই নাম তাহলে *রোমঁ আ ক্লে*। ফ্রান্স্-এ সতেরো শতকে রাজা চতুর্দশ লুই-এর দরবারে সুপরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে ঐতিহাসিক রোমান্স্ লেখা হতো; মূলত অভিজাত সাহিত্যচক্রের লোকেরাই তার চরিত্রদের সনাক্ত করতে পারতেন। যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না হলে এখনকার পাঠক সেই চরিত্রদের পেছনের মানুষজনকে চিনতে পারবেন না।

তিনটি ইংরিজি উপন্যাসের কথা এই প্রসঙ্গে আসে। প্রথমটি হলো টমাস লাভ পিকক্-এর *নাইটমেয়ার অ্যাবি* (১৮১৮)। এই উপন্যাসের ফ্লাস্কি হচ্ছেন ইংরেজ কবি স্যামুএল টেলর কোলরিজ, সাইপ্রেস হলেন লর্ড বায়রন, আর স্কাইথ্রপ রোমান্টিক যুগের আর-এক কবি, পারসি বিশ শেলি।

কবি শেলির স্ত্রী, মেরি গডউইন শেলি, তাঁর বিখ্যাত *ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন* ছাড়াও একটি উপন্যাস লিখেছিলেন : *দ লাস্ট ম্যান* (১৮২৬)।[২] তার পটভূমি একুশ শতকের শেষ দিকের ইংল্যান্ড। ততদিনে সেখানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যদিও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা একইভাবে বহাল। ছটি চরিত্রের পারস্পরিক যোগাযোগই উপন্যাসটির প্রথম ভাগের মূল কাহিনী। এই চরিত্রগুলিও মেরি শেলি-র চেনা মানুষের ছাঁচেই গড়া।

তৃতীয় উপন্যাসটি অলডস হাক্স্লি-র *পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট* (১৯২৮)। এখানে পাওয়া যায় ডি. এইচ. লরেন্স্, মিডলটন মারি আর ১৯২০-র দশকে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদ, অসওয়াল্ড্ মোজ্‌লি-কে। তবে *নাইটমেয়ার অ্যাবি* ছিল আগাগোড়াই ব্যঙ্গ রচনা; প্রধান তিনটি চরিত্রকে যতই অস্বাভাবিক বলে মনে হোক, গোটা বইটির স্বাদ তাতে কমে না। পিকক লিখতেনও খুব চমৎকার; আজও পড়তে ভালো লাগে। সে-তুলনায় *পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট* অনেক কম উপাদেয়।

ঠিক কজন চরিত্রের মধ্যে বাস্তব মানুষের ছাপ থাকলে তাকে *রোমঁ আ ক্লে* বলা যাবে? এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট মত চোখে পড়ে নি। মনে হয়, একাধিক, অন্তত তিনটি চরিত্র, না থাকলে কোনো উপন্যাসকে *রোমঁ আ ক্লে* বলা ঠিক নয়। নইলে বিস্তর উপন্যাসকে *রোমঁ আ ক্লে* বলতে হবে, কারণ : অনেকে তাঁর চেনা দু-একটি মানুষকে তাঁদের উপন্যাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসকেও *রোমঁ আ ক্লে*-র বাইরে রাখা উচিত।

টমাস মান-এর *জাদু পাহাড়* (১৯২৪)-এ নাফ্‌টা নামে একটি জেসুইট চরিত্র নাকি হাঙ্গেরীয় মার্কসবাদী দার্শনিক ও সাহিত্য-সমালোচক, গেওর্গ লুকাচ-এর ধাঁচে তৈরি।[৩] তার জন্যে *জাদু পাহাড়*-কে *রোমাঁ আ ক্লে* বলা অর্থহীন। সমারসেট মম্-এর *কেক্স্ অ্যান্ড এল্* (১৯৩০)-এর দুটি চরিত্রর পেছনে হিউ ওয়ালপোল আর টমাস হার্ডির ছায়া পড়েছে বলে অনুমান করা হয়। শুধু এর জন্যে ঐ উপন্যাসটিকে *রোমাঁ আ ক্লে* বলে মার্কা মারা কি ঠিক হবে? তেমনি যে উপন্যাসে নায়কের মধ্যে লেখকের চেহারাই ধরা পড়ে সেটিকেও *রোমাঁ আ ক্লে*-র দলে ফেলা যায় না। ডি. এইচ. লরেন্স্-এর *সন্স্ অ্যান্ড লাভারস্* (১৯১৩)-এ পল মোরেল-এর সঙ্গে উপন্যাসটির লেখক লরেন্স্-এর অনেক মিল আছে। কিন্তু স্রেফ তার জন্যে, *পথের পাঁচালী-অপরাজিত*-র মতোই, *সন্স্ অ্যান্ড লাভারস্*-কে *রোমাঁ আ ক্লে* বলা ঠিক নয়।

বায়রন বেঁচে থাকতেই তাঁকে ব্যঙ্গ করে *গ্লেনারভেন* (১৮১৬) নামে একটি বই লিখেছিলেন লেডি কেরলিন ল্যাম। গ্লেনারভেন চরিত্রটির সঙ্গে বায়রন-এর মিল তখন অনায়াসে ধরা যেত। বায়রন-এর জীবনী পড়েছেন এমন যে-কেউ এখনও তা বুঝবেন। এই হলো সত্যিকারের *রোমাঁ আ ক্লে*। আর যেসব মানুষকে তাঁদের পরিবার-পরিজনের বাইরে কেউ চেনেন না, উপন্যাসে তাঁরা দেখা দিলে খুব কম পাঠকই তাঁদের আসল পরিচয় ধরতে পারবেন।

সত্যিকারের মানুষের পাশাপাশি সত্যিকারের ঘটনা হাজির করাও কি *রোমাঁ আ ক্লে*-র কাজ? এ বিষয়ে যেটুকু আলোচনা দেখেছি, তাতে জোর পড়েছে চরিত্রর ওপর; ঘটনার ব্যাপারটা কোনো গুরুত্বই পায় নি। ফলে *রোমাঁ আ ক্লে*-র কোনো নিখুঁত সংজ্ঞার্থ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সাহিত্য-সমালোচনা তো নিখাদ বিজ্ঞান নয়। তাই সংজ্ঞার্থর বদলে সাধারণ পরিচয়ের ভিত্তিতে *রোমাঁ আ ক্লে* প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

হালে অমিতাভ চৌধুরীর একটি লেখায় *শোণপাংশু* নামে বুদ্ধদেব বসুর একটি উপন্যাসের কথা জানলুম।[৪] ১৯৫৭-য় বিশ্বভারতীর একটি গোলমাল উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। বুদ্ধদেব বসু এটি লেখেন ১৯৫৮-য়, বই বেরিয়েছিল ১৯৫৯-এ। মূল ঘটনা হলো : ছাত্রদের হাতে এক অধ্যাপকের নিগ্রহ। এখন তো এমন কতই হয়। কিন্তু সেই সময়ে ব্যাপারটি আখছার ঘটত না। তাছাড়া ঐ অধ্যাপকের পক্ষে-বিপক্ষে খবরের কাগজে বিস্তর লেখালিখি হয়েছিল। সেই অধ্যাপকটি অবশ্য মনে রাখার মতো কেউ নন, তবে ঘটনাটি ছিল ঐ সময়ের পাঠকদের কাছে টাটকা খবর। তাই নবেন্দু গুপ্ত নামক চরিত্রটির পেছনে যে ড. সুধীন ঘোষের ছায়া পড়েছে—১৯৫০-এর দশকের ওয়াকিফহাল পাঠকরা তা অনায়াসে ধরতে পারতেন।

আরও হালে, জানুয়ারি ২০০৫-এ সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর স্মৃতিকথায় আবার ঐ ঘটনাটির কথা পড়লুম। সুখরঞ্জনবাবু অবশ্য অমিতাভবাবুর মতো প্রত্যক্ষদর্শী নন। তিনি যা লিখেছেন তার সবটাই শোনা কথা। দুই সাংবাদিকের বিবরণে এতই তফাত যে জানতে ইচ্ছে হলো : বুদ্ধদেব বসুর হাতে সেটি কোন্ রূপ নিয়েছে।

উপন্যাসের কথায় পরে আসছি। আগে অমিতাভ চৌধুরীর বিবরণটি তুলে দিই :

এবার শান্তিনিকেতনের একটি ঘটনার কথা বলি. এমনটি ওখানে এর আগে কখনও ঘটেনি। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন খ্যাতনামা লোক। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ইংরেজি সাহিত্যের নামকরা ঔপন্যাসিক ডঃ সুধীন ঘোষ, ক্ষিতিমোহন সেন, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, রামকিঙ্কর বেইজ।

উপলক্ষ একটি গ্রিক ট্র্যাজেডির অভিনয়। নাটকটির নাম 'আন্তিগোনে'। সোফোক্লিসের রচনার ইংরেজি অনুবাদ। এই নাটকটি ঘিরে শান্তিনিকেতনে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়, তা তার একশ বছরের ইতিহাসে কখনও হয়নি।

ডঃ সুধীন ঘোষকে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে ১৯৫৭ সালে নিয়ে আসেন বিশ্বভারতীর নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি মারা যাওয়ার প্রাক্কালে ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে পরবর্তী উপাচার্যরূপে প্রস্তাব দেন তাঁর সুহৃদ, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর নাম। সবাই সানন্দে রাজি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সুনাম, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি বিশ্বভারতীর মত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত বলে সকলেই মনে করেন।

অধ্যাপক বসু শান্তিনিকেতনে এলেন। সবাই ভাবল, এবার শান্তিনিকেতন মাথা তুলে দাঁড়াবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিশ্ব পরিচয়' উৎসর্গ করেছেন অধ্যাপক বসুকে, পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি জগৎজোড়া, বিজ্ঞানী হলেও সাহিত্য সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় তিনি আগ্রহী,—শান্তিনিকেতনে সবাই খুশি। বিশ্বভারতীতে তিনি নতুন অধ্যাপক নিয়োগ করলেন বেশ কিছু পদে। মিঃ রয় নর্থ নামে একজন ইংরেজ ছিলেন ইংরেজি বিভাগের প্রধান। কার্যকাল শেষ হওয়ার পর তিনি স্বদেশ ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেন। তাঁর জায়গায় নতুন উপাচার্য বিলেত থেকে নিয়ে এলেন তাঁর একজন সুহৃদ ডঃ সুধীন ঘোষকে। ডঃ ঘোষ দীর্ঘদিন লন্ডনপ্রবাসী। লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতিও আছে খানিকটা। ইংরেজিতে লেখা তাঁর একটি উপন্যাস 'সিঁদুরে নৌকো' (ভার্মিলিয়ন বোট) খ্যাতিও পেয়েছে বিদেশে। কথাবার্তায় চৌকস, চালচলনে একটু বেখাপ্পা হলেও স্মার্ট, ইংরেজি ভাষায় দখলও উত্তম। সুতরাং তাঁকে নিয়ে শান্তিনিকেতনের সবাই একটু বেশিই মাতামাতি করলেন।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই সবার মনে একটা খটকা লাগল। প্রথমত, তাঁর পোশাকটা ছিল একটু বেখাপ্পা ধরনের, রঙিন গেঞ্জি, রঙিন টুপি, সাদা ছোট্ট শর্টস—যাকে বড় জাঙিয়াও বলা যেতে পারে—তিনি চক্কর দিতে লাগলেন শান্তিনিকেতনের ক্লাসে ক্লাসে।

ভাল কথা, একটু বেখাপ্পা ধরনের লোক শান্তিনিকেতনে স্বাগত, পেটে বিদ্যে থাকলে এবং রসিকতায় সমঝদার হলে সবাই তাঁকে আপন করে নেয়। কিন্তু বাদ সাধল কিছুদিন পরেই। কলেজে ইংরেজির ক্লাস নিতে গিয়ে তিনি ছাত্রছাত্রীদের বারবার বোঝাতে লাগলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক ভদ্রলোকটি বাংলা কেমন জানতেন তিনি জানেন না, তবে তিনি যে ইংরেজি জানতেন না, সে বিষয়ে নিশ্চিত এবং তার উদাহরণ অজস্র। যেমন নাইটহুড প্রত্যাহারের ইংরেজি চিঠি। ওটা আবার ইংরেজি নাকি? এইরকম অসংখ্য 'উদাহরণ' দিয়ে তিনি অনবরত আশ্রমগুরুর প্রতি বিষোদ্গার করতে লাগলেন।

ডঃ ঘোষের পোশাক, ডঃ ঘোষের কথাবার্তায় একটা ঘোষ-বিরোধী হাওয়া উঠেছে শান্তিনিকেতনে। উপাচার্য অধ্যাপক বসুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ছাত্র ও শিক্ষকমহলে এই প্রশ্ন উঠতে লাগল, ডঃ ঘোষকে কেন নিয়ে আসা হল রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। কোনও শেক্সপিয়ার-বিরোধী কি স্থান পাবেন স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-আভনে? কোনও গান্ধী-বিরোধী সবরমতী আশ্রমে? তাঁর কথাবার্তা, তাঁর

চালচলন মনঃপূত হচ্ছিল না অনেকেরই। তাঁর একমাত্র সুহৃদ ছিলেন আশ্রমবাসী অন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁর পরিবার। উপাচার্য তো ছিলেনই।

অবস্থা চরমে উঠল ওই গ্রিক নাটকের রিহার্সাল নিয়ে। ওই নাটকটিব অভিনয় নিবে গড়ে উঠল একটি পরিপূর্ণ গ্রিক ট্র্যাজেডি। শান্তিনিকেতনে এর আগে বহুবার ইংরেজি নাটকের অভিনয় হয়েছে। কিছুদিন আগেই অভিনীত হয়েছে বার্নার্ড শ-এর অ্যানড্রোক্লিস অ্যান্ড দ্য লায়ন। সবাই দু'হাত তুলে প্রশংসা করেছে।

১৯৫৭ সালের শেষদিকে যখন 'আন্তিগোনে'-নাটকের রিহার্সাল চলছে সংগীত ভবনের বড় মঞ্চে, তখন কলকাতা থেকে গিয়ে আমিও সেইখানে উপস্থিত ছিলাম। আরও অনেকের সঙ্গে মন দিয়ে রিহার্সাল দেখছি, এমন সময় মঞ্চে এলেন কিঙ্করদা—রামকিঙ্কর বেইজ। ডঃ ঘোষ তাঁর ওপর ভার দিয়েছেন মঞ্চ সাজানোর। তাছাড়া সব নাটকে—বাংলা এবং ইংরেজি—কিঙ্করদার প্রচুর উৎসাহ।

ইতিমধ্যে আমরা শুনতে পেলাম কয়েকদিন আগে নাটকের প্রস্তাবিত নায়িকা কলেজের ছাত্রী জয়িতা চট্টোপাধ্যায়কে (চক্রবর্তী) নিয়ে একটি কাহিনী চালু হয়ে আছে। ডঃ ঘোষ নাকি জয়িতাকে নাটকে নির্বাচনের আগে, তার পায়ের গড়ন দেখতে চেয়েছিলেন। সেটাই পল্লবিত হয়ে সারা শান্তিনিকেতনে ছড়াল যে, ডঃ ঘোষ জয়িতার পায়ের গড়ন দেখার নামে তাকে শাড়ি অনেকখানি তুলতে বলেছিলেন। এই সংবাদ ছাত্রদের আরও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। পরে জয়িতা জানায়, সব বাজে কথা, ডঃ ঘোষ তাকে শুধু পায়ের পাতা দেখাবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে, ঘটনাই ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করে এবং ছাত্রছাত্রীদের আরও ঘোষ-বিরোধী করে তোলে।

রিহার্সাল চলছে। আমরা অনেকেই দেখছি। বেশ ভাল লাগছে। হঠাৎ দেখলাম কিঙ্করদা ও ডঃ ঘোষের মধ্যে কী নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি চলছে। ডঃ ঘোষ বেশ উত্তেজিত। হঠাৎ তিনি হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন কিঙ্করদাকে। কিঙ্করদা হতভম্ব, নাটকের কুশীলবরা স্তম্ভিত এবং আমরা, দর্শকরা বিস্মিত। মার খেয়ে কিঙ্করদা স্টেজ সাজানোর জন্য আনা একটি গাছের ছোট ডাল প্রত্যাঘাত করার জন্য তুলেও তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন মাটিতে এবং বিড়বিড় করতে করতে চলে গেলেন নিজের বাড়িতে। এদিকে তখন হই-হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। 'কিঙ্করদাকে ডঃ ঘোষ মেরেছেন'—এই আওয়াজ ওঠে সংগীত ভবনের চারপাশে। আমিও সকলের সঙ্গে গলা মেলাই। ইতিমধ্যে রিহার্সাল ছত্রভঙ্গ, ডঃ ঘোষ লাঠি হাতে সরে পড়লেন মঞ্চ থেকে এবং ততক্ষণে সংগীত ভবনের পায়ে গোল চত্বরে ছাত্ররা সমবেতকণ্ঠে চিৎকার করছে—আমাদের প্রিয় কিঙ্করদাকে মারার প্রতিবিধান চাই। আমি নিজেও তখন এতই উত্তেজিত যে, 'জ্বালাময়ী ভাষণকারী'দের সঙ্গে আমিও গলা মেলালাম।

উত্তেজনা বাড়তে লাগল। সারা শান্তিনিকেতনে কিঙ্করদাকে মারার ঘটনা পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে ডঃ ঘোষ একটি সাইকেল রিকশয় চেপে পোস্ট অফিসের দিকে রওনা হলেন। পান্থনিবাসের কাছাকাছি আসতেই তিনজন ছাত্র রিকশ থামিয়ে ডঃ ঘোষকে নামাল এবং একজন মারল তাঁর নাক বরাবর বিরাট ঘুষি। ডঃ ঘোষের চশমা পড়ল ছিটকে। চোখের কাছে হল বিরাট ক্ষত এবং তাঁর চিৎকারে পাশের ক্লাব থেকে ছুটে এলেন কিছু কর্মী। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

এদিকে, সংগীত ভবনে সমবেত ছাত্ররা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে দলে দলে আশ্রমবাসী এসে পান্থনিবাসের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ জানাতে থাকলেন। চলে এলেন বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, অন্যান্য অধ্যাপক, কর্মসচিব, রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ ক্ষিতীশ রায় প্রমুখ। ওদিকে,

হাসপাতালে ডঃ ঘোষের চিকিৎসা চলছে এবং এদিকে ছাত্রছাত্রীরা দাবি তুলেছে অধ্যাপকমশাইকে এক্ষুনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হবে।

উত্তেজনা বাড়তে লাগল, বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। অবশেষে মন্দিরের সামনের খোলা মাঠে সবাই জড়ো হয়ে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে, ওদের দাবি ডঃ ঘোষকে এক্ষুনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতেই হবে। অনেক কথা কাটাকাটির পর ছাত্রদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেন কর্তৃপক্ষ। প্রায় ঘণ্টা তিনেক বিক্ষোভের পর অবশেষে স্থির হল, সেই রাত্রেই ডঃ সুধীন ঘোষ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবেন এবং তাঁকে নিয়ে যাবেন বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর গ্রামের বাড়ি হুগলি জেলার বৈঁচি গ্রামে।

হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মাঝরাত্তিরে ডঃ ঘোষকে নিয়ে বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষমশাই বোলপুর স্টেশনের দিকে চলে গেলেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা উল্লাসে জয়ধ্বনি দিল। বেশ কিছু অধ্যাপক প্রকাশ্যে কিছু না বললেও মনে মনে খুশি হলেন ডঃ ঘোষের এই করুণ প্রস্থানে।

নতুন উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন বসু মশাই সেদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। টেলিফোনে সব শুনে পরদিনই হন্তদন্ত হয়ে চলে এলেন। এসেই শুরু করলেন হম্বিতম্বি, তদন্তের ব্যবস্থাও হল। ছাত্রদের ডেকে এনে প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাদের নাকানিচোবানি দিতে লাগলেন। কিন্তু কোনও ফল হল না। সবাই একবাক্যে ডঃ সুধীন ঘোষের 'অভদ্র আচরণের' বিরুদ্ধে বলতে লাগল। পড়াশোনা শিকেয় উঠল। বিশ্বভারতীতে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। অধ্যাপক বসু মনে করলেন ডঃ ঘোষকে অপমান তাঁরই অপমান। কলকাতার ও দিল্লির খবরের কাগজে শান্তিনিকেতনের অচলাবস্থা নিয়ে নানা খবর বেরতে লাগল।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষিতিমোহন সেন একটি বিবৃতি দেন। ঘটনার সময়ে তিনি হাজির ছিলেন না, তবে তাঁর মনে হয়েছিল : "...যাহা শুনিতেছি তাহা যদি সত্য হয় তবে এই আশ্রমের ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারে আচ্ছন্ন।"

আরও কড়া বিবৃতি দিয়েছিলেন ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী। তাঁর পরিষ্কার মত ছিল : ড. ঘোষ শান্তিনিকেতনে দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকার পক্ষে পুরোপুরি অযোগ্য; তাঁকে সরানোর ব্যবস্থা করা উচিত। এরপর অমিতাভবাবু লিখেছেন :

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকরা বললেন, এই ধরনের মারা অন্যায় হয়েছে, ঠিকই, কিন্তু ডঃ ঘোষকে শান্তিনিকেতন থেকে বের করে দেওয়া ঠিক হয়নি। রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ ক্ষিতীশ রায় বললেন, 'এইভাবে তাঁকে বের করে দেওয়ার বদলে ছাত্রছাত্রীরা যদি 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন' গানটি গাইতে গাইতে সুধীন ঘোষ মশাইকে বোলপুর স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসত, তাহলে বোধহয় ভাল হত।' তবে ডঃ ঘোষকে ঘুষি মারা যে অন্যায় হয়েছে, তা সবাই স্বীকার করলেন। যথেষ্ট প্ররোচনা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের আর একটু সংযত থাকা উচিত ছিল বলে তাঁরা মনে করেন।

এই ঘটনা কলকাতায়ও আলোড়ন তুলল। মোটামুটি সাহিত্যিক-সম্প্রদায় সত্যেন বসুর সুহৃদ সুধীন ঘোষকে অপমান করা গর্হিত কাজ বলে মনে করলেন। কাগজে বিবৃতি দিয়েও তাঁদের মতামতও জানালেন। বুদ্ধদেব বসু এই ঘটনা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলেন। উপন্যাসটির নাম 'শোণপাংশু'। তাতে ছাত্রদের আচরণের বিরুদ্ধে নানা কথা লেখা হল। তাতে বক্তৃতাবাজ একটি কালোপানা ছেলের

উত্তেজনামূলক কথাবার্তাও আছে। মনে হয়, বুদ্ধদেব বসুমশাই দূর থেকে ঘটনার কথা শুনে এই আমাকে নিয়েই চরিত্রটির কাঠামো ঠিক করেন। তবে উপন্যাস উপন্যাসই, তার সত্যাসত্য বিচার করার ভার পাঠকদের ওপর নেই।

যাই হোক, ১৯৫৭ সালের সেই শান্তিনিকেতনী-কাণ্ড গড়াল আরও অনেকদূর। রবীন্দ্র-অনুরাগী একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এমন সব 'খানাতল্লাশ' শুরু করলেন যে, বিশ্বভারতীতে পড়াশোনা শিকেয় তুলে একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল ডঃ ঘোষের অপসারণ। রামকিঙ্কর বেইজকে লাঠি দিয়ে অকারণ পেটানোর ঘটনা উপাচার্যমশাই তো বেমালুম ভুলে গিয়ে অন্য রাস্তা ধরলেন। এমনকি অধ্যাপক বসুমহাশয়ের সাহিত্যগুরু 'সবুজপত্র' কাগজের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরিমহাশয়ের সহধর্মিণী, তাঁর পূর্বপরিচিত ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কথা শুনতেও তিনি নারাজ।

অমিতাভবাবুর বয়ানে একটু ভুল আছে। *শোণপাংশু*-র কোথাও 'একটি কালোপানা ছেলের উত্তেজনামূলক কথাবার্তা'-র নামগন্ধ নেই। সুতরাং অমিতাভবাবুকে 'নিয়েই (ঐ) চরিত্রটির কাঠামো ঠিক' করা হয়েছে—এ কথা মেনে নেওয়া মুশকিল। তবে সুধীন ঘোষ ও রামকিঙ্কর বেজের ব্যাপারে অমিতাভবাবু যা লিখেছেন, তা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ তিনি পুরো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

॥ ৩ ॥

এবার সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের বিবরণটি পড়া যাক।

সম্ভবত ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় সরকার সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত করলেন। তিনি ওই পদে যোগ দেন ১লা জানুয়ারি ১৯৫৬-তে। তাঁর এই নিয়োগকে শান্তিনিকেতনের মৌলবাদীরা মেনে নিতে পারেননি। এই মৌলবাদীদের নেতৃত্বে ছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেন, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও কানাইলাল সরকার (আনন্দবাজার পত্রিকা)। তিনিই শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন বিজ্ঞান ফ্যাকালটি গড়ে তুলে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করে দেন। বলতে গেলে তাঁরই আমলে বিশ্বভারতী একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবয়ব ধারণ করল। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল এই তিন বছরে দুটি ঘটনা সত্যেন বসুকে খুবই চিন্তিত করে তোলে। ওই সময় তাঁর জামাতার অকালমৃত্যু ঘটে। জামাতা হাওড়ায় থাকতেন। মেয়ের বৈধব্যদশা তাঁর মনকে ভেঙে দেয়। ওই সময়ে তাঁর মেয়ের সন্তানেরা কেউই প্রাপ্ত বয়স্ক ছিল না। তিনি মেয়ে ও নাতিনাতনিদের শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। এটি গেল তাঁর নিতান্তই ব্যক্তিগত সঙ্কট। অন্যটি ঘটল ইংরাজির একজন অধ্যাপককে নিয়ে। তাঁর নাম ড. সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ। বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরাজি সাহিত্যে বিশেষ করে গ্রিক ট্র্যাজিডির ওপর গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছিলেন। এই ড. ঘোষকে সত্যেন বসু চিনতেন তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় থেকে। তিনি যখন বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্য পড়াচ্ছিলেন, ভাইস চ্যান্সেলার সত্যেন বসু তখন তাঁকে শান্তিনিকেতনে আসার প্রস্তাব দেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন ইংরাজি পড়াতে। ড. ঘোষ অবিবাহিত ও কিছুটা অ্যাপাটে ধরনের লোক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রকমের বৈচিত্রময় পোশাক পরতেন। মদ্যপানও করতেন প্রচুর। এ কারণে শিল্পী রামকিঙ্কর বেজের সঙ্গে এক নিবিড় সখ্যতা

গড়ে উঠছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনের মৌলবাদীরা প্রবোধচন্দ্রের নেতৃত্বে গোড়া থেকে ড. ঘোষের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছিলেন। কোনও এক শীতের রাতে গৌড় প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটকের মহড়া চলছে এবং তার পাশেই চলছে মঞ্চসজ্জার প্রস্তুতি। মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন রামকিঙ্কর বেজ। রামকিঙ্কর বেজ ও ড. ঘোষ দুজনেই আকণ্ঠ পান করে মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থা দেখছেন। দেখতে দেখতে ড. ঘোষ মঞ্চসজ্জা তাঁর মতে কী হওয়া উচিত তা বললেন। রামকিঙ্কর বললেন, না, ওটা রবীন্দ্রনাটকে চলবে না। কিন্তু ড. ঘোষ নাছোড়বান্দা, তদুপরি মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া। রামকিঙ্করও একই অবস্থায়। রামকিঙ্কর জোর দিয়ে বললেন, 'শালা, এটা কী গ্রিক নাটক।' ব্যস আর যায় কোথায়। রামকিঙ্করের সঙ্গে ড. ঘোষের মারামারি আরম্ভ হল। উপস্থিত অন্যান্যরা মারামারি থামিয়ে দেওয়ার আগেই রামকিঙ্কর বেশি মাত্রায় আহত হলেন। শান্তিনিকেতনে প্রচণ্ড উত্তেজনা। ভাইস চ্যান্সেলার সত্যেন বসু তখন দিল্লিতে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ড. ঘোষের বিরুদ্ধে খবর ছাপতে লাগল ক্রমাগত। এর দু-তিন দিন পরে ড. ঘোষ সন্ধ্যার পর পূর্বপল্লীতে কারও বাড়ি থেকে ফিরছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাড়ির রান্নাঘরের পিছন দিয়ে। লীলা রায় রান্নাঘরে কুপির আলোতে কিছু একটা করছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় ভিতরে হ্যারিকেনের আলোতে পড়াশোনা করছিলেন। এ সময় কে একজন আর্তনাদ করে উঠল, 'আমাকে মেরে ফেলল, আমাকে বাঁচাও...।' লীলা রায় কুপি হাতে রান্নাঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। স্বামীকে বললেন, 'তুমি আলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো। একজনকে কারা মেরে ফেলছে।' লীলা রায় কুপি হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এলে আক্রমণকারীদের একজন লীলা রায়ের গায়ের কাছে এসে ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। অন্নদাশঙ্কর রায় আলো নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন যে ড. ঘোষ রক্তাপ্লুত অবস্থায় গোঙাচ্ছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ড. ঘোষকে তাঁদের ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন। অন্নদাবাবু নিজেই বোলপুর গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন। সত্যেন বসু দিল্লি থেকে ফিরতেই অন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁর স্ত্রী লীলা রায় তাঁদের রান্নাঘরের পিছনে ড. ঘোষকে কীভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তা জানালেন। লীলা রায় আক্রমণকারী একজন শিক্ষকের নামও বলেছিলেন। কিন্তু 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বলতে থাকল, ড. ঘোষ কোনও এক মেয়েছেলের বাড়ি থেকে ফূর্তি করে মদ খেয়ে ফিরছিলেন। রাস্তা বুঝতে না পেরে অন্ধকারে জঙ্গলে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন। লীলা রায় ও অন্নদাশঙ্কর রায় এ সব রিপোর্টের প্রতিবাদ করে 'আনন্দবাজারে' চিঠি দিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়কে মারের ভয় দেখিয়ে চিঠি দিলেন প্রবোধ সেন ও তাঁর দলবলেরা। 'আনন্দবাজার পত্রিকার' এই ভূমিকার প্রতিবাদে অন্নদাশঙ্কর রায় খুব সাহস দেখিয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন তিনি 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

শোনা কথা দিয়ে স্মৃতিকথা ভরালে যে কতরকমের গোলমাল হতে পারে—এর থেকেই তা বোঝা যায়। ঘটনাটার মূলে যে রবীন্দ্র-নাটক নয়, গ্রীক-নাটক—সেটাও সুখরঞ্জনবাবুর মনে নেই। ছাত্ররা কবে কখন সুধীন ঘোষের ওপর চড়াও হয়েছিল তা-ও তিনি জানেন না। রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি নিয়ে সুধীন ঘোষের ব্যাঁকা মন্তব্য ইত্যাদির জন্যে শান্তিনিকেতনে অনেকেই যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—তার পরিণামেই ছাত্ররা তাঁকে মেরেছিল এ কথাও তিনি বলেন নি। সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যর কোনো ভূমিকাই তাঁর শোনা গল্পে নেই। বিবরণের মধ্যে ও শেষে সুখরঞ্জনবাবু 'শান্তিনিকেতনের মৌলবাদী'দের কথা তুলেছেন। এর থেকে তাঁর বিপক্ষপাতও ধরা পড়ে। উপসংহারে তিনি লিখেছেন, "শান্তিনিকেতনের মেয়াদ শেষ করে

কোনও এক সময়ে সত্যেন বসু কলকাতায় ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'স্যার, শান্তিনিকেতনের দিনগুলি আপনার কেমন মনে লেগেছিল?' তিনি পাল্টা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'শান্তিনিকেতনে কি কখনও গিয়েছিস?' আমি বললাম, 'না স্যার, সেভাবে কখনও যাইনি।' বেশ খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বলেছিলেন, 'একটা এতটুকু ছোট জায়গায় কী করে অতগুলো দুষ্ট লোক একত্রে বাস করতে পারে তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।' "

সত্যেন বসু যে এই কথাগুলো বলেছিলেন তা সত্যি হতে পারে। অমিতাভ চৌধুরীও জানিয়েছেন : 'রামকিঙ্কর বেইজকে লাঠি দিয়ে অকারণ পেটানোর ঘটনা উপাচার্যমশাই তো বেমালুম ভুলে গিয়ে অন্য রাস্তা ধরলেন।' কিন্তু কী নিয়ে প্রথম গোলমাল বেধেছিল— সে বিষয়ে দুই সাংবাদিকের বিবরণ পুরোপুরি আলাদা : দুটি বয়ান একসঙ্গে সত্যি হতে পারে না। তবে সুধীন ঘোষ যে ছাত্রদের হাতে মার খেয়েছিলেন—দুজনেই সে-কথা বলেছেন।

|| ৪ ||

বুদ্ধদেব বসু শান্তিনিকেতনের ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না; শোনা কথাকে তিনি স্মৃতিকথা বলে চালান নি। মূল ঘটনাটি নিয়ে তিনি লিখেছেন একটি উপন্যাস। তাই স্থান-কাল-পাত্রও কিছুটা পাল্টেছে। *শোণপাংশু*-র পটভূমি বিশ্বভারতীর মতো কোনো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নয়। তার বদলে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলে বড়লোকদের একটি স্কুল; স্বভাবতই ইংরিজির মাধ্যমেই সেখানে লেখাপড়া হয়। ড. নবেন্দু গুপ্তকে গড়া হয়েছে ড. সুধীন ঘোষের আদলে। বহু বছর ইওরোপে কাটানো, অদ্ভুত সাজপোশাক আর রগচটা স্বভাব—এই তিনটি লক্ষণ দিয়ে সুধীন ঘোষকে ধরা যায়। *শোণপাংশু*-র আর কোনো চরিত্র বাস্তব মানুষের প্রতিচ্ছবি কিনা তা জানা নেই। মেয়েদের স্কুলের দাপুটে প্রধান শিক্ষিকা সুভদ্রা দেবী বা স্কুলের মালিক লীলারামজী অনেকটাই টাইপ চরিত্র। স্কুল কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচার, সমস্ত ধরনের সুযোগ-সুবিধে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকদের মনে নিরাপত্তাবোধের অভাব, প্রথম সুযোগেই ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছে—এর সবটাই টিপিক্যাল। তখনকার মতো এখনও বিস্তর শিরোমণি (এলিট)-মার্কা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই ব্যাপার দেখা যায়। এর মধ্যে বুদ্ধদেব বসু এনে ফেলেছেন এক খাপছাড়া শিক্ষক, গুপ্তসাহেবকে। তাঁর ওপর ছাত্রদের আক্রমণ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা। তবে তার পেছনের কারণ কোনো নাটকের মহলা নয়, দুই শিক্ষকের মধ্যে মারামারি বা একতরফা মারের কথাও উপন্যাসে আসে নি। বরং ছাত্রদের খুঁচিয়েছিলেন একজন শিক্ষক, বেণীমাধববাবু। গুপ্তসাহেব খ্যাপা লোক ঠিকই, তবে এই উপন্যাসের কথক 'আমি' তাঁকে পুরোপুরি নির্দোষ বলে মনে করে না, যদিও তার সহানুভূতি গুপ্তসাহেবের দিকেই।

এই বেণীমাধববাবুকে কোনো বাস্তব চরিত্রের ছাঁচে গড়া হয়েছে কিনা জানা নেই। জানলেও কোনো বাড়তি লাভ হতো না। সুভদ্রাদেবী ও লীলারামজীর মতো ইনিও মার্কামারা লোক। নিজেদের অভিজ্ঞতায় স্কুল-কলেজের খল চরিত্রদের সঙ্গে এঁকেও মিলিয়ে নেওয়া যায়। আলাদা

আলাদা জায়গার আলাদা আলাদা চরিত্র আর ঘটনা একই উপন্যাসের দু মলাটের মধ্যে থাকতে পারে। ১৯৫৭-র সমকালীন ওয়াকিবহাল পাঠকরা নিশ্চয়ই গুপ্তসাহেবকে সুধীন ঘোষের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু এখনকার পাঠক, ১৯৫৭-র পরে যাঁদের জন্ম, বা তখন যাঁরা নেহাতই বাচ্চা ছিলেন, তাঁরা কী করে জানবেন : *গোলপাতা*-র পেছনে রয়েছে শান্তিনিকেতনের সেই কেলেঙ্কারির কাহিনী? সুধীন ঘোষ এমন কিছু অবিস্মরণীয় অধ্যাপক বা লেখক ছিলেন না যে তাঁকে দু পুরুষ পরের পাঠকও চিনবেন। ফলে, উপন্যাসের আদত পটভূমি না জেনেও *গোলপাতা* পড়া যায়। আর বুদ্ধদেব বসু যে সুধীন ঘোষেরই পক্ষে—সে-কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

রোমাঁ আ ক্লে-র ক্ষেত্রে এটাই একটা বড় চ্যালেন্জ্। যে-পাঠক তার চরিত্রগুলিকে অনায়াসে চিনতে পারেন তাঁর প্রতিক্রিয়া হয় একরকম, যাঁর সে-কথা জানা নেই, তাঁর প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হতে বাধ্য। আজকাল যাকে বলা হয় 'পাঠকের সাড়া' (*রিডার'স রেসপন্‌স্*), তার দুর্বলতা এইখানেই। আগে জানা থাকলে পাঠকের আগ্রহ সরে যায় চরিত্রর দিকে, উপন্যাসের ঘটনা বা আখ্যান রচনার দিকটি গৌণ হয়ে পড়ে। আর যে-পাঠকের তা জানা নেই তিনি উপন্যাসটিকে *ফিক্‌শন* বা কল্পকথা হিসেবেই পড়তে পারেন। কল্পকথা আর বাস্তব জীবনের মধ্যে কোনো চীনের পাঁচিল নেই। কল্পকথায় বাস্তব জীবনের চরিত্র ও ঘটনা থাকবে, তবে স্বনামে নয়—এমনটাই ধরা হয়। বাস্তব চরিত্রর যাবতীয় ঘটনা নিয়ে নাম ধাম না-বদলে যে-উপন্যাস লেখা হয়, তার জন্যে একটি নতুন নাম প্রস্তাব করা হয়েছে : *ফ্যাকশন*, *ফ্যাক্ট* আর *ফিক্‌শন* মিলিয়ে এটি এক জোড়কলম শব্দ।* এর সঙ্গে ঘোঁট বা চক্র অর্থে *ফ্যাকশন* শব্দটির কোনো সম্পর্ক নেই। মনে রাখতে হবে, যে-কোনো *রোমাঁ আ ক্লে*-ই আসলে কল্পকথা, চরিত্ররা বাস্তব হলেও তাদের নামধাম পালটে দেওয়া হয়। *ফ্যাকশন*-এ তা করা হয় না, তবে একেবারে অখ্যাত, অজ্ঞাত লোকদের নিয়ে *রোমাঁ আ ক্লে* লেখা যায় না। *গোলপাতা*-কে তাই ওই ধরনের উপন্যাস বলা যাবে না। অবশ্য 'অখ্যাত' বা 'অজ্ঞাত' কথাগুলো অল্পবিস্তর আপেক্ষিক। তবু ইংরিজি সাহিত্যর ছাত্রর কাছে কোলরিজ, শেলি, লরেন্স্ প্রমুখ চেনা লেখক। সে-তুলনায় সুধীন ঘোষ ন্যায্যতই বিস্মৃত ও বিস্মরণীয়। তাই *গোলপাতা*-তে তাঁকে সনাক্ত করার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়।

সবশেষে একটি কথা। *গোলপাতা* ঠিক *রোমাঁ আ ক্লে* নয়, *ফ্যাকশন* তো নয়ই। কিন্তু তা যদি হতোও, তাহলেও উপন্যাসটির বিচার হবে উপন্যাস হিসেবেই। নবেন্দু গুপ্ত যদি সুধীন ঘোষের প্রতিচ্ছবি না-ও হতেন, তাতেও কিছু যেত-আসত না। আমার বিচারে, উপন্যাস হিসেবে *গোলপাতা* মনে রাখার মতো কিছু নয়। তার কারণ একটাই : সমকালের একটি ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসে বুদ্ধদেব বসু একদিকে বড় বেশি হেলে পড়েছেন; অবান্তর সব চরিত্র আমদানি করে নষ্ট করেছেন কাহিনীর ভারসাম্য। তাঁর সহানুভূতি কোন্‌দিকে তা সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু খলচরিত্রটিকে তিনি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন নি। 'আমি'-র আঙ্গিকে লিখে, ঘটনার পরম্পরাকে উলটে দিয়ে খানিক অভিনব হওয়ার চেষ্টা এখানে আছে। কিন্তু সে-চেষ্টা সফল হয়েছে এমনও বলা যাবে না।

টীকা

১. শুধু উপন্যাস নয়, এই ধরণের নাটকও লেখা হয়েছে। তাকে বলে *দ্রাম আ ক্লে।* আরও সাধারণ একটি নাম আছে, *Livre a clef*. চাবি সমেত বই। লা ব্রুইয়েরে-এর *চরিত্রাবলি* (১৬৮৮)-কে তার সূচনা বলে ধরা হয়। এ ছাড়া শেক্সপিয়র-এর *ম্যাকবেথ* নাটকের অনুকরণে লেখা *ম্যাকবার্ড* (১৯৬৬)-কেও *লিভর আ ক্লে* বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে কাডন, মারফিন ও রায়, আর হথর্ন (১৯৯০) দ্র.।

২. নারীবাদী সাহিত্যচর্চার কল্যাণে বইটি হালে বার-পাঁচেক ছাপা হয়েছে (রচনাপঞ্জি দ্র.)। আপোকালিপ্স্, কল্পবিজ্ঞান ও ভবিষ্যদ্বাদ নিয়ে নানা আলোচনাতেও উপন্যাসটির কথা এসেছে।

৩. হথর্ন (১৯৯২), ১৮-১৯ দ্র। লুকাচ অবশ্য *জাদু পাহাড়*-এ এইভাবে নিজের উপস্থাপনায় আপত্তি করেন নি, কারণ তিনি মনে করতেন : উপন্যাস বিচারে বিষয়নিষ্ঠা *(অবজেক্টিভিটি)* বজায় রাখা দরকার। এওর্সি, ৩২ দ্র.।

৪. অমিতাভ চৌধুরী ও সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর বয়ানদুটি একই সময়ে বেরয় নি। রচনাপঞ্জি দ্র.।

৫. *ফ্যাক্ট্* আর *ফিক্শন* মিলিয়ে এই শব্দটি তৈরি করেছিলেন ট্রুম্যান ক্যাপোট। *ইন কোল্ড্ ব্লাড* উপন্যাসে তিনি বাস্তব জীবনের ব্যক্তি ও ঐতিহাসিক ঘটনাই ব্যবহার করেছেন। হথর্ন (২০০০) দ্র.।

আরভিং স্টোন-এর *দ অ্যাগনি অ্যান্ড দ এক্স্টাসি* ইত্যাদি জীবনীভিত্তিক রচনাকে বোধহয় *ফ্যাকশন*-এর পূর্বসূচনা বলে ধরা যায়।

রচনাপঞ্জি

অমিতাভ চৌধুরী। *ছিন্ন পাতায় সাজাই তরণী।* আজকাল, ২০০৩।

বুদ্ধদেব বসু। *শোণপাংশু*। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৫৯।

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত। "ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়", *চতুরঙ্গ*, জানুয়ারি ২০০৫।

Cuddon, J A (revised by C. E Preston). *A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, New Delhi : Maya Blackwell/Doaba Books 1998.

Eorsi, István "Gyorgy Lukács, Fanatic of Reality". *The New Hungarian Quarterly*, XII : 44, 1971, 26-34.

Hawthorn, Jeremy. *Study in the Novel : An Introduction* New Delhi Universal Book Stall, 1992.

—*A Glossary of Contemporary Literary Theory* London · Arnold, 2000.

Murfin, Ross and Supryia M Ray *The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms*. Boston and New York : Bedford/St Martin's, 2003

Shelley, Mary *The Last Man* Ware : Wordsworth Classics, 2004

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : সিদ্ধার্থ দত্ত, প্রভাসকুমার সিংহ

চল্লিশের নৈতিকতা ও রামকিঙ্কর

মৃণাল ঘোষ

এক

শান্তিনিকেতন

'মহত্তর নৈতিকতার গর্ভ ছাড়া শিল্পসাহিত্যের কোনো ফর্মেরই অন্য কোনো জন্মস্থান নেই।' দেবেশ রায় লিখেছিলেন এ কথা 'রক্তমণির হারে' নামে তাঁর সম্পাদিত দেশভাগ-স্বাধীনতা বিষয়ক এক গল্প সংকলনের ভূমিকায়। রামকিঙ্করের সমগ্র সৃষ্টিপ্রবাহ নিয়ে ভাবতে গেলে এ কথার সত্যতা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নৈতিকতার প্রত্যয় পরিবর্তিত হয়। সেই সঙ্গে পাল্টায় শিল্পের 'রূপ' বা ফর্ম-ও। স্বদেশচেতনার নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলায় যে নতুন রূপ উদ্ভাবন করেছিলেন, নন্দলাল বসু ও তাঁর অন্যান্য সহযোগীর উদ্যোগে সেই নব্য-ভারতীয় ধারা অনেকটা প্রসারিত হয়েছিল। তারপর একসময় ম্লান হয়ে এল তার দীপ্তি। প্রবাহিত সময় তখন নতুন নৈতিকতা উৎসারিত করছে। 'রূপ'-এরও যে তখন পরিবর্তন প্রয়োজন, এটা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৯-এ বিশ্বভারতীর সঙ্গে কলাভবন প্রতিষ্ঠার পিছনে সেই অভাব পূরণের লক্ষ্য কাজ করেছিল।

বিশ্বভারতী তথা কলাভবনে আরও এক মহত্তর নৈতিকতাকে প্রসারিত করতে চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কলাভবন থেকে আমাদের দৃশ্যকলার আধুনিকতা নতুন বাঁক নিল। নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। যে তিনজন শিল্পী এই নতুন ফর্মের সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তাঁরা হলেন নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেজ। অবশ্য এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামও অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ১৯২৪ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত তাঁর বিপুল বেগে অজস্র ধারায় যে চিত্রসাধনা, আজ পর্যন্তও তা আমাদের আধুনিকতাতে এক নতুন নৈতিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। অবশ্যই সেই নৈতিকতা-সম্পৃক্ত ফর্মেরও। এই চার শিল্পী প্রত্যেকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র। তবু তাঁদের উৎসারিত ফর্ম বা দৃশ্যরূপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঐক্যও আছে। তাকে বলা যেতে পারে মূল্যবোধের ঐক্য। সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সময়ের নিহিত নৈতিকতাকে প্রসারিত করার প্রয়াসের ঐক্য। সেই ঐক্যের গর্ভ থেকে চার প্রতিভার দীপ্তি চারদিকে বিকশিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতন রামকিঙ্করকে (১৯০৬-১৯৮০) নতুন জন্ম দিয়েছিল। বলা যেতে পারে, তাঁর ভিতরের নৈতিকতার বোধকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করেছিল। বাঁকুড়ায় সতেরো আঠারো বছর বয়সের মধ্যে তিনি চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রকরণ সম্পর্কিত অনেক কিছুই আয়ত্ত করেছিলেন তাঁর সহজাত প্রতিভায়। উনিশ বছর বয়সে ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে এলেন যখন, নন্দলাল তাঁর ছবি দেখে বলেছিলেন, তাঁর শিক্ষা তো প্রায় সম্পূর্ণ। তবু এসেছেন যখন দু-তিন বছর থেকে যেতে বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে। রামকিঙ্করের নিজের হস্তাক্ষরে তাঁর অননুকরণীয়

ভঙ্গিতে এ কথাগুলো উদ্ধৃত আছে সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারী' বইতে। বলেছেন তিনি :

'শান্তিনিকেতনে নন্দলালবাবু তখন কলাভবনের প্রধান শিক্ষকরূপে ছিলেন রামানন্দবাবু আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। নন্দলালবাবু আমার ছবি দেখে বলেছিলেন এ তো হয়ে গেছে আর কেন, তারপর কিছুক্ষণ থেমে বলেছিলেন আচ্ছা ২/৩ বছর থাক তো?

আমার সেই ২/৩ বছর আজও আর শেষ হলো না।'

বাঁকুড়ায় তাঁর যে ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, যে 'নৈতিকতা' বা মূল্যবোধ তৈরি হয়েছিল, সেটা কিন্তু মূল্যহীন বা অবান্তর হয়ে যায়নি কখনও। সেই ভিত্তির উপরই তিনি শান্তিনিকেতন তথা শান্তিনিকেতন উৎসারিত বিশ্বকে আত্মস্থ করেছিলেন।

বিনোদবিহারীর সঙ্গে তাঁর রূপসৃষ্টির পার্থক্য এখানেই। বিনোদবিহারীর শৈশব কৈশোর তাঁকে এক ধরনের নৈতিকতা বা মূল্যবোধ দিয়েছিল। তাঁর আশৈশব ক্ষীণ দৃষ্টি তাঁকে বিশেষ এক তন্ময়তা দিয়েছিল। অন্তর্মুখী এক চেতনা সঞ্চারিত করেছিল তাঁর মধ্যে। আত্মমগ্নতা এনেছিল। এনেছিল প্রকৃতির প্রতি নিবিষ্ট এক মুগ্ধতা। চোখ খারাপ থাকায় স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষায় বেশিদূর এগোতে পারেননি বিনোদবিহারী। এই অভাবই তাঁকে স্কুলের বাইরের পড়াশুনোর দিকে গভীরভাবে টেনেছিল। এক তাত্ত্বিক মনন গড়ে উঠেছিল তাঁর। এই আত্মমগ্ন নির্জনতার বোধ নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তিনি ১৯১৭ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে। ১৯১৯-এ কলাভবন প্রতিষ্ঠার পর কলাভবনে যোগ দিলেন তিনি। এর প্রথম পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে তিনি অন্যতম। নন্দলালের কাছে তাঁরও প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নব্য-ভারতীয় ধারায়। তারপর তাঁর ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ বা নৈতিকতাই তাঁকে নতুন পথের সন্ধানে চালিত করে।

কলাভবনে নন্দলালের অন্যান্য ছাত্ররা যখন নব্য-ভারতীয় ধারার চর্চাতেই নিমগ্ন থাকেন, বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর তখন সেই ভিত্তি থেকেই নিজেদের মতো করে নতুন পথের সন্ধানে ব্রতী হন। আধুনিকতার দুটি স্বতন্ত্র অভিমুখ মেলে ধরতে প্রয়াসী হন। বিনোদবিহারীর মননকে বলা যেতে পারে চিত্রীর মনন। পরিণত পর্যায়ে তিনি বেশি করে আকৃষ্ট হলেন দূরপ্রাচ্য বা চিন জাপানের ছবির ঐতিহ্যের দিকে। ভারতীয় অনুচিত্র বিশেষত জৈন পুথিচিত্রও তাঁকে আকৃষ্ট করে। এ সমস্ত ঐতিহ্যের মধ্যে এক ধরনের নির্জনতা-সম্পৃক্ত তন্ময় ধ্রুপদী স্থৈর্যের প্রকাশ আছে। তাঁর আত্মমগ্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তিনি একে মিলিয়ে নিতে পারেন। আর এই সমন্বয়ের পথেই গড়ে তোলেন তাঁর নিজস্ব 'রূপ' বা কর্ম। বাইরের রাজনীতির সঙ্গে, সমাজের উপরিস্তরের কল্লোল কোলাহলের সঙ্গে বিনোদবিহারী নিজেকে খুব বেশি মেলাতে পারেননি। যদিও শান্তিনিকেতনে আসার আগে স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ক্ষীণ হলেও কিছু আত্মিক সংযোগ ঘটেছিল। সেই সংযোগ থেকে নিজের মনের গভীরে তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন হননি। কিন্তু প্রত্যক্ষে তাঁর চিত্রচর্চায় এই সমাজসংঘাতের কোনো অভিঘাত আসেনি। বা এসেছে অনেক পরোক্ষে, যেমন ১৯৪৬-৪৭এ আঁকা তাঁর হিন্দি ভবনের ম্যুরাল 'মধ্যযুগের সন্ত'-তে।

রামকিঙ্করের ব্যক্তিত্ব ছিল এ থেকে একেবারেই আলাদা। অনেক বহির্মুখী, উচ্ছল তাঁর মনন। শান্তিনিকেতন আসার আগে বাঁকুড়াতেই স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটেছিল। স্বদেশপ্রেম ও সমাজচেতনার যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল সেখানে, সেটাই নানা শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে সারা জীবনব্যাপী। এই স্বাদেশিকতা শৈশবেই তাঁর চিত্রচেতনাকেও প্রভাবিত করেছিল। নব্য-ভারতীয় ধারার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটেছিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখা ছবির মধ্য দিয়ে। সেই আঙ্গিককে তিনি কিছুটা রপ্তও করেছিলেন। পাশাপাশি সেই সময়ে প্রচলিত অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার আঙ্গিকও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন নিজের চেষ্টাতেই। শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর পূর্ব-অর্জিত এই প্রাকরণিক দক্ষতাই আরও পরিশীলিত হতে থাকল। তবু সেটাও গৌণ। শান্তিনিকেতন তাঁর কাছে পরতে পরতে খুলে দিচ্ছিল মননের সম্পূর্ণ আকাশ। সারা বিশ্বের সঞ্চিত বোধের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটছিল পর্যায়ক্রমে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে এই কাজটিই করতে চেয়েছিলেন। এখানকার গ্রন্থাগারে ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়েছিল সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার। রামকিঙ্কর বা বিনোদবিহারী এই গ্রন্থাগার থেকেই আবিশ্ব আবহমানের শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সারা পৃথিবীর অজস্র জ্ঞানীগুণী মানুষের যাতায়াত ছিল এখানে। তাঁদের সঙ্গে নিরন্তর সংযোগও শিক্ষিত করে তুলছিল রামকিঙ্করকে।

সম্রান্ত ও বিদগ্ধ একটা মন তৈরি হয়ে উঠেছিল তাঁর। গড়ে উঠেছিল যে-কোনো পরিশীলিত সংস্কৃতিকে অনুভব ও অনুধাবন করার সহজাত ক্ষমতা। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিক কে. জি. সুব্রামন্নিন এক জায়গায় বলেছেন, কিছু কিছু প্রাণী যেমন আবহমণ্ডলের কোনো অদৃশ্য পরিবর্তন বা ভূকম্পনের অপরিস্ফুট সংকেতকে তার শরীর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে, রামকিঙ্করেরও সে-রকম সহজাত বা 'ইনটিংটিভ' ক্ষমতা ছিল যে-কোনো সাংস্কৃতিক আবহে সাড়া দেওয়ার বা তাকে বুঝে নেওয়ার। দৃষ্টান্ত হিসেবে সুব্রামনিয়ন বলেছেন, একবার রামকিঙ্করকে তিনি জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস'-এর অংশবিশেষ পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তখন দেখেছিলেন, অনেক ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরও যে সব জায়গা বুঝতে অসুবিধা হয়, রামকিঙ্কর সেগুলো খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারছিলেন। এই পরিশীলিত মনন তাঁকে সাহায্য করেছিল আধুনিকতার নতুন ভাষার সন্ধানে, চিত্র ও ভাস্কর্য উভয় ক্ষেত্রেই।

এবং এর প্রভাবেই হয়তো তিনি কতগুলি নান্দনিক সংস্কারের উপরে উঠতে পেরেছিলেন। স্বদেশচেতনা তখনকার অনেক শিল্পীকেই 'রূপ' সম্পর্কে একটা সংস্কারে আবদ্ধ করেছিল। নন্দলালের ছাত্র, রামকিঙ্করের সতীর্থ অনেক শিল্পী এই সংস্কারেই আটকে গেছেন। নব্য-ভারতীয় ধারার রূপকেই অনুসরণ করে চলেছেন আজীবন। রবীন্দ্রনাথ বা শান্তিনিকেতন তাঁদের কাছে কোনো নতুন বার্তা আনেনি। তখনকার শান্তিনিকেতনের দৃশ্যকলার পরিমণ্ডলে বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর এখানেই স্বতন্ত্র। স্বদেশচেতনাকে আত্মস্থ করেও তাঁরা এর মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখেননি। আধুনিকতার নতুন দরজা খুলেছেন। দুজন দুভাবে। বিনোদবিহারী প্রাচ্য ঐতিহ্যের প্রশান্ত অন্তর্মুখীনতা ও ক্যালিগ্রাফির ছন্দকে পাশ্চাত্যের উত্তর প্রতিচ্ছায়াবাদী আঙ্গিকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তাঁর চেনা পরিমণ্ডল, প্রকৃতি ও জীবনপ্রবাহের, অন্তর্লীন সত্যকে অভিব্যক্ত করার উপযোগী 'রূপ' নির্মাণ করেছেন। আর রামকিঙ্কর দেশজ লৌকিক জীবন

ও শিল্পের উত্তরাধিকারকে পাশ্চাত্যের উত্তর-প্রতিচ্ছায়াবাদী ও উত্তর-ঘনকবাদী (post-cubist) আঙ্গিকের সঙ্গে সমন্বিত করে স্বদেশের নিগূঢ় বাস্তবতাকে রূপ দেওয়ার উপযোগী দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক দৃশ্যভাষা গড়ে তুলেছেন। ১৯৩০-এর দশকের পরবর্তী কালের ভারতীয় দৃশ্যকলার আধুনিকতার দুটি ভিন্ন অভিমুখ উৎসারিত হয়েছে শান্তিনিকেতনের এই দুই শিল্পীর কাজ থেকে।

দুই

চল্লিশের বিহ্বলতা

আমাদের সমাজবাস্তবতা ও সামাজিক আলোড়নের দিক থেকে ১৯৪০-এর দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ঔপনিবেশিকতা তার বাস্তব চেহারাটাকে প্রকটভাবে মেলে ধরেছে তখন। স্বদেশি আন্দোলন রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিকতার প্রতিশোধ নেমে আসছে নানাভাবে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তর তারই একটা প্রকাশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে আলোড়িত করছে। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিকতা ও ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলনেও তার প্রভাব প্রকট হচ্ছে। ব্রিটিশের নানা কূট চালে এবং আমাদেরও বহু যুগের সঞ্চিত পাপ ও পুঞ্জিত পারস্পরিক ঘৃণার বাষ্পে সাম্প্রদায়িক সংঘাত চরমে উঠেছে। এই সংঘাতে ভাঙা দেশের স্বাধীনতাও এল পুঞ্জীভূত অন্ধকার নিয়ে। এই পরিবৃত অন্ধকারে প্রথমে বিপর্যস্ত হয় সামাজিক নৈতিকতা। এই বিপর্যস্ত নৈতিকতার দুটি অভিঘাত আসতে পারে শিল্প-সাহিত্যে। আলোড়িত হয়ে ঘুলিয়ে উঠতে পারে নন্দনের সেই নৈতিকতা। আবার নতুন শক্তি সঞ্চয় করে সতেজও হয়ে উঠতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে এই নৈতিকতার দু-রকম প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন দেবেশ রায় পূর্বোক্ত 'রক্তমণির হারে'-র ভূমিকায়। লিখেছেন, 'এমন তো হতেই পারে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গায় সেই নৈতিকতা যতটা সহজ বোধের নাগালে ছিল, দেশভাগের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত দেশভাগে ততটা নাগালে ছিল না।' এর ফলে চল্লিশের প্রথমার্ধের যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ সাহিত্যকে যতটা আলোড়িত করেছে, এর প্রতিক্রিয়া যতটা প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে, দ্বিতীয়ার্ধের স্বাধীনতা বা দেশভাগের প্রতিফলন সেই তুলনায় অনেক কম।

চল্লিশের এই আলোড়ন প্রাথমিকভাবে দৃশ্যকলার ক্ষেত্রে এক বিহ্বলতার সৃষ্টি করেছিল। চল্লিশের তরুণ শিল্পী যাঁরা, তাঁদের প্রায় সকলেই দুটি উৎস থেকে শিল্পশিক্ষা পেয়েছিলেন। বলা যেতে পারে, শিল্পনন্দনের দ্বিবিধ নৈতিকতাকে আত্মস্থ করে তাঁরা স্বকীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একটি নব্য-ভারতীয় রূপরীতি। দ্বিতীয়টি ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক আঙ্গিক। এই দুইয়েরই ছিল দুটি ভিন্ন নৈতিকতার ভিত্তি। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা থেকে নব্য-ভারতীয় ঘরানা গড়ে তুলতে চেয়েছিল স্বদেশ নির্ভর বা আত্মনির্ভর এক আত্মপরিচয়। অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিকতা আমাদের সংস্কৃতির ভিতর অনুপ্রবেশ চাইছিল। কিন্তু আমাদের অনেক শিল্পী যখন একে আত্মস্থ করছিলেন, তখন শুধু যে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনটাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তা নয়। তাঁরা শিল্পের দেশীয় অভিজ্ঞতার গণ্ডিকেও প্রসারিত করতে চাইছিলেন। প্রসারিত করতে চাইছিলেন নান্দনিক

নৈতিকতার সীমা। কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে অ্যাকাডেমিক শিক্ষাধারার জোর কমিয়ে আনার প্রতিবাদে ১৮৯৭ সালে রণদাপ্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে যে প্রতিবাদ দানা বেঁধেছিল, যার ফলে গড়ে উঠেছিল 'জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি', তার পিছনে এরকম সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি থাকাও অস্বাভাবিক নয়। আমরা তো জানি এই অ্যাকাডেমিক রীতি আজও আমাদের চিত্রকলাকে প্রকাশের স্বতন্ত্র ভিত্তি গড়তে সাহায্য করছে। তবু চল্লিশের দশকে পৌঁছে এই দুই আঙ্গিকেরই সীমাবদ্ধতাগুলি প্রকট হয়ে উঠল।

যে বাস্তবতার মুখোমুখি হলেন তাঁরা, তার প্রকৃষ্ট চিত্রভাষা গড়ে তুলতে ওই দুটি মডেলের কোনোটিই যথেষ্ট নয়। তাঁরা তখন অন্য উৎসে সন্ধান চালাচ্ছিলেন, যে উৎসের সূচনা খানিকটা হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথ এবং অমৃতা শেরগিলের ছবিতে। নব্য-ভারতীয় ঘরানা দেশীয় লৌকিকের ভিতর একেবারেই প্রবেশ করতে পারেনি। যামিনী রায় এই শূন্য ক্ষেত্রটিতে কাজ শুরু করেছিলেন। পরে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালও এই উৎসকে কাজে লাগিয়েছেন। পাশ্চাত্য আধুনিকতার সমৃদ্ধ ক্ষেত্রটি ১৯৩০-এর দশকের আগে পর্যন্ত অনেকটাই উপেক্ষিত ছিল। একে প্রথম ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। তারপর রবীন্দ্রনাথ এর সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগান তাঁর নিজের ছবিতে। অভিব্যক্তিবাদী রীতিকে তিনিই প্রথম আত্মস্থ করতে পারেন আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে। আর উত্তর-প্রতিচ্ছায়াবাদী রীতি প্রকৃষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল অমৃতার ছবিতে।

চল্লিশের তরুণ শিল্পীরা এই উৎসগুলির কোনো কোনোটা শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু মিলিয়ে নেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা তখনও তাঁদের গড়ে ওঠেনি। তাঁদের প্রাথমিক বিহ্বলতার কারণ এটাই। এজন্য আজও তাঁদের বিরুদ্ধে নানারকম সমালোচনা জেগে ওঠে। আঙ্গিকের আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে না পারার সমালোচনা। এই শিল্পীরাই যখন ক্রমশ পরিণতির দিকে এগিয়েছেন, তখন তাঁদের মধ্যে অনেকেই রূপের স্বতন্ত্র বিশ্ব গড়ে তুলতে পেরেছেন। ক্রমান্বয়ে সেই 'রূপ' বিবর্তিত হয়েছে, বহু-ব্যাপ্ত হয়েছে।

আজকে আমরা কয়েকটি স্বতন্ত্র ধারায় ভাগ করে নিতে পারি চল্লিশে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত শিল্পীদের রূপচেতনাকে। এর প্রথম বিভাগেই আসবে শান্তিনিকেতন থেকে উদ্ভূত রূপচেতনা। বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর এর প্রধান প্রতিভূ। এই ক্ষেত্রটিতে রামকিঙ্করের অবদানই এই নিবন্ধে আমাদের প্রধান আলোচ্য। সে সম্পর্কে আমরা বিস্তৃতভাবে আর একটু পরে আসব। দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত হবে বামপন্থী চেতনা ও আন্দোলন থেকে উদ্ভূত শিল্পকলা। সামাজিক অবক্ষয়েরও সেই সময়ের ভাঙা বিশ্বের প্রকৃষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে এই ক্ষেত্রটিতে। জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোর বা দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে রয়েছে এর পরিচয়। সম্প্রতি (জুলাই-আগস্ট ২০০৬) রেবা হোরের ছবি ও টেরাকোটা ভাস্কর্যের একটি বড় প্রদর্শনী হল কলকাতায়। চল্লিশের জীবননিষ্ঠ প্রতিবাদী মনন কেমন করে তমিস্রাকে আলোয় রূপান্তরিত করে, তারই এক অসামান্য স্মারক হয়ে রইল এই প্রদর্শনী। তৃতীয় ধারায় আনা যায় 'ক্যালকাটা গ্রুপ', 'বম্বে প্রগ্রেসিভ গ্রুপ' বা অন্যান্য এরকম সংগঠনের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করছিলেন যাঁরা, তাঁদের ছবি। এটাই চল্লিশের সবচেয়ে ব্যাপ্ত ধারা। এম. এফ. হুসেন, রাজা, সুজা,

হেব্বার থেকে নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, সুনীল মাধব সেন, পরিতোষ সেন পর্যন্ত বহু শিল্পী এ ধারার অন্তর্গত। ভারতীয় লৌকিকের সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিকতার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁদের আঙ্গিক। তারপর তা নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার রীতিতে নিবিষ্ট থেকেও কাজ করেছেন অনেক শিল্পী। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার বা অতুল বসু যার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

চল্লিশের এই বহুব্যাপ্ত বিস্তারের মধ্যে রামকিঙ্করের অবস্থানের ক্ষেত্রটি অনেক স্বাতন্ত্র্যময় ও উজ্জ্বল। যে বিভ্রান্ততার কথা বলা হয়েছিল একটু আগে চল্লিশের শিল্পী প্রসঙ্গে রামকিঙ্করের ভিতর সে-রকম কোনো দোলাচল ছিল না। তার দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, তাঁর ব্যক্তিগত নৈতিকতার ভিত্তিটি ছিল খুব দৃঢ়। লক্ষ্যের প্রতি ছিল তাঁর অবিচলিত স্থির দৃষ্টি। জীবনের সমস্ত শক্তি তিনি শিল্পের জন্য সমর্পণ করেছিলেন। বৈরাগীর মতো ত্যাগও করেছিলেন সমস্ত কিছু 'রূপ'-এরই কারণে: দ্বিতীয়ত, নিজেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করেছিলেন আর একটি বৃহত্তর নৈতিকতার পাদপীঠে। যে নৈতিকতা থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছিলেন সেই নৈতিকতা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মধ্যেও। এই দুই নৈতিকতার যোগফল রামকিঙ্করের সমগ্র সৃষ্টি।

চল্লিশের অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় বিনোদবিহারী বা রামকিঙ্কর বয়সের দিক থেকে একটু অগ্রবর্তী। চল্লিশের গোড়ায় অন্যান্য শিল্পীরা যখন পথের সন্ধানে একটু বিভ্রান্ততায় আচ্ছন্ন, শান্তিনিকেতনের এই দুই শিল্পীই তখন স্বকীয় পথ প্রায় গড়ে ফেলেছেন। চল্লিশের অভিজ্ঞতা রামকিঙ্করকে আরও প্রাজ্ঞ করেছিল। 'রূপ'কে আরও নতুন দিকে প্রসারিত করেছিল। কলকাতা বা মুম্বাইতে চল্লিশের শিল্পীরা চল্লিশের দশক জুড়ে তাঁর কাজ তেমনভাবে লক্ষ করেননি। নজর করলে হয়তো উপকৃত হতেন। কে. জি সুব্রামনিয়ন তাঁর এক সাক্ষাৎকারে এরকম ইঙ্গিত করেছেন। 'ক্যালকাটা গ্রুপ' মাত্র ১৯৫৩ সালে তাঁদের এক প্রদর্শনীতে রামকিঙ্করকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। প্রদোষ দাশগুপ্ত তাঁর 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা' বইতে জানিয়েছেন, রামকিঙ্কর 'এই (ক্যালকাটা) গ্রুপের সভ্য হিসেবে ১৯৪৯ সনে যোগদান করলেন স্ব-ইচ্ছায় যাতে নিজেকে আধুনিক জগতের নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে অবহিত রেখে কাজ করে যেতে পারেন।' রামকিঙ্করের অনেক শ্রেষ্ঠ কাজই অবশ্য ১৯৪৯-এর আগে হয়ে গেছে। চল্লিশের অনেক শিল্পী যে রামকিঙ্করকে সেভাবে বুঝতে পারেননি, তারও একটি দৃষ্টান্ত প্রদোষ দাশগুপ্তের ওই লেখায় রয়ে গেছে। প্রদোষবাবু লিখেছেন :

> "তাঁকে (রামকিঙ্করকে) এই বলে দোষারোপ করা যেতে পারে যে তাঁর নিজের গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে তাঁর বেশিরভাগ কাজেরই কোনো সঙ্গতি নেই। রামকিঙ্করকে আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে গণ্য করার সময় এই প্রশ্ন সবসময়ই আমাদের মনে জেগে থাকবে। শান্তিনিকেতনের গ্রাম্য আবহাওয়া, তার পটুয়া, কুমোর-কামার এদের কাজের ফর্ম এবং নকশার বিশিষ্টতা রামকিঙ্করকে কোনো প্রকারেই অনুপ্রাণিত করতে পারেনি এটা খুবই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।" পৃঃ ১২৯)

তিন

ছবি

এই সমালোচনাই আমাদের কিছুটা বুঝতে সাহায্য করে, কোথায় এবং কীভাবে রামকিঙ্কর তাঁর সমকালের শিল্পবোধ ও নৈতিক চেতনা থেকে এগিয়ে ছিলেন। যামিনী রায় সম্পর্কে রামকিঙ্কর যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। যামিনী রায়ের বেলেতোড়ের বাড়িতেও তিনি গেছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কিন্তু যামিনী রায়ের পথ যে তাঁর পথ নয়, এটা বুঝতে ভুল করেননি। 'পটুয়া কুমোর-কামার এদের কাজের ফর্ম' সরাসরি ব্যবহার করে যে তাঁর কোনো লাভ নেই, এই উপলব্ধিই তাঁর আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য। অথচ তীব্রভাবে তিনি নিজের মাটি থেকেই তাঁর শিল্পের রসদ সংগ্রহ করেছেন। উৎসকে সময়ের তাপে রূপান্তরিত করে নেওয়ার মন্ত্র তাঁর জানা ছিল।

এই কাজটিই তিনি সারা জীবন ধরে করে গেছেন। এটা করতে গিয়ে বিভিন্ন ফর্মের মধ্যে বা রূপকল্পের বিভিন্ন ভঙ্গির মধ্যে টানাপোড়েন চলেছে। এই সংঘাত তাঁকে উত্তেজিত করেছে। কিন্তু এর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি হাল ছাড়েননি। রামকিঙ্কর ছিলেন একান্ত অতৃপ্ত শিল্পী। সহজ পেলবতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ছবি বা ভাস্কর্যের ভিতর তিনি খুঁজতেন অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ। সেটা মনের মতো না হলে নষ্ট করে ফেলতেন কাজ। চল্লিশের যে ফর্মের সংকট, যা সেই সময়ের বাস্তবতা ও বাস্তবতাজনিত নৈতিকতা থেকে উদ্ভূত, সেই সংকটের যে কোনো সহজ সমাধান নেই, তা তিনি জানতেন। সেজন্য অবিরত তাঁকে সংগ্রামটা চালিয়ে যেতে হয়েছে। বিভিন্ন ফর্মকে মিলিয়ে নিয়ে তাতে সময়ের তাপ বা নৈতিকতা সঞ্চারের সংগ্রাম।

বিনোদবিহারীর সঙ্গে তাঁর কাজের ধরনের পার্থক্য ছিল। স্বভাবতই সেটা তাঁদের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য থেকেই উদ্ভূত। বিনোদবিহারীর নির্জন, প্রশান্ত মন ও প্রপদী মনন সময়ের আপাত-কোলাহলকে সহজে এড়াতে পারত। ধ্যানের নির্লিপ্ততায় তন্ময় থাকতে পারত। এক আদর্শায়িত সৌন্দর্যচেতনার দিকে তাঁর লক্ষ্য স্থির ছিল। ভিতরে আলোড়নের কোনো প্রকাশ ঘটত না। ছবিতেও সেই আলোড়নের কোনো ছাপ পড়ত না। রামকিঙ্করের স্বভাব এর বিপরীত। সমস্ত রকম ফর্ম নিয়েই ছিল তাঁর অন্তহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেই বিভিন্ন রূপের মধ্যে সংঘাত জাগত। সেই সংঘাতকে তিনি গোপনও করতে চাইতেন না। বরং সেই সংঘাতকে করে তুলতে চাইতেন প্রবহমান জীবনের সংঘাতেরই রূপক। রূপের শুদ্ধতার থেকেও তাঁর বড় সন্ধান ছিল জীবনের নৈতিকতার সঙ্গে সেই রূপকে মিলিয়ে দেওয়ার উপায়।

তাঁর ছবিতে ও ভাস্কর্যে দুর্ভিক্ষ এসেছে, সাঁওতালদের জীবন এসেছে, কৃষ্ণ জন্মের পুরাণকল্প এসেছে, তাঁর চেনা মানুষজন এসেছে, আবার চারপাশের প্রকৃতিও এসেছে। এসব কিছুর মধ্য দিয়েই তিনি সময়ের নিহিত আলোড়নকে ধরতে চেয়েছেন। সেই সময়ের মধ্যে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের কোনো অবকাশ নেই। সে সময় কেবলই যুদ্ধ, হিংসা, সাম্প্রদায়িক কলহ ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়। তাঁর ছবি বা ভাস্কর্য হয়ে উঠেছে সেই সময়েরই ধারাভাষ্য। তাঁর

কর্মের সাধনায় তাই কোনো প্রশান্তি নেই, কোনো নির্লিপ্ততা নেই, কোথাও কোনো পরিতৃপ্তিও নেই। সমস্ত বিশ্বের রূপের উত্তরাধিকারের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছেন। নিয়েছেন সেগুলিই যা তাঁর সময়কে ধরার জন্য প্রয়োজন। তারপর মেলানোর চেষ্টা করেছেন। জীবনের প্রতি, সময়ের নৈতিকতার প্রতি দায়বোধ যদি তীব্রতর না হত, তাহলে তাঁর কাজটা অনেক সহজ হত। রামকিঙ্কর কখনও সেই সহজ পথে চলেননি।

চল্লিশের প্রধান ধারার, আমরা যাকে তৃতীয় ধারা বলেছি একটু আগে, সেই ধারার অনেক শিল্পীর সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। তাঁদের অনেকেই নিঃশর্তে পাশ্চাত্য আধুনিকতার দিকে হাত বাড়িয়েছেন। কেউ বা তার সঙ্গে দেশীয়-লৌকিককে মিলিয়েছেন। কিন্তু কেন বা বাস্তবের কোন ভিত্তির উপর এই সমন্বয় সেটা ভাবেননি। মুম্বাইয়ের এস. এইচ. রাজা (১৯২২), এফ. এন. সুজা (১৯২৪-২০০২) বা জাহাঙ্গির সাবাভালা (১৯২২) যেমন। রূপে তাঁরা ভুলিয়েছেন, কিন্তু জীবনে লিপ্ত হতে চাননি। সময়ের নৈতিকতা নিয়ে মাথা ঘামাননি। আবার রাজা-র মতো শিল্পী স্বদেশকে ধরতে তন্ত্রের বিমূর্ততায় আশ্রয় নিয়েছেন। যা পেলব, সুন্দর এবং সময়ের আলোড়ন থেকে সুদূর। দৃষ্টান্ত নেওয়া যায় এই বাংলা থেকেও। রথীন মৈত্রের ছবিতে লৌকিকের যে সহজ বিন্যাস, তা অলঙ্করণের বেশি কোনও সত্যে পৌঁছতে পারে না। অবনী সেনের পাশ্চাত্য আধুনিকতা আত্মীকরণও যুক্ত হতে পারে না সময়ের নৈতিকতার সঙ্গে। চিন্তামণি করের ভাস্কর্যের বিপুল বিশ্বেও প্রাচ্য পাশ্চাত্যের এই অসমন্বিত দ্বন্দ্বের প্রাবল্য। এ সমস্ত দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যদি রামকিঙ্করের রূপগত সংগ্রামের দিকে তাকাই তাহলে চল্লিশের নৈতিকতার গহন সমস্যার কিছুটা আঁচ পেতে পারি।

রামকিঙ্কর রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের কাছ থেকে নিয়েছেন প্রচুর। এই দুজনই তাঁর নবজন্মদাতা। এদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি বিশ্বের দিকে নিজেকে প্রসারিত করেছেন। সেই আদর্শই তিনি নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আঙ্গিক সরাসরি নিজের কাজে কখনও ব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে তাঁর কি একটু সংশয় ছিল? 'মহাশয়, আমি চাক্ষিক, রূপকারমাত্র' নামে তাঁর সাক্ষাৎকার সংকলনের বইতে তাঁকে বলতে শুনি :

> "আমরা যখন ছাত্র হয়ে আঁকা শিখছি নন্দলালবাবুর কাছে, তখন তো গুরুদেবও আঁকছেন। কবিতার কাটাকুটি দিয়েই শুরু। ভালো খেয়াল। শেষ দশ বছর ঐ পাগলামিতেই পেয়ে বসেছিল। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে খুব আলোচনা হয়। বিদেশের অনেক জায়গায় চিত্রশিল্পী হিশেবেই নাকি গুরুদেবের প্রধান পরিচিতি। কালার, স্ট্রোক, প্যাশান ইত্যাদি নিয়ে রবি ঠাকুরের ছবি সম্পর্কেও অনেকে আলোচনা করে। বিশিষ্টতা হয়তো আছে। তবে মূলতই খেয়াল। কবিতার কাটাকুটি করতে করতেই এসব ইচ্ছার জন্ম। ভালো। খারাপ কী?" (পৃ: ৩৭)

আবার 'শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারি' বইতে সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন বলছেন রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে তখন আবার শোনা যায় অন্য সুর। সেখানে বলছেন :

> 'দেখলে না, শেষকালে ক্ষেপে গিয়ে নিজেই (রবীন্দ্রনাথ) আঁকতে আরম্ভ করলেন। জোর কাকে বলে দেখেছ তো ওঁর ছবিতে। বাইরের জোরের কসরত নয়। ও

দেখলেই বোঝা যায়। ভিতরের প্রাণের জোর। বেশি বলে না, কিন্তু আপনিই চেনা যায় দেখামাত্র। ছবি অবশ্য আগেও মাঝে মাঝে আঁকতেন। ছোট ছোট স্কেচ। কিন্তু শেষে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাজের ঝড় বয়ে গেলো। আমাদের হাওয়াটাই বদলে দিলেন একেবারে।' (পৃ: ৪৭)

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে তাঁর এই দুই উক্তিকে মিলিয়ে নিলে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের ছবির জোরটাকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু খেয়ালি ব্যাপারটা তাঁর কাছে তত গ্রহণযোগ্য হয়নি। রবীন্দ্রনাথের আঙ্গিকের সঙ্গে তিনি মেলাতে পারেননি নিজেকে। বাস্তবতার আরও প্রত্যক্ষ আলোড়ন তাঁর কাম্য ছবি বা ভাস্কর্যে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি পরিপূর্ণভাবে ছবি। তাতে দ্বিমাত্রিক চিত্রীয় বিন্যাসের উপরই জোর। আর রামকিঙ্করের ছবি ভাস্কর্যগুণান্বিত। পটের দ্বিমাত্রার মধ্যেই ত্রিমাত্রিকতার আবহ সেখানে। কেননা তাঁর ছবি প্রত্যক্ষভাবে জীবনের সংঘাতেরই প্রতিরূপ। এমনকী তাঁর অনবদ্য জলরঙের নিসর্গরচনাতেও একটি তৃতীয় মাত্রার দ্যোতনা আসে। বিনোদবিহারীর ছবির সঙ্গেও তাঁর ছবির এখানেই পার্থক্য। বিনোদবিহারী মূলত চিত্রী। রামকিঙ্কর একাধারে চিত্রী ও ভাস্কর হয়েও বা হওয়ার জন্যই চিত্রেও ভাস্কর্যের গাঠনিকতা এনেছেন। এই স্ট্রাকচারাল কোয়ালিটি এসেছে আদিমতার সঙ্গে তাঁর সংযোগের জন্য। এই আদিমতার প্রতি টানই তাঁকে অভিব্যক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট করেছে যেমন, তেমনি ঘনকবাদ বা কিউবিজমের প্রতিও আকৃষ্ট করেছে।

পাশ্চাত্য আধুনিকতার এই দুটি রূপকল্প, এক্সপ্রেসনিজম ও কিউবিজম, রামকিঙ্করকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। চল্লিশের চিত্রকলার এটা একটা বৈশিষ্ট্য। অনেক শিল্পীই এই দুটি আঙ্গিককে ব্যবহার করেছেন বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করতে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যবহার দেশের জলহাওয়ার সঙ্গে মেশেনি। আরোপিত থেকে গেছে। ছবি যেন ধার করা ভাষায় কথা বলেছে। আত্মপরিচয় গড়ে ওঠেনি। রামকিঙ্করের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। কেননা তাঁর কাছে এই আঙ্গিক উঠে এসেছে তারই সত্তার গভীর থেকে। শিল্পের আঙ্গিকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভেদ নেই বলে তিনি মনে করতেন। তা একটি 'বৃহত্তর সৃজনশীলতার বৃত্ত' বা 'ক্রিয়েটিভ সার্কিট'-এরই অঙ্গ। কেননা পাশ্চাত্য আধুনিকতায় এই দুটি আঙ্গিক উদ্ভাবিত হয়েছে প্রাচ্যেরই আদিমতার উত্তরাধিকার থেকে। রামকিঙ্কর রূপের এই সলিডিটি, এই স্ট্রাকচার বা ত্রিমাত্রিকতা দেখতে পেতেন আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনে যেমন, তেমনি আমাদের শিল্পের ঐতিহ্যেও। এজন্যই তাঁকে যদি বলা হত, তাঁর ছবিতে পাশ্চাত্য প্রভাব রয়েছে, তিনি সেটা মানতেন না। 'মহাশয় আমি চাক্কিক, রূপকারমাত্র' বইতে স্পষ্টতই বলেছেন :

'আমাকে অনেকে বলে, পশ্চিমের শিল্পীদের প্রভাবে আঁকি। কিন্তু আমার ধারা তো এদেশেরই ধারা। এদেশের শিল্প কখনও নকল করেনি। ছন্দ হল তার ভেতরের কথা। পুজোর ঠাকুরমূর্তির কথা যদি ছেড়ে দাও, আমাদের দেশের মূর্তির মোদ্দা কথা হচ্ছে স্ট্রাকচার, ছন্দোময় রূপগঠন।' (পৃ: ৪৭)

কাজেই আমাদের ঐতিহ্যের এই স্ট্রাকচার বা গাঠনিক প্রবণতাকে তিনি নিয়েছেন। আমাদেরই বাস্তবতার সঙ্গে তাকে মিলিয়েছেন।

এখানেও বিনোদবিহারীর ছবির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। বিনোদবিহারীর ছবিতে কিউবিস্টিক স্ট্রাকচারের প্রাধান্য খুবই কম। রামকিঙ্করে সেটা খুব বেশি করে উপস্থিত। এদিক থেকেই পিকাসো তাঁকে প্রভাবিত করেছে। পিকাসোও কিউবিজমকে ব্যবহার করেছেন বাস্তবতার বিশ্লেষণে। বাস্তবতার নিহিত ক্ষয় বা বিপন্নতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে। রামকিঙ্করও তাই। যদিও পিকাসোর ভাস্কর্য তিনি পছন্দ করতেন না। হয়তো জীবনের সেই ব্যাপ্তি ধরা পড়ত না বলে। রামকিঙ্করের কাছে জীবনের অভিব্যক্তি ছাড়া শিল্পের কোনও অর্থ ছিল না।

বাঁকুড়ার গ্রামের জীবনের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যকে সঙ্গে করে রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনে এসে জীবনের দুই রূপ তিনি দেখেছেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল—মানবতার ও সৃজনের দুই আলোকিত স্তম্ভ। দেখেছেন স্বাধীনতা আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, দুর্ভিক্ষ, বিশ্বযুদ্ধের আস্ফালন আর মহাত্মা গান্ধির মতো বিরাট মানুষ। আর একদিকে দেখেছেন শান্তিনিকেতনের চারপাশের বিপুল প্রকৃতি ও সাঁওতালদের কর্মময় ছন্দিত বর্ণিত জীবন। এগুলিই তাঁর শিল্পে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। নন্দলালের বাঁধা গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বে ঝাঁপ দিয়েছেন। আধুনিকতার গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকারগুলিকে ব্যবহার করেছেন তাঁর স্মৃতির ও বাস্তবের দৃশ্য ও ঘটনাপ্রবাহকে রূপ দিতে।

তাঁর প্রথম দিকের ছবিতে নব্য-ভারতীয় আঙ্গিকের কিছু রেশ ছিল। বাঁকুড়ায় থাকতে একজন তাঁকে দিয়েছিলেন রাফায়েলের ম্যাডোনার প্রতিলিপি। সেটারই একটা কপি করে দিতে বলেছিলেন তাঁকে। রামকিঙ্কর কপি করেননি। পরিবর্তে এঁকেছিলেন বন্দিনী সীতার ছবি। শান্তিনিকেতনে এসেও নব্য-ভারতীয় ধারার আভাস অনেকদিন পর্যন্ত থেকেছে তাঁর ছবিতে। ১৯৩০-এ আঁকা 'আ স্ট্যান্ডিং উওম্যান' নামে একটি টেম্পারার ছবি আছে দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারিতে। দরজা ধরে দাঁড়ানো গৃহবধূ, সামনে পুষ্পিত লতানো গাছ। রামকিঙ্করীয় নিজস্বতা তেমনভাবে পরিস্ফুট হয়নি এই ছবিতে। আবার ১৯৪০-এর একটি তেলরঙের ক্যানভাস 'মাদার', সেখানে দেখা যায় কিউবিজমের জ্যামিতির প্রাবল্য। এই আঙ্গিক-অতিরেকের মধ্যেও মাটির টান ফুটে ওঠেনি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই প্রান্ত যখন মিলেছে নিজস্ব বাস্তবতার নৈতিকতার টানে, তখনই বেরিয়ে এসেছে তাঁর নিজস্বতা। ১৯৪৮-এর তেলরং 'বিনোদিনী' বা 'গার্ল উইথ ডগ' ছবিতে উত্তর-প্রতিচ্ছায়াবাদী আঙ্গিকের তুলিচালনা। কিন্তু রূপের ভিতর দিয়ে কেমন করে ধরতে হয় মানুষের মন, তারই অনবদ্য দৃষ্টান্ত এগুলি।

তেলরঙের ছবিতে আমরা রামকিঙ্করকে পরিপূর্ণভাবে পাই যখন তিনি আঁকেন কর্মীষ্ঠ মানুষের ছবি অথবা মানুষের বিপন্ন বাস্তবতার ছবি। ধান কাটা, ফসল তোলা যে কতভাবে এসেছে তাঁর ছবিতে। 'গোল্ডেন ক্রপ', 'ইন দ্য ক্যাসল', ১৯৪৭-এর 'শিফটিং জেনারেশন', ১৯৫৭-র 'হারভেস্টার'—এসব ছবিতে কিউবিজমের জ্যামিতিকে ব্যবহার করেছেন নানাভাবে। কর্মপ্রয়োগে গড়ে ওঠা সেই জ্যামিতিক তলবিন্যাস অবয়বকে ও পরিপ্রেক্ষিতকে বিশ্লেষণ করেছে। পরিস্ফুট হয়েছে কাজের ভিতরের ছন্দ ও আনন্দ। আবার দুর্ভিক্ষের ছবিগুলিতে এই বাস্তবেরই নিহিত ট্র্যাজেডি, বিপন্ন করুণাকে তুলে এনেছেন। আকাশে পাখা মেলে উড়ছে শকুন। নীচে পড়ে আছে মানুষের শব। দুটো শকুন তাকে খুবলে খাচ্ছে। সাদা কালো ও

ধূসরের এই ছবিটিতে খানিকটা লালের ব্যবহার রয়েছে মৃত মানুষটির ছিন্ন শরীরে আর উড়ন্ত শকুনটির গলায়, পায়ের কিছু অংশে। তাতে উগ্র হয়ে বেরিয়ে এসেছে ক্ষুধা, মৃত্যু ও হিংসার প্রকট রূপ। টেম্পারায় এঁকেছেন 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড'। কঙ্কালসার মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছে ক্ষুধার মূর্ত প্রতীক মা। পিছনের শূন্য পটে অল্প কিছু কালোর ছোপ। আলোর শূন্যতা দিয়ে এক নিবিড় অন্ধকার গড়ে উঠেছে এখানে। অথবা সেই বিখ্যাত টেম্পারাটি। নির্জন শূন্য পথ। দূরে টানা চলে গেছে গাছের সারি। তুলির দ্রুত টানে আঁকা রৈখিক ছোপে সঞ্চারিত হয়েছে পথের জঙ্গম প্রবহমানতা। এর মধ্যে সম্মুখপটে টান টান বসে দীর্ঘদেহী শীর্ণা মাতৃমূর্তি। তার কোলে মাথা রেখে মাটিতে শায়িত ঘুমন্ত অথবা মৃত বালক। যেন চিরন্তন কালের প্রাণকে এঁকেছেন শিল্পী এই মানবী মূর্তিতে। সৌন্দর্য ও বিপন্নতার এক করুণ সংঘাত এখানে।

কৃষ্ণের পুরাণকল্প বরাবার এসেছে রামকিঙ্করের ছবিতে। শৈশবে ঘরের ভিতর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির ছবি দেখে আর সেই ছবি নকল করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই তাঁর ছবি আঁকায় হাতেখড়ি। এই কৃষ্ণের জন্মের পুরাণকল্পকে তিনি ব্যবহার করেছেন চল্লিশের হত্যা, মৃত্যু ও বিধ্বস্ত বাস্তবতার প্রতীকী রূপায়ণে। কলাভবন সংগ্রহের 'কৃষ্ণের জন্ম' ছবিটিতে চল্লিশের বাস্তবতার প্রতীকী ভাষ্য ফুটে ওঠে প্রকটভাবে। নগ্নিকা গর্ভিনী নারী শুয়ে আছে ভূমিতলে। গর্ভের উপর উদ্যত অসি হাতে বসে আছে ঘাতক। তার শরীর গঠনে রেখার কৌণিকতায় ফুটে উঠেছে নৃশংসতা। ভূমিতে ছড়িয়ে আছে শিশুর ছিন্ন মুণ্ড। ওদিকে সদ্যোজাত কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে কেউ। ছুটতে ছুটতেও সে পিছন ফিরে দেখছে হত্যার তাণ্ডব। তার মাথাটি শরীর থেকে দীর্ঘায়িত হয়ে কৌণিকভাবে বেরিয়ে আসছে। আকাশে কালো মেঘে বিদ্যুতের আগুন ঝলসে উঠছে। বাংলার কৃষিজীবী সমাজের অতীত ইতিহাস ও পুরাণকল্পকে রামকিঙ্কর এখানে আধুনিক বিশ্বের সন্ত্রাসময় সংঘাতের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আঙ্গিকেও ব্যবহৃত হয়েছে কিউবিজমের সারাৎসার। পিকাসো-র 'গের্নিকা' ছবির কথা মনে আসে খুব। অতিরিক্ত আখ্যান ও প্রতীকের ভারে, অতিরিক্ত পিকাসো নির্ভরতায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে কি শিল্পীর স্বকীয়তা ও সামগ্রিক নান্দনিকতা? এই প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। রামকিঙ্কর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নয় এই ছবি, বলা হয়েছে এরকমও। কিন্তু রামকিঙ্করের কাছে শুদ্ধ নান্দনিকতার থেকেও জীবনের এই টান অনেক বড় ছিল। এই নৈতিকতাতেই তাঁর শিল্পীসত্তার স্বকীয়তা। তাঁর কাছে শিল্পের স্বদেশ-বিদেশ কিছু ছিল না। বিশ্বই তাঁর উত্তরাধিকার।

এই বিপর্যস্ত সংঘাত যখন চলছে ঘরে বাইরে, তখন জীবনের আরও এক আখ্যানও প্রবাহিত হয়ে চলেছে পাশাপাশি। বাংলার গ্রামে কৃষকের কাজের বিরাম নেই। ১৯৪৪-এর একটি জলরঙের ছবি আছে কলাভবন সংগ্রহে। হেমন্তের মাঠে ধান কাটছে কৃষক রমণী। মাঠের মাঝে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সে। ডান হাতে কাস্তে। উপরে তোলা বাঁহাত থেকে তাঁর শরীর বেয়ে নেমে এসেছে ধানের গুচ্ছ। ধূসর, হাল্কা হলুদ আর অস্ফুট সবুজের দ্রুত সঞ্চালিত তুলির ছোপে গড়ে উঠেছে প্রতিমাকল্প। সুন্দর যখন বাস্তবে এসে মেলে, তখন

নন্দনের যে রূপ হয় তাই ধরা পড়েছে এই ছবিতে। এই দুটি ছবির মধ্য দিয়ে আমরা পাই রামকিঙ্করের মনের বা নৈতিকতার দুটি দিক। চল্লিশের নৈতিকতার এই একটি কাঠামো তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের আধুনিকতা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে।

চার

ভাস্কর্য

ভাস্কর হিসেবে রামকিঙ্করের পরিচয় তাঁর চিত্রী পরিচয়কে ছাপিয়ে যায়। তবু ছবিতে ধরা পড়ে তাঁর যে মন, তার ব্যাপ্তি অনেক বেশি। কবে যে তিনি আঁকেননি ছবি, তা হয়তো তিনি মনে করতে পারতেন না। এত আঙ্গিকে এত মাধ্যমে এত অজস্র ধারায় তিনি এঁকে গেছেন সারা জীবন, আর এত ছড়িয়েছেন, এত বিলিয়েছেন আর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এত লুটেপুটে নিয়েছে ধান্দাবাজ বহু মানুবজন, যে আজ আর তার পুরো হদিশ পাওয়া ভার। সে সব ছবি যদি থাকত তাহলে তাঁর শিল্পীমনের ক্রমিক উন্মোচনের একটা রূপরেখা পাওয়া যেত। রামকিঙ্কর ব্যবসায়ী ছিলেন না। তাই যে স্টাইল বাজার 'খায়' সেই স্টাইলের পুনরাবৃত্তি করে যাননি বছরের পর বছর। প্রতিটি ছবিই ছিল তাঁর নতুন উন্মোচন। তাই ছবির ভিতর দিয়ে তাঁর সময়ের ক্রমবিকাশও ধরা পড়ে।

তা সত্ত্বেও ভাস্কর হিসেবে তাঁর পরিচয় যে ছবিকে ছাপিয়ে যায়, এর কারণ ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন প্রথম আধুনিক। তাঁর আগে আধুনিক ভারতে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অনেক ভাস্কর কাজ করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের ভাস্কর্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি কেউ। বা আধুনিকতার মূল্যমানে ভাস্কর্যের ভিতর দিয়ে স্বকীয় আত্মপরিচয় গড়ে নিতে পারেননি। সময়ের নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত করতে পারেননি ভাস্কর্যের রূপ। রামকিঙ্করই প্রথম সে কাজটি করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে তখন ভাস্কর্য শেখানোর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। প্রদোষ দাশগুপ্ত তার স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, তিনিও গোড়ায় শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন ভাস্কর্য শেখার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু ব্যবস্থা নেই দেখে ফিরে আসেন। চলে যান মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে। শান্তিনিকেতনে অনেক গুণীজন যেমন আসতেন, তেমনি একসময় এসেছিলেন মার্গারেট মিলওয়ার্ড ও লিজা ফন পট নামে দুই শিল্পী। তাঁরা কিছুদিন ভাস্কর্য শিখিয়েছিলেন। রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীর বা রুদ্রাপ্পা হাল্লি তাঁদের কাছে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। তারপর সবটাই রামকিঙ্কর নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করেন।

তখন শান্তিনিকেতনে স্বাধীনভাবে ভাস্কর্য করে যাওয়ার কিছু সমস্যা ছিল। ভাস্কর্য তো একটি ব্যয়সাপেক্ষ মাধ্যম। মাটিতে বা প্লাস্টারে ছোট ছোট কাজ করা সম্ভব। কিন্তু তার স্থায়িত্ব সীমিত। কাঠ, পাথর বা ব্রোঞ্জে কাজ করা ব্যয়সাপেক্ষ। সে ব্যয় বহন করার ক্ষমতা রামকিঙ্করের নিজের তো ছিলই না, কলাভবনেরও ছিল না। ফলে রামকিঙ্করকে বিকল্প পথ উদ্ভাবন করতে হয়েছে যাতে কম খরচে কিছুটা অন্তত দীর্ঘস্থায়ী কাজ করা যায়। তাঁর সিমেন্ট কংক্রিটে কাজের সূচনা এই সীমাবদ্ধতা থেকেই।

'শ্যামলী' বাড়ির দেয়ালে পূর্ণাবয়ব সাঁওতাল পুরুষ-নারীর রিলিফে রূপায়ণের মধ্য দিয়ে ভাস্কর্যে তাঁর আধুনিকতা বোধের প্রথম সঞ্চার ঘটতে থাকে। ১৯২৯-এর প্লাস্টারে করা 'কচ ও দেবযানী'-তে পুরাণকল্পমূলক বিষয়ের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তিবাদী তীব্রতার সঞ্চার করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বা তার পরেও কিছুদিন ভাস্কর্যে তাঁর স্বকীয়তা সেভাবে পরিস্ফুট হয়নি। সেই স্বকীয়তা প্রথম দেখা গেল ১৯৩৫-এর করা 'সুজাতা'-য়। 'সুজাতা' তাঁর সিমেন্ট কংক্রিটে করা প্রথম বড় মাপের ভাস্কর্য। জয়া আপ্পাসামী তখন কলাভবনের ছাত্রী। তাঁর রোগা লম্বাটে চেহারাকে রামকিঙ্কর ধরেছেন এই ভাস্কর্যে। বৃক্ষের আদলে গড়া চলমান এক যুবতী। স্বাভাবিকতা থেকে বেরিয়ে এসে এই যে দীর্ঘায়িত অবয়ব নির্মাণ, প্রকৃতি ও মানুষকে এই যে একাত্ম করে তোলার প্রয়াস, একাত্ম করে সৌন্দর্যের এই যে বিশেষ অভিব্যক্তি, এটা এর আগে ভারতীয় ভাস্কর্যে ছিল না। শীর্ণাবয়বের কারণে পিকাসোর 'স্টিক স্ট্যাচু'র কথা মনে আসতে পারে, কিন্তু 'স্টিক স্ট্যাচু'-র অভিব্যক্তি ব্যক্তিময় শূন্যতা থেকে 'সুজাতা' অনেক দূরবর্তী। 'সুজাতা'-র মধ্যে কিছু ঐতিহ্যগত অনুভবও রয়ে গেছে যা একে 'স্টিক স্ট্যাচু' থেকে আলাদা করেছে। ভারতীয় ভাস্কর্যে ঐতিহ্য সম্পৃক্ত আধুনিকতার সূচনা হল 'সুজাতা'-র মধ্য দিয়ে।

নন্দলাল একে অবশ্য খানিকটা আখ্যানের আদল দিয়েছেন। যুক্ত করতে চেয়েছেন পুরাণকল্পের সঙ্গে। অদূরে ছিল রুদ্রাপ্পা হাল্পির নতোন্নত পদ্ধতিতে করা গোবর মাটির বুদ্ধ মূর্তি। যেন সেই বুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়ে, এই ভাবনায় তাঁর নাম দিলেন 'সুজাতা'। কাহিনীর সম্পূর্ণতা আনতে তার মাথায় বসিয়ে দিতে বললেন পায়সান্নের বাটি। তবু এই পুরাণকল্প আরোপিত। না আনলেও 'সুজাতা' রূপের স্বরাটত্বে স্বমহিমায় উজ্জ্বল থাকত। ভারতবর্ষে প্রথম আধুনিক ভাস্কর্য রচিত হল। তা অনুমোদন পেল রবীন্দ্রনাথেরও। রবীন্দ্রনাথ রামকিঙ্করকে ডেকে বলেছিলেন, এরকম ভাস্কর্যে সারা শান্তিনিকেতন ভরিয়ে দিতে। সমরেশ বসুর ভাষায় এর পর আর তাঁকে ফিরে দেখতে হয়নি।

অবশ্য রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের পথ তাতেও যে খুব সুগম হয়েছিল, তা নয়। কিন্তু তিনি কখনও থেমে থাকেননি। সমস্যা এসেছে। বাধা পেয়েছেন। নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তাঁর ভাস্কর্য উৎপাটিত হয়েছে, 'ধান মাড়াই' রচনাটি যেমন; অনেক রচনা পরিকল্পনা করেও শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পেয়ে বন্ধ করে দিতে হয়েছে, তবু তিনি নিশ্চেষ্ট হননি। শিল্পের জন্য এরকম নিবেদিত প্রাণ এবং এত তীব্র ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আমাদের দেশে খুব কম শিল্পীই এসেছেন তাঁর আগে বা পরে।

১৯৩৮-এ করা তাঁর 'সাঁওতাল পরিবার' ভাস্কর্যটি তাঁকে আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসেবে স্বীকৃতি দিল। কলাভবন সংলগ্ন চত্বরে মুক্ত প্রান্তরে আকাশের তলায় গাছপালার মধ্যে রচিত হল এই কাজটি। উপাদান হিসেবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন চার বস্তা সিমেন্ট আর কিছু লোহা। আর কাঁকর তো শান্তিনিকেতনে এমনিতেই পাওয়া যায় প্রচুর। এই সামান্য উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই পরিবেশ ভাস্কর্য। প্রথমে বাঁশের কাঠামো তৈরি করে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু সিমেন্ট কংক্রিটের ভারে

ভেঙে পড়েছিল সেই কাঠামো। পরে লোহার কাঠামো করে তার উপর কাজ শুরু করেন। চারপাশে মাচা তৈরি করে তার উপর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে সিমেন্ট কংক্রিট ছুঁড়ে ছুঁড়ে এগোতে থাকে কাজ। এই যে সিমেন্ট কংক্রিট ছুঁড়ে ছুঁড়ে লাগানোর প্রক্রিয়া এটা রামকিঙ্করের নিজের উদ্ভাবিত। এর ফলে যে অমসৃণ ত্বক তৈরি হল, তা সমৃদ্ধ বুনোটের কাজ করে। এরকম টেক্সচার বা বুনোট অন্য কোনও মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। এটা তাঁর মূর্তির নান্দনিকতায় বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

'সাঁওতাল পরিবার' আজ সকলেরই চেনা। সারা দিনের কাজের শেষে বাড়ি ফিরছে সাঁওতাল দম্পতি। সঙ্গে পাশে পাশে চলেছে পোষা কুকুরটি। নারীর কাঁধ থেকে ঝোলানো দড়ির খাঁচায় শান্ত হয়ে বসে আছে শিশু সন্তানটি। নারী মাথার উপর আর পুরুষটি পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই হল ভাস্কর্যের বিষয়। মাটির কাছাকাছি লৌকিক জীবনের এই যে পরিতৃপ্ত পরিপূর্ণতা, এরকম সারল্যময় সহজ বিষয় নিয়ে ভাস্কর্য এর আগে খুব বেশি হয়নি। মহারাষ্ট্রে কিছু হয়তো হয়েছে এর আগে, কিন্তু সেসব অত্যন্ত পরিশীলিত অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার ভাষায়। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 'ট্রায়াম্ফ অব লেবার' করেছিলেন ১৯৫৪ সালে, আর 'মারটার্স মেমোরিয়াল' ১৯৫৬-তে। পরিবেশ ভাস্কর্য হিসেবে এ দুটি বিখ্যাত। 'ট্রায়াম্ফ অব লেবার'-এর বিষয়ও জনজীবন থেকে উঠে আসা। কিন্তু দুটোই হয়েছিল 'সাঁওতাল পরিবারের' অনেক পরে। আর আঙ্গিকের দিক থেকেও দেশের শিকড়ের সঙ্গে তাদের কোনো সংযোগ নেই। এ সমস্ত বিবেচনা করলে বলা যায়, রামকিঙ্করের 'সাঁওতাল পরিবার' আমাদের আধুনিক ভাস্কর্যে এক নতুন সংকেত নিয়ে এল।

চল্লিশের দশকে আমাদের ভাস্কর্যে আধুনিকতার সূচনা হলেও 'ফর্ম' নিয়ে সমস্যা থেকেই গেছে। আমাদের প্রধান ভাস্কররা পাশ্চাত্য আধুনিকতার আঙ্গিককে নানাভাবে মেশাতে চেষ্টা করেছেন আমাদের ঐতিহ্যগত ভাষার সঙ্গে। কেউ বা সেই সমন্বয়ের চেষ্টাও করেননি। সরাসরি ব্রাঁকুসি, হেনরি মুর, বারবারা হেপওয়ার্থ বা জিয়াকোমেত্তির ভাষাকেই ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। ফলে ভাষার এক অসমন্বিত দ্বন্দ্ব থেকেই গেছে আমাদের আধুনিক ভাস্কর্যে। এই সমস্যার পরিপূর্ণ নিরসন হয়নি ১৯৬০-এর দশক পর্যন্তও। মীরা মুখোপাধ্যায় বা কেরালার কানহাই কুনহিরামনের মতো শিল্পী ষাটের দশকের পরে এই সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধানের পথ খুঁজেছেন। এ কথা মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারি ১৯৩৮ সালে রামকিঙ্কর 'সাঁওতাল পরিবার'-এর মধ্য দিয়ে ভাস্কর্যের রূপ ভাবনায় কীরকম নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন।

১৯৩৮-এই তিনি করেন রবীন্দ্রনাথের একটি মূর্তি। তাতে রবীন্দ্রনাথের চেহারার স্বাভাবিকতা একেবারেই নেই। কপাল জুড়ে দুটি কোটর। চোখদুটি বলের মতো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। একই তলে নেই তারা। একটি চোখ স্বাভাবিক অবস্থান থেকে নেমে এসেছে অনেকটা। দাড়িতে গড়ে উঠেছে কতগুলি ধাপ। এরকম বিমূর্ততার ভিতর দিয়ে শিল্পী অভিব্যক্ত করতে করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত সংক্ষুব্ধতা। এরকম মুখাবয়ব ভাস্কর্য আমাদের দেশে আগে হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এরকম কাজ করার সাহস সেই সময় রামকিঙ্কর ছাড়া আর কারুর ছিল না। আঙ্গিকের দিক থেকে এটি অত্যন্ত অভিনব

রচনা। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মুখাবয়বটি করেছিলেন রামকিঙ্কর ১৯৪১ সালে কবির মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে। এন্ড্রুজ সাহেব মারা গেছেন তখন। রবীন্দ্রনাথ শোকে অভিভূত। তাঁরই শোকসভায় পড়ার জন্য লিখছিলেন একটি ভাষণ। সেই সময় কিছুক্ষণের জন্য রামকিঙ্কর মাটি দিয়ে স্কেচটি করার সুযোগ পান। সেই স্কেচ থেকে গড়ে তোলেন এই মূর্তি। শুধু ব্যক্তিগত শোকের পরিমণ্ডল নয়, এখানে ধরা পড়েছে 'সভ্যতার সংকট'-এ মর্মাহত কবির অন্তর্লোকের আলোআঁধারী পরিমণ্ডল। প্রথমটিকে যদি বলা হয় বিমূর্ত, তাহলে দ্বিতীয়টি অভিব্যক্তিবাদী মুখাবয়ব।

মুখাবয়ব ভাস্কর্য রামকিঙ্কর আরও অনেক করেছেন। তার মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথের ব্রোঞ্জমূর্তিতে অমসৃণ বুনোট সমৃদ্ধ স্বাভাবিকতাকে বিশ্লিষ্ট করে যে অভিব্যক্তিবাদের আবহ, তাতে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়েছে প্রকৃষ্টভাবে। ১৯৪৯-এ করা ব্রোঞ্জের 'মধুরা সিং'-এর আবক্ষ মূর্তিতে স্ফুরিত অবয়বের মধ্যে ভিতরের পুঞ্জীভূত শক্তির উচ্ছ্বসিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার প্রবলতা লক্ষ করা যায়। অমসৃণ বুনোটের ভিতর অভিব্যক্তির আলোছায়ার খেলা চলে। এক পূর্ণতার বোধ পরিস্ফুট হয় এই মূর্তিতে, যা ভারতীয় ভাস্কর্যচেতনার অঙ্গ। তার সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিকতার অভিব্যক্তিতে মিলিয়ে নেন তিনি। এই সমন্বয়ের ভিতর দিয়েই ভারতীয় আধুনিকতার এক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন রামকিঙ্কর।

১৯৪৩-এর মন্বন্তর ছবিতে যেমন, তেমনি ভাস্কর্যেও তাঁর সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য মাত্রা হয়ে উঠেছে। ১৯৪৩-এই তিনি গড়েছিলেন 'হারভেস্টার' বা ধানমাড়াই নামে একটি মূর্তি। স্তম্ভের মতো দুটি পা উল্টোনো 'ভি' অক্ষরের মতো ভূমি থেকে উপরে উঠে গেছে। নগ্নিকা এক নারীমূর্তি তার উপর সমস্ত শরীর পিছনে হেলিয়ে দণ্ডায়মান। তার মাথাটি পিছনে ঝুঁকে পড়েছে, তাই আর দৃষ্টিগোচর নয়। দুটি হাত মাথার উপরে উঠে ধরে আছে ধানের গুচ্ছ। সেই গুচ্ছ পিছনে নেমে এসেছে ভূমি পর্যন্ত। কৃষক রমণীর ধান মাড়াইয়ের এক মুহূর্তের একটি ভঙ্গি ধরা পড়েছে এই ভাস্কর্যে। দুর্ভিক্ষের পরিমণ্ডলে কর্মীষ্ঠ এই রমণীকে নন্দিত করেছেন শিল্পী। ১৯৫২-তে প্যারিসে একটি ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয়েছিল, যার বিষয় ছিল 'আননোন পলিটিকাল প্রিজনার্স'। সেই প্রদর্শনীতে রামকিঙ্কর পাঠিয়েছিলেন এই কাজটি। তাঁকে যখন পরে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেন তিনি এই বিষয়ের প্রদর্শনীতে এই কাজটি দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, উত্তর দিয়েছিলেন তিনি, 'যখন ওদিকে লড়াই চলছে বিয়াল্লিশের উত্তেজনায় গুলি চলছে। দুর্ভিক্ষ হল। তখন আসলে ভুক্তভোগী কারা? পলিটিশিয়ানরা তো জেলে গিয়ে বসে আছেন। এই মাঠে কাজ করা কুলি-মজুরই তো আসল প্রিজনার।' এই হলেন রামকিঙ্কর। আর এই তারে বাঁধা ছিল তাঁর সমাজচেতনা ও শিল্পচেতনা। চল্লিশের নৈতিকতায় এভাবেই সাড়া দিয়েছিলেন তিনি।

এই নৈতিকতারই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে ১৯৫৬-র 'কলের বাঁশি'-তে। চালকলের বাঁশি বেজেছে। কাজের ডাকে ছুটে চলেছে দুটি সাঁওতাল যুবতী। পুকুরে স্নান সেরে ভেজা কাপড় শুকোতে শুকোতে চলেছে তারা। পেছনে ছুটছে একটি বালক, উড়ন্ত কাপড়টি ধরে আছে সে। 'সাঁওতাল পরিবার'-এর কিছু ব্যবধানে স্থাপিত সিমেন্ট-কংক্রিটের এই মূর্তি। স্বাধীন

ভারতের নতুন আশার পরিমণ্ডল ধ্বনিত হয় এই ভাস্কর্যে। 'সাঁওতাল পরিবার', 'হারভেস্টার' বা 'ধান মাড়াই' আর 'কলের বাঁশি' এই ত্রয়ী ভাস্কর্য নিয়ে পরিপূর্ণ হয় রামকিঙ্করের বিশ্ববীক্ষা, যেখানে 'দেশ' উঠে আসে অনুপম বৈভবে। এই বাংলার সত্তা, আশা ও যন্ত্রণাকে চিনে নিতে পারি আমরা। ভাস্কর্যে এই কাজটি তাঁর আগে আর কেউ করেননি। চল্লিশের নৈতিকতার রূপায়ণে এজন্যই রামকিঙ্কর অনন্য।

১৯৪০-এ তিনি করেছিলেন গান্ধীজির 'ডাণ্ডি মার্চ'। কলাভবন প্রাঙ্গনেই রয়েছে সেই সুবিশাল মূর্তি। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিকে নিয়ে একসঙ্গে একটি কাজ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যে কাজ করেছিলেন কলকাতার জন্য সেটা তৎকালীন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়নি।

এইগুলো যেমন স্বাভাবিকতার ভিতর অভিব্যক্তির প্রগাঢ়তা আনা রচনা, তেমনি বিমূর্ত ছন্দের কাজও তিনি করেছেন অনেক। সিমেন্টে করা 'মিথুন' তাঁর গোড়ার দিকের কাজ। ১৯৪১-এ সিমেন্টে করেছিলেন 'আলোর ঝাড়'। ১৯৫৩-তে 'গতি'। এরকম আরও অনেক কাজের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির বিমূর্ত সৌন্দর্য যা জীবনকে পড়িয়েই পরিব্যাপ্ত হয়, সেই সৌন্দর্যকে নানাভাবে উন্মীলিত করতে চেয়েছেন শিল্পী। আবার ধ্রুপদী ভারতীয় ভাস্কর্যচেতনাকে আধুনিকতায় মেলে ধরেছেন দিল্লির রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে করা 'যক্ষ-যক্ষী' মূর্তিতে। সম্পূর্ণ পাথর কেটে করা এই মূর্তি নির্মাণে তাঁরা সময় লেগেছিল ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৬, এই বারো বছর। এই কাজটির জন্য করেছিলেন অজস্র ম্যাকেট। অনেকেই মনে করেন এই ম্যাকেটগুলির মধ্যে যে নিবিড় ভাস্কর্যগুণ রয়েছে পরিপূর্ণ মূর্তিতে তার সবটা ধরা পড়েনি। অজুরার কাজে অনেক সময়ই তেমন স্ফূর্তি পেতেন না রামকিঙ্কর। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একজন স্বাধীন শিল্পী। কোনো বাঁধন তাঁকে কোনোদিন বাঁধতে পারেনি।

সেই স্বাধীনতা সঞ্জীবিত হয়েছিল তিনটি উৎসের নৈতিক চেতনার সমন্বয়ে। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথ তথা শান্তিনিকেতনের বিশ্বচেতনা। স্বদেশ-বিশ্বের সমন্বয় চেতনা। দ্বিতীয়টি চল্লিশের সামাজিক পরিস্থিতি ও ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত নৈতিকতা। তৃতীয়টি বাংলার প্রবাহিত জীবন ও কৌম সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত নৈতিকতা। এই তিনটিকে রামকিঙ্কর সঠিকভাবে মেলাতে পেরেছিলেন তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতার চেতনার মধ্যে। সেই স্বাধীনতাই উৎসারিত হয়েছে তাঁর শিল্পে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক উৎস :

১. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারি'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ১৯৯৪।

২. রামকিঙ্কর। 'মহাশয়, আমি চাক্ষিক, রূপকারমাত্র'। মনচাষা। আলিপুরদুয়ার। ২০০২।

৩. প্রকাশ দাস সম্পাদিত। 'রামকিঙ্কর'। এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং। কলকাতা। ১৯৮৯।

৪. আর. শিবকুমার। 'শান্তিনিকেতন : দ্য মেকিং অব কনটেক্সচুয়াল মডার্নিজম'।

ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট, নিউ দিল্লি। ১৯৯৭।
৫. কে. জি. সুব্রামনিয়ন। 'রামকিঙ্কর অ্যান্ড হিজ ওয়ার্ক' ও 'রিমেমবারিং রামকিঙ্কর'। 'নন্দন' পত্রিকা। কলাভবন। বিশ্বভারতী। ২০০৫।
৬. দেবেশ রায় (সম্পাদিত)। 'রক্তমণির হারে'। সাহিত্য অকাদেমি। ১৯৯৯/২০০৫।
৭. মৃণাল ঘোষ। 'সমকালীন ভাস্কর্য'। প্রতিক্ষণ, কলকাতা। ১৯৯৫।
৮. মৃণাল ঘোষ। 'বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন'। প্রতিক্ষণ, কলকাতা। ২০০৫।

থিয়েটারের সংযোগ : স্রষ্টার অবস্থান

তীর্থঙ্কর চন্দ

গল্পটি শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর। তিনি তখন 'পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংজী' যাত্রাপালায় রণজিৎ সিংহের পুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। পুত্র পিতাকে হত্যা করবে—এমনই ষড়যন্ত্র এবং একটি নাচের আসরে ঘটবে ঘটনাটা। নর্তকীও ওই ষড়যন্ত্রের একজন। ওই হত্যাদৃশ্যে শেষমুহূর্তে পিতার অসামান্য ব্যক্তিত্বের সামনে পুত্রের অস্ত্র পড়ে যায়—সেটা আর পিতার বক্ষবিদ্ধ হয়নি। নর্তকী এরপর ভর্ৎসনা করে পুত্রকে বলে, কুমার, কৃপাণ পড়ে গেল। —উত্তরে পুত্ররূপী অজিতেশ-এর একটি অসামান্য সংলাপ। এরপর অজিতেশ-এর নিজস্ব বয়ান : প্রতিদিনই আমি সংলাপটা যথাসাধ্য বলি কিন্তু কোনদিনই ঠিক তেমন হয় না। আমি ধরতেও পারছি না কেন কী হচ্ছে। সবাই ভাল বলছে অথচ— । একদিন মহেন্দ্র গুপ্ত এলেন পালাটি দেখতে। পালা শেষ হলো। গ্রীণরুমে এলেন মহেন্দ্রবাবু। জিজ্ঞেস করলাম, অভিনয় কেমন হচ্ছে। — বললেন, ভাল, বেশ ভাল। —আমি বললাম, না, খুব ভাল হচ্ছে না। —মহেন্দ্রবাবু বললেন, কী করে বুঝলেন। —আমি তখন ঐ রণজিৎ সিংহের হত্যাদৃশ্যের কথা বললাম, কী অসাধারণ সংলাপ অথচ অডিয়েন্স রেস্পন্স করছে কই। —মহেন্দ্রবাবু একটু হাসলেন, বললেন, আমার তো বেশ ভালই লাগছে। —কিন্তু দর্শক যদি সেইরকম রেস্পন্স না করে তাহলে আমার মন ভরবে কেন, আমি বললাম। —শুনে মহেন্দ্রবাবু একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আপনি একটা কাজ করতে পারেন। নর্তকীর ঐ জিজ্ঞাসার পর আপনি সামান্য পজ্ নিন। এই তিন চার সেকেণ্ড। তারপর সংলাপ শুরু করে দেখুন কেমন হয়। —দেখলাম পরের শো-তেই। সামান্য পজ্ দিয়ে সংলাপ ধরতে গিয়েই মনে হলো ভেতরে কী একটা কাজ করছে। তারপর সংলাপটা বলতে আমার নিজেরই এত ভাল লাগছিল আর যখন শেষ হলো তখন গোটা প্যাণ্ডেল জুড়ে হাততালি। —অজিতেশ বললেন, বাবু, আমরা অনেকদিন নাটক করেছি ঠিকই, যাত্রাও করেছি তবু দর্শককে একেবারে হাতের তালুর মত চিনতে পারিনি—চেনেন ওঁরা, ঐ জনপদেশের উপাসকরা।

১৯৬৯ সালে ফরাসি ভাষাবিদ জর্জেস মউনিন (Georges Mounin) নাট্যচর্চায় অভিনেতা ও দর্শকের সম্পর্ক ও সংযোগ সম্পর্কে এতদিনের ধ্যান ধারণাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন। তাঁর মতে, সঠিক যে সংযোগ (Communication) তা আসলে নির্ভর করে দুদিকে যাঁরা আছেন, তাঁরা উভয়েই উভয়ের সংকেত (বা code)-গুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কিনা—পারস্পরিক এই বোঝাপড়ার উপরই একটা প্রকৃত সংযোগ (genuine communication) তৈরি হয়। থিয়েটারে সেটা হয় না—মউনিন বললেন।

তিনি থিয়েটারটাকে একেবারে একমুখী হিসাবেই দেখেন। এটাকে ব্যাখ্যা করতে একটা শব্দ-চিত্রও তৈরি করলেন তিনি।

উদ্দীপনা

প্রেরক	⟶	গ্রহীতা ⟶ সাড়া
(এই ক্ষেত্রে অভিনেতা)	(এখানে অভিনয়)	(বলাবাহুল্য, দর্শক)

অর্থাৎ নাট্যে অভিনেতাই একমাত্র সক্রিয় আর গ্রহীতার ভূমিকায় দর্শকেরা নীরবে নিষ্ক্রিয়ভাবে কেবল রসাগ্রহীর অবস্থানে রয়ে যায়।

অবশ্য মউনিন-এর এই ভাষ্য খুব দ্রুতই বাতিল করে দেওয়া হলো। এমনকী, এ-ও বলা হলো, অভিনেতা এবং দর্শকের আদান-প্রদান সম্পর্কিত তাঁর এই মতামত 'বুর্জোয়া দর্শনের একেবারে দুর্বলতম ভিত্তির উপর' দাঁড়িয়ে রয়েছে। মউনিন-এর ওই ভাষ্যের উত্তরে ফ্রাঙ্কো রাফিনি (Franco Raffini) বললেন, যোগাযোগের জন্য যদি প্রেরক এবং গ্রাহক দুজনেই দুজনের সংকেতগুলো জানেন, সবসময় এটা যে খুব প্রয়োজনীয় তা-ও মনে হয় না, যাই হোক, যদি জানেনও, সেসব যদি মিলেও যায় তবু অভিনেতা এবং দর্শকের, সংকেত এবং প্রতিসংকেত-এর খেলাটি একই পথ ধরে ঘটে না। অভিনেতারা যে সব নাটকীয় সংকেত ব্যবহার করেন **মোটামুটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন**, অভিনেতাদের প্রেরিত সেইসব সংকেত-কে মোটের উপর ধরে ফেলতে পারেন। (এই বাক্যে বোল্ড শব্দদুটি আলোচনার শেষভাগে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।)

এখন এই পর্যায়ে 'সংকেত'-সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নাট্য উপস্থাপনার সময় অভিনেতাদের উপস্থিতির সঙ্গে পোশাক মঞ্চ আলো আবহ ইত্যাদি সবকিছু আলাদা আলাদা এবং সবকিছুর সমমিশ্রণে প্রকৃতপক্ষে একটি জটিল সংকেত-এর সমাহার দর্শকের কাছে উপস্থিত হয়। একটি উজ্জ্বল উত্তোলিত শিরস্ত্রাণ কিংবা ভাঙা ঘরে একটি ওল্টানো মাটির কলসী যে দম্ভ বা দারিদ্রের বারতা পাঠায়—সে-ও তো সংকেত বা কোড-এর চেহারাতেই। পরবর্তী ক্ষেত্রে যেহেতু এই সংকেত বা কোড এবং সংকেতমোচন বা ডিকোড-ই আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠবে সুতরাং আপাতত এইটুকু।

মউনিন নাট্যের যোগাযোগ-কে তাঁর ভাষাতত্ত্বের যে বিন্যাস পদ্ধতি তার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে পাচ্ছিলেন অথচ নাট্য শুধু সংলাপ নয় আরও বহু উপাদান মিলেমিশে একটা জটিল যোগাযোগ বিন্যাস গড়ে তোলে এবং তাতে যে বারতা (message) বাহিত হয়ে পৌঁছয় তাও প্রকৃতপক্ষে 'বহু বারতা' (multiple message)। ফলে মউনিন-এর থেকে এগিয়ে গিয়ে নাট্য-সংযোগের শব্দ-চিত্রটি দাঁড়ালো এইরকম

অবাঞ্ছিত শব্দ
Noise
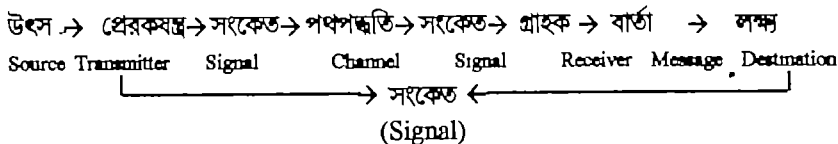
একেবারে শুরুর—প্রেরণের যে কারণ বা নিয়ামক (factor) তা বক্তার/স্রষ্টার মনের কোনো ভাব বা কল্পনা হতে পারে, কোনো একটি ঘটনা হতে পারে অথবা কোথাও জলস্ফীতির আগাম সংকেতও হতে পারে। প্রেরকযন্ত্র হিসাবে কণ্ঠ অথবা একটি ইলেকট্রিক ল্যাম্প অথবা একটি টেলেক্স মেশিন বা একটি কম্পিউটার ব্যবহৃত হলো। প্রেরকযন্ত্র থেকে ভাবাধ্বনি অথবা ল্যাম্পের আলো অথবা গ্রাফিক সাইন-এর ভেতর দিয়ে বক্তব্য বিষয় বা সংকেতটি বিভিন্ন চ্যানেলে এসে পৌঁছয়। এই চ্যানেলে এসে পৌঁছবার পথে অবাঞ্ছিত কিছু শব্দ ইত্যাদি এর সঙ্গে মিশে যেতে পারে ফলে চ্যানেল পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সংকেত-এর মধ্যে কিছু গুণগত পার্থক্য চলে আসে। কোনো বৈদ্যুতিক তার অথবা আলো অথবা ধ্বনি এই চ্যানেল হিসাবে কাজ করে। এই চ্যানেল-পরবর্তী সংকেত এসে পৌঁছয় কোনো একটি গ্রাহক যন্ত্রে যেটা সরাসরি আমাদের কোনো ইন্দ্রিয় হতে পারে অথবা অ্যাম্প্লিফায়ার বক্স অথবা কোনো পর্দা হতে পারে। এইসব কিছুর ভেতর দিয়ে কোনো সংবাদ কোনো ঘটনা বা কোনো নির্দেশ তার লক্ষ্যে পৌঁছয়।

আধুনিক পৃথিবীতে যোগাযোগের এই পথ রেখা মউনিন-এর প্রস্তাবিত বা ব্যাখ্যাত উপায় থেকে যথেষ্ট জটিল। এবং বলা বাহুল্য, থিয়েটারের সংযোগটি জটিলতর কারণ শিল্পের এই মাধ্যমটি বাকি আর সবকটি মাধ্যমকেই আত্মস্থ করার ক্ষমতা রাখে। ফলে এক জটিল সংযোগ-বিন্যাসে আবদ্ধ থাকেন অভিনেতা দর্শক উভয়েই এবং পারস্পরিক বিনিময় প্রক্রিয়ায় বক্তব্যের সংমিশ্রণে তা একসময় জটিলতম হয়ে ওঠে। সেই, সংযোগ-শব্দ-চিত্রটি বিরাট এবং সেই শব্দ-চিত্র আপাতত এই প্রাথমিক পর্যায়ে সরিয়ে রাখা হলো। তবে খুবই সংক্ষেপে এটুকু বলে নেওয়া যায়, একেবারে শুরুতে নাটকের উৎস হিসাবে নাট্যকারের ভাবনা বা কোনো আবেগ নাটকটি লিখে ফেলতে বাধ্য করে (Pre-text)। তারপর নাটকের থেকে তাঁর নিজস্ব কথাটি বার করে আনতে পরিচালকের চিন্তা ভাবনা—মূল নাটকের গ্রহণ-বর্জন (Post-Text কি বলা যায়!); সঙ্গে আলো মঞ্চ পোশাক আবহ-র পরিকল্পক এবং অন্যান্য টেকনিশিয়ানদের সংযুক্তি, মতামত এবং সর্বোপরি অভিনেতা অভিনেত্রী নিজেরা—পরিচালক-নির্দিষ্ট ভাবনা বা সংকেতকে যথাযথভাবে পাঠাতে সাহায্য করেন। এর কোনোটিই যে একেবারে অপরিহার্য এমন নয়। এদের কোনো একটি বা দুটিকে বাদ দিয়েও প্রযোজনা চলে কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট নাট্য নির্মাণে বহুর সংযোগ অবশ্যই আকাঙ্ক্ষিত।

সাহিত্য বা শিল্পের অন্যক্ষেত্রে আর হয় কিনা জানি না, নাট্যশিল্পেই দু-ধরনের টেক্সট বা পাঠ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও এরা গভীরতায় অভিন্ন তবু এদের আপাত প্রকাশ—যা নাট্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং নাট্যে পরিবেশিত হয়—অনেকটাই স্বতন্ত্র। প্রথমটিকে লিখিত বা ড্রামাটিক টেক্সট (Pre-text) এবং দ্বিতীয়টিকে থিয়েট্রিক্যাল বা পারফরমেন্স টেক্সট (Post-text!) বলতে পারি। আমরা অবশ্য চলিত কথায় প্রথমটিকে শুধুই স্ক্রিপট্ বা নাটক এবং দ্বিতীয়টিকে প্রোডাকশ্যন স্ক্রিপ্ট্ বলি।

ঐ দুটি স্ক্রিপ্টের তফাৎ গড়ে ওঠে পরিচালক-এর নিজস্ব চিন্তা ভাবনার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ নাটকের কোন বিষয়টি নাট্যে নির্দিষ্ট করে প্রকাশিত হবে এবং সেজন্য কী কী গ্রহণ বর্জন হবে—সে একান্ত তাঁর (ওই পরিচালকের) ভাবনা প্রসূত। বর্জন একেবারে সার্বজনীন, সংযোজনও হয় এমনকী রবীন্দ্রনাটকেও পরিচালক নিজে অথবা তাঁর ইচ্ছাক্রমে সংলাপ সংযুক্তি ঘটে। সে ভাল কি মন্দ সে আলোচনা এ নিবন্ধের বিষয় নয় কিন্তু সে কাজের উদ্দেশ্যও লিখিত নাটকের ভেতর থেকে একটি বা একাধিক ভাবনাকে প্রকাশ করার প্রয়াস। আর সেই প্রয়াস-রসায়নে এইবার আলো মঞ্চ পোশাক আবহ ব্যবহৃত বস্তু এবং সর্বোপরি অভিনেতার অভিনয়ের অনুপান মিশ্রিত হয়। এমনকী, অভিনয় স্থান—নির্দিষ্ট মঞ্চ বা অঙ্গনের ব্যবহারও নাট্যের বিষয়বস্তুকে ভিন্নতা দেয়।

সংযোগ তাত্ত্বিক (Communication Theorist) আব্রাহাম মোলস (Abrham Moles)-এর ভাষায় : একটি নাট্য প্রযোজনা বিভিন্ন উপায়/চ্যানেলের মাধ্যমে একই সঙ্গে বহু বার্তা (multiple messages) নিয়ে যায় এবং এই 'বহুবার্তা' একই সঙ্গে নান্দনিক অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতায় সম্পৃক্ত হয়। এই যে বহু চ্যানেলের একটি মিশ্রণ, তাকে কিন্তু দর্শকেরা স্বাভাবিক-কারণেই একটি অবিচ্ছিন্ন টেক্সট্ হিসাবে দেখতে পায়।—ওই প্রতিটি উপাদান তার নিজস্বতা নিয়েই ওই প্রেরণ-এর (প্রযোজনার) সঙ্গে মিশে থাকে, রামধনু-র মতো সাতটি আলোর বিচ্ছুরণেই তার সৌন্দর্য। একক হিসাবে অবশ্যই তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কিন্তু এখন এই নাট্যসৃজনে তারা সংগুপ্ত। আর এই সংমিশ্রণ সুচারু না হলে এককভাবে কোথাও আলো কোথাও আবহ কখনও বা মঞ্চ অনেক বেশি উচ্চকিত হয়ে প্রযোজনাকে দুর্বল করে তোলে। একজন সু-পরিচালকের কাজে অবশ্যই একটি সু-মিশ্রণ প্রত্যাশা করা যায়। অন্যদিকে, নাট্যচর্চার সঙ্গে যাঁর যেমন পরিচয়, সেই অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে তাঁদের নিজেদের সংগ্রহে থাকা থিয়েট্রিক্যাল, ড্রামাটিক এবং সাংস্কৃতিক সব সংকেত বা কোড ব্যবহার করে তাঁরা প্রযোজনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, প্রযোজনার নতুন উপলব্ধি তাঁদেরকে তৃপ্ত/অতৃপ্ত করে, তাঁরা উচ্ছ্বসিত/ম্রিয়মান হয়ে পড়েন, হাসিতে ফেটে পড়ে অথবা নীরব থেকে, প্রশংসাবাণী শুনিয়ে অথবা বন্ধ করার নানারকম আবেদন জানিয়ে দর্শকেরা তাঁদের সংকেত পাঠান। অভিনেতারাও নিজেদের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে সঞ্চিত সংকেত-কাঠামোতে এইসব নতুন বা অতি পরিচিত প্রকাশ ভঙ্গির অর্থ চিনে নিতে থাকেন। প্রযোজনা চলাকালীন হাততালি কোথাও কোথাও অভিনেতাদের এবং বহু দর্শককেও বিব্রত করে কারণ গোটা প্রযোজনা-সময় ধরে নিঃশব্দ নীরবতাই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত—দর্শকের উচ্ছ্বাস যেন প্রযোজনা শেষেই ফেটে পড়ে।

ওই নীরবতার সংকেত আবার কোথাও বাতিল। সেখানে অভিনয় চলাকালীন সহর্ষ প্রতিক্রিয়া না হলে অভিনেতাদের কাছে বিপদ-সংকেত আসে—এ কোথায় এলাম, অথবা, এ কী করছি! —এই অভিনেতারা উচ্ছ্বাস-সংকেত-এ অভ্যস্ত। এভাবেই দর্শক এবং অভিনেতার আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে 'নাট্য' একটি সজীব সামাজিক কর্ম হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, এটাও বলা প্রয়োজন, এই বারতা আদান-প্রদানের সূচনা কিন্তু দর্শকদের দিক থেকেই—অভিনয়স্থলে তাঁদের একত্রিত হওয়ার সংকেতই অভিনেতাদের অভিনের চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করার প্রথম বারতা—আমরা সমবেত, উপস্থিত করো তোমাদের সৃষ্টি কর্ম। —অভিনেতারা এরপর মেলে ধরেন তাঁদের প্রযোজনা অর্ঘ্য।

সংস্কৃত নাটকাভিনয়ে প্রাচীন যুগে কেবলমাত্র শিক্ষিত পরিশীলিত দর্শকদের উপস্থিতিই একমাত্র কাম্য ছিল এবং স্বভাবতই তাঁরা উচ্চবর্ণের মানুষ। এই নির্দিষ্ট উপস্থিতির প্রধান কারণ বর্ণ বিভাগ ইত্যাদি তো বটেই, তার সঙ্গে ওই নাট্যে ব্যবহৃত 'উচ্চমান'-এর কাব্যিক ভাষা ছাড়াও যেসব মুদ্রা ব্যবহৃত হত তার গূঢ় অর্থ মুহূর্তে বুঝতেন তাঁরা যাঁরা ওই শিক্ষায় শিক্ষিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্র অসামান্য কিন্তু তার প্রসার, তখন, কেবলমাত্র ঐ উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমায়িত। হাতের একটা নির্দিষ্ট মুদ্রা এবং অভিনেতা অভিনেত্রীর ছোট ছোট পদক্ষেপে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা মানে হরিণ-হরিণীর উপস্থিতি অর্থাৎ এ অরণ্য অথবা কোনো প্রমোদকানন ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এসব সংকেত ওই প্রাকৃত জনেরা বুঝবেন কী করে! অথচ তখন—এবং সবসময়ই—ওই 'প্রাকৃত'-জনেদের নিজস্ব কিছু সংকেত, নিজস্ব কিছু বারতা থাকে কিন্তু সেসব মান্যতা পায়নি বহুদিন। ওই 'প্রাকৃত'-জনেরাও উচ্চবর্ণের ওইসব ব্যবহৃত সংকেত বুঝতে পারতেন যদি নিয়মিত উপভোক্তার আসনে বসে তার রসাস্বাদনের সুযোগ তাঁদের থাকত। কিন্তু তখনকার 'শিক্ষিত' 'পরিশীলিত' 'উচ্চবর্ণ'-এর মানুষেরা অত সহজে সবাইকে এক পংক্তিতে নিয়ে আসবে! বর্ণ বিভাজন তো শ্রম-বিভাজনেরই নিহিত সত্য। ফলে শ্রম-উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করেই যাদের এমন স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থান, তারা কি কখনোই সেই অগণণ জনতার পাল-কে মুক্তি-র মাঠে নিয়ে যেতে চাইবে! এই একই ছবি পৃথিবীর অন্যত্রও। রোমান প্রভু এবং দাসদের, আফ্রিকার সেট্‌লার এবং ওখানকার আদি বাসিন্দাদের, এমনকী অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই মোকাম কলিকাতায় কাজের সন্ধানে আগত সব দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক এবং কলিকাতার তৎকালিন মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের জীবনযাপন, সংস্কৃতিচর্চা যথেষ্ট পাশাপাশি অথচ যেন এক অদৃশ্য দেয়াল দিয়ে ঘেরা, যেন যোজন দূরবর্তী দুই প্রবাহ। অথচ মানের দিক থেকে দাসেরা ঐ স্বল্পদিনের ক্ষমতায় আসার পরই যেসব ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন, পরে রোমান 'সভ্য' সেনানায়কের দল যেগুলিকে নির্মমভাবে ভেঙে ফেলে, আফ্রিকার আদিবাসীদের লোককলায় যার অনবদ্য প্রকাশ, কিংবা অস্ট্রেলিয়া বা হাইতির দ্বীপপুঞ্জেও—সেই শিল্পচর্চা তার অসামান্যতা নিয়েই বাস্তব ছিল। এবং সেটা তাঁদের মত। ক্রমাগত সেসবকে স্বীকৃতি না দিয়ে, তাকে 'কন্টামিনেট' করে, তাঁদের শ্রম-সঞ্জাত অবকাশ-ব্যবহার করে উপরের

শ্রেণীতে যে সংস্কৃতি-র জন্ম হয়, তার নৈপুণ্য থাকতে পারে কিন্তু তার নেপথ্য ইতিহাস বড় করুণ। সে বাকি ইতিহাস বলাবাহুল্য, বহু আলোচিত।

আমাদের সংকেত এবং সংকেত মোচন-এর পাঠে এবার একটি অনবদ্য উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। 'টিনের তলোয়ার' নাটকে 'কইলকেতার তলায় থাকা' মথুর যখন 'বাংলার 'গ্যারিক' কাপ্তেনবাবু-র ওই মেঘনাদ বধ কাব্যের অসামান্য আবৃত্তি-কে— সাহিত্যগত ও বাচনিক সংকেত-কে কোনোভাবেই আত্মস্থ করতে পারে না—তার কাছে কেবল স্বরধ্বনির খেলা বলে মনে হয় তারপর ফুৎকারে সেসব উড়িয়ে দিয়ে বলে, এর চেয়ে আমাদের রামলীলে ভাল। —কাপ্তেনবাবু বুঝতে পারেন মথুর কীভাবে ভুল সংকেত পাঠাচ্ছে, তাঁর বিস্মিত এবং বিদ্রূপাত্মক উক্তি, রামলীলে। —মথুর আবার এই শব্দের গভীরতা ধরতে না পেরে সহজভাবেই বলে ওঠে, হ্যাঁ গো, রামলীলে। রামলীলে ভাল, বাইজির খেমটা ভাল—ইত্যাদি ইত্যাদি। আর তারপরই দূর থেকে যখন ময়না গান ধরে, 'ছেড়ে কইলকেতা বন হবো পগার পার—', তখন কাপ্তেনবাবুর কাছে ময়নার-র ওই সি সার্পে অবলীলায় পেয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর-ই অসামান্য আর মথুর-এর কাছে ওই সহজ কথা সহজ সুর তার গায়কি সব একেবারে অসামান্য কারণ এই গানের সব সংকেতই ওর চেনা। মথুর আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে কাপ্তেনবাবুকে বলে, গান সোনো, গান।— মাইকেল-এর মেঘনাদ বধ কাব্যের থেকে অনেক বেশি আদরের 'ছেড়ে কইলকেতা বন হবো পগার পার।' আমাদের বিস্ময় বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ স্বাভাবিক কারণ আমরা 'মথুর' নই। অবশ্য আমাদের বিস্ময় বা তাচ্ছিল্যের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে মথুরও তার হেঁড়ে গলায় হাতের নোংরা তোলার বালতি বাজিয়ে ততক্ষণে গলা মিলিয়ে দিয়েছে ছাতুবাবুর বাজারে আলুর চুবড়ি নিয়ে বসে যে সব্জীওয়ালী সেই ময়না-র সঙ্গে।

উদাহরণটি ইচ্ছাকৃতভাবেই সামান্য বিস্তারিত করা হলো এইজন্যে যে এই সংকেত (কোড) এবং সংকেত মোচন (ডিকোড)-এর খেলা শিল্পের এটা একটা প্রাথমিক শর্ত। হয়ত বিতর্ক হতে পারে, আধুনিক কাব্য এবং চিত্রকলা তার অবয়বের মধ্য দিয়ে যে সংকেত পাঠানোর চেষ্টা করে, সেসবের সংকেত মোচন বেশির ভাগ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। এখন এইজন্য একজন কবি-বা একজন চিত্রশিল্পী কেবল 'জনগণের কথা' ভেবে নিজেদের সৃষ্টিকে তাঁদের ভাষায় খর্ব, খঞ্জ করে রাখবেন কিনা, নতুনভাবে তাঁর ছবি বা কবিতা নিয়ে ভাববেন কিনা এবং আদৌ সেরকম সৃষ্টি করা যায় কিনা—সে স্বতন্ত্র আলোচনা কিন্তু ঐ শিল্প মাধ্যম দুটি প্রধানত সাধারণের থেকে দূরবর্তী হয়ে আছে—এটা বাস্তব সত্য।

এখন একজন পরিচালক বা প্রযোজক তাঁর নিজস্ব সৃজনশীল প্রযোজনায় যেসব সংকেত ব্যবহার করবেন, সব দর্শকের ভাঁড়ারেই যে সেইসব সংকেত মোচনের অস্ত্র (মেধা/অভিজ্ঞতা) সঞ্চিত আছে, তা না-ও হতে পারে। আবার দর্শকও তো সেই সংস্কৃত নাটকের সময় থেকেই সবাই একইরকম শিক্ষিত পরিশীলিত নয়। এখন পরিচালক তাঁর প্রযোজনায় ঐ মাল্‌টিপল্ মেসেজ-এর মধ্যে এমন কিছু উপায় রাখলেন যেখানে বহু দর্শক

প্রত্যেকেই নাট্যাভ্যন্তরে পৌঁছনোর এক একটা পাশপোর্ট পেয়ে যান। সংকেত-মোচনের একটা প্রাথমিক ধরনতাই। পুরো প্রযোজনা জুড়ে ওই খেলা, একটা আনন্দময় উত্তেজনা দর্শককে সজাগ সচেতন এবং অবশ্যই আবিষ্ট করে রাখে। জুরিজ লোটম্যান (Juriz Lotman) বিষয়টিকে এইভাবে দেখেন—একজন দর্শকের নিজের ভাঁড়ারে যা সংকেত-সঞ্চয় আছে, সেইগুলি দিয়ে ওই নতুন প্রযোজনার রহস্য ভেদ করার চেষ্টা শুরু হতে পারে। এবং ক্রমশ এই 'ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর' প্রক্রিয়ায় দর্শক নিজেই এমন সব সংকেতকে আত্মস্থ করতে থাকেন, বুঝতে থাকেন, যা এতোদিন তাঁর নিজের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। তাহলে এইভাবেই প্রযোজনায় একটা চেনা-অচেনার সংমিশ্রণ যদি থাকে, তবে চেনা-র হাত ধরে ক্রমশ অচেনার জগতে ঢুকে পড়া এবং ক্রমশ অচেনাকে ভয় না পেয়ে—তার সব বাণী সুরকে ধরতে না পারলেও নিজেদের অজ্ঞাতেই এমন অনেক কিছুর সাথে পরিচিত হয়ে যাওয়া, যেটা ভবিষ্যতের পুঁজি হয়ে রইলো। ওইজন্য প্রতিটি আকর্ষণীয় প্রযোজনাই সংকেত-অবলোকন, সংকেত-নির্মাণ ও সংকেত-মোচনের এক জটিল দ্বান্দ্বিক খেলায় অসামান্য হয়ে ওঠে।—

মঞ্চ-মধ্য থেকে উঠে আসা এই বারতা সম্পর্কে সর্বতোসক্ষম হতে গেলে নিজেকেও অভিজ্ঞ করে নিতে হয়। এখন এই অভিজ্ঞতা কেবল অভিনয়ের সূত্র ধরেই ঘটে না।—একটি টেক্সট বা পাঠ-এর প্রকৃত সংকেত-মোচন (ডিকোডিফিকেশ্যন) তখনই ঘটানো সম্ভব যখন একজন পাঠক/দর্শক অন্য (other) টেক্সটগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন (এবং এইভাবে টেক্সট-এর নিয়মগুলিও বুঝতে পারেন)। এইভাবে একটি প্রযোজনা অবশ্য করেই ইন্টারটেক্সচুয়াল—অর্থাৎ একটি প্রযোজনার কাহিনী বা প্রকাশভঙ্গির ভেতর আরও অনেক টেক্সটের উপস্থিতি স্বাভাবিক।—একটি নির্দিষ্ট টেক্সট্ বা পাঠ আরও বহু পাঠের সংমিশ্রণ। একটি টেক্সট বা পাঠ-এর ভেতর আরও অনেকগুলি টেক্সট-এর বিচ্ছুরিত কণাগুলি যাতায়াত করে, পরস্পরকে প্রশমিত করে।—জুলিয়া ক্রিস্তেভা (Junia Kristeva)।—এইভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট পাঠে আমরা 'ইনটারটেক্সচুয়ালিটি' বা বিভিন্ন পাঠের অর্ন্তবয়ন দেখতে পাই। এখন কোনো পাঠক একটি টেক্সটের, একজন দর্শক একই সঙ্গে একটি নাটকের টেক্সট বা পাঠ এবং প্রযোজনা সম্পর্কে যদি বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন, যদি নির্দিষ্ট টেক্সটের ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি তাঁর জ্ঞাত থাকে, যদি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে তিনি অবহিত হন, তাহলে (নাট্যের ক্ষেত্রে) প্রযোজনার ভেতরকার/বিভিন্ন টেক্সটের প্রাসঙ্গিক সম্পর্কগুলি তিনি ধরতে পারবেন এবং এর সাহায্যেই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট দক্ষতা নিয়ে নাট্যের সংকেত-মোচন ঘটানো সম্ভব। বিষয়টি এইখানে, বলাবাহুল্য, কিছুটা অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে চলে গেল। একেবারে সাধারণভাবে হয়ত বিষয়টাকে এইভাবে বলা যেতে পারে। 'কর্ণ-কুন্তি সংবাদ' নামক কবিতা/নাট্যাংশ/পাঠ-এর সময় মহাভারত-এর পরিপ্রেক্ষিতটি জানা থাকলে টেক্সট্-এর ভেতরকার শব্দগত, বিন্যাস এবং আচার সম্বন্ধীয় যে সব বিচ্ছুরণ, সেসব স্পষ্ট স্পষ্ট বোঝা যেত। আবার কর্ণ-কে কোনো এক

অনার্য পুত্রের বর্ণে, আভরণে এবং দ্রৌপদীকে ভারতবর্ষের প্রতিভূ হিসাবে কেউ যদি উপস্থিত করান তাহলে এই দেশের প্রাচীন ইতিহাস জানা থাকলে, উপস্থাপকের সেই সংকেত ধরে ফেলা সহজ। 'ওথেলো' প্রযোজনায় সেই একই শেক্সপিয়ারের টেক্সট কিন্তু ওথেলো-রূপী অভিনেতা যখন নিজের গায়ের ওই কালো চামড়ার দিকে তাকিয়ে 'ইট ইজ দ্য কজ্' 'ইট ইজ দ্য কজ্' উচ্চারণ করেন তখন গোটা আফ্রিকার ইতিহাসের বিচ্ছুরণ এর মাঝখানে দিয়ে ছুটে চলে যায় আর যে সেই মর্মান্তিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত —। অর্থাৎ কোনো একটি প্রযোজনা কেবল সেই প্রযোজনাটিই নয়, তার মধ্য দিয়ে আরও বহু কিছুর প্রকাশ।

নাট্যে আবার দুটি টেক্সট্—ওই ড্রামাটিক এবং থিয়েট্রিক্যাল টেক্সট-এর একটা আত্মীয় সূত্র সুস্পষ্ট। নাট্য যতক্ষণ না প্রযোজিত হচ্ছে ততক্ষণ সে অর্ধস্ফুট, অর্ধনির্মিতও বলা হয়। তার সম্পূর্ণতা প্রকাশ ওই মঞ্চায়নে। এখন একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে আব্রাহাম মোলস্ (Abraham Moles) যখন বলেন যে, আমরা যদি এরমধ্যেই কোনো একটি নাটক সম্পর্কে জেনে ফেলি, তাহলে কেনই বা আবার ওই 'হ্যামলেট দেখতে যাওয়া'—তখন এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে হ্যামলেট-কে নতুন ভাবে উপস্থাপিত করার একটা পরোক্ষ প্রস্তাবও থাকে। অর্থাৎ একজন পরিচালক একটি পুরাতন ভাবকে, একটি অর্ধস্ফুট স্বরকে নব আবিষ্কারে সোচ্চার প্রকাশে নতুন করে তুলবেন আকাঙ্ক্ষা এমনটাই। দর্শকেরা জানা বিষয়কে নতুন করে দেখতে পারবেন, লিখিত পাঠ বা ড্রামাটিক টেক্সট্টি থিয়েট্রিক্যাল টেক্সট্-এ উন্নীত হয়ে সম্পূর্ণতা পাবে। অর্থাৎ একজন পরিচালক কীভাবে তাঁর কোনো নব-চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে এই টেক্সটটিকে বাছলেন, দর্শকেরা প্রযোজনাটি দেখতে দেখতে সেই চিন্তার, সেই অন্য (other) টেক্সটগুলির কাছে পৌঁছে যাবেন। সমৃদ্ধতর হবেন।

এখন এইখানে একটি সখ্যের অথবা একটি দ্বন্দ্বের সূচনাও হতে পারে। মূলত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিচালক এবং দর্শক। পরিচালক-এর কাছে রয়েছে ওই মাল্টিপল্ মেসেজ পাঠানোর সরঞ্জাম এবং দর্শকের ভাণ্ডারে আছে এতদিন পর্যন্ত সঞ্চিত হওয়া তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর সংকেত-মোচনের পুঁজি। মাঝখানে একটি প্রযোজনার অবস্থান। সখ্য হয় তখন যখন ওই প্রযোজনা দেখার ভেতর দিয়ে অনেক দর্শক যার মধ্যে অনেকে নাটকটি পড়ার সুযোগ পাননি বা দুর্বোধ্য বলে সরিয়ে রেখেছেন—তাঁরা এইবার ওই প্রযোজনার আলোয় নাটকটিকে স্পষ্ট দেখতে পান। এমন ঘটনা তো আমাদের বাংলা নাট্যমঞ্চেও ঘটেছে। 'রক্তকরবী' নাটকটি দশবার পড়ার চাইতে একবার বহুরূপী-র প্রযোজনাটি দেখে নিলে নাট্যবিষয়কে অনেক সহজ বলে বুঝে নেওয়া যায়—এমন কথাই তো বলেছিলেন আমাদের নাট্যশিক্ষক। অর্থাৎ প্রযোজনায় এমন সব সংকেত ব্যবহৃত হলো যার ভেতর দিয়ে 'সাধারণ দর্শক' নাট্যের/নাটকের গহনে প্রবেশ করার দরজাটি অবারিত দেখতে পেল। এমনকী, কিছুদিন আগে কাঁচরাপাড়া 'পথসেনা'-র 'রক্তকরবী'প্রযোজনা অঙ্গন মঞ্চের বহু মানুষ—বহু মানুষ দেখেছেন। ব্যক্তিগতভাবে কোনো নাট্যকর্মীর ভাল লাগা মন্দ লাগা স্বতন্ত্র কিন্তু বহু মানুষের দর্শক হিসাবে ওই নাট্যকর্মটির সঙ্গে সংযুক্তি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর রচনাবলী থেকে বাইরে নিয়ে আসার স্পর্ধা জুগিয়েছে।

পথসেনা-র প্রযোজনায় ব্যবহৃত সব সংকেতই যে সবাই বুঝে ফেলেছেন, এমনটা নয়, কিন্তু দর্শক-কে একটা ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর-এর পথে সংকেত-সঞ্চয় বাড়ানোর খেলায় পথসেনা তাঁদের ঘরের বাইরে টেনে আনতে পেরেছেন এটাই ওই দলের কৃতিত্ব।

আবার অন্যদিকে, পরিচালক তাঁর নিজস্ব কোনো চাওয়া কোনো দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রযোজনাকে একেবারে তাঁর মতো করে সাজাবেন—এটাই স্বাভাবিক। নাটকটিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে গিয়ে অথবা নাটকের ভেতরে আপাত লুকিয়ে থাকা কোনো গভীরতর অর্থকে বাইরে নিয়ে আসার যে পরিকল্পনা সেটা অবশ্যই তাঁর নিজস্ব। অর্থাৎ প্রযোজনার ছবিটা তো তাঁর কাছে এরকমভাবে স্পষ্ট তিনি তাকে সবচেয়ে সঠিক মনে হওয়া একটা ফ্রেমে বেঁধে পরিবেশন করবেন। শিল্পের প্রকাশে স্রষ্টাকে যে কোনোরকম নির্দেশই অ-সভ্যতার পরিচয়। তবে সবিনয়ে একটি সংযোজন থাকতে পারে। নিজস্ব জন-আবেষ্টনী (milieu)-তে বড় হয়ে ওঠা শিক্ষিত স্বচ্ছন্দ একজন মানুষ/একজন স্রষ্টা যখন তাঁর ওই আবেষ্টনীর বাইরে থাকা আরও অনেক মানুষের কাছে তাঁর সৃষ্টিকে পৌঁছে দিতে চান—যদি চান—তাহলে নিশ্চই ওইসব মানুষের সাংস্কৃতিক অবস্থানের কথা তাঁকে জানতে হবে। আর যদি সেই প্রচেষ্টা থাকে তাহলে তিনি হয়ত তাঁর সৃষ্টিকে খণ্ড খর্ব না করেও তাঁর নির্মাণে ওই আরও মানুষের প্রবেশের জন্য কিছু প্রবেশপথ রাখবেন। কিন্তু এটা হয়ত খুব সহজ নয়—বারবার ওই ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে যাবার কাজটা, সেখানে প্রবেশ করার মনন-অর্জনটা। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও যেন শিল্পের দোহাই দিয়ে বাতিল না হয়ে যায়। অবশ্যই—অবশ্যই পরিচালক/স্রষ্টা যদি চান। আসলে এমন তো প্রায়শই শোনা যায়, একেবারে নাট্য-প্রযোজনার কথায় ফিরি, সেখানে দর্শক সংখ্যা ক্রমাগত কমে গেছে। তার অনেকগুলো কারণ হতে পারে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কিন্তু প্রযোজনায় নিজেদের ব্রাত্য হিসাবে দেখার অভিজ্ঞতা। ব্রাত্য শুধু নাট্যে চরিত্রগতভাবে অনুপস্থিত থাকা নয়, দর্শকের সেই মনন-এর মর্যাদাহীনতাও বটে।

আরও একটি কারণ—কোনো প্রযোজনাকে যখনই তার আনুষঙ্গিক-এর সংযুক্তিতে যথেষ্ট ওজনদার (বিভিন্ন অর্থেই) করে তোলা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে স্থবির হতে বাধ্য। মঞ্চ আলো আবহ-এর অসামান্য সংযোজন কাঙ্ক্ষিত কিন্তু কখনও কোনো এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতার কল্পনায় অথবা সহজ অনুসন্ধানের পথ বাতিল করে দিয়ে অর্থের বিনিময়ে মহার্ঘ বস্তুর সংযোজন চিন্তা গোড়ায় ওই 'ওজনদার' পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এবং, ওইরকম পথ চলাই স্বাভাবিক—ক্রমশ এই চিন্তাতেই অভ্যস্ত করে তোলে। এখন মঞ্চোপরি ব্যবহৃত বস্তু এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক তো তাদের মত করেই সংকেত পাঠায়। সেখানে বহু মানুষ নিজেদের স্বচ্ছন্দ করে তুলবেন কীভাবে! অথচ বহু দর্শকের আকাঙ্ক্ষা তো প্রায় সবারই—নাটকে লোক হচ্ছে না, এই ক্ষোভ বা বেদনা প্রকাশ তো সেই বহুর সম্মেলনের প্রতিই দীর্ঘশ্বাস।

অন্যভাবেও বিষয়টি দেখা যাক এবং সেইজন্য অতি সাধারণ আপতত স্বল্প ব্যাখ্যাত একটি চিত্ররূপ এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে :
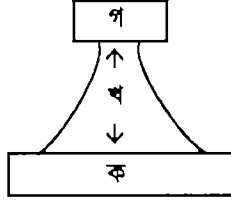
'ক' একেবারে নিচের তলার হ্যান্ড নটস্-দের অবস্থান। দেশীয় ও বিদেশী পুঁজির চাপে, সাম্প্রতিকতম বিশ্বায়নপ্রসূত মুক্ত অনীতির দাপটে—এঁদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং এঁদের অবস্থা প্রকৃত সর্ব-হারাদের দলে। বিশ্বায়নের স্বপক্ষে সওয়ালকারিদের এবং বিশ্বায়নের বিরোধিতা করেও মুক্ত অর্থনীতির সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সব ব্যবস্থাপকদের শত যুক্তি এবং তাগিদেও সমাজের এই দারিদ্রলাঞ্ছিত চেহারাটা লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়ন—যাকে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদও বলা হচ্ছে সঙ্গত কারণেই—তার একটি প্রধান কাজ মানুষকে তার শেকড় থেকে উপড়ে ফেলা, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া অতীত বলতে তোমার কিছুই নেই, কেবল শূণ্যতা। অপ্রত্যক্ষ অথচ সবচেয়ে নৃশংস সেই থাবার লক্ষ্য প্রাথমিকভাবে ওই 'ক' দলের কমন ম্যানদের উপর।

'গ' হচ্ছে সেই সংখ্যালঘুদের বিভাগ যারা পুঁজির তাঁবেদারি এবং তদারকি করে নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে নিচ্ছে কল্পনাতীতভাবে। এরাই উচ্চকিত বিজ্ঞাপিত এবং এদের সম্পদের পরিমাণের গড় দিয়েই বলে ফেলা হয়, এই দেশ কত সমৃদ্ধ। এরা প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাছাকাছি এবং ক্ষমতার যে ক্ষমতা সেই উপভোগেও এরা অভ্যস্ত।

আর ওই একই অর্থনীতির খেলায় মধ্যবর্তী 'খ' বিভাগের মানুষদের অবস্থা উভয়দিকে গতিশীল, তুলনায় উপর দিকে উঠে যাবার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কম। এই অংশের পরিধি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে এবং বিশ্বায়ন/মুক্ত অর্থনীতি সমস্ত সমাজকে একেবারে সরাসরি হ্যান্ডস্ এবং হ্যান্ড নটস্দের দলে ভাগ করে ফেলবে। কোন মধ্যবর্তী বাফার স্টেট-এর তার প্রয়োজন নেই। অর্থব্যয় করে 'জ্ঞানের ক্ষমতা' অর্জনে সুবিধা করতে পেরে এই বিভাগের মুষ্টিমেয়রা উপরে উঠে যাচ্ছে, হেরে গিয়ে নেমে আসছেন বহু বহু।

এখনও যে কোনো বিভাগই যে একটা হোমোজেনিয়াস ম্যাস্—বিষয়টা এমন নয়—তার মধ্যেও স্তরবিভাগ আছে। যে অর্থনীতির সাহায্যে মধ্যবিত্তরা উঠে গেল উপরে বা নিচে নেমে এলো তারা প্রবেশমাত্র ওই 'গ' বা 'ক' বিভাগের সব রীতি নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে না। নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত একদা সম্পন্ন কৃষক আর, বন্ধ কারখানার শ্রমিক 'ক' বিভাগের ৬৯-এর 'ঙ' বা ৭৫-এর 'ফ' এখন অর্থনৈতিকভাবে এক হলেও মানসিকতায় তাদের তফাৎ অনেকটাই—এসব অতি পুরোনো বহু কথিত কথা। আর বিশ্বায়ন চায় 'খ' ও 'গ' দলের স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলে একটা হোমোজেনিটি-তে নিয়ে আসতে—তার রুচিবোধকে

এক করতে যাতে বিশ্বের কারবারিদের খাতক হিসাবে এরা দ্রুত নাম লেখাতে পারে— 'ক' দল এদের শুধু শ্রম যোগান দিয়ে যাবে। (আমরা কি আবার সেই রোম বা আফ্রিকার শোষণের ইতিহাসের কাছে পৌঁছতে চলেছি।)

'গ' বিভাগের সদস্যরা কিংবা 'খ' বিভাগের ঐদিকে ধাবিত মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যজনেরা (!!) সমগ্র বিশ্বের উচ্চবিত্তদের একটিমাত্র সমাজের ধারণায় রোমাঞ্চিত, উদ্বেলিত। একটি নির্দিষ্ট যাপনকে লক্ষ্য করে আহার পোশাক চালচলন ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট সংকেত-এর ব্যবহার তাদের জীবনে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসছে। নানা উপায়ে জানা যাচ্ছে কী চলছে 'আউটার স্পেশ'-এ এবং ক্রমশ সেটা আর 'আউটার স্পেশ' থাকছে না, তার টেন্টাকল্‌-এর ভেতর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের সানন্দ আত্মনিবেদন চলছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মিলনের দোহাই পাড়া হয় ঠিকই কিন্তু এখন সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েই তো ঐ বন্ধুত্ব অর্জন সম্ভব। কিছুই দেবার নেই, শুধুই নেবার, ওরা মিলবে না, মিলনের জন্য আমাদের ভেতরে একটা উদগ্র বাসনা তৈরি করে দিয়ে তারা কাজ সারতে চায় আর সেইজন্যই একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক কালো ছায়ায় ক্রমশ সমগ্র ভূমণ্ডলকে ঢেকে ফেলছে। ফলে সেই 'উন্নত মানবদের' ব্যবহৃত কোড-এ অভ্যস্ত হয়ে আমরা ডিকোডিফিকেশন-এর আনন্দে নেচে উঠি, আমরা প্রায় সেইসব কোড-ই সামান্য পরিবর্তন করে নিজেরা জীবনে নাট্যে ব্যবহার করি এবং দেশির অগুণতি অশিক্ষিত সেই কোড-কে ডি-কোড করতে না পেরে দূরে রয়ে গেল বলে হতাশায় ক্ষোভে ফেটে পড়ি এবং আমাদের কোড সাপ্লায়ারদের আরো নিকটবর্তী হই।

অথচ আমাদের নিজস্ব মাটির যে সংকেত অসংখ্য ভূমিস্পর্শী মানুষের যাপনের যে উৎসারণ, তার প্রতি আমাদের কোনো লক্ষ্যই থাকে না। সেখানে যেতে গেলেই তো 'ডি ক্লাসড্' হতে হয়। অতি আকাঙ্ক্ষায় আমার ওই উচ্চতর দলভুক্তি ঘটেছে, এত সহজে তার থেকে দূরবর্তী হওয়া সম্ভব। ওই 'গ' বিভাগের অনেক সুবিধাও তো আছে। প্রচার, যশ, 'সর্বত্র' স্বীকৃতির আহ্বান এবং আরও আরও যেটা ভাবাতে থাকে, প্রশাসনের সন্নিকটবর্তী যারা কিংবা স্বয়ং প্রশাসকেরা সবাই তো এত নষ্ট নয়! এই তো আমার প্রয়োজনা দেখে— অথবা, গতপর্শুর একটি মহতী সভায়—। এইরকম। আর এর বাইরের যে আশঙ্কা সেটি আরও ভয়াবহ। একেবারে পরিচয়হীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা। 'গ' বা 'উন্নয়নশীল 'খ' বিভাগ থেকে কোথায় কাদের কাছে কেন-ই বা এই হারিয়ে যাওয়া, যেতে হয়—আমারই প্রথম উচ্চারণের সেইসব শব্দ এখন ক্রমশ আমার কাছেই অশ্রুত মনে হয়। অন্য একটি সমস্যাও আছে। যদিও প্রচেষ্টা চলছে তবু এখনও ওই 'গ' দলের সবাই একই সংস্কৃতির উপাসনায় পদ্মাসনে বসে পড়েনি ফলে ওই দলের হয়েও এখনও মধ্যবিত্ত মানসিকতা পুরো বিস্মৃত না হয়ে যারা নাট্যচর্চায় রত, তাদের দর্শক নেই। কারণ ওই 'সমৃদ্ধ গ' দলেরই বহু-র কাছে এই নাট্য মাধ্যমটি তো মড়া ব্যাঙের মত। আরও অনেক 'বিনোদনে' তারা সম্পৃক্ত। ফলে তাদের—ওই উচ্চবিত্তদের প্রেক্ষাগৃহে টানতে হলে নাট্যকে ঢেলে সাজাতে হবে, তার প্রচেষ্টাও বিভিন্ন প্রযোজনায় দেখা যাচ্ছে।

অথচ নাট্যশিল্পের 'অকালমৃত্যু' ঠেকাতে যে পরিমাণ দর্শকের আকাঙ্ক্ষা, তার জোগান কিন্তু আসবে/আসে ওই 'কমনম্যান'-দের থেকেই। নাট্যকে কীভাবে সাজালে ওরা আসবে, ওদের সংকেত ভাণ্ডারই বা কতটুকু, তার উপর দাঁড়িয়ে নতুন প্রয়োজনার সংকেত মিশ্রণই বা কীভাবে ঘটবে সে চর্চা তো বিস্মৃত। এক সময় প্রযোজক নিজে 'ক' দলের অথবা ওই 'কমন ম্যান'দের নিকটবর্তী ছিলেন, আজ উচ্চাশায় কিংবা ভয়ে বা বিস্ময়ে তিনিও এখন অনেক দূরবর্তী। দূরের ব্যবহৃত সব সংকেত-কে নিজের জ্ঞান-ক্ষমতায় বিমুক্ত করার আনন্দে সেই স্রষ্টার এখন উদ্বেল হওয়ার কাল। নিজস্ব স্থানীয় চর্চাতে সেইসব সংকেত-যুক্ত করার কোনো চেষ্টাই চলে না। এবং তখন, হয়ত বেদনারই হয়ে ওঠে বিষয়টি, যখন মউনিন-এর কথামত নাট্য শিল্পের প্রবাহ হয়ে ওঠে একমুখী—দর্শক হয়ে ওঠেন বিস্ময়াবিষ্ট, হতবাক। অন্যদিকে না থাকে স্রষ্টা হিসাবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা, না থাকে মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের মত দর্শকের সংকেত-ভাঁড়ার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ কিছু মানুষ। ফলে সৃষ্টি ক্রমশ গণ্ডীবদ্ধ হতে বাধ্য।—আবার এমনও হতে পারে, বারবার দর্শনে সেই নতুন সংকেত-বারতা এক সময় বহুর পরিচিত হয়ে যাবে, লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হওয়া গেল। কিন্তু সেই অবকাশও তো নির্মাণ প্রক্রিয়াতেই অবরুদ্ধ ইতিহাস হয়ে গেছে। নাট্য নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাবার কোনো উপায়ই তো রাখা হয়নি। আমরা সম্ভবত এখন এই মূক হয়ে যাবার মত আদিগন্ত বিস্তৃত কোনো প্রশ্নচিহ্নের সামনে অপেক্ষারত। অথচ, শিল্পের ইতিহাসে, আমরা জানি, নাট্যের ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি। সেই সক্ষমতার চর্চাতে কারও নৈঃশব্দের উৎসে সম্পর্কে যদি এখনও অজ্ঞাত থাকি, তাহলে দেখা যাবে, হয়ত আমরা আবার সেইখানে পৌঁছে যাবো, যেখানে জর্জর দৃশ্যমান রেখে মুষ্টিমেয়র দল তাদের উন্নততম শিল্পের চর্চা করবে আর বাইরে থাকবে অগণিত মানুষ। তাদের পা দিয়ে যে পিলসুজের তেল গাড়িয়ে পড়ে সেই পিলসুজের আলোয় উদ্ভাসিত হয় ওই মুষ্টিমেয়র 'বিনোদন চর্চা'। সভ্যতার এত অগ্রগমনের পর এতখানি বিকাশের পর আবার ওই বিন্দুতে গিয়ে থামা, স্রষ্টা এবং উপভোক্তা উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট ক্ষতিকর —এ বিষয়ে সম্ভবত কোনো সন্দেহ নেই।

কৃতজ্ঞতা : কেইর এলাম (Keir Elam)-এর দ্য সেমিয়টিক্স অব থিয়েটার অ্যান্ড ড্রামা (The Semiotics of Theatre and Drama; Routledge. 2nd Edition, 2002)-বইটির কাছে অশেষ ঋণ স্বীকার করছি। কিছু কিছু জায়গায় বইটির থিয়েট্রিক্যাল কমিউনিকেশন (Theatrical communicattion)-অংশের প্রায় হুবহু অনুবাদও আছে, অনুসন্ধানী পাঠক অবশ্যই সেটা বুঝতে পারবেন।

আগেও বহু জায়গায় বলা হয়েছে, আইজাজ আহমেদ (Aijaz Ahmed)-এর 'অন কম্যুনেলাইজেশন্ অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন' (On Communalisation and Globalisation. Three Essays) বইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য পাঠ্য বলে মনে হয়। এখানেও তার দু-একটি ভাব উদ্ধৃতি আছে।

উত্তর ও উত্তরহীনতা

রাম বসু

উত্তর মেলেনি, তাই উত্তর পাওনি
জেগে থাকে অবিরাম উত্তরের জন্য মাথা কোটা
জিজ্ঞাসার বর্শা বুকে চিরে আকাশে তাকানো
যদিও আকাশ অনাদি কালের উত্তরহীনতা।

স্তব্ধতায় মাটি ভিজে গেলে
সুরভিত অন্ধকার উপচে ওঠে কোরকে কোরকে
লম্বা লম্বা পা ফেলে অভীপ্সার মতো
না বলে সে হাঁটু গেড়ে প্রণাম জানায়।

যে শুনতে পায়, সে-ই ধন্য হয়
অথচ অবাক, আমরা শুনতেও পারি না
কারণ আমরাই তখন নিদ্রামগ্ন নীরবতা
তামসের বাতিঘর।

সুচারু কোমল এই নিষ্ঠুরতা আবহমানের
এই আবহমানের বাঁচবারও সার্থকতা
বাতাস বিস্তার
তামস হনন বাঁচবার স্তব।

মানুষ যে আগাগোড়া প্রশ্ন ও সংশয়
তাই সে মানুষ
মানুষ যে অনির্বাণ অপূর্ণতা
তাই সে দিব্য হোমকুণ্ড
স্পর্ধার প্রতিরূপ
তাই সে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে যায় দিগন্তের দিকে
সে তখন বিশ্বাস করে নক্ষত্ররা ঢেকে আছে মুখ।

বিশ্বাস ও অবিশ্বাস হাত ধরাধরি করে থাকে চিরকাল।

এসো বহমান বঙ্গ-ইতিহাসে

সিদ্ধেশ্বর সেন

(ইতিহাসবোধের শিকড় থেকে—)

আমার চলৎকালে চেয়েছে মান্যতা
মায়ের মুখের পুণ্য—ভাষা

যেন ইতিহাস কেউ না হানে কলুষ
মনগড়া-অসত্যের—যেমন হয়েছে—
—অনৈতিক, অনৈতিহাসিক

কবিগুরুর জন্মনগরী, বিবেকানন্দের,
কেন হারালোও তার ইতিহাস-নাম শিকড়ের—
মঙ্গলকাব্যের পাঁচ-শতাব্দীর স্থান-নাম 'কলিকাতা'

ভাগীরথী-গঙ্গা কূলে
সেই আদিকল্প ত্রয়ী গ্রাম
: 'সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলিকাতা'—বালকেরও জানা নাম

তাই, আমি বলি,
জাতিরই স্ব-ভাবের মান আর হুঁশ—
কারও আত্মপ্রসাদে অপভ্রংশের
'Kolkata-কোলকাতা-কলকাতা' তোকে নয়,
মূল স্থান-নামের ভৌগোলিক—সত্যে
মহাকবির 'চলন্ত' কলিকাতা—ফেরাবে তোমাকে
এ-যে উত্তরাধিকার বেয়ে আসা
মরু-বিজয়ের আগে ভাষা
—(জোড়াসাঁকো, পিতৃগৃহ আমারও)
'আমরা করব জয়'—বীজগর্ভ মাটিতে-জলে-বাতাসে

রবীন্দ্রনাথের গানে-প্রাণে
'সভ্যতার সংকট'-এর ঘ্রাণে

'কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই'—
এসো বহমান বঙ্গ-ইতিহাসে।

তথ্য-সূত্র : কলিকাতা : ১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'চলন্ত কলিকাতা' কবিতা (রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

২) 'দেখি কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই' ('একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু'—কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('সঞ্চয়িতা', 'সহজপাঠ')।

৩) কলিকাতা : বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' (১৫ শতাব্দী) ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' (১৬ শতাব্দী)।

৪) ভৌগোলিক মূল স্থান-নাম কলিকাতা থেকেই > কলকাত্তা (আইন-ই-আকবরি—১৬ শতক) > ও ক্রমে Calcutta (য়ুরোপীয় রোমান লিপিতে—১৭ শতক) নিষ্পন্ন; বাকি Kolkata-কোলকাতা-কলকাতা-কইলকাত্তা কথ্য অপভ্রংশ।

৫) "...আমাদের উত্তরপুরুষরা বলতে পারে "দাও ফিরে সেই Calcutta ফিরে লহ এই Kolkata"—অন্নদাশঙ্কর রায় (প্রয়াত)।

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ('ভ্রান্তিবিলাস' প্রবন্ধ, 'কালান্তর'-শারদীয় ১৪০৬ বঙ্গাব্দ)। কসমোপলিটান শহর সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী, মৃণাল সেনও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

হয়ত বলবে

মৃগাঙ্ক রায়

সে এখন তীব্র ইচ্ছার মতো একা
পশ্চিম আকাশের লাল নদী পার হয়ে
বয়ে যাচ্ছে তার ছায়াপথ,
তার বাস্তুর অন্ধকার।
সে একা, হাতে তার কে দিয়ে গেছে
পাথরের ভাঙা মুখ কার। দুই চোখ মেলে সে
তাকিয়ে আছে তার দিকে। কী দেখে
ওই ফাটা দুই চোখে, কী দেখে
এমন করে। কথা কিছু বলে না কখনো,
হয়ত বলবে কোনোদিন। হয়ত বলবে
তার পৃথিবীর জ্যোৎস্নার কথা,
বন্ধনের ঢেউয়ের কথা, মেঘের মতো

নারীর মদিরতার কথা, ভালোবাসার কথা,
শরীরের কোলাহলের কথা।
হয়ত বলবে কোনোদিন।

তিনি বলেন

যুগান্তর চক্রবর্তী

এত মানুষ—দেখেও ভালো লাগে
শরীরও যেন সুস্থ মনে হয়!
বলেন যিনি প্রবীণ জননেতা
শতাব্দী তাঁর দুয়ারে কড়া নাড়ে

সময় তাঁর গলার কথা বলে
দৃষ্টি আজও কয়েক দশক দূর
দু-কাঁধে যেন ইতিহাসের ভার
ধারণ করে শতাব্দী তাঁর জরা

ইতিহাসের সংকটে-সংঘাতে
ঘটেছে বহু ঐতিহাসিক ভুল
সেসব আজ ইতিহাসের পাতা
সাক্ষী থাকে দ্রষ্টা ইতিহাস

মানুষ, শুধু মানুষই শেষ কথা
রক্ত স্বেদ শ্রমের বীর মানুষ
মানুষ বড় প্রাণের কাছাকাছি
নিশ্বাসের স্পর্শ গায়ে লাগে

শস্যে আর শিল্পে আজ মানুষ
লিখুক নিজে বাঁচার ইতিকথা
কর্মে গানে ধ্বনিত হোক জীবন
আজও আমার আশায় বেঁচে থাকা—

তিনি বলেন—সময় তাঁর গলায়
তিনি এখন ইতিহাসের মানুষ।

৮ জুলাই, ২০০৬

পার্বতী

তরুণ সান্যাল

বালকবেলায় কবে যাকে দেখেছি
নিভৃতে তাকেই নিয়ে খেলছি বুড়ো বয়সে আজকেও

তুই কি পার্বতী হবি, পর্বতবাসিনী গৌরী, পাশে সিংহ
বাঁধা সিপ ডগ আলসেসিয়ান

রাজহংসী গলা স্বর্ণকেশী ক্ষীণকটি স্ফিতস্তনী দিঘল নীল চোখ
এই বাঁকা দাঁড়াবি দশভুজা, হাতে ত্রিশূল
একচল্লিশের ক্লান্ত কিশোরী মেয়ে,
সে দিনও সঙ্গে কেউ ছিল না, ছিল কপালে চুলের ভাঁজে বাঁকা চাঁদ,
সমুদ্র গড়ান

হাতের মাটিতে আমি জল মেশাই, কাদা ছানি, একটু একটু তোকেই গড়ি দেবী,
তুই নাকি পড়শির মেয়ে, কি করে যে তোরই মুখ ভেসে উঠেছে ছাঁদে,
সমস্ত অঙ্গনময় জ্যোৎস্না খেলতে থাকে
পাতলা মেঘ ছিঁড়ে নামে চাঁদের বাড়ির সঙ্গিনীরা
আমি দেখতে থাকি ঘোর অরণ্যেও হাসছে-খেলছে মুন-লিট সোনাটা
পিয়ানোয় ঝরে পড়ছে চোখের ঘুমের সঙ্গে ভেজা দৃষ্টি দলবৃত্তে সুর
দেবী করেই তো গড়েছিলাম তাকেই পার্বতী

যা আমার স্মৃতি ছেড়ে
যা যা আমায় ছেড়ে

আমি নদীসমুদ্রের মধ্যে আজ বিয়ে দিচ্ছি

নদীকেই দানে বসাই চিত্তির পিঁড়িতে
সমুদ্র তো বদলালো না সেই একই তম্বুরায় বাজতে থাকে
বাজতে থাকি আমি
আমি একাই নদীকে সাজাই, চেলি পরাই, পানপাতায় মুখ ঢেকে দিই,
হাতে দিই ঢেউ জাগর বকুলের ঝরা দুঃখগুলি
পরিয়ে দিস তারই গলায়, মেয়ে,
যে গোপনে বসে আছে শিয়রে

বালকবেলার সব সাধ ইচ্ছা নদী কেড়েছে
ভিন গাঁয় মাঝরাতে শুনি পরিযায়ী উড়ান।
না আমার হাতে সেই ভেজা কাদামাটি নেই
কি করে-যে বানাই পার্বতী।

তেমন একটি কবিতা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

একটি কবিতা, তেমন একটি কবিতা
যার জন্য
সারাটা জীবন হতুশে হয়ে কেটে যাচ্ছে আমার
করতল পেতে বসে আছি
কখন খরায় জর্জর মাটিতে বৃষ্টির ফোঁটার মতো
আসবে সেই প্রার্থিত পংক্তিগুলি
যার জন্য আমার অবিরাম নিশিপালন
আর গাঢ়তম অন্ধকারে
সূর্য-উপাসকের প্রথায় বসে থাকা
এক বালক রক্ত হয়ে
কখন শাদা পাতার ওপর ঝলসে উঠবে
মেঘছেঁড়া নবজাতক ভোরের প্রথম লাল
তেমন কবিতা তেমন একটি কবিতার জন্য—
যে বারবার 'আসছি' বলেও ঝুপি দিয়ে
কাছে থেকে দূরে
দূর থেকে দিগন্তরেখায় মিলিয়ে যায়।

বিচ্ছিন্নতা

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

আগুন উন্মাদ হোলো, তাকে ছেড়ে চলে গেছে স্বাহা।
পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছেদের লিপি জ্বলে, ভূগর্ভেও জ্বলে;
পড়শির মৃত্যু খেয়ে এলাচনগরে ঢুকে মাঝখানে বসে
তপ্ত ঘ্রাণ গ্রাস করে কুশলকাহিনী আর কাঁচা শালিধান...

আকাশে অনন্ত ডাক ছিঁড়ে যায়—স্বাহা, স্বাহা, স্বাহা,—
ক্ষুধাভাণ্ড ফেটে গিয়ে শস্যরস শুষে নেয় আঁচ,
কান্তার উজাড় করে দহনের বাণী বেজে ওঠে
প্রাণীরা প্রণত হয়—দয়া কর, অগ্নিযুগ শেষ করে দাও...

সমুদ্র দুভাগ করে ঢেউ খুঁড়ে ঝাঁপ দিলো স্বাহা,
অগ্নিদেব জোড়হাতে বলে ওঠে, আমি ক্লান্ত শেষ পর্যটক,
জ্বলে যাচ্ছি আত্মভুক—আমার ঘরের চালা শুধু বাকি আছে
স্বাহার রহস্যহাসি উল্লাসী ফেনার স্তূপে রাত্রির বিদ্যুৎ,
স্বাহাহীন ভুবনের দ্বারে দ্বারে অগ্নি ভিক্ষা করে,
পোড়ায় কার্পণ্যমেধা, পুড়ে যায় আমাদের রক্ষিত বাগিচা...
১১.৮.২০০৬

আপন ছায়া

শ্যামসুন্দর দে

দিনের অন্তিম আলো সন্ধের আড়ালে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
আকাশ ছোঁওয়া নারকেল আর তালের পাতায়
আর কিছুক্ষণ পরে
সবকিছু ঢেকে দেবে
রাতের আঁধার
ঘুচে যাবে মাটি আর আকাশের ব্যবধান!
ল্যাজের গরব তুলে লিচু গাছটার ডালে ডালে

যে কাঠবিড়াল ব্যস্ত হয়ে ঘুরছিল
ডাল বেয়ে ছাতের কার্নিশে ওঠে
চলে যায় চোখের আড়ালে
সে এখন কোথায় ঘুমিয়ে
গাছের কোটরে
সকালে পুকুর জলে যে মেছো বক
সাঁতরে সাঁতরে চুনো মাছ ধরছিল
সেও এখন চলে গিয়েছে
তার ঠিকানাতে।
রাত পার হলে আবার সকাল
আবার জীবন।
আমি শুধু খুঁজি সেই তারা
নিঃসঙ্গ থেকে জ্বলে আকাশের অঙ্গনে
কখন ফুটবে অগণন তারা
চাঁদের উদয় শেষে
সব তারা ঢেকে যায়
সূর্যের আভায়
শুধু আরো কিছুক্ষণ থাকে
সে তারাটি।
পৃথিবীতে ছায়া পড়ে
মেঘ আর চাঁদের লুকোচুরি খেলায়
কখনো আলো, কখনো অন্ধকার
আমি সেই ঘুম ভাঙা কাল থেকে জেগে আছি
পাতার বিবর থেকে কোকিলের ডাকে
কখন নেমে আসবে শান্তির প্রহর।

উড়ে যায় নীড়হারা পাখি
ডানার শব্দ তুলে আঁধারে
খুঁজে পেতে নীড়।
কোথায় সেই বাউল
গান গায় একতারাটা বাজিয়ে
সেও বুঝি নীড়হারা।
তারায় তারায় প্রশ্ন জাগে
কতটুকু দাম পেয়েছে পৃথিবী

কতটুকু বা আমি দিয়েছি
পেরেছি কি মাটিকে ভালোবাসতে
পেরেছি কি অধিকার ছিনে নিতে
দুর্মর গর্জন তুলে
জঞ্জাল ভাসিয়ে দিতে
জলপ্রপাতের স্রোতে।
জোনাকির আলোর মতন
মনের বিলাস।
অথচ চাঁদের আলোয় আমার ছায়া
পড়েছে পৃথিবীর প্রাঙ্গণে।

আমার পাশে বিশ্বলোক

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

মনের ভুলে অজানা অচেনা স্টেশনে
নেমে চারদিকে তাকাই...
আগের চেনা লোকদের নাম ধরে ডাকি
অচেনা লোকেরা সামনে এসেই হারিয়ে যায়...।
আসলে আমার সাথে ভুল করে
আর কেউই নামেনি বুঝলাম।

সেই অজানা অচেনা স্টেশনে নেমে
ও আমার সুখ-শান্তি। ও আমার
আলো-আঁধার। ও আমার চাওয়া-পাওয়া।
ও আমার বালক বয়েস,। আমার
জন্মদিনের মোমবাতি,। নতুন চালের পায়েস
জলপাই রঙের সকাল...
সবার সবার নাম ধরে ডাকি খুব
খুব ডাকি; তখন আমার চারপাশে
আমাকে ছুঁয়ে জাগ্রত বিশ্বলোক।

দাবাগ্নির পক্ষপাতী না

সত্য গুহ

তোমাকে তড়জ করে ধূলিস্বর্গে অর্ধনারীশ্বর
অলৌকিক কিছু নয়
এভাবেই, প্রকৃত প্রস্তাবে,
নিজেকে জেনেছি বলে উৎপন্ন শ্মশান-মধ্যে প্রেতাদির ভীড়ে
সুখে আছি—বেশ সুখেই আপন মনে আছি

দেখেশুনে
আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে সব মান্য করে আছি
মৃত সুস্থতাকে আসন করে স্থাণু

যে যা জানে জানুক, আমি তো
তোমার প্রেমে, উত্তাপে নিষ্পন্ন পরিপূর্ণতা
নিজের সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল, আমি, অন্যে যা পারে,
অর্থ-যৌন-রিরংসা-হিংসা-স্বার্থপরতাকে ভেবে জীবন,
অন্যের উঠোন চষে দিতে পারি না—পারি না ঘুঘু চরাতে গেরস্তের ধানে

আমি শুকনো বীজ বুনে অহল্যাকে করতে পারি গণেশ-জননী-স্পর্ধী
শোককে করতে পারি শ্লোক—মাটিকে প্রতিমা
এবং বাঁশ নিঙড়ে নিঙড়ে বার করতে পারি সঙ্গীত

আর যদি দরকার পড়ে—যদি দুঃশাসন তোমার চুল-শাড়ি ধরে টানাটানি করে
আমি বোমাও বানাতে পারি মারাত্মক
যা নির্ভুল সতর্কতায় লক্ষ্য তাক করে—
চিতার থাবার থেকে হরিণীর জ্যোৎস্না বাঁচাতে
আমি কিন্তু দাবাগ্নির পক্ষপাতী নই, কেননা

তোমার প্রতি রোমকূপেই যে অনন্ত সন্তান টানে দুধ।

বলো, শাস্তি ভালো নয়

ব্রহ্মপুত্র : ২০০২

জয়া মিত্র

এতদূর থেকে এসে দেখা হল ম্লান অবেলায়
তোমার সোনালি চোখে চোখ রাখি
খুলে দিই শার্টের বোতাম
অমনি ঝমঝম শব্দে দশদিক ভরে যায়
এই গোধূলিতে
তোমারও বুকের নিচে জমে আছে ঢেউকাটা বালি
ডুব দিয়ে পার হবো সেই জল নেই।
আর তুমি স্রোত দাও, তীব্র চোরাটানে
ভেসে যায় স্থির কূল
দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে খোলা বুকে ডাকো।
তবে বলো, শাস্তি ভালো নয়
বড়ো বেশি শান্ত হয়ে থেকে থেকে
পাথর জমেছে প্রতিবেশে
বলো, ভালোবাসা ক্রোধ দেয়
শুধু ভালোবাসা সেই স্রোত দেয়
বাঁধভাঙা শিলাখণ্ড বহে নিয়ে যাওয়া
সেই জলের চাদর
বুকের ভিতর থেকে ডাক দাও
গোপন শঙ্খের শব্দ তুলে
ভাসিয়ে দিলাম হাল ভেসে যাক দাঁড়
ছিন্নবন্ধন স্রোত ভেসে যাবো ভাঙনভৈরবী

না, বাবর প্রার্থনা করেননি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

[বাবরের আত্মজীবনী অসামান্য গ্রন্থ। বাবর মাতৃভাষা তুর্কীতে জীবনীটি লেখেন। বিভিন্ন সময়ে এই আকরগ্রন্থ অনূদিত হয় ফারসীতে (দুবার), হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসী ভাষায়। রাশিয়ায় পিরিসকুল কাদিরভও বাবরনামার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন অনেকটা উপন্যাসের আঙ্গিকে। ওই বই থেকে পূর্ণিমা মিত্র ও ননী ভৌমিক যুগ্মভাবে বাংলায় অনুবাদ করেন। জানি না ভস্তক বা ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে এখন আর তা পাওয়া যায় কিনা!

ঐতিহাসিকরা অনেকেই লিখেছেন বাবরের প্রার্থনায় পুত্র হুমায়ুন বেঁচে উঠেছিলেন। কিন্তু আসল ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সাজানো, যার মূলে কোনো প্রকৃত সত্য ছিল না। জীবনের প্রথম তিন দশক বাবর মদ্য স্পর্শ করেননি। কিন্তু যখন খেতে আরম্ভ করলেন তখন দিবারাত্রই মদের ঘোরে থাকতেন। রাতে ঘুম আসতো না বলে একের পর এক গান ও কবিতা লিখে যেতেন। হুমায়ুন তখন সম্বলের যুদ্ধক্ষেত্রে। হুমায়ুন অসুস্থ হয়ে পড়বার কিছুদিন আগে প্রাসাদের গোপন ষড়যন্ত্রীরা বাবরকে তীব্র বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করে। বাবরের সারা দেহ হলুদ হয়ে গিয়েছিল। প্রাণের আশা প্রায় ছিলই না। তারপর মদ্যপান, যা তিনি কখনোই ছেড়ে দিতে পারেন নি। দেশের সমস্ত হাকিমরা সকলেই বলেছিলেন বাদশার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাছাড়া হুমায়ুন (কি সত্যই খুব) অসুস্থ (অথচ বাবরনামায় দেখছি 'রোগের সঙ্গে লড়াই করে শেষে হুমায়ুন সেরে উঠলেন এবং এক সপ্তাহ পরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং পরের দিন বিশ্রাম মহলে গেলেন পিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য') ছিলেন?

প্রাথমিক জ্বরের বাড়াবাড়ির সময় গুরি মোল্লানেতা শেখ-উল-ইসলাম 'বাবরের অসুস্থ হলদেটে মুখের দিকে তাকিয়ে' বললেন, বাবর যদি তাঁর কোষাগারের সবচেয়ে মূল্যবান হীরা কোহিনূর ইমাম মুর্তিজার সমাধিতে রেখে আসেন, তাহলেই হুমায়ুন ভাল হয়ে উঠবেন। বাবর অবশ্য সে সময় ব্যঙ্গ করে ধর্ম-ব্যবসায়ীদের বলেছিলেন যে প্রয়োজনে পুত্রের জন্য নিজের জীবনও তিনি দিতে পারেন। তবে কোহিনূরের পরিবর্তে পুত্রের প্রাণভিক্ষা তিনি চান না। বাবর পরে নিভৃতে হুমায়ুনকে কি বললেন তা এবার স্বয়ং বাবরের মুখ থেকেই শুনুন 'ওদের কথায় তুই বিশ্বাস করিস নাকি? আমরা সবাই মরণশীল, যার যার নির্দিষ্ট সময়েই এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু সেই দুঃসহ মুহূর্তে আমি দেখলাম তোমার রোগকে ওরা তোমার আর আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাচ্ছে! শেখ-উল-ইসলাম আমাকে কাবু করতে চায়। তুই সেরে উঠলি, আর যদি ওর কথা শুনে আমি কোহিনূর হীরা দিতাম তো ও আর মোল্লারা জাঁক করে বলে বেড়াত তারাই হুমায়ুনকে সারিয়ে তুলেছে, শাহ্‌র চেয়ে তাদেরই ক্ষমতা বেশি। আমি তাই ওদের চুপ করাবার জন্যই ওই নিজেকে উৎসর্গ করার কৌশল নিলাম! আমি বিশ্বাসই করি না, শুধু প্রার্থনা করে মানুষের আয়ুকে বাড়ানো যায়। একমাত্র খোদাতাল্লার ইচ্ছায় মানুষ জন্মায় এবং মরে'।

বাবরনামার সুবৃহৎ জীবনী মূল তুর্কী থেকে ইংরেজি অনুবাদ ও পিরিসকুল কাদিরভের রাশিয়ান থেকে পূর্ণিমা মিত্র ও ননী ভৌমিকের বঙ্গানুবাদ দুটি বই-ই আমি পড়েছি। পরে সুদীর্ঘদিনের এক ঐতিহাসিক গুজবের আড়ালের প্রকৃত সত্যটি জেনে 'না,. বাবর প্রার্থনা করেননি' লিখতে উৎসাহিত হয়েছি।'—স সেনগুপ্ত]

সন্তান কে না ভালবাসে, বাবরও বাসতেন।
তবে তাঁর প্রার্থনায় পুত্র হুমায়ুন যে বেঁচে ওঠেননি, তা
স্বয়ং আত্মজীবনী 'বাবরনামায়' নিজে লিখে গিয়েছিলেন।
এভাবেই কতো গুজব যে ইতিহাসের পাতা
হয়ে গেল, কেউ কখনো সে বার্তা
জানবে না।

অন্ধকারকে সরাতে প্রতিটি উষায়
সব পাখিই কূজন জাগায়, কিন্তু কার সে প্রকৃত প্রতিভায়
পূর্বাপর সত্য—সূর্য জেগে ওঠে, জীবনের যাচাই শেখায়,
কোনো পাখি নিজে তা জানে না।

মূল তুর্কী ভাষায় 'বাবরনামা' পৃথিবীর নানা ভাষায়
অনূদিত হয়েছে, বাংলায় যুগ্ম অনুবাদক পূর্ণিমা মিত্র ও ননী ভৌমিক
সেখানে স্বাধীনচেতা ও ধর্মনির্ভিক
বাবর লিখছেন 'ধর্মগুরু শেখ-উল-ইসলাম বল্লেন—বাবর
তোমার ভাণ্ডারে সবচেয়ে মূল্যবান যে হীরা কোহিনূর, সেটাই
ধর্মের নামে পীরের দরগায় দান করো—তাহলেই
হুমায়ুন ভাল হয়ে যাবে।'—পুত্রকে এ বার্তা জানিয়ে বাবর বলেছিলেন
'দেখ পুত্র! আমি যদি তা দিতাম, আর তুমি
ভাল হয়ে উঠতে, তবে ধর্মবাদীরা বলতোই তুমি
তাদের জন্যই ভাল হয়ে উঠলে। না, আমি তা চাইনি
তোমার আরোগ্যলাভের জন্য কোনো প্রার্থনাও করিনি।
তুমি তো আমার যাবতীয় ঐশ্বর্যের চেয়েও মূল্যবান
এমনকি মোল্লারা যদি বলতো তোমার জন্য প্রাণ
দিতে হবে, আমি তাও দিতাম। আমি বিশ্বাসই করি না, শুধু প্রার্থনা করে
মানুষের আয়ুকে বাড়ানো যায়, একমাত্র খোদাতাল্লার ইচ্ছায়
মানুষ জন্মায় এবং মরে'।
ইংরেজি অনুবাদেও এ-সব স্পষ্ট লেখা আছে দেখা যায়।

হে বাবর! তুমি নিজেকে সব-সময়ই তুর্কী বলেছো—কখনোই মোগল বলো নি,
যে ধর্ম অন্ধ তার হাতে একটাও নতুন লাঠি গুজতে চাও নি।
বাদশাদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ কবি, গজলের সাশ্রু গীতিকার,
আজ তাই তোমাকে প্রণতি জানালাম অক্ষরে আমার।

হীরেন ভট্টাচার্য
(অসমীয়া কবিতার বাংলা অনুবাদ)

ভিন্ন ভিন্ন তিন লাইন

তুমি বাড়িয়ে দাও তোমার সবুজ হাত
আমি শস্যের প্রতিমা গড়ি...

তুমি শস্যের দুচোখে বয়ে আসা আমার কলং-কপিলী*
সন্ধ্যার বাতাসে ধুলো বালির ভেজা গন্ধ

বোড়ো মেঘ ছাউনি ফেলেছে—
তুমি আগলে থাকবে আমার ভরন্ত রূপসী মাঠ

* দু-খানা নদীর নাম

আমার ঘুমের আধ ভেজানো দুয়ার দিয়ে
(একা একা গৌরী গুনগুনিয়ে আসে)

আজ রাত তারায় ভরাট আকাশ
কোথাও একচিমটেও ঠাঁই নেই, এ ওর গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে আছে
আঁধার রাতে চেনাজানা না থাকা ঝিলমিল এই তারাগুলো

ওদেরই আবার কোনোটা আমার ঘুমের আধ-ভেজানো দুয়ারে টুঁ মারছে—

শ্যাওলা পিছল আমার স্মৃতি ভর বর্ষার এক তাল মেঘের মতো
ভুলোবনের সুকাঠ গাছের ডালে পাতায় মন খুলে ছড়িয়ে বসছে

কাল সাতসকালেই গৌরী ফুল কুড়োতে আসবে.....

শেকড়

আমার চারিদিকেই শেকড়
গা থেকে মাটি অব্দি ঢেউ খেলে নেমে গেছে

আমি গোড়ালি গেড়ে দাঁড়িয়ে আছি গাছের মতো
ঝড়-বাদলে ঝাঁঝড়া আমার রক্তের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে উঠেছে
ভর-দুপুরের একানে সবুজ—

ছায়ার মতো আমি চলে যাচ্ছি একা একা
বাউল বাতাসে গাছের কচি পাতাগুলো আস্তে আস্তে মেলে দিচ্ছে
তাদের পাখসাটে বুনো ডানা...

স্মৃতির ভেজা বাতাস

মেঘ ভুলে যাই বৃষ্টি
নদী কী মনে রাখে কঠিন হাতে খসিয়ে আনা সবুজ দুটো পার

সূর্য ডুবে গেল নৌকোর গলুইর পাশে
স্মৃতির ভেজা বাতাস জুড়িয়ে দিয়েছে
শরীর জড়িয়ে থাকা ভালোবাসার নোনা ঘাম

হঠাৎ মাঝি শুরু করে দিলো আগাগোড়া না-থাকা একটা গান

কাস্তে চাঁদটা দেখতো মেঘে মেঘে
আজ কত দেখার মতো হয়ে উঠছে...

অনুবাদ : হীরেন ভট্টাচার্য

একুশ শতক ও মার্কসবাদ : আগামী দিনের কিছু ভাবনা

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গে বাস করলেও মার্কসবাদ নিয়ে কিছু লিখতে এখন আর ভরসা পাই না। কারণ একাধিক। প্রথমত, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ছাড়া মার্কসবাদ নিয়ে আদৌ কারও কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। যাঁদের অনেকেই দৃষ্টিভঙ্গিতে এখনও নিজেদের বামপন্থী মনে করেন, তাঁদের অধিকাংশই এখন মার্কসবাদ সম্পর্কে নিরুৎসাহী ও সন্দিহান; পরিবর্তে তাঁরা অনেকেই আজ উত্তরআধুনিকতা, উত্তর উপনিবেশবাদের পক্ষাশ্রয়ী। মার্কসবাদের বিকল্প হিসেবে তাঁরা উত্তর-পথধারী এই মতবাদগুলিকে গ্রহণ করাকেই শ্রেয় মনে করেন। দ্বিতীয়ত, এর বিপরীতে অবস্থান করছেন কিছু মানুষ, যাঁরা এখনও স্বপ্ন দেখেন এবং বিশ্বাস করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের যে মহাপতন অনুষ্ঠিত হল, তা নিতান্তই সাময়িক এবং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। এঁদের বিচারে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের জন্য মূলত দায়ী মিখাইল গরবাচেভের সংস্কার কর্মসূচী এবং মূলত গরবাচেভ নেতৃত্বাধীন "সংশোধনবাদী" সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও সি. আই. এ-র যৌথ চক্রান্তের শিকার সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। এঁরা মনের গভীরে বিশ্বাস করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অধোগতি শুরু হয়েছিল ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চভের স্তালিন-সমালোচনার সময় থেকে। সামান্য কিছু ভুলত্রুটি থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ক্ষেত্রে স্তালিনের ইতিবাচক ভূমিকা যেমন প্রশংসনীয়, এই পর্ব নিয়ে কাটাছেঁড়া, বিচার-বিশ্লেষণ তেমনই সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের বেড়াজালে আবদ্ধ পৃথিবীটাকেই আবার অনেক বামপন্থী ভবিতব্য মেনে নিয়ে মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি ধারণার সঙ্গে বিশ্বায়নী সংস্কার, বাজার অর্থনীতি ও বেসরকারিকরণের ভাবনার এক বিচিত্র মিশেল প্রস্তুত করতে আগ্রহী। এঁদের দৃষ্টিতে মার্কসবাদের এটাই আধুনিকতম, সৃজনশীল সংস্করণ।

অকপটেই বলি, এই জাতীয় ভাবনাগুচ্ছ একুশ শতকের অতি কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দুর্বল হয়ে যাওয়া ভিত্তিকে সংহত করার কোনও হদিশ দেয় না, দেয় না কোনও প্রকৃত নতুন ভাবনার ইঙ্গিত। এই ধরনের ভাবনাচিন্তা জন্ম দিচ্ছে মার্কসবাদ সম্পর্কে গভীর সংশয়, মতান্ধতা ও চরম সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির। এতে লাভবান হচ্ছে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী শিবির। তাই গভীর আক্ষেপের সঙ্গে একটি প্রশ্নই অনেক সময় করতে ইচ্ছে হয় : বামপন্থার প্রতিষ্ঠিত ধ্বজাধারীদের হাতে মার্কস আজ সত্যিই কি নিরাপদ?

॥ ২ ॥

তাহলে প্রশ্ন ওঠে : কেন এমনটা হল? সম্ভাব্য উত্তরগুলি এরকম। এক : সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়

মার্কসবাদের প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড নিয়ে যে প্রশ্নগুলি তুলে দিয়েছে, সেইসব অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি অনেকেই হতে চান না। সুতরাং বিশ্বাসকে যদি আঁকড়ে থাকতে হয়, তাহলে এ সব তথাকথিত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দুই : সমাজতন্ত্রের ভাবনা নিয়ে অনেক বামপন্থীরই কোনও মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক দায় অতীতেও ছিল না, এখন একেবারেই নেই। এঁদের অনেকের কাছেই প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের চিন্তা দুর্বোধ্য ও অবাস্তব মনে হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জমায়েত হতে বা শ্লোগান তুলতে এঁরা অনেকেই দশবার ভাবেন। তাই সমাজতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এঁরা মার্কসবাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে উত্তর আধুনিকতার অতি প্রবল নেতিবাচক র‍্যাডিক্যালিজমের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। তিন : সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও বিশ্বায়নী বাজারের দৌলতে অনেক বামপন্থীই এ কথা ভাবতে শুরু করেছেন যে পরিস্থিতির পরিবর্তন নয়, পরিস্থিতির সঙ্গে যথাসম্ভব আপস করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারাটাই এখন বামপন্থীদের প্রধান কর্তব্য। তাই মতাদর্শের কথা না বলাটাই তাঁরা শ্রেয় মনে করেন। এঁরা একই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আবার প্রায়োগিক ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, মতাদর্শ নিরপেক্ষভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার কর্মসূচি প্রণয়নে বদ্ধপরিকর।

এই ভাবনাচিন্তার যাঁরা শরিক, সমস্যা হল যে তাঁরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মহাপতনের বিষয়টিকে এক ধরনের প্রায়োগিক ব্যর্থতা বলেই থেমে যান। কিন্তু এই প্রায়োগিক অসাফল্যের পিছনে কি নিহিত ছিল তত্ত্ব ও দর্শনের স্তরে মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত কোনও সমস্যা যার নিরসন না হওয়ার পরিণতি সমাজতন্ত্রের এই প্রায়োগিক মহাবিপর্যয়? একুশ শতকে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে হলে এই কঠিন প্রশ্নটির মুখোমুখি হওয়ার সময় এসেছে।

নিজের অগোছালো অবিন্যস্ত চিন্তাকে একটা জায়গায় দাঁড় করাতে গিয়ে যে প্রশ্নটি মনে উঁকি দিচ্ছে সেটি এরকম : মার্কসবাদ ডায়ালেক্টিক্সকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও মার্কসবাদের ইতিহাসের গভীরে নিহিত রয়েছে যে ডায়ালেক্টিক্স,—সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা কি যথেষ্ট সচেতন? যদি মার্কসবাদের বৌদ্ধিক ইতিহাসকে খতিয়ে দেখি, তাহলে আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দাঁড়িয়ে বোধ হয় এ কথা অনস্বীকার্য যে দুটি বিপরীতমুখী ধারা প্রায় গোড়া থেকেই মার্কসবাদের অভ্যন্তরে প্রবহমান ছিল। একটি ধারা ছিল বিষয়ীবাদী, যার অন্যতম উদাহরণ মার্কসের প্রথম পর্বের দার্শনিক এবং মধ্যপর্বের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখাপত্র, যেখানে বারেবারেই প্রাধান্য পেয়েছে মানবমুক্তি, ইতিহাসে শ্রমজীবী, নিরন্ন মানুষের ভূমিকা, বিপ্লবের সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রশ্নে বাস্তব পরিস্থিতি ও মানবিক উপাদানের জটিল টানাপোড়েনের বিষয়টি। অপর ধারাটি ছিল বিষয়বাদী, তথাকথিত "বৈজ্ঞানিক" ভাবনায় জারিত, যার মূল কথাটি পর্যবসিত হল এই স্বীকায় যে, মার্কসবাদ কার্যত একটি বিজ্ঞান, যেখানে এক ধরনের অমোঘতা, অনিবার্যতা ও নির্ধারণবাদই শেষ কথা বলে। এখানে বিষয়ীগত ভাবনা বা উপাদান সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, প্রাধান্য পায় বিজ্ঞানমনস্কতার মোড়কে ঘটমান আপাতসফল বিষয়গুলি এবং তার পরিণতিতে অনুচ্চারিত থেকে যায় বিপ্লব প্রক্রিয়া কিংবা

সমাজতন্ত্র নির্মাণের ত্রুটিবিচ্যুতি। প্রথম ধারাটির প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে বহুলাংশে এঙ্গেলস-এর মার্ক্সবাদকে এক ধরনের সামাজিক ডারউইনবাদে পর্যবসিত করার ভাবনায়, যাকে পরবর্তীকালে অনুসরণ করে কাউটস্কি মার্ক্সবাদকে পরিণত করলেন এক জাতীয় যান্ত্রিক নির্ধারণবাদে। অদ্ভুত শোনালেও ঘটনা এটাই যে রুশ বিপ্লবের পরে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্ক্সবাদচর্চা ও সামগ্রিকভাবে ইতিহাস, দর্শন ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাতেও এই তথাকথিত "বৈজ্ঞানিক" একরৈখিকতাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ার প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও লেনিনপর্বে কিন্তু এমনটা ঘটেনি। বিশের দশকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই কালপর্বে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতার যে এক আশ্চর্য বিস্ফোরণ ঘটেছিল, প্রবল তর্কবিতর্ক, আলাপ আলোচনা ও চিন্তাবিনিময়ের যে এক অনাস্বাদিত সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, লেনিন-পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নে তার একান্ত অভাব সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে ক্রমেই এক বদ্ধ্যাবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। যে পথ অনুসরণ করে লেনিন-পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে সংহত করার চেষ্টা হল, তার সঠিকতা নিয়ে সোভিয়েত পার্টি নেতৃত্বের অভ্যন্তরেই অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু এক প্রবল একরৈখিকতা, যা স্বীকার করে না কোনও ভিন্নতা, কোনও ভিন্ন স্বরের উপস্থিতি, এই ভিন্নধর্মী বক্তব্যকে আখ্যায়িত করল সমাজতন্ত্রের বিরোধী শ্রেণীশত্রু হিসেবে, যার পরিণতি গ্রেপ্তার ও মৃত্যু। প্রথম পর্বে স্তালিন ও যুদ্ধোত্তর পর্বে ব্রেজনেভ উভয়েই ছিলেন এই নিয়মতান্ত্রিক, দৃষ্টবাদী, একরৈখিক মার্ক্সবাদের পৃষ্ঠপোষক এবং যদি আমরা খেয়াল করি যে এই দুই নেতার সময়কালই ছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের দীর্ঘতম দুই অধ্যায়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্ক্সবাদের প্রায়োগিক ব্যর্থতার তাত্ত্বিক ভিত্তিটিকে চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয় না।

বিজ্ঞানমনস্কতা তথা নিয়মতান্ত্রিক একরৈখিকতার এই ধারা মার্ক্সবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তার দাপটে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে অপর ধারাটি, যার মূল কথা মানবতাবাদ, বিষয়ীবাদিতা, গণতন্ত্র। ১৯৩২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম প্রকাশিত হয় মার্ক্সের "অর্থনৈতিক-দার্শনিক পাণ্ডুলিপি" (১৮৪৪)। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সোভিয়েত ইউনিয়নে তরুণ মার্ক্সের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হবার পরে তেমন কোনও হেলদোল দেখা যায়নি,—কার্যত এটি পর্যবসিত হয় গুটিকয়েক বিশেষজ্ঞের বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনায় (যেমন লাপিন, ওইজারমান প্রমুখ)। কিন্তু তরুণ মার্ক্সের চিন্তাভাবনাকে সমাজতন্ত্রের প্রায়োগিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার কোনও চেষ্টাই দেখা গেল না, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্ক্সবাদের পথ ইতিমধ্যেই পাকাপাকিভাবে এক অতি সরলীকৃত, একরৈখিক ভাষ্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। মার্ক্সকে নতুন করে দেখা, নতুন করে পড়ার এই প্রচেষ্টা শুরু হল পশ্চিম ইউরোপে, এবং ১৯৫৬ সালে বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অতীতের পর্যালোচনা ও আত্মসমালোচনা অনেক মার্ক্সবাদীর কাছেই উন্মোচন করে দিল মার্ক্সবাদচর্চার এক নতুন দিগন্ত। সার্ত্র, শ্যাফ্,

গারুদি থেকে শুরু করে অনেক দিকপাল মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীই প্রশ্ন তুললেন এতদিনের পরিচিত, আপ্তবাক্যসুলভ মার্কসবাদের প্রথাগত একরৈখিক ভাষ্যের যথার্থতা নিয়ে। পশ্চিম ইউরোপের একাধিক কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে দেখা দিল মতাদর্শগত স্তরে দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও সংকট, যার জেরে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে দাঁড়ালেন অনেকেই। এ সবের জের কাটতে না কাটতেই সোভিয়েত ইউনিয়নে কায়েম হল ব্রেজনেভ নেতৃত্ব, অন্তর্হিত হল প্রথম 'গ্লাসনস্ত'-এর স্থায়িত্বের সম্ভাবনা। একই সঙ্গে ফ্রান্সে সার্ত্র, গারুদি প্রমুখের "মানবতাবাদী", "বিষয়ীবাদী" মার্কসবাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কলম ধরলেন লুই আলথুসের, পরবর্তীকালে যা পরিচিত হল "কাঠামোতাত্ত্বিক মার্কসবাদ" পথে এবং যে মার্কসবাদ প্রায় জেহাদ ঘোষণা করল তরুণ মার্কস, মানবতাবাদ এবং বিষয়ীবাদের বিরুদ্ধে। এই কাঠামোতাত্ত্বিক মার্কসবাদ একদিকে যেমন নস্যাৎ করল মানবতাবাদী মার্কসবাদের দাবিগুলিকে, অপরদিকে অস্বীকার করল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির একরৈখিক মার্কসবাদী ভাষ্যকেও। পরিবর্তে সূচিত হল এক নতুন ভাবনা, যার মূল কথা এটাই যে মার্কসের প্রধান অবদান হল একটি বিজ্ঞানমনস্ক পদ্ধতি সৃষ্টি করা, যেটি সন্ধান দেয় যথার্থভাবে সমাজবিশ্লেষণের। এই পদ্ধতিকে আলথুসের চিহ্নিত করলেন কাঠামোতাত্ত্বিক নামে, যার সারবস্তুটি হল এই যে, কোনও বিষয়বস্তু বা ঘটনার নিজস্ব, কোনও বিষয়ীবাদী সত্তা নেই। এই সত্তাটি নির্ধারিত হয় তার অভ্যন্তরস্থ কাঠামোর বিন্যাস দিয়ে এবং এই বিন্যাসের অনুসন্ধান ও তার নিরিখে সত্তাটিকে বিচার করাটাই হল প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যার হদিশ আমরা পাই মার্কসের 'ক্যাপিটাল'-এ। এই ব্যক্তিটি যেমন কাঠামোতাত্ত্বিক নির্ধারণবাদের জন্য সওয়াল করে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন করে এক বিজ্ঞানমনস্কতা ও একরৈখিকতাকে প্রশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করল, অপরদিকে কাঠামোতাত্ত্বিকতায় ভাবনা পুরোপুরি খারিজ করে দিল মানবিকতামুখী মার্কসবাদের প্রয়োজনীয়তাকে। বিচ্ছিন্নতা, মানবমুক্তি ইত্যাদি প্রশ্নগুলি, যার সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিত গণতন্ত্রের প্রশ্নটি, আবারও একবার অন্তর্হিত হল মার্কসবাদের বৌদ্ধিক আলোচনায়।

এর পরবর্তী সে সময়,—অর্থাৎ, সত্তর থেকে নব্বই কালপর্বে,—ইউরোকমিউনিজমের উদ্ভব, চেকোশ্লোভাক সংকট ও গরবাচেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্ত-এর কর্মসূচি মূলত ছিল মার্কসবাদের মানবতামুখী, বিষয়ীবাদী ধারারই প্রায়োগিক প্রতিফলন, যা আবার একই সঙ্গে ছিল মার্কসবাদের প্রচলিত একরৈখিক, নির্ধারণবাদী ধারার বিরুদ্ধে এক জোরালো প্রতিবাদ। তাই বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন এই প্রতিটি প্রশ্নে মার্কসবাদী মহলের অভ্যন্তরস্থ রক্ষণশীল শক্তিগুলি প্রবলভাবে সরব হয়েছিল এই নতুন ভাবনাগুলির বিরোধিতায়।

।। ৩ ।।

মার্কসবাদের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই যে দ্বন্দ্ব, এই যে জটিল ডায়ালেকটিক, সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ও পতনের আলোচনায় সাধারণত তার আলোচনাটি উপেক্ষিতই থেকে যায়। মার্কসবাদের ইতিহাস ও বিকাশের ধারাটিকে মূলত একটি বিশেষ ধারার সঙ্গে একাত্ম

করে দেখার ফলে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা = বিজ্ঞানমনস্কতা/বিষয়বাদের ব্যর্থতা = মার্কসবাদের ব্যর্থতা এরকম একটি অতি সহজ সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছে যাই। আর তারই পরিণতিতে দু'টি প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার বিষয়। প্রথমত, মার্কসবাদের প্রচলিত ভাবনাচিন্তায়, বিশেষত বাম-রাজনৈতিক মহলে, প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে গেছে মার্কসবাদের অপর ধারাটি, যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে বিষয়ীবাদিতা, বহুত্ববাদ, সহনশীলতা, ভিন্নতা,—এক কথায়, গণতন্ত্রের বিষয়টি। এই ধারার উৎসমুখ তরুণ মার্কসের সামাজিক-দার্শনিক চিন্তা এবং তারই সূত্র ধরে আমরা পৌঁছে যাই রোজা লুক্সেমবুর্গ, আনতোনিও গ্রামশি, গেওর্গ লুকাচ, নিকোলাই বুখারিনের এক ভিন্নধর্মী মার্কসবাদে, যাকে প্রথাগত মার্কসবাদ চিরকালই দেখেছে গভীর সন্দেহ ও উপেক্ষার চোখে। এই ধারাকে আশ্রয় করেই বোঝা যায় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেস, ইউরোকমিউনিজম, চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলি ও মিখাইল গর্বাচেভের গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈইকার কর্মসূচির তাৎপর্য। তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে এই দ্বিতীয় ধারার মার্কসবাদের সব কিছুই সঠিক বা যথার্থ ছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ও পতনের আলোচনায় মার্কসবাদের ইতিহাসের অভ্যন্তরে নিহিত এই বিকল্প অথচ প্রবলভাবে উপেক্ষিত ধারাটিকে অস্বীকার করে আজ আর বোধ হয় লাভ নেই।

এই ধারাটিকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করার পরিণতিতেই একুশ শতকের মার্কসবাদ পড়ে গেছে এক জটিল ও গভীর সংকটে। বামপন্থী মহলে উত্তরআধুনিক চিন্তার প্রবল প্রভাবের মূলে রয়েছে সেই প্রশ্নগুলি, যার উত্তর প্রতিষ্ঠিত কেতাবী, সূত্রায়িত মার্কসবাদে আমরা পাই না, অর্থাৎ, ভিন্নতার গুরুত্ব, ভিন্ন স্বরের স্বীকৃতি, বহুত্ববাদ। এগুলি তেমনই বিষয় যা মার্কসবাদের বিকাশের ইতিহাসে বারে বারেই উঠে এসেছে, কিন্তু একরৈখিকতার দাপটে যা পাদপ্রদীপের আলোকে আসতে পারেনি, এবং এই শূন্যস্থান ভরাট করতে মার্কসবাদকে অস্বীকার করে আসর জমিয়েছে উত্তরআধুনিকতা। উত্তরআধুনিকতা যখন মার্কসবাদকে পশ্চিমী আধুনিকতারই এক অপরিহার্য অঙ্গ মনে করে, মার্কসবাদকে যখন গণ্য করে এক সর্বগ্রাসী, অগণতান্ত্রিক, একরৈখিক দর্শন হিসেবে, তখন মার্কসবাদ সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় একটি বিশেষ ভাষ্য, একটি বিশেষ ধারার সঙ্গে, যেখানে সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত থেকে যায় অপর ধারাটির উল্লেখ কিংবা আলোচনা। মার্কসবাদের প্রবক্তারাই যদি মার্কসীয় চিন্তার বৌদ্ধিক বিকাশের অন্তর্নিহিত ডায়ালেকটিক-কে অস্বীকার করেন এবং তার পরিণতিতে যদি উত্তরআধুনিকতাবাদ মার্কসবাদের একরৈখিকতার বিরুদ্ধে কামান দাগে, তাহলে বোধ হয় আয়নায় নিজেদের মুখ আমাদেরকে আরও একবার দেখা দরকার।

আবার এই একমাত্রিক ভাষ্য ছাড়া মার্কসবাদকে যাঁরা অনুধাবন করতে চান না, তাঁরা সেই কারণে আঁকড়ে ধরে থাকেন পুরনো অতীতকে, অস্বীকার করতে চান অন্য কোনও বিকল্প ভাষ্যের সম্ভাবনা এবং তার পরিণতিতে এঁদের হাতে মার্কসবাদ পরিণত হয় এক ধরনের অন্ধ বিশ্বাসে, যা মার্কসবাদের পথে জন্ম দেয় এক জাতীয় মৌলবাদের। এই মৌলবাদী মার্কসবাদের প্রধান ভরসা এক প্রবল আত্মসন্তুষ্টি, যা মার্কসবাদের বৌদ্ধিক ইতিহাসের জটিল টানাপোড়েনের আলোচনায় না গিয়ে মার্কসবাদের এক বিশেষ ভাষ্যকে পরিণত করে এক

অতিকথায়, যা পার্টিকে ধরে রাখে, পার্টির শৃংখলাকে অটুট রাখে, কিন্তু ক্রমেই ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয় কমিউনিস্ট পার্টির বৌদ্ধিক ও মতাদর্শগত ভিত্তিকে।

আবার এই একই কারণে মার্কসবাদী মহলের একাংশে আজ বলছেন যে বিশ্বায়নের যুগে মতাদর্শগত বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, কারণ এঁদের কাছেও মার্কসবাদের চিরাচরিত ভাষ্যের প্রায়োগিক ব্যর্থতা অপর কোনও বিকল্প ভাবনার ইঙ্গিত দেয় না। সুতরাং বিশ্বায়নী ব্যবস্থার সঙ্গে একটি সমঝোতা করে নিয়ে তাঁরা একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

পরিশেষে একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। বুদ্ধিজীবীমহলে মার্কসবাদের চর্চা নিয়ে যে আগ্রহ লক্ষ করা যায়, তাঁদের অনেকের মধ্যেই মার্কসবাদের বৌদ্ধিক ইতিহাসের এই দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কে যে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়, পার্টিগতভাবে তার কোনও প্রতিফলন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রায়োগিক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টিগোচর হয় না। বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক এই বিভাজন, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক এই দুই পৃথক সত্তা ব্যবহারিক দিক থেকে বুদ্ধিজীবীমহলকে ও তত্ত্বগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে ক্রমেই দুর্বল করেছে, যা কোনও যথার্থ মার্কসবাদীর একেবারেই অভিপ্রেত নয়। একবিংশ শতকের মার্কসবাদে আগ্রহী বুদ্ধিজীবী যখন ক্রমেই আরও বেশি করে চোখ ফেরাচ্ছেন গ্রামশি, রোজা লুকসেমবুর্গ, বুখারিন প্রমুখের উপেক্ষিত রচনাগুলির দিকে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে ততটাই বেশি করে আঁকড়ে ধরছেন মার্কসবাদের একরৈখিক ধারার প্রবক্তাদেরকে এবং উভয় পক্ষের কোনও যথার্থ মেলবন্ধন না হলে একুশ শতকে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ আরও বিপন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। নতুন শতাব্দীর মার্কসবাদের কাছে এটিই বোধহয় সবচেয়ে বড় ও কঠিন চ্যালেঞ্জ।

সন্ত্রাসের স্বৈরতন্ত্র

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

'Anarchism was often a sort of punishment for the opportunist sins of the working class movement.'

লেনিন কথাগুলো লিখেছিলেন ১৯২০ সালে যখন নব্য-প্রতিষ্ঠিত সোবিয়েত রাষ্ট্রে বলশেভিকদের বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী মনোভাবের ও কার্যপদ্ধতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। ইউক্রেনে কৃষক নৈরাজ্যবাদী নেতা Nestor Makhno এক সশস্ত্র সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে তখন, আর শহরাঞ্চলের 'লেফট্ সোস্যাল রেভলিউশনরীজ'-রা ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিতে লিপ্ত। এদের উত্থানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিছুটা আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে লেনিন কথাগুলো লিখেছিলেন (যদিও Left Wing Communism. an Infantile Disorder-এর রচনার তাৎক্ষণিক উপলক্ষ্য ছিল তৎকালীন জর্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে আদর্শগত মতপার্থক্য)।

আজ এতকাল পরে, লেনিনের ওই মন্তব্যের যাথার্থ্য মর্মান্তিকভাবে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বিংশ শতাব্দী জুড়ে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও দুই বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থায় যে স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদ, নির্লজ্জ আপোসপন্থা, অগণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি ও অমানবিক শাসনপ্রণালী, সে আন্দোলনের আদর্শ ও সাফল্যের ইতিহাসকে অনেকাংশে কলঙ্কিত করেছে, তারই খেসারত দিতে হচ্ছে আজ এই একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পিছু হঠতে হঠতে আজ এমন এক পর্যায় এসে পৌছেছে যেখানে তার নেতা ও কর্মীদের স্থান ছেড়ে দিতে হচ্ছে এমন সব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীদের কাছে যারা ধর্মীয় মৌলবাদ বা উৎকট জাতীয়তাবাদ বা সঙ্কীর্ণ উপজাতীয় স্বার্থান্বেষণ—এই ধরনের পশ্চাদপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের ছত্রছায়ায় জনগণকে জড় করতে সক্ষম হচ্ছে। এমন কি—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভিযানে যেখানে অতীতে কমিউনিস্টরাই নেতৃত্ব দিয়েছিল (ভিয়েতনাম, কিউবার লড়াই-এর কথা স্মরণীয়), আজ দেখছি মধ্য-প্রাচ্যে সেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পুরোপুরি চলে গেছে এমন সব গোষ্ঠীর নেতৃত্বে যারা সমাজতন্ত্রের আদর্শের বদলে বিশ্বাস করে গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসনে এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে অনুসরণ করে বাছবিচারহীন ব্যাপক সন্ত্রাসের রণকৌশল।

শুরু করা যাক প্যালেস্তিন দিয়ে। ইয়াসর আরাফতের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় প্রভাবান্বিত যে PLO ও Fatah গড়ে উঠেছিল এক ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন হিসেবে এবং ইজরায়েল সম্প্রসারণ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে একটা সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা আদায় করতে পেরেছিল, কিছুকাল পরে তারাই পরাজিত হল নির্বাচনে—এবং দেশের লোক নির্বাচিত করল Hamasকে, যে সংগঠনটি উগ্র ধর্মীয় অনুশাসন এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থায় বিশ্বাসী। ইজরায়েলের আগ্রাসনের মূল রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তে তার ধর্মীয় ইহুদি চরিত্র-ই

(ও তার ফলে তার সাধারণ নাগরিকদের আক্রমণের চাঁদমারি করার প্রবণতা) Hamas-এর ইসলামীয় প্রচারের নিশানা। লক্ষণীয়—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পুষ্ট ইজরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচারে Hamas ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শ্রেণীবৈষম্য, নারী-নিপীড়ন, এ সব প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে—এ সত্ত্বেও প্যালেস্তিনি নাগরিকেরা কেন Hamasকে নির্বাচিত করল? এর জবাবের সন্ধানে মধ্য-প্রাচ্যের বহু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক দুটো ইঙ্গিত দেন—এক, আরাফতের শাসনকালীন দুর্নীতি ও তার দলের নেতা ও কর্মীদের ব্যভিচার যা সাধারণ মানুষকে PLO থেকে বিমুখ করেছে। দুই, প্যালেস্তিন থেকে ইজরায়েলের পুরোপুরি অপসারণে আরাফতের অক্ষমতা যার ফলে প্যালেস্তিনের জনগণ তাঁর নেতৃত্বে আস্থা হারিয়েছে। প্যালেস্তিনের জাতীয় সংগ্রাম আজ ক্রমশই মুসলমান-ইহুদির সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পর্যবসিত হতে চলেছে। ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামে ব্যাপক জনগণের সহযোগিতায় গেরিলা যুদ্ধের স্তর পরম্পরায় যে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিল কমিউনিস্ট পার্টি, সারা বিশ্বের—এমন কি আমেরিকার সাধারণ মানুষের যে সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল ভিয়েতনামের নেতৃত্ব এবং অবশেষে স্বদেশ থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সমরসেনাকে যেভাবে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়েছিল—তার কোনো চিহ্নই আজকের প্যালেস্তিনের মুক্তিযুদ্ধে দেখতে পাই না। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধারা নৈতিক ও সামরিক সাহায্য পেয়েছিলেন সোবিয়েত ও চীন থেকে। প্যালেস্তিনের যোদ্ধারা সে সাহায্য থেকে আজ বঞ্চিত। সব আরব রাষ্ট্রগুলি যদি সম্মিলিত হয়ে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়াত, তাহলে প্যালেস্তিন অনেক আগেই মুক্ত হত।

মধ্যপ্রাচ্যের মর্মান্তিক পরিণামের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে দোষী করা যায় না। ওই দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির দুর্বলতা ও নৈতিক অধঃপতন অনেকাংশে দায়ী বলা যেতে পারে। তাদের পশ্চাদপসরণে যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে তা দখল করে নিচ্ছে উগ্র ধর্মীয় সন্ত্রাস। ইজরায়েল ও মার্কিন রাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের পরিবর্তে বিচার-বিহীন হত্যাকাণ্ড বা সাম্প্রদায়িক অন্তর্দ্বন্দ্ব (ইরাকে সিয়া-সুন্নি সংঘর্ষ) প্রতিরোধের একমাত্র ভাবা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরাকে আত্মহননকারী বোমা নিক্ষেপক আসল সাম্রাজ্যবাদী শত্রুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে না পেরে এলোমেলো ধ্বংসে নিরীহ মানুষকে মারছে। ব্যর্থতা ও অক্ষম হতাশার এমন মর্মন্তুদ অভিব্যক্তি ইতিহাসে বিরল। সম্প্রতি বাগদাদে সাদ্দাম হোসেনের বিচারকালীন শুনানির সময়, বিচারক সাদ্দামের বাগাড়ম্বর থামিয়ে ওঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে বিদ্রোহীরা দৈনিক গড়ে ৬০ জন ইরাকীকে মারছে। তারপর সাদ্দামের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন—"বাজারে কফির দোকানে ওরা ইরাকীদের কেন আক্রমণ করছে? মার্কিনীদের মধ্যে গিয়ে নিজেদের বিস্ফোরিত করছে না কেন?" এ প্রশ্ন ভাবিত করে তুলছে পৃথিবীর মার্কিন-বিরোধী ইরাকের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদেরও। এ তো লড়াইয়ের সঠিক পথ নয়। লেবাননেও শক্তিশালী ইজরায়েলের বিধ্বংসকারী বোমারু আক্রমণের প্রতিরোধে হেজবোল্লা রকেট ছুঁড়ছে ইজরায়েলের শহরের দিকে। উভয় দেশেই নিহত হচ্ছে সাধারণ নিরীহ মানুষ। জনগণের সশস্ত্র প্রতি-আক্রমণ বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুপক্ষর বিনাশ—এর কোনো লক্ষণই এ যুদ্ধে দেখতে পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্যের কিছু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং এদেশেও, বিশেষ করে 'হিন্দুত্ব'র ধ্বজাধারী সংঘ পরিবারের সভ্য ও সমর্থকেরা, সন্ত্রাসের রাজনীতি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একচেটিয়া বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাস, World Trade Centre আক্রমণ, আফগানিস্তানে তালিবানের দৌরাত্ম্য, আল-কিদার সন্ত্রাসবাদী জটাজাল, কাশ্মীরে লস্কর-এ-তায়েবার ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম, মুম্বাইতে বোমা বিস্ফোরণ—এ সবেরই সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কিছু মুসলমানের যোগসাজশ আছে, এই সন্দেহে এক পুরো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেবার একটা প্রবণতা আজ সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি। পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই, যে-কোনো একজনকে শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দোষী সাব্যস্ত করার এই নেশা আমাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে, যে কিছুকাল আগে, ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর, দিল্লিতে লোকসভার উপর এক ব্যর্থ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের উৎস অনুসন্ধানের সূত্রে পুলিশ দিল্লির এক মুসলমান অধ্যাপককে গ্রেফতার করে এবং বিশেষ আদালত তাঁর উপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়। শেষে, মানবাধিকার সংগঠনের কিছু সাহসী আইনজীবীর হস্তক্ষেপে তিনি নির্দোষ বলে প্রমাণিত হন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসবাদ—এ দুটোর মধ্যে একটা প্রভেদ টানা দরকার। ইজরায়েলে জাইওনিস্ট গুণ্ডাবাহিনী, বা এদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ-বজরঙ্গ দল-বিশ্ব হিন্দু পরিষদের খুনির দল অনেক সময়ই রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি অসহিষ্ণুতা ঘৃণাবশত তাদের বিলোপ সাধনের লক্ষ্যে এরা নিয়োজিত। বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও গুজরাটে মুসলমান হত্যার পিছনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অনুমোদন ও সহযোগিতার প্রামাণিক তথ্য আজ সর্বজনবিদিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এইসব দলগুলির সন্ত্রাসবাদ আক্রমণাত্মক। অন্যদিকে, সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলির সন্ত্রাসবাদের পিছনে একটা প্রতিরক্ষামূলক মনোভাব কাজ করছে। ক্ষমতাবান শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও শেষে সন্ত্রাসবাদী প্রতিহিংসায় পর্যবসিত হয়। পাঞ্জাবে খালিস্তানীদের হিন্দু হত্যা, কাশ্মীরে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীদের হিন্দু পণ্ডিতদের আক্রমণ, আসামে বহিরাগত ভিন্ন ভাষীদের নির্যাতন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নাগা-কুকী-মেইতি প্রভৃতি ভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে খুনোখুনি—এইসব সন্ত্রাসবাদী ঘটনাগুলির নেপথ্যে রয়েছে এক ধরনের বিকৃত স্বাজাত্যবোধ, যা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় অপরকে পর্যুদস্ত করে এবং নির্বিচার ধ্বংসের মাধ্যমে। মুম্বাইতে বোমা বিস্ফোরণ এই প্রতিহিংসা-স্পৃহারই চূড়ান্ত চেহারা।

(২)

Taking the name of freedom, Violence herself in her vivid colours, with her signing and her mockery, her struggles and her dramatic scenes, becoms an irresistible temptress.

গত শতকের প্রখ্যাত ফরাসি কবি পল ভ্যালেরি তাঁর সমসাময়িক সমাজের দিকে তাকিয়ে

যে ছবি এঁকেছিলেন, তা আজ বিশ্বব্যাপী প্রলয় নাচনের রূপ নিয়ে এক ক্ষুব্ধ অস্থির প্রজন্মকে প্রলুব্ধ করছে।

আসলে, সন্ত্রাসের রাজনীতি শুধু বিশেষ কোনো অঞ্চলে (মধ্যপ্রাচ্য) সীমাবদ্ধ নয়, এবং বিশেষ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (ইসলাম ধর্মাবলম্বী) একচেটিয়া হাতিয়ার নয়। এ যুগে, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব—সে নয়া-ঔপনিবেশিকতা বনাম জাতীয়তাবাদ, বা উপজাতি বনাম উপজাতি, বা জাতীয় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম-ই হোক—সমাধান খুঁজছে একমাত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে। গত কয়েক দশকে, বিশ্ব রাজনীতিতে রাষ্ট্রশক্তি, দ্বন্দ্ব-সমাধান বা Conflict-resolution-এর উপায় হিসেবে জঙ্গি দমনমূলক সন্ত্রাসের পথ-ই বেছে নিয়েছে—এবং তার প্রতিক্রিয়া রূপে বিরোধী পক্ষও সন্ত্রাসের রণকৌশলই অনুসরণ করছে। এই সন্ত্রাসের রাজনীতির বড়কর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সাম্প্রতিক কালে, এই যন্ত্রের সূত্রপাত আফগানিস্তানে ১৯৮০র দশকে—যখন সি.আই.এ ওসামা-বিন-লাদেন ও ইসলামি মৌলবাদীদের যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক শিক্ষা দিয়ে এক সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী দল তৈরি করে, আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য ও পরে, সোবিয়েত ফৌজকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে। অস্ত্রশস্ত্রের অবাধ চলাচল শুরু হয় তখন থেকে। এ সব সামরিক সরঞ্জামের চোরাই চালান ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের অগ্নিগর্ভ অঞ্চলগুলিতে—একদিকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে রাশিয়ার চেচনাই, অন্যদিকে শ্রীলংকা থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে সংগ্রামরত বিদ্রোহীরা ক্রমশই সন্ত্রাসের পথে ঝুঁকতে শুরু করল—যতই রাষ্ট্রশক্তি তাদের দাবি রাষ্ট্রসন্ত্রাসের দ্বারা অবদমিত করার চেষ্টা করেছে, সহজপ্রাপ্য অস্ত্রশস্ত্র বিদ্রোহীদের সামনে সন্ত্রাসের পথ আরও প্রশস্ত করে দিয়েছে।

শ্রীলংকায় LTTE (যারা স্বতন্ত্র তামিল রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রামরত) ও আসামের ULFA (যারা স্বাধীন অহম রাষ্ট্রের দাবিতে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত)—এ দুটি সংগঠনের চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করলে দেখা যাবে উভয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, উৎকট স্বাদেশিকতা ও অসহিষ্ণুতা-প্রসূত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের প্রবণতা। হানাহানিতে, রাষ্ট্রশক্তির সেনাবাহিনী থেকেও বেশি প্রাণ হারিয়েছে নিরীহ নাগরিক। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, এই দুটি সংগঠনই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। 'হিন্দুত্ব'র ধ্বজাধারীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার সন্ত্রাসবাদ কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের (মুসলমান) ধর্ম নয়; হিন্দুদের মধ্যেও সন্ত্রাসবাদীরা সক্রিয়। LTTE কর্তৃক সিংহলি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ হত্যা ও তদ্বিপরীতভাবে দক্ষিণপন্থী বৌদ্ধ গুণ্ডাবাহিনী দ্বারা তামিল হত্যা; অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গুজরাটে মুসলমান নিধন, আসামের ধেমাজিতে গত বছর ULFA-র বোমাবিস্ফোরণে শিশু হত্যা; লেবাননে ইজরায়েলের বোমাবর্ষণে হাজার হাজার মানুষের প্রাণসংহার; ইরাকে মার্কিনী সৈন্যদের হত্যালীলা; গুয়ান্তানমোর কারাগারে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে অবরুদ্ধ বন্দীদের উপর পাশবিক অত্যাচার—এ সবই আধুনিক রাজনৈতিক জগতে পরিব্যাপ্ত সর্বজনীন সন্ত্রাসের সদর্প আস্ফালন।

আজ আমরা ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি যেখানে রাষ্ট্রশক্তি ও তার

প্রতিপক্ষ—উভয়েরই পারস্পরিক আদান-প্রদানের একমাত্র ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্ত্রাসবাদ। গণতান্ত্রিক উপায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আপোস-মীমাংসার সুযোগ সংকুচিত হতে হতে একেবারে প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে।

(৩)

A riot is at the bottom the language of the unheard.

মার্কিন মুলুকে ষাটের দশকে, বহুযুগ ধরে অবদমিত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ যখন সহিংস বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, তখন মার্কিন লুথার কিং ওই মন্তব্যটি করেন। প্রতিবাদের আওয়াজ যখন দিনের পর দিন অবজ্ঞাত হয়, তখন একদিন আসে যখন সে আওয়াজ বাড়তে বাড়তে কর্ণবিদারক হয়ে ওঠে। আর্তনিনাদের আড়ালে প্রতিবাদের মূল কারণটা হারিয়ে যায়।

সন্ত্রাস আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এমন এক স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রায় ডাল-ভাতের মতো, যে আমরা এর গভীর কারণগুলো তলিয়ে বুঝতে চাই না। একটা সহজ সরলীকরণের নেশায় সবকিছুর জন্যই অঙ্গুলি-নির্দেশ করি পাকিস্তানের দিকে, ISI-এর প্রতি। নিঃসন্দেহে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা-সংস্থা ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক জনকল্লোলে ISI-এর জাল বিছিয়েছে, নিজেদের স্বার্থসাধনে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ের সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু সুযোগটা তারা পাচ্ছে কেন? আমাদেরই সরকারের কোনো গাফিলতির কারণে কি তরুণ প্রজন্মের এক অংশ হতাশা ও ব্যর্থতার এমন এক চূড়ান্ত পর্যায় এসে পৌঁছেছে যেখানে সন্ত্রাসের পথ ছাড়া তাদের কাছের প্রতিবাদের আর কোনো পথ খোলা নেই? সেই পুরোনো সুবিধাবাদের নীতিবাক্য—My enemy's enemy is my friend—এদের সহজেই পাকিস্তানের সামরিক শিক্ষাশিবিরের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে যদি গত কয়েক দশকের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই। যে কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এ দেশে, তাদের হিংস্র কাজকর্মের উৎস যদি খুঁজতে যাই, তাহলে দেখতে পাব তারা তৈরি হয়েছে ভারতীয় রাষ্ট্রের অনমনীয়তা ও অসহিষ্ণুতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। পাঞ্জাবে খালিস্থানি সন্ত্রাসবাদ আজ প্রায় অবলুপ্ত। কিন্তু তার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৮৪এ ব্যাপক শিখ নিধন থেকে, যে গণহত্যার অভিযুক্তদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয় তদানীন্তন কংগ্রেসি সরকার। হাজার হাজার ক্রোধান্ধ তরুণ শিখ খালিস্থানি আন্দোলনে যোগ দেয় প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে। কাশ্মীরে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ক্রমশই সন্ত্রাসের রাজনীতিতে অধঃপতিত হল আশির দশকের থেকে যখন কংগ্রেস নেতৃত্ব বিরোধী পক্ষকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা দেয় এবং সংসদীয় রাজনীতিতে আস্থা হারিয়ে ওখানকার মুসলমান যুবসম্প্রদায় সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্তানে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের রণকৌশলে পারদর্শী হয়ে কাশ্মীরে ফিরে গিয়ে এক ভয়াবহ অরাজকতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক অবস্থাটা কিছুটা ভিন্ন। মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড—এই সব অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন উপজাতি জনগণের অভাব-অভিযোগ নিরসনের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার সৈন্যবাহিনী দিয়ে তাদের ন্যায্য প্রতিবাদ অবদমনের চেষ্টা করে এসেছে।

মণিপুর ও ত্রিপুরাতে উপজাতি তরুণেরা বিভিন্ন সশস্ত্র দল গড়ে তুলেছে যারা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে লিপ্ত যা অনেক সময়ই সাম্প্রদায়িক হানাহানির রূপ নেয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে এই দুটি প্রদেশেই একদা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে উপজাতি সম্প্রদায় কৃষক আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। ১৯৪০-এর দশকে, মণিপুরে ইরাবৎ সিং এবং ত্রিপুরাতে দশরথ দেববর্মন গড়ে তুলেছিলেন জঙ্গি কৃষক সংগঠন। কমিউনিস্ট পার্টির এই বিপ্লবী ঐতিহ্য কীভাবে অবলুপ্ত হল, এবং আজ ওখানকার গরিব উপজাতি সম্প্রদায়ের তরুণেরা কমিউনিস্ট প্রভাব মুক্ত হয়ে কেন সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাবের সন্ধানে কি আবার লেনিনের কথায় ফিরে যেতে হয়? কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনো opportunist sin-এর জন্য আজ এই পরিণতি?

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সশস্ত্র দলগুলির মধ্যে নাগাল্যান্ডের Nationalist Socialist Council of Nagaland (NSCN)-এর Isaak-Muivah গোষ্ঠীর চরিত্র স্বতন্ত্র। অর্ধশতাব্দী ধরে নাগাবিদ্রোহীরা ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। সন্ত্রাসবাদের পরিবর্তে এঁরা জনসমর্থনভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল অবলম্বন করেছেন। এঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শে উগ্র জাতীয়তাবাদের বদলে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধর্মের সাযুজ্যের একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। একেত্রে চীনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আমার মনে আছে, ১৯৯২-এর গোড়ায় ব্যাংককে এক গোপন আস্তানায় NSCN-এর দুই নেতা Isaak ও Muivah-র সঙ্গে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার হয়। ওদের লড়াই-এর ইতিহাস বলতে গিয়ে Muivah বলেন—"শুরুতে আমাদের কর্মীরা চীনে যেত সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ও ফিরে আসত অস্ত্রশস্ত্রের থলি নিয়ে। কিন্তু, পরে যারা যেত তারা ফিরে আসত তাদের থলিভর্তি করে মার্কস ও মাও-এর বই নিয়ে।"

এ কথাগুলো শুনে তখন আমার চোখ খুলে গিয়েছিল। মাও-এর বহুল-প্রচারিত উদ্ধৃতি—"বন্দুকের নল-ই ক্ষমতার উৎস"—অনেক বিপ্লবী-ই আওড়ান। কিন্তু বন্দুকের নলের পিছনে যে একটা গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাজনীতি থাকা প্রয়োজন, এ কথাটা আমরা ভুলে গেছি। তাই ইরাবৎ সিং-এর মণিপুর আজ দখল করে বসেছে সন্ত্রাসবাদীরা। আর সবচেয়ে পীড়াদায়ক—সন্ত্রাসের রাজনীতি আজ এত বিস্তারশীল যে তা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতিকেও কলুষিত করছে। সম্প্রতি ছত্তিশগড়ে মাওবাদী কমিউনিস্টরা তাদের বিরোধী পক্ষ, সরকার-পুষ্ট 'সালওয়া-জুদুম'-এর আদিবাসী নারী ও শিশুদের যেভাবে হত্যা করেছে, তার থেকে সন্ত্রাসবাদী অপরাধের তফাত কোথায়?

(৪)

স্তালিন একদা বলেছিলেন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা ধূলায় ভূলুণ্ঠিত; কমিউনিস্টদের দায়িত্ব তাকে তুলে ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্তালিন নিজের উপদেশ বিস্মৃত হয়ে স্বদেশে সন্ত্রাসের একনায়কত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা কমিউনিস্টরাও সে দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়েছি। দিনের পর দিন দেখেছি মানবাধিকার, নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী

নিষ্পেষণ পদদলিত হয়েছে কাশ্মীরে, নাগাল্যান্ডে, মণিপুরে, অন্ধ্রে, ছত্তিশগড়ে। এই অনাচারের বিরুদ্ধে আমরা কোনো সংগঠিত প্রতিবাদ গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করিনি। এই অত্যাচারিত মানুষে যদি প্রতিবাদের আর কোনো গণতান্ত্রিক কর্মপন্থা না খুঁজে পেয়ে সন্ত্রাসবাদকেই শেষ অবলম্বন বলে বেছে নেয় তাহলে কি তাদের দোষ দেব, না নিজেদের দোষী করব? হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি অবাধে একের পর এক বিধ্বংসী অপকীর্তি করে গেছে গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। আমরা কমিউনিস্টরা—কী সংসদীয় কমিউনিস্ট দলগুলি, কী সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি—হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের এই আগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে না তুলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছি। আমার মনে আছে, আদবানী যখন অযোধ্যায় রামমন্দির বানাবার জিগির তুলে রথযাত্রা শুরু করছে, তখন আমি এক সি. পি. আই (এম. এল)-এর নেতাকে বলেছিলাম—"আপনাদের তো জনসমর্থন আছে, সশস্ত্র স্কোয়াডও আছে। আদবানীর এই মারাত্মক অভিযাত্রাকে বাধা দিয়ে বন্ধ করতে পারছেন না?" ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন—"আসলে জানেন কী? এইসব ধর্মীয় স্পর্শকাতর 'ইস্যু'তে সবাইকে জড়ো করা যায় না, যত সহজে অর্থনৈতিক দাবির পিছনে করা যায়।" তারপর আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন—"তাছাড়া, সরকারি প্রশাসন (তখন কংগ্রেসি আমল) বাড়াবাড়ি হতে দেবে না।"

অপ্রতিহত সেই রথযাত্রার ফল কী হয়েছিল শেষে, তা আমরা আজ সবাই জানি। বাবরি মসজিদ ধ্বংসও আমরা প্রতিহত করতে পারলাম না, এবং তারপরেও যে মুসলমান জনসাধারণ হিন্দু ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর বিজয়োৎসবের বলি হল, তাদেরও আমরা রক্ষা করতে পারলাম না। ১৯৯২-৯৩-এর গণহত্যা অভিযানের শেষে যারা বেঁচে রইল, তাদের তরুণ প্রজন্ম ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় ব্যর্থ হয়ে প্রতিবাদের অন্য পন্থার খোঁজে মরিয়া হল। তাদের ন্যায্য অভিযোগ ও দাবি নিয়ে কমিউনিস্টরা এক ব্যাপক ধর্মনিরপেক্ষ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু কোনো কমিউনিস্ট পার্টিই এই হতাশ ও বেপরোয়া মানুষগুলির পাশে এসে দাঁড়াল না। এদের কাছে আর কী উপায় ছিল—সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে তাদের প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করা ছাড়া?

সন্ত্রাসবাদের একটা নিজস্ব গতিশীলতা আছে যা এক অবশ্যম্ভাবী পরিণামে শেষ হয়। যে আরম্ভকারী, তার প্রারম্ভিক ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে এক স্বায়ত্ব শক্তি হিসেবে সন্ত্রাসবাদ লক্ষ্যবিহীন হয়ে ছুটে চলে। এই নিয়ন্ত্রণ-অসাধ্য ক্ষেপণাস্ত্রের চালকেরাও অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদীরা—কিছুকাল পরে ইচ্ছাশক্তিবিহীন যান্ত্রিক অংশবিশেষে পরিণত হয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের ভাড়াটে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অবিকল প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রতিপক্ষ এইসব রাষ্ট্রবিরোধী বিদ্রোহীরা।

পরম্পরাগত এই বিদ্রোহী প্রজন্মের দল কি বারবার 'উন্মাদ হয়ে ছুটে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে যন্ত্রণায়' মরবে? অতীতের ও বর্তমানের 'সুবিধাবাদের পাপের' প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কি এখনও উপলব্ধি করবেন না সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতারা?

'নিয়তির অভিসারে', ষাট বছর : ফিরে দেখা

(রাজনীতির অ-বাম পর্ব)

বাসব সরকার

২০০৬ সাল। এই ১৫ আগস্ট শুরু হয়েছে স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তী বছর। ষাট বছর আগেওই দিনে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল মধ্যরাতে সংসদে তাঁর ঐতিহাসিক 'ট্রিস্ট উইথ্ ডেস্টিনি' ভাষণ দিয়েছিলেন। নিয়তির অভিসারে এই দেশ ও তার কোটি কোটি মানুষ যে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল, সেখানে পথের দিশা নির্ণয়ে অন্তত কয়েকটা নির্ভর করার মতো ভিত্তি ছিল, যেমন গণতন্ত্র, সর্বজনীন ভোটাধিকার। তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরো কিছু ধারণা, যাদের ব্যবহারিক রূপ অদেখা থাকলেও নামের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ছিল মানুষের। তাদের মধ্যে বিশেষ করে বলা যায় প্রজাতন্ত্র, সার্বভৌমিকত্ব ও যুক্তরাষ্ট্রের কথা। ভাষণে জহরলাল এই বিষয়গুলির দিকে আমজনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন মধ্যরাতে যখন সারা দুনিয়া সুষুপ্তি মগ্ন, তখনই ভারত জেগে উঠছে স্বাধীনতার নতুন প্রভাতে। সকালে লালকেল্লার দুর্গপ্রাকার থেকে জাতির উদ্দেশ্যে জহরলাল এই লক্ষ্যমাত্রাগুলির দ্রুত রূপায়ণে দৃঢ় সংকল্পের কথাও ঘোষণা করেন। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ভারতের যে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান চালু করা হয় এইসব লক্ষ্যমাত্রা তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আগামীর পথে জাতির কর্মকাণ্ডের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়।

১

এই ভাষণের পর ছয় দশকের শেষে এটা দেখার চেষ্টা স্বাভাবিক আমরা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। সালতামামি না বলে একে যুগতামামি বলাই বোধহয় ঠিক। সালতামামিতে যেমন বছর শেষের হিসেব নিকেশ করে দেখার চেষ্টা হয় কাজে লাভ লোকসানের অঙ্কে চেহারাটা কেমন, যুগতামামি তাই একটা যুগ বা সময় বিশেষে কয়েকটি যুগের খতিয়ান হাজির করে। সেই হিসেবের মধ্যে ঢোকার আগে বলা দরকার যে ধারণা বা ভিত্তির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম দুটি ভোটাধিকার ও গণতন্ত্রের ধারণা স্বাধীনতা আন্দোলন চলা কালেই দেশে কিছু কিছু গড়ে উঠতে থাকে। ১৯০৯ ও ১৯১৯ এর শাসন সংস্কার আমজনতার একটা সংকীর্ণ অংশে হলেও ভোটের ব্যাপারটার আভাস দেয়। যারা সেই ভোটাধিকার পেয়েছে এবং যারা পায়নি তাদের মধ্যে ফারাক কেন, সেসব কথা অর্থশাস্ত্রের 'পারকোলেশন' তত্ত্বের মতোই আমজনতার চেতনায় জমা হয়।

মহাত্মা গান্ধীর গণরাজনীতির যুগে ভোটাধিকার কেন প্রসারিত হবে না তাকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্রের চেতনাও ছড়ায়। তখন যেহেতু জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক দাবি বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস পাওয়াটাই চরম প্রাপ্তি বলে মনে করেছে, ফলে নির্বাচন, ডোমিনিয়ন পার্লামেন্ট, একটা সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দেশের শিক্ষিত

ও সচেতন মানুষের মধ্যে আলোচনাও শুরু হয়েছিল। তার বাইরে আমজনতার বৃহত্তম অংশ যারা গান্ধির ডাকে আন্দোলন করেছে তারা অধিকাংশই নেতাদের প্রতি গভীর আস্থায় তাদের অনুসরণ করেছে। রাজনৈতিক সক্রিয়তা যে স্তরে থাকলে জনগণের পক্ষে সীমিত শিক্ষার (অ্যাকাডেমিক অর্থে) ভিত্তিতেও রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করা সম্ভব এদেশের বেশির ভাগ মানুষের পক্ষেই সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বৃটিশ শাসিত প্রদেশগুলিতে আপেক্ষিক ভাবে সাধারণ মানুষ কিছুটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাছাকাছি আসতে পারলেও, দেশের যে এক তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করতো দেশীয় রাজ্যগুলিতে সামন্ত-স্বৈরাচারের অধীনে তাদের কাছে রাজনৈতিক জীবন ছিল অনুগ্রহের বিষয়। ইতিহাসগত ভাবে এটাও বলা দরকার দেশের বিভিন্ন প্রদেশে যেখানে অসহযোগ, আইন অমান্য এবং তারপর রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে সেই ১৯৩০-এর দশকে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেসের সমান্তরালভাবে স্টেটস্ পিপল্স্ কংগ্রেস আন্দোলনের হাতে খড়ি শুরু করেছে। এমনকি ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট দেশীয় রাজ্যগুলি ক্ষমতা হস্তান্তরের দৌলতে স্বাধীনতার সুপ্রভাতে জেগে উঠবে কিনা, সেটাও ছিল বিতর্ক ও অনিশ্চয়তায় ভরা। এতোটা বিস্তারিতভাবে এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করার কারণ হলো রাজনৈতিক চেতনার মানে আশমানজমীন ফারাক থাকার জন্যেই সর্বজনীন ভোটাধিকার দূরস্থান ভোট বিষয়ে দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের কোনও ধারণা ছিলনা।

এই পরিবেশে গণতন্ত্র কথাটার অর্থ আরো ঘোলাটে হতে বাধ্য। কিন্তু শাসকদের স্বৈরাচার ও শোষণের জ্বালায় মানুষ মরীয়া হয়ে উঠলে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা তারা মানুষ হিসেবেই ভাবতে বাধ্য। অর্থাৎ তাদের বদলে এমন কারো, কিম্বা অনেকের ক্ষমতা তারা কাঙ্খিত মনে করেছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে ১৯৩৭-৪৭ কালপর্বে যেসব গবেষণা পরবর্তীকালে হয়েছে সেখানে গণতন্ত্রের কথাটা মাঝে মাঝেই উঠেছে। সেই গণতন্ত্র কায়েম করার জন্যে যে ব্যবহারিক দিক ছিল, যাকে গণতন্ত্রের হাতিয়ার বলে, তার ধারণা আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত পরিণত স্তর ছাড়া গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধি তিরিশের দশকের শেষে গুজরাটের অন্যতম দেশীয় রাজ্য রাজকোটে যে সত্যাগ্রহ করেন, রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের দিক থেকে সেখানেও উন্নততর কোন মান কায়েম করতে চাননি কিম্বা পারেননি।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে যাঁরা অতি বিশিষ্ট কনস্টিটিউশনালিস্ট নেতা ছিলেন তাঁরাও ভারতে ১৯২০র দশকের শেষ দিকেই সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের পর্বে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের ধারণা ও বক্তব্য বিস্তৃত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ঘটনা হিসেবে উল্লেখ্য ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাপর্বে গান্ধি ও মহম্মদ আলি জিন্নার মধ্যে মতভেদের অন্যতম কারণ ছিল জনগণের ভূমিকা। কনস্টিটিউশনাল রাজনীতিতে নিবেদিতপ্রাণ জিন্না মেনে নিতে পারেননি যে অজ্ঞ ও নিরক্ষর সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণে মাথা গুণতি রায় ছাড়া আর বেশি কিছু দিতে পারে। গান্ধি-জিন্না বিচ্ছেদ তখনই ঘটে এবং জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন।

ভারতে গণচেতনায় ভোটাধিকার প্রয়োগ বলতে সঠিকভাবে কি বোঝায় সেই ধারণা

ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত অস্পষ্ট ও অপরিণত ছিল। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা বিশেষ কিছু নেই। উপরন্তু এই ভোটাধিকার ঠিক কারা পাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর সব অংশ পাবে কিনা, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, নারী ও পুরুষ এবং সর্বোপরি নানা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমান অর্থাৎ সব সংখ্যালঘু এবং দলিত ও আদিবাসীরা, নানা উপজাতি সমান ভোটাধিকার তথা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ভোগে সমতা ভোগ করবে কিনা, এসব বিষয়ে প্রকৃত সহমত গড়ে তোলার সচেতন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই আলোচকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো ১৯৪৬ সালে ইংরাজ শাসনে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রিয় স্তরে শেষ যে নির্বাচন হয়, সেখানে আইন মোতাবেক মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষ, শিক্ষা ও সম্পত্তির যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার পেয়েছিল। আর সেই অধিকার প্রয়োগ করেছিল মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ। তার জন্যে জাতীয় নেতৃত্বের একাংশ ছাড়া অন্যদের যে বিশেষ দুঃখবোধের কারণ ঘটেছিল তেমন কথাও বলা যাবে না। অথচ মহাত্মা গান্ধি সেই অসহযোগের সময় থেকে 'স্বরাজ ফর নাইনটি এইট পারসেন্টের' কথা বলে এসেছেন, যারা সেই অধিকার পায়নি তাদের মনে যে গভীর ব্যর্থতা ও হতাশা কাজ করেছে তারও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। এক কথায় বলা যায় ভোটাধিকারের মন্থর বিকাশ যতোটা তাত্ত্বিক আলোচনার স্তরে আবদ্ধ ছিল রাজনীতির প্রয়োগিক ক্ষেত্রে তেমনটা ছিল না। এমন মনে করাও হয়তো ভুল নয় যে, অচিরে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা রাজনীতি সচেতন মানুষদের এই সান্ত্বনা দিয়েছিল দেশ স্বাধীন হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।

এই প্রেক্ষিতগত আলোচনায় আর দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে দেড়শ বছরের বেশি সময় ধরে। ভোটাধিকার, দলপ্রথা, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন সবই সেখানে এগিয়েছে ধাপে ধাপে। এক ধাক্কায় পুরানো জমানার সমগ্র কাঠামো ভেঙে তৈরি গণতন্ত্র কায়েম হয়নি। তার জন্যে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা, অনেক সংগ্রাম দরকার হয়েছিল। সেই সব দেশে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্রের রূপ বলতে ঠিক কি বোঝায় সাধারণ মানুষ দূরে থাক তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মাথাতেও ছিল না। তাছাড়া বিভিন্ন দেশ নিজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মান অনুযায়ী গণতন্ত্রের সেই-কাঠামোতেও অনেক প্রাসঙ্গিক রদবদল করে। দ্বিতীয়তঃ ইংল্যান্ডেও সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিমণ্ডল থেকে তার নারী সমাজকেও বঞ্চিত রেখেছিল ১৯২৮ সাল পর্যন্ত। সাফ্রেজিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসেও তার ক্রমবিকাশের স্তর পরম্পরা ধরা আছে। ১৯ শতকের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার চাই। ভারতে গণতন্ত্র, ভোটাধিকারের ইতিহাসে এসবের কোনটাই প্রায় দেখা যায় না। ১৯ শতকের কাউন্সিল আইন আর স্থানীয় শাসনের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু শতাব্দীর শেষ দুই দশকে। তারপর ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার, ১৯১৯ এর মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন হয়ে দেশ এসে পড়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের মুখোমুখি। তখন বৃটেনের পক্ষ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে তাড়া এসে পড়ছে ক্রমাগত। ইংরাজদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার চূড়ান্ত দিন ঘোষণা হয়ে গেছে ৩০ জুন, ১৯৪৮।

সুতরাং যে ভোটাধিকার ভিত্তিক গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রদেশে গড়তে হবে, তার গুণ ও মান নিয়ে জনগণের নানা স্তরে খুঁটিয়ে আলাপ আলোচনা, সমস্যা কোথায়, সমাধান কি তার পূর্ণাঙ্গ ধারণা ছাড়াই স্বাধীনতা এসে যায় ১৫ আগস্ট ১৯৪৭। পরাধীন দেশের পক্ষে রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পাওয়া এমন এক অভিজ্ঞতা, যার জন্যে কি মূল্য মানুষকে দিতে হয়েছে, কতো রক্ত, কতো হানাহানি, কতো কান্না বুকে চেপে মানুষ সেদিন নিয়তির অভিসারে বের হয়েছিল, ষাট বছর পরে তার একটা মূল্যায়ন এদেশের মানুষের নিজের স্বার্থেই জরুরী। সেদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেবল একটা শিক্ষাই মানুষ গ্রহণ করেছিল ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে আর কোথাও মান্যতা দেওয়া হবে না। সেকুলার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতিতে নানা জায়গায় ঘাটতি থেকে গেলেও এদেশের মানুষ এই একটা বিষয়কে নিজেদের যাপিত জীবনের অঙ্গ করে তুলেছিল যে, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ—নো পাসারান। উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাতে গান্ধির নিধন এই প্রত্যয়কে বদ্ধমূল করে।

২

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ছিল দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রয়োগের প্রস্তুতিপর্ব। রচিত হলো দেশের সংবিধান, দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো এবং অসংখ্য খুঁটিনাটি ভরা জটিল একটা দলিল। তার অঙ্গসজ্জার জন্যে নাগরিকের মৌলিক অধিকার, শাসননীতির নির্দেশাবলী, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থাসহ আরো নানা বিষয়ে গৃহীত হয় যাতে গণপরিষদের আন্তরিকতার নানা পরিচয় আছে। কিন্তু দেশশাসনের যে কাঠামোগত ব্যবস্থা, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে প্রতিটি দেশের স্বকীয়তা, সেখানে গণপরিষদ বেশি ধ্যান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। গণপরিষদের প্রথম দিনে, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬, জহরলালের 'অবজেকটিভস্, রেজোলিউশন' পেশ এবং সেটা গৃহীত হওয়ার পর সংবিধান নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা চলে। সেই সব আলোচনায় বড়ো মাপের নেতারা ছাড়া আর যাঁরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত লীগ নেতা তমিজুদ্দিন খান এবং সভার একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য সোমনাথ লাহিড়ি। তারপর পরিষদের কাজ মুলতুবী হয়ে যায়। ১৯৪৭-এর শেষ থেকে ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ পর্যন্ত চলে পরিষদ তার কাজ শেষ করে এবং শেষ দিনেই সংবিধান গৃহীত ও বিধিবদ্ধ হয় আর চালু হয় ঠিক দু'মাস পর। এতো বড়ো, জটিল খুঁটিনাটি ভরা সংবিধান রচনার জন্যে যে সময় দেওয়া দরকার, মাত্র দু'বছর সময় তার পক্ষে কিছুই নয়।

তাই নেতারা গোড়া থেকেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেন, যেমন প্রথম, শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো নতুনভাবে রচনা না করে বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কিছু প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন ঘটিয়ে, তাঁদের ভাষায় 'কনসিকোয়েন্সিয়াল চেঞ্জেস' করে, অর্থাৎ সেটাই একটু হেরফের করে যথাপূর্ব বজায় রাখা হবে। এখানে বলার কথা হলো বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ পাশ করেছিল এদেশে তার উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে, ভারতীয়দের স্বাধীন, গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটানোর

জন্যে নয়। তারই কন্‌সিকোয়েন্‌শিয়াল পরিবর্তন এদেশের কতোটা পরিবর্তন আনবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে স্বাধীনতার প্রাথমিক উচ্ছ্বাসে সেই সব প্রশ্ন চাপা পড়ে যায়। আর দ্বিতীয়, সংবিধানের ধারা উপধারা পাশ করাতে আইনসভায় বিল পাশের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। তার অর্থ ছিল সবটাই একান্ত আইনের দৃষ্টিতে দেখা। অনুমান করা যায় বড়ো নেতারা প্রায় সবাই যেহেতু শিক্ষায় ছিলেন বিলাত ফেরৎ ব্যারিস্টার, তাই আইনী বিচার তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। চোস্ত্‌ ইংরেজিতে বৃটিশ কনস্টিটিউশনাল ল' নিয়ে তর্ক যে মূলতঃ নিরক্ষর দেশবাসীর মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে, সেটা ততোটা খেয়ালে রাখা হয়নি। তাঁরা অনেকেই জনগণের 'ন্যাচারাল লীডার' ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সংবিধান তো লীডারদের জন্যে নয়, 'লেড'দের জন্যে। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটে যায় নেতৃত্বের উপর আমজনতার অনুমিত আস্থার ভিত্তিতে।

জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল দেশের উদার বুর্জোয়াশ্রেণী। উপনিবেশিক ভারতের বহু শতকের অনগ্রসরতা, কুসংস্কার ভেঙে বেরিয়ে আসার একটা রাজনৈতিক সাংবিধানিক নকশা ফুটে ওঠে এবং সংবিধানে। এই উদার বুর্জোয়া নেতৃত্বের কোন কোন অংশের সঙ্গে সামন্ত কায়েমী স্বার্থের যোগ ছিলনা, সেকথা বলা যাবে না। তবে তারা কোনো দিনই আর দেশপরিচালনায় নিয়ামকের ভূমিকায় আসতে পারেনি। উদার বুর্জোয়া নেতৃত্বের র‍্যাডিকাল অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন জহরলাল। সংবিধানের প্রস্তাবনায় তারই বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়। তার অন্যতম প্রমাণ হলো বিলাতের বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী র‍্যাডিকাল লিবারেল চিন্তাবিদ অধ্যাপক আর্নস্ট বার্কারের একটা মন্তব্যে। তাঁর জীবনের শেষ গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার পূর্ণ বয়ান উদ্ধৃত করে লেখেন এটাই হলো তাঁর দীর্ঘজীবনের চিন্তাভাবনা ও মতাদর্শের নির্যাস। এই গ্রন্থের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে তিনি লিখেছিলেন : 'The core of democracy is choice and not what is chosen.' প্রথম থেকেই সংবিধান যে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা চালু করে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে, সেখানে গোড়া থেকেই এই ২০০৬ সাল পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ভারতের সঙ্গে, কিছুটা আগে পরে তৃতীয় দুনিয়ার যেসব দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সংগ্রাম রাষ্ট্রিক পরিণতি লাভ করেছিল, তারা সবাই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পথ অঙ্গীকার করেছিল। তারা কেউই শেষ পর্যন্ত তাকে বজায় রাখতে পারেনি।

সংবিধান চালু করার মাত্র ছয় সপ্তাহ পরে কেন্দ্রিয় সরকার মন্ত্রিসভার বৈঠকে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেটা হলো দেশের অগ্রগতি ঘটাতে হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের পথ ধরে। গঠন করা হলো পরিকল্পনা কমিশন, সভাপতি প্রধানমন্ত্রী জহরলাল। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন যে অচিরে মন্ত্রিসভার সমান ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবে তার আভাস প্রথম থেকেই ছিল। দেশে সেটাই শুরু সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা কেন্দ্রের। উল্লেখ্য সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালে যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়েছিল জহরলালকে তারও সভাপতি মনোনীত করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। তখন রাষ্ট্রক্ষমতা ইংরাজদের হাতে। এমন কি কংগ্রেস একা বা অন্যদলের সহযোগে কেন্দ্রিয় সরকারের

পরিচালন ক্ষমতাও ভোগ করতো না। তার সুপারিশ কাগজে কলমেই থেকে যায়। এই প্রথম রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক রূপান্তরের পরিবেশ সৃষ্টি কার্যকর সুযোগ আসে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হয় ১৯৫১তে। তার মূল জোর ছিল কৃষির বিকাশ ঘটিয়ে আমজনতার খাদ্যের অভাব পূরণ করা। এটাও অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল ঠিকই কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের পথ নয়। সেই কাজ শুরু হয়, ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকে, যার লক্ষ্য ছিল শিল্পায়ন। সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের প্রস্তাবিত শিল্পায়ন মডেল ছিল তার মর্মবস্তু, যেখানে সরকারের ভূমিকা হবে নিয়ামকের। ১৯৯১ সালে বিশ্বায়নের যুগে এই শিল্পায়ন মডেল সোভিয়েত অনুসারী বলে জহরলালের কঠোর সমালোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার তিরিশের দশকের শেষে সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল যখন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে বিকাশের প্রথম ছক রচনার চেষ্টা করেন, তখন তাঁরা দুজনেই সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপুল সাফল্য দেখেই এদেশে তার রূপায়ণ জরুরী মনে করেছিলেন।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রজাতান্ত্রিকতা সম্পর্কে আমজনতার কোনও ধারণা ছিল না। ইংরাজ শাসনে নির্বাচন, স্থানীয় শাসন, প্রাদেশিক স্তরে দ্বৈত শাসন, পরে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ইত্যাদির সঙ্গে মানুষ স্বাধীনতার আগের পঞ্চাশ বছরে কিছুটা পরিচিত হয়। কিন্তু দেশ পরিচালনার একচেটিয়া ক্ষমতা আছে কেন্দ্রে বড়লাটের হাতে, তার ব্যবহারিক বিকল্পের সঙ্গে পরিচয়ের কোন সুযোগ আসেনি। ১৯৩৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কেবল প্রস্তাব আকারে এসেছিল। নেতারা ও বিভিন্ন স্বার্থযুক্ত মহল একমত হতে না পারায় সেটা অপ্রযোজ্য থেকে যায়। তাই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা সংবিধান চালু হওয়ার পর আনকোরা নতুন বিষয় হয়ে আসে।

আর প্রজাতান্ত্রিকতার বিষয়টা ছিল ভারতীয় মন মেজাজের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একটা চিন্তা। এখানে উত্তরাধিকারসূত্রে সব কিছু পাওয়াটাই মানুষের অভ্যাস, তা সে ধনসম্পত্তি কিম্বা ক্ষমতা যাই হোক না কেন। ক্ষমতা যে বংশানুক্রমিক নয়, তার উৎস যে মানুষ, তারাই সব ক্ষমতার মালিক, পশ্চিমী দেশগুলি অনেক সংগ্রাম, অনেক রক্তের বিনিময়ে সেই সত্য কায়েম করেছে। ভারতে সংবিধান বিনামূল্যে সেই অধিকার মানুষকে দেওয়ার উদ্যোগ করলেও তা গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি মানুষের ছিল না। মৌলিক অধিকার সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা যায়।

৩

পার্লামেন্টারী শাসন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রথম পরীক্ষা শুরু হয় ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে। নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হওয়ার সর্বজনীন অধিকার সেই প্রথম প্রয়োগ করে মানুষ। নির্বাচনে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। সেটা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক রাজ্যেই একটা প্রতিবাদী বিরোধী শক্তিরও উদ্ভব হয়। স্বাধীনতার মাত্র পাঁচ বছর পরে শাসক দলের নীতি ও কাজের সমালোচনায়

রাজনৈতিক বিরোধিতার উদ্ভব সেই পর্যায়ে কেবল সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজন করতে চেয়েছিল। সেটা বিকল্প সন্ধানী ছিল না। তবে বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষত পশ্চিম বাংলা, অবিভক্ত মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশসহ আরো কয়েকটি অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টিও অন্যান্য কিছু বামপন্থী দল মাথা চাড়া দেয়। বামপন্থী বিরোধীদের একটা অংশ ছিল যেমন কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি যাদের সঙ্গে ১৯৪৮ সালে কংগ্রেসের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তেমনই কিছু পুরানো কংগ্রেস নেতা যাঁরা জাতীয় আন্দোলন গান্ধি, জহরলাল, প্যাটেলের সহযোগী ছিলেন। আঞ্চলিকতাবাদী নানা দাবি, ভাবাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি যেমন ঝাড়খণ্ড, স্বতন্ত্র অন্ধ্ররাজ্য, পাঞ্জাবী সুবা গঠনের দাবি এই সময়েই যথেষ্ট জোরালো হয়ে ওঠে এবং তেলেগুভাষী অন্ধ্ররাজ্যের প্রতিষ্ঠাও হয়।

এই সবই ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রবণতার প্রাথমিক বিকাশের চিহ্ন। পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়ে রাজ্যসমূহের বক্তব্য তুলে ধরার তাগিদও অনুভূত হয় বিশেষতঃ পরিকল্পনা কমিশনের কাজের প্রেক্ষিতে। একেই কেন্দ্রপ্রধান শাসনব্যবস্থা গঠনের প্রতি কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সুস্পষ্ট পক্ষপাত যেখানে রাজ্যগুলিকে রাজনৈতিক দিক থেকে কেন্দ্রের এজেন্টে পরিণত করেছিল, সেখানে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও দিল্লিতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় নানা স্তরেই আশংকা দেখা দেয়। কেন্দ্র ও রাজ্যে কংগ্রেসের দলীয় সরকার, জহরলালের মতো নেতার অসাধারণ ক্যারিসমা এবং দলীয় নীতি ও কর্মসূচি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা এমন একটা পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিল যেখানে রাজ্য নেতৃত্ব ও তাদের সরকারের স্বাতন্ত্র্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। তাই অন্ততঃ একটা জায়গায় রাজ্যগুলি নিজেদের মতামত অকুণ্ঠভাবে প্রকাশের দাবি জানায়। সেটা হলো পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করার আগে রাজ্যসমূহের সামগ্রিক অনুমোদন চাই। এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় জাতীয় উন্নয়ন পর্ষৎ, যা কমিশনের একচেটিয়া ক্ষমতার রাশ কিছুটা টেনে ধরতে চায়।

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি যখন প্রথম অর্থকমিশন গঠিত হয় তখনই রাজ্যসমূহের মধ্যে কেন্দ্রিয় রাজস্বের বন্টনযোগ্য অংশের ভাগ কোন রাজ্য কতো শতাংশ হারে পাবে সেটাকে কেন্দ্র করেই দেশের অসম বিকাশের সমস্যা তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। আঞ্চলিক বৈষম্য যে এতো প্রবল, সেটা দূর করার জন্যে সহমতের ভিত্তিতে কোনো উদ্যোগ নেওয়া না হলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে স্বার্থদ্বন্দ্ব যে সংকট সৃষ্টি করতে পারে, সেই সমস্যার আভাসও তখন থেকেই পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক ক্ষমতার তারতম্য যে রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ভূমিকাকে, বিশেষতঃ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে তার অবস্থান দুর্বল করতে পারে সেই আশংকাও তখনই দেখা দেয়। ভারতের বিকাশমান যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর অর্থনৈতিক চাপ তখন থেকেই পড়তে শুরু করে যা ১৯৬০-এর দশকে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের তাগিদ সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে এই তাগিদ মূলতঃ অর্থনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ১৯৫০-এর দশকের শেষ থেকে যতোদিন গিয়েছে ততোই সেখানে রাজনৈতিক তাগিদের প্রাধান্য বাড়ে।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে দেশের পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা প্রমাণ করে দেয় যে শাসক কংগ্রেস দলের একচেটিয়া রাজনৈতিক প্রাধান্য কোনো চিরকালীন বিষয় নয়। কেরল ছাড়া অন্যান্য

রাজ্যে এবং লোকসভায় কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেলেও প্রায় সর্বত্র তার আসন সংখ্যা এবং প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ হার কমে। কেরলে দেশের প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন সরকার কায়েম হয়, পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্টরা সরকারীভাবে বিরোধীপক্ষের স্বীকৃতি পায় এবং অন্যত্র কমিউনিস্টসহ অন্যান্য বামপন্থীদের আমজনতার কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। পশ্চিম বাংলায় এই সময় থেকেই বিকল্প সরকার গঠনের শ্লোগান ওঠে। ২৭ মাস পরে ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করে কেরলের কমিউনিস্ট সরকারকে অপসারিত করা হয়। এই রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর প্রবণতা এরপর থেকে ক্রমাগত বাড়তে থাকে, এবং যে কোনো অজুহাতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করা প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়। তারই নীট ফল হলো কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই ক্ষমতা প্রয়োগে যতোটুকু সংযতভাব দেখায়, ১৯৬৭-র পরে তা যেন সীমাহীন অসংযমে পরিণত হয়।

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই বামপন্থীদের সমালোচনায় একটা কথা প্রায়ই উঠতে থাকে যে শাসকদল কোন ধরনের সমাজ কায়েম করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে এই দাবির ভিত্তিতে দীর্ঘদিন জনসমর্থন পাওয়া কিম্বা ধরে রাখা যায় না। তাছাড়া নিরঙ্কুশ ক্ষমতা শাসকদলের মধ্যেও নানা স্বার্থদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এদের প্রকোপ থেকে দলকে বাঁচানোর তাগিদে একটা মতাদর্শগত লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরা দরকার হয়ে পড়ে। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনে তাই 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের' কথা বলা হয়। তার আবেদন মোটেই জোরালো ছিল না। কয়েক বছরের মধ্যে তার সঙ্গে যুক্ত হয় গান্ধির ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্ব—পঞ্চায়েতী রাজব্যবস্থা। কংগ্রেসের রাজ্যস্তরের নেতারা পঞ্চায়েতী রাজের বিকেন্দ্রিত ক্ষমতায় আদৌ বিশ্বাসী ছিল না। তাই কেন্দ্রের প্রভূত পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এই প্রকল্প মার খেয়ে যায়।

দেশে কেন্দ্রিয় সরকারের গড়নে, নীতি নির্ণয় ও রূপায়ণে উত্তর ভারতের প্রাধান্য ততোদিন রীতিমতো বেড়ে যায়। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধূমায়িত হচ্ছিল। এহেন সময়ে ডি এম কে-র নেতৃত্বে দ্রাবিড় জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। একটা সময় তামিলভাষীরা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃহত্তর তামিলরাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্বভারতের সঙ্গে দিল্লির ভৌগোলিক দূরত্ব এবং কেন্দ্রের হিন্দি বলয় কেন্দ্রিক রাজনীতি সেখানে পঞ্চাশের দশকের সুরু থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা গড়ে তুলেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয় দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদী প্রবণতা। আর ধর্ম থেকে ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশে প্রতিকূলতা ও চাপা অসন্তোষ ছিল। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয় জাতীয় নেতৃত্ব ভারতে জাতীয়তাবাদ জয়ী হয়েছে বলে জাতি গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করতেন, সেই ধরনের আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। তারই চূড়ান্ত স্বীকৃতি আসে ১৯৬১ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জহরলাল দেশের সমস্ত দল, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী নিয়ে জাতীয় সংহতি সম্মেলন আহ্বান করেন। সমগ্র দক্ষিণ ভারত যে 'হিন্দ্ হিন্দি, হিন্দু' মানসিকতার দাপটে চিন্তিত, এটা ছিল তারই স্বীকৃতি।

অন্য নানা ক্ষেত্রে মতভেদ, বিরোধ যাই থাক না কেন স্বাধীনতার প্রায় সূচনা থেকে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে একটা ব্যাপক ঐক্যমত্য দেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। আন্তর্জাতিক বিষয়ে স্বাধীনতার ঠিক পরেই জহরলাল একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী হিসেবে 'নিউট্রালিজম' বা নিরপেক্ষবাদের রাজনীতি গ্রহণ করেন। তখনই এবং ১৯৪৯ সালে জীবনে প্রথম মার্কিন সফরে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে স্পষ্ট করে দেন যে এই নিরপেক্ষতা সুইজারল্যান্ড বা অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতার সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ 'যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন, ন্যায়বিচার লঙ্ঘিত, কিম্বা যেখানে আগ্রাসন ঘটেছে, সেখানে ভারত নিরপেক্ষ থাকতে পারে না এবং থাকবে না।' দুনিয়ার ঠাণ্ডাযুদ্ধের নায়ক রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের উপস্থিতিতে এই বক্তব্য তাঁর প্রবল অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। জহরলাল তাঁর নিরপেক্ষবাদকে বলতেন 'ডায়নামিক নিউট্রালিজম'। মার্কিন সরকারের দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধজোট গঠন নীতি ১৯৫৪ সালে যখন এশিয়ায় ছড়ায়, সিয়াটো জোট গঠন করে পাকিস্তানকে তার সদস্য করা হয়, তখন ভারতকেও প্রবল চাপ দিয়ে তার সদস্য করার চেষ্টা হয়। জহরলাল সেই চাপ প্রতিহত করে ভারতের অবস্থানকে বলেন জোটনিরপেক্ষতা।

ভারতের নীতি ছিল সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে জাতীয় স্বার্থে সব রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপন। সেই সময়ই দেশের বিদেশ নীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়, প্রথমে হিন্দি-চিনি এবং পরে হিন্দি-রুশী ভাই-ভাই সম্পর্ক। প্রথমটি নিতান্তই স্বল্পস্থায়ী হয়, যার মেয়াদ দশ বছরেরও কম; আর দ্বিতীয়টি পঞ্চাশ বছর পরে আজো অক্ষুণ্ণ আছে। প্রথমটির ভিত্তি ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 'পঞ্চশীল' নীতি। কিন্তু লাদাকে আকসাই চীন অঞ্চলে চীনের রাস্তা নির্মাণ, দলাই লামার তিব্বত ছেড়ে সদলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ, এবং ম্যাকমেহন লাইন এই বন্ধুতাকে তলানিতে নিয়ে আসে। ১৯৬২ সালে ২০ অক্টোবর চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধে তার চূড়ান্ত ব্যর্থতা। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলন থেকে ১৯৬১ সালে প্রথম জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, যাকে বলা হয় বান্দুং থেকে বেলগ্রেড পর্ব, সেটাই ছিল রাষ্ট্র হিসেবে ভারত, তার অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ নীতি এবং জহরলালের সর্বজন স্বীকৃত 'ফাইনেস্ট আওয়ার'।

৪

চীন ম্যাকমেহন লাইন পেরিয়ে ভারতে ঢোকে, অসমের তেজপুর পর্যন্ত দখল করে এবং একমাস পরে ২০ নভেম্বর দখল ছেড়ে চলে যায়। ভারতের অবমাননা চরমে ওঠে। জহরলাল বলেছিলেন 'India shall never be the same again.' বাস্তবিকই ভারত আর আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারেনি। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ দেখা দেয়। নেহরুর কর্তৃত্বের দারুণ অবক্ষয় ঘটে। জহরলাল তারপর আর দেড় বছর বেঁচে ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে এবং বাইরে বিশেষতঃ রাজাজীর স্বতন্ত্র পার্টি নেহরুর অপসারণ দাবী করে। পরাজয়ের দায় স্বীকার করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন পদত্যাগ করেন। এই যুদ্ধের কারণ নিয়ে প্রবল মতভেদ আছে, যে আলোচনা এখানে করা যাবে না। তখনই জোটনিরপেক্ষ

বিদেশ নীতি ছেড়ে মার্কিন যুদ্ধজোটে যোগ দেওয়ার জন্যে প্রবল চাপ আসে। আইয়ুব খানের পাকিস্তানও তার সঙ্গে গলা মেলায়। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'Unarmed Victory' বইয়ে চীনের সঙ্গে অবনিবনার দায় ভারতের বলে মন্তব্য করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই প্রেক্ষিতে মতাদর্শগত বিরোধ প্রকাশ্যেই ফুলে ওঠে।

১৯৬৩ সালেও নেহরুর অর্থনৈতিক নীতি প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে। আগস্ট মাসে লোকসভায় রামমনোহর লোহিয়ার উদ্যোগে শুরু হয় দেশে দারিদ্র্য সংক্রান্ত বিতর্ক। ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষের দৈনিক গড় আয় মাত্র ৫৬ পয়সা, এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সকলকে নাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দুটি পরিকল্পনার দশ বছরে যেখানে ৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বেড়েছে বলে কমিশন দাবি করেন, সেখানে এই সম্পদ কোথায় গেল, সেটাই ছিল বিবেচ্য। জবাবে জহরলাল স্বীকার করতে বাধ্য হন ভারতে 'the rich has become richer and the poor poorer'. দেশে একচেটিয়ার উদ্ভব দ্রুত না হলে যে পরিস্থিতি এমন সংকটজনক হতো না, সেটাই খতিয়ে দেখার জন্যে মনোপলি এনকোয়ারি কমিশন গঠিত হয়। কংগ্রেস সংগঠনে নানা ধরনের বিরোধিতার মূলে আঘাত করার জন্যেই জহরলাল তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী কামরাজ নাদারকে একটা সাংবিধানিক রদবদলের পরিকল্পনা পেশ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। বলা যায় দেশের অবিসম্বাদী নেতা হিসেবে সেটাই জহরলালের শেষ পদক্ষেপ।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে কাশ্মীরে হজরৎবাল সমস্যা মোকাবিলার আগেই জহরলাল ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের অধিবেশনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। কাশ্মীর সমস্যার মোকাবিলায় লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে পাঠানোর পাশাপাশি কারারুদ্ধ কাশ্মীরী জননেতা শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু জহরলালের পক্ষে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের নতুন উদ্যোগ নেওয়ার আর সময় ছিল না। ২৭ মে ১৯৬৪ জহরলাল প্রয়াত হন। ১৭ বছর একটানা প্রধানমন্ত্রিত্বের পর জহরলালের মতো একজন ক্যারিসম্যাটিক নেতার প্রয়াণে দেশে রাজনৈতিক শূন্যতা অনিবার্য ছিল। আবার ১৯৬২ সালের পর নেহরুর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা চাপা বিক্ষোভও কংগ্রেসের মধ্যে ছিল। বিক্ষুব্ধরা প্রধানমন্ত্রীর পদ দখলে উঠে পড়ে লাগেন। মার্কিন দেশে এর আগেই 'After Nehru who' শিরোনামে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়ে তাদের মনোমত নেতা নিয়ে আকারে ইঙ্গিতে নানা নাম হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস কামরাজের নেতৃত্বে কিছু প্রভাবশালী নেতার শলাপরামর্শে লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে মনোনীত করে। বিক্ষুব্ধ মোরারজী দেশাই, এস. কে. পাতিল সেটা মানতে বাধ্য হন। কারণ শাস্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নামে ঐক্যমত্য সম্ভব হয়নি, নেতাদের উচ্চাশার দ্বন্দ্বে। গুলজারিলাল নন্দ দু'সপ্তাহের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়লে শাস্ত্রী সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাস্ত্রীর মনোনয়নের আগে আরেকজন খুবই আশা করেছিলেন নেহরুর পর তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রিত্ব ঘটনাহীন ছিল। ১৯৬৪ সালের জুন মাস থেকে ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬তে তাসখন্দ শহরে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু এই কুড়ি মাসের কার্যকালে পাকিস্তানের সঙ্গে দু'বার যুদ্ধ ছাড়া জাতীয় জীবনে চোখে পড়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে

কচ্ছের 'রান' অঞ্চলে এক সপ্তাহ আর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে কাশ্মীর ও পাঞ্জাব সীমান্ত বরাবর দশদিনের যুদ্ধই ছিল প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা। এই শেষের যুদ্ধকে বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন 'war of attrition' নিতান্ত শক্তিক্ষয়ের যুদ্ধ, কোনো পক্ষেরই জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা ছিল না। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবর্গ দু'বারই পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। কিন্তু বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটে। সোভিয়েতের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যুদ্ধ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। তার মাধ্যমেই ঘটে উপমহাদেশের রাজনীতিতে সোভিয়েতের উপস্থিতি। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে সোভিয়েতের তাসখন্দ শহরে রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের উদ্যোগে লালবাহাদুর ও আইয়ুব খান শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি। সেই রাতেই শাস্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন।

শাস্ত্রীর আমলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বড়ো মাপের পরিবর্তন ঘটে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে তাঁর বিশেষ বিশ্বাস ছিল না। তখন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তিন বছর প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে। বিড়লাদের সহযোগী লক্ষ্মীকান্ত ঝা, যাঁকে শাস্ত্রী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন, তাঁর পরামর্শে 'plan holiday' ঘোষণা করেন। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুফল জনগণের কাছে যে প্রক্রিয়ায় পৌঁছতে পারে, তার প্রয়োগের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার আগেই তাকে স্থগিত করে দেওয়া হয়। বিশ্বায়নের যুগে যখন উদারীকরণের সপক্ষে প্রচার চলে নিত্য দিন তখন পরিকল্পনার দোষত্রুটি খোঁজার আগে দেখা দরকার তার কর্মপদ্ধতি মাঝে মধ্যেই থামিয়া দেওয়ার মাধ্যমে তাকে বানচাল করার পথ খুলে দেওয়া হয়েছিল কিনা, সেটাও বিচার করা দরকার। এমনিতেই প্রশাসনের আমলা নির্ভরতা যা ইংরাজ আমলের তুলনায় বেড়ে গিয়েছিল, সেই প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের এহেন সিদ্ধান্ত যে আমলাতান্ত্রিকতাকে জোরদার করেছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না। বস্তুতঃ কেন্দ্রিয় মন্ত্রিসভার নেহরুর পর এমন ব্যক্তিত্ব খুব কমই ছিল, পরিকল্পিত ব্যবস্থায় যার বিশ্বাস অটুট।

শাস্ত্রীর মৃত্যুর পরে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবি খুব জোরালো ভাবে তোলেন মোরারজী দেশাই। তাঁর ধারণা ছিল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং তার মধ্যে যারা কর্তাব্যক্তি, অর্থাৎ সাংসদদের মধ্যে যাঁরা সহজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আদায় করতে পারেন যেমন কামরাজ, নিজলিঙ্গাপ্পা, অতুল্য ঘোষ, জগজীবন রাম প্রমুখ ব্যক্তি তাঁদের না-পসন্দের তালিকায় সেই সময়ে মোরারজী ছিলেন একনম্বরে। তবু শাস্ত্রীর উত্তরাধিকারী মনোনয়নে মোরারজী দাবি করেন কংগ্রেস সাংসদদের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হোক। পর্দার আড়ালে কলকাঠি নেড়ে কোনো নাম স্থির করে তাকে সর্বসম্মত পছন্দ বলা যাবে না। স্বাধীনতা উত্তরকালে কংগ্রেসে নেতা নির্বাচনে সেই প্রথম ভোটে সব কিছু ঠিক করার উদ্যোগ। মুখিয়া নেতারা কৌশল হিসেবে দুটি বিষয় স্থির করেন (১) কংগ্রেস এমন এক জন প্রার্থী মনোনীত করবে যিনি কোনো না কোনোভাবে ক্যারিসমার ঐতিহ্য দাবি করতে পারেন, অর্থাৎ প্রার্থী পরিচিতি দিতে কারো কোনো অসুবিধা না হয়। (২) সেই প্রার্থী জোরালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে চলবে না, তাহলে এইসব সাংগঠনিক নেতাদের উপর তার নির্ভরতা থাকবে না।

এই দুই মাপকাঠিতে সাংগঠনিক নেতাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে উঠে আসেন ইন্দিরা গান্ধি। নেহরু দুহিতা, কিছু সময়ের জন্যে কংগ্রেস সভাপতি (যার আমলে কেরলে নামবুদিরিপাদের কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয়েছিল), এবং কংগ্রেসের সর্বভারতীয় স্তরে কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত। ইন্দিরা অন্ততঃ তখন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না। এইসব মুখিয়া নেতারা ভেবেছিলেন ইন্দিরার মতো অনভিজ্ঞ এবং শারীরিকভাবে দুর্বল কোনো নেতাকে সামনে রেখে তাঁরা 'back seat driving' করতে পারবেন। আরেকজন বিশেষ ইচ্ছুক ব্যক্তি ছিলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, যিনি শাস্ত্রীকে আগাগোড়া 'prisoner of indecision' বলেছিলেন, সংগঠনে তাঁর সমর্থন খুবই ক্ষীণ ছিল। নেহরু পরিবারের মধ্যে বিজয়লক্ষ্মী প্রকাশ্যে না হলেও পরোক্ষে ইন্দিরা বিরোধী ছিলেন এবং সেই বিরোধিতা অংশতঃ তাঁর কন্যাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। নেহরুর ছোটো বোন শ্রীমতী কৃষ্ণা হাতিসিং ছিলেন প্রথম থেকেই ইন্দিরার পক্ষে। ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে নেহরু পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজীব গান্ধির কার্যকালেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাংসদদের ভোটে ইন্দিরা সহজেই মোরারজীকে পরাজিত করেন। কংগ্রেসের মধ্যে যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব বরাবর ছিল এবং এখনও আছে, সেটা প্রমাণিত হওয়ায় দলের মধ্যে গণতন্ত্রের হাওয়া জোরালো হয়েছিল কিনা বলা শক্ত, কিন্তু কোথাও যে একটা কিছু বেসুরো বাজছে তা অস্বীকারও করা যায় না।

কিন্তু ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম বছরে সেই ১৯৬৬ সালে নেতাদের back seat driving প্রকল্প যথেষ্ট সফল হয়। তখন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অশোক মেহতা এবং কেন্দ্রিয় অর্থমন্ত্রী শচিন চৌধুরীর মিলিত চাপে ১৯৪৯ সালের পর ১৯৬৬তে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটানো হয় ৫৬ শতাংশ। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দোয়াব এলাকায় সবুজ বিপ্লব সত্ত্বেও দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন নিদারুণ ভাবে কমে। সরকারী খাদ্যবন্টন ব্যবস্থা কার্যতঃ ব্যর্থ হয়। পশ্চিমবাংলায় সেই বছর খাদ্য আন্দোলন ব্যাপকতায় ইতিহাস সৃষ্টি করে। একালের বহু পরিচিত বন্‌ধের রাজনীতির সেটাই শুরু। এই রাজ্যে হিমালয় থেকে সমতট ৭২ ঘন্টা বন্‌ধে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন 'ডোমিনো' তত্ত্ব প্রয়োগ করে ভিয়েতনামে কার্পেট বমিং করেন। প্রতিবাদে কলকাতায় ব্যাপক আন্দোলন ঘটে এবং 'আমার নাম, তোমার নাম, ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম' শ্লোগানে সারা রাজ্য মুখরিত হয়। রাষ্ট্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা তখন যেভাবে হ্রাস পায়, তার মোকাবিলা করার শক্তি ইন্দিরার ছিল না। দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই কংগ্রেস সংগঠনে ভাঙ্গন ঘটে। পশ্চিমবাংলায় উদ্ভব অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেসের। সারা হিন্দি বলয় জুড়ে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভাঙ্গন দেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে যার প্রমাণ রয়েছে পরের বছরের সাধারণ নির্বাচনে।

৫

উত্তর-উপনিবেশ পর্বে ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন ছিল একটা প্রবল রাজনৈতিক ভূকম্পের মতো। কংগ্রেসের একচেটিয়া রাজনৈতিক প্রাধান্যের তখন অবসান ঘটে। পঞ্জাব

থেকে সমগ্র হিন্দি বলয় ধরে পশ্চিমবাংলা পর্যন্ত এবং দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু ও কেরলে কংগ্রেস রাজ্যে শাসন ক্ষমতা হারায়। এদের মধ্যে ১৯৫৭ সালের কেরলেই একবার অকংগ্রেসী কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। উত্তর ভারতে কংগ্রেস দলের ভাঙন তার জন্যে দায়ী। তামিলনাড়ুতে ডি এম কে দল সরকার গঠন করে। তারপর থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সেই রাজ্যে আর কংগ্রেসের পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি। কোন না কোন দ্রাবিড় দল সরকার গড়েছে। সর্ব ভারতীয় দলগুলি তাদের সঙ্গে জোট গড়েই সেই রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব এই বিপর্যয়ের কারণ হলেও নির্বাচনে এটাও প্রমাণ হয়ে যায় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আবেদন বলিষ্ঠ কোন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি ছাড়া আর সফল হতে পারবে না। লোকসভাতে কংগ্রেস দল গরিষ্ঠতা পেলেও বিরোধীদের প্রবল উপস্থিতি তার নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তৎসত্ত্বেও কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার গঠন সহজ হয়নি। কারণ এবারেও ইন্দিরার নেতৃত্বের প্রতিপক্ষ হিসেবে মোরারজীর চ্যালেঞ্জ ছিল। শেষ পর্যন্ত আপোষে স্থির হয় মোররজী মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং অর্থমন্ত্রকের দায়িত্বে থাকবেন। এই পরিবর্তন যে সব দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে মুখ্যবিষয় ছিল :

(১) ক্ষমতার লোভে আয়া রাম গয়া রামের রাজনীতি বা দলত্যাগের রাজনীতি যা রাজ্য সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে। সেই ধারা ১৯৮৫ সালের দলত্যাগ বিরোধী আইন সত্ত্বেও এখনও চলেছে।

(২) কেন্দ্র রাজ্যগুলিতে যে কোন সুযোগে কংগ্রেস সরকার কায়েম করার জন্যে নানা অজুহাতে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করতে থাকে। ডি এম কে কেন্দ্র রাজ্য ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস ঘটাতে সাংবিধানিক সুপারিশের জন্যে রাজামান্নার কমিশন গঠন করে। আরো এক ধাপ এগিয়ে ১৯৭৪ সালে পাঞ্জাবে অকালি দল আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবে দাবি করে কেন্দ্রের ক্ষমতা পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, কারেন্সী ও বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়া অন্যসব বিষয়ে রাজ্যের অটোনমি থাকতে হবে।

(৩) ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হয়ে এবারে তাঁর বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে যাদের নিয়োগ করেন, তারা ছিলেন বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী। তখনই সিদ্ধান্ত হয় দেশ শাসনের গতানুগতিক ধারার বাইরে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। ফলে একদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরোধীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা অন্যদিকে আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে জনসমর্থন বৃদ্ধিও সুসংহত করতে নীতি পরিবর্তন, দুটো কাজই পাশাপাশি চালাতে হবে। এরই মধ্যে কেন্দ্রে ক্ষমতা দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে, রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের আকস্মিক মৃত্যু এবং নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগের প্রশ্নে। ইন্দিরা বিরোধী নেতারা চেয়েছিলেন তাঁদের পছন্দসই এমন এক প্রার্থী মনোনয়ন করতে যিনি ইন্দিরার কাজে বাধা দিতে পারবেন। দেশে তখন মাঝে মধ্যেই একটা বিতর্ক মাথাচাড়া দিত যে রাষ্ট্রপতি কি নিছক নিয়মতান্ত্রিক শাসক না কি তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। তাঁরা সুকৌশলে কংগ্রেসের প্রার্থী করলেন সঞ্জীব রেড্ডিকে যাঁর সঙ্গে ইন্দিরার মানসিক দূরত্ব যথেষ্ট

ছিল। ইন্দিরার পরোক্ষ সমর্থনে প্রার্থী হলেন সুপরিচিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভি ভি গিরি। নির্দল প্রার্থী গিরিকে সমর্থন করেন বামপন্থীসহ সমস্ত বিরোধী দল। ইন্দিরা নির্বাচনে কংগ্রেস সদস্যদের 'বিবেক ভোট' দেওয়ার আহ্বান জানান। এরই পাশাপাশি তিনি অর্থ দপ্তরের কাজের সমালোচনায় একটা নোট প্রচার করেন যাতে কার্যতঃ মোরারজীর কাজের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছিল। সঞ্জীব রেড্ডি পরাজিত হন এবং মোরারজী পদত্যাগ করেন। ইন্দিরা বিরোধী কংগ্রেস সাংসদরা বিদ্রোহ করে দলের বাহিরে চলে যান। লোকসভায় ইন্দিরা সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে।

(৪) ইন্দিরা বিরোধী কংগ্রেসীরা যারা তখন থেকেই সংগঠন কংগ্রেস বা সিন্ডিকেট নামে পরিচিত হন, তাদের চাপে ইন্দিরাকে পদত্যাগ করতে হতো যদি না দুই কমিউনিস্ট পার্টির সাংসদরা শর্ত সাপেক্ষে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করতো। পি ডি অ্যাক্টসহ জনবিরোধী আইন ও নীতিসমূহ বাতিল করতে হবে এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা অচিরে গ্রহণ করতে হবে। ইন্দিরাপন্থীরা তখন থেকেই ইন্ডিকেট নামে পরিচিত হন। আগস্ট ১৯৬৯ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭০, এই দেড় বছর কমিউনিস্ট সমর্থনে সরকার পরিচালনার সুযোগ ইন্দিরা সার্থক ভাবে ব্যবহার করেন একটা প্রগতিশীল বামপন্থী ভাবমূর্তি তুলে ধরার কাজে। অন্যান্য ছোটখাটো কিছু পদক্ষেপ ছাড়া বামদের দীর্ঘদিনের বক্তব্য মেনে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাজন্যভাতা বিলোপ করা হয়।

(৫) বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েতসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং তৃতীয় দুনিয়ার প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতা যথাসম্ভব প্রসারের চেষ্টা হয়। যার সুফল পাওয়া যায় সত্তর দশকে ক্রমাগত। যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, নাম শীর্ষ সম্মেলন থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে UN এর সাধারণ সভায় প্রস্তাব গ্রহণে। মার্কিন, চীন ও কিছুটা বৃটেনের প্রতিকূলতার মুখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনে ভারতের অবস্থান, ভারত-সোভিয়েত চুক্তি, পাকিস্তানে ভাঙ্গন, সিমলা চুক্তি প্রভৃতি ঘটনা এই উপমহাদেশের রাজনীতিতে নূতন মাত্রা যোগ করে, যার তুল্য ঘটনা পরের সাড়ে তিন দশকে আর ঘটেনি। এটাই ছিল ইন্দিরার নেতৃত্বের ফাইনেস্ট আওয়ার।

(৬) দেশের মধ্যে ইন্দিরার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভিত্তি গড়েছিল ১৯৭১ সালে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন। নিজের বামপন্থী ভাবমূর্তি যথাসম্ভব তুলে ধরার মধ্য দিয়ে তিনি দেশ থেকে 'গরিবি হঠাও' এর ডাক দিয়েছিলেন। সেই প্রথম একটা অর্থনৈতিক কর্মসূচি নির্বাচকদের সমানে রেখে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। কি করা হয়েছে সেই হিসাবের বদলে, কি করতে চাওয়া হচ্ছে-তার জন্যেই গণসমর্থন দাবি। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ কিম্বা রাজন্যভাতা বিলোপ করার পিছনে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের কিছুটা ভূমিকা আছে, গণমানসে সেই ধারণা দূর করে গরিবি হঠাও যে একমাত্র তাঁর কর্মসূচি, ইন্দিরার নির্বাচনী প্রচার তাতেই দেশে প্রভূত সমর্থন পায়। সংগঠন বা আদি কংগ্রেস কার্যতঃ সমস্ত শক্তি হারায়, আর বামপন্থীরাও সরকারের বামঘেঁষা পরিবর্তনের জন্যে বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করার সুযোগ পায় না। প্রভূত পরিচিতা নিয়ে ইন্দিরা লোকসভায় জয়ী হন, যে সাফল্য বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাঁর

স্বাধীন উদ্যোগ গ্রহণে সাহায্য করে। আর জহরলালের কন্যা বলে নয়, ইন্দিরা সম্পূর্ণ নিজের কৃতিত্বেই দেশের অবিসম্বাদী নেতা হন। ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের বিকাশে এটা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

আশ্চর্যের কথা হলো এই বিরাট জনপ্রিয়তা, লোকসভায় নিশ্চিন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা, দলে অপ্রতিহত প্রভাব, সমস্ত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী যখন হতমান তখন ইন্দিরার চরিত্রের এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। সেটা হলো সম্পূর্ণতঃ নিজেকে গণতান্ত্রিক সংযোগপ্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কিছু স্তাবক, অন্ধ অনুগামী পরিবৃত হয়ে ক্রমেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রকণতা বরাবরই ছিল বলে অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে গরিবি হঠাও এর কর্মসূচি ঘোষণা করা যতো সহজ ছিল তার বাস্তবায়নের পথে নেতৃত্বের অনীহা, দোদুল্যমানতা, আমলাতন্ত্র নির্ভরতা, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা নিয়ে আশংকা কার্যত এই বিশ দফা কর্মসূচি রূপায়ণ বন্ধ করে দেয়। ইন্দিরার অবাম রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষ এই সুযোগে প্রত্যাঘাতের চেষ্টা করে। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে মুখ্যতঃ ইন্দিরা বিরোধী শক্তি সমবেত হয় প্রথম গুজরাটে 'নবনির্মাণ' আন্দোলন করে এবং তার পরেই বিহারে। জয়প্রকাশ একে বলেছিলেন 'total revolution', যা এই দুই রাজ্যের বাইরে তেমন কোন আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। ইতিমধ্যেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ইন্দিরার রায়বেরিলি থেকে ১৯৭১ এর নির্বাচন বিধিভঙ্গের দায়ে বাতিল ঘোষণা করে।

এই রায় ইন্দিরার রাজনৈতিক নেতৃত্বে এমন একটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দেখা দেয় যার অভিঘাত দেশের জনজীবনেও অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনে। ঘোষিত হয় অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা যার আরেক নাম ছিল 'অনুশাসন পর্ব'। একটা শ্বাসরোধকারী পরিবেশ যেখানে সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। মজার কথা হলো এই স্বৈরাচার সংবিধানের ধারা মোতাবেক জারী করা হয়েছিল বলেই তাকে 'সাংবিধানিক একনায়কত্ব' বলা হতে থাকে। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি দেবকান্ত বরুয়া ঘোষণা করেন 'Indira is India and India is Indira'. স্তাবকতার এহেন প্রকটরূপকে মোটেই ধিক্কার জানানো হয়নি। অথচ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে সম্পত্তির অধিকার বাদ দিয়ে তাকে আইনগত অধিকারে পরিণত করার মধ্যে যে দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট সে সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় নির্দেশ দেন যে, পার্লামেন্ট সংবিধানের মৌল কাঠামোয় কোন পরিবর্তন করতে পারবে না, তখন সুপ্রীম কোর্ট বনাম পার্লামেন্ট নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়, সরকার যেখানে বলিষ্ঠ কোন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। জরুরী অবস্থা জারী থাকা কালে ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে সরকার সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে তাকে বাতিল করার চেষ্টা করে। সংবিধানে রাষ্ট্রিক লক্ষ্যমাত্রা 'সমাজতন্ত্র', 'সেকুলারত্ব' ধারণাকে প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত করে এই সংশোধনী। এই সদর্থক পরিবর্তন স্বাভাবিক সময়ে দেশজুড়ে যে সাড়া জাগাতে পারতো, ২৫ জুন ১৯৭৫ সাল থেকে জারী করা অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার অত্যাচার, অনাচার তাদের নাকচ করে দেয়।

৬

লোকসভার মেয়াদ জরুরী অবস্থার সময় একবছর বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন দেশের রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। কেন্দ্রে একটানা তিরিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা হারায়। ইন্দিরা রায়বেরিলিতে পরাজিত হন। দেশে ক্ষমতাসীন কোন প্রধানমন্ত্রীর সেই প্রথম পরাজয়। লোকসভায় কংগ্রেস সমগ্র উত্তর ভারতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে তার রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। দেশে সেই প্রথম একটা নির্বাচনে 'নর্থ-সাউথ ডিভাইড্' প্রকট হয়ে ওঠে। এইসময় কংগ্রেসের শাসন ক্ষমতা হারানো অন্যসব পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় দেশের শাসক দলের পরাজয়ের মতো স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। এই প্রথম দেশের মানুষ কোন বিশেষ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতি আকর্ষণ বোধ করে শাসকদলকে পরাস্ত করেনি। তারা সচেতনভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিকে নিজেদের রাজনৈতিক পছন্দের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এতেকাল তারা প্রতিদ্বন্দ্বি দলগুলির-কর্মসূচির প্রতি নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেছে কিম্বা হয়তো অভ্যস্ত ভাবেই ভোট দিয়েছে। কিন্তু ১৯৭৭ এর নির্বাচনে কোন কর্মসূচি নয় শাসন পরিচালনা রীতিকেই তারা বর্জন করে। সুতরাং এতোকালের অভ্যাসে ভোটে তারা যে ধরণের সাড়া দিত, এবারই প্রথম তারা বিকল্প একটা ধারাকে সচেতনভাবে সমর্থন করে।

গত ১৫ আগস্ট অমর্ত্য সেন বেসরকারী একটি ইংরাজী টি ভি চ্যানেলের আলোচনায় জনমানসের এই পরিবর্তনকে 'active democracy'র প্রথম প্রকাশ বলেছেন। তাঁর মতে আগের তিরিশ বছরে যা ছিল তা 'passive democracy'. যেখানে মানুষ ভোটে অংশগ্রহণ করতো নানা ধরণের দাবি দাওয়াপূরণের লক্ষ্যে। কিন্তু এইবার তারা একান্তভাবে স্বৈরাচারের বিরোধিতা করে গণতন্ত্রের শক্তিকে কায়েম করার জন্যেই ভোট দেয়। স্বৈরাচারকে বাতিল করে গণতন্ত্রকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করার রাজনৈতিক লক্ষ্যই ছিল ১৯৭৭ নির্বাচনের চালিকা শক্তি। এখানে অর্থনৈতিক প্রশ্ন, দাবি দাওয়া রাজনৈতিক মর্মবস্তুকে বাড়তি শক্তি যোগায়, কখনোই মুখ্য হয়ে ওঠেনি, তাকে ছাপিয়ে যায়নি। এক কথায় বলা যায় গণতন্ত্রের জন্যই গণতন্ত্র চাই, সেটাই জনগণের মৌলিক দাবি, কোন বিশেষ অংশে, কোন শ্রেণীর দাবি তখনকার মতো গৌণ হয়ে যায়।

স্বাধীনতার এই ষাট বছরে তাই স্পষ্ট দুটি ভাগ আছে। প্রথম তিরিশ বছর এই গণতন্ত্র ছিল passive অর্থাৎ জনগণের জীবন যাপনের নানা দাবিপূরণের সঙ্গে জড়িত। আর শেষ তিরিশ বছর, ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত, সেই গণতন্ত্র হয়ে উঠেছে জনগণের ক্রমপ্রসারমান ভূমিকায় active, যে সক্রিয়তা ভারতে প্রজাতান্ত্রিকতার বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। আনুপূর্বিক বিবরণে না গিয়ে মোটা দাগের কথা হিসেবে এটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট যে ১৯৭৭র জনতা বিকল্প ইন্দিরা বিরোধী একটা সুবিধাবাদী জোট ছিল বলেই তার স্ববিরোধিতাই তার পতন ঘটায়। ইন্দিরা গান্ধীর দ্বিতীয়বারের প্রধানমন্ত্রিত্ব তাঁর মর্মান্তিক নিধন না ঘটলে হয়তো ঘটনার

চাপেই পরাজিত হতো পরের নির্বাচনে। রাজীবের শাসন কংগ্রেসের প্রতি জনগণের আস্থার পরিচায়ক ছিল না। সেটা ছিল নিতান্তই শোকের আবহে এক বিপুল জয়। তার বনিয়াদ যে দুর্বল ছিল তার প্রমাণ ১৯৮৯র নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বনাথপ্রতাপ, নরসিংহ রাও প্রথম কমিউনিস্ট প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা, দুইবারের যুক্তফ্রন্ট, বিজেপি জোটের সরকার, এবং সর্বশেষ মনমোহন সিংয়ের জোট সরকার, কারো পক্ষেই এই নিশ্চিন্ত আশ্বাস কাজ করছে না যে জনসমর্থন অক্ষুণ্ণ থাকবে। জনসমর্থনের মান ও পরিমাণ দুটোই এখন দ্রুত পরিবর্তনমুখী। একটানা প্রধান শাসক দলের সংখ্যালঘুত্ব সেটাই প্রমাণ করে। সেখানে মণ্ডল রাজনীতি, উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নিম্নবর্গের ক্ষমতায়ন, নারীর স্বাধিকার চেতনাবৃদ্ধি থেকে শুরু করে নানা জটিল বিষয় ক্রমাগত দেশের শাসকদল বা জোটকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, যেখানে কোন কিছুই আর শাসনের সুস্থিতির গ্যারান্টি দেয়না।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বহুত্ববাদ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা, এবং সামাজিক শক্তিসমূহের বিন্যাসের পরিবর্তনীয়তা এইটুকু অন্ততঃ বুঝিয়ে দেয় গণতন্ত্রের নিহিত অর্থ ও শক্তি এখন দেশের আমজনতা সচেতনভাবে অনুভব করে এবং তাকে কাজে লাগাতে চায়। সেই প্রক্রিয়া সীমিত স্বার্থের অভিঘাতে মাঝে মাঝে সাময়িক বিপন্নতার মধ্যে পড়তে পারে, কিন্তু কোনমতেই বিপর্যস্ত হয় না। এই পর্বে জনগণ প্রথম চালকের স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রথম ধাপে পৌঁছেছে। নিয়তির অভিসারে গত ষাট বছরে দেশ এই সার্থকতার যে সন্ধান পেয়েছে, তা যথেষ্ট আশার কথা বলে মনে করায় কোন সংশয় থাকতে পারে না।

পুঁজি যার, জমি তার

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

একদিন স্লোগান ছিল : লাঙল যার, জমি তার। আজ নতুন স্লোগান : পুঁজি যার, জমি তার। পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ আকর্ষণের একটা প্রধান উপকরণ যে এখন সুলভ জমি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা যে একেবারে নতুন, তা নয়। কলকাতার পূর্ব তীরে, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের সমান্তরাল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জমির পর জমি বিভিন্ন উদ্যোগীকে বিক্রয় করে দেওয়া শুরু হয়েছে অনেক দিন আগেই। অল্প দামে কেনা সেই সব জমির অনেকটাই অব্যবহৃত থেকেছে কিংবা অপব্যবহৃত হয়েছে। তার ফলে রাজ্য সরকার অস্বস্তিতে পড়েছে এবং ফেলে রাখা জমি ফিরিয়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে জমির চাহিদা একটা ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছেছে, কলকাতার সন্নিহিত বা নিকটবর্তী অঞ্চলে শিল্প, শিল্পনগরী, উপনগরী, বন্দর, হাইওয়ে, বিদ্যুৎকেন্দ্র, আবাসন-প্রকল্প, বাণিজ্যকেন্দ্র বা বিনোদনকেন্দ্র ইত্যাদি নানাবিধ উদ্যোগের জন্য বড় মাপের জমি চেয়েছেন স্বদেশি অথবা ভিনদেশি বিনিয়োগকারীরা। রাজ্য সরকার সেই চাহিদা পূরণে বিশেষভাবে তৎপর হয়েছেন, যথাসম্ভব দ্রুত জমির ব্যবস্থা হয়েছে। এটা শিল্পায়ন/নগরায়ণের সম্মিলিত অভিযান।

এবং রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টা সমালোচনা বড় তুলেছে। সেই সমালোচনা ও প্রতিবাদ কেবল বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও, কেবল বামফ্রন্টের ভিতর থেকে নয়, খোদ সি পি আই এম-এর ভিতর থেকেও। সমালোচনা প্রধানত এই কারণে যে, এ ভাবে কৃষিজমি অন্য কাজে দিয়ে দেওয়া হলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষির ফলন কমে যাবে, ফলে খাদ্যে নিরাপত্তা কমে যাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজীবীরা তাঁদের চিরাচরিত জীবিকা হারাবেন। রাজ্য সরকার এই সমালোচনার জবাবে প্রধানত দুটি যুক্তি দিয়েছেন। এক, যে জমি নেওয়া হচ্ছে তার একটা বড় অংশ অনুর্বর। তা ছাড়া কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর অনেক সুযোগ আছে। সুতরাং জমি কমলেও শস্য উৎপাদন কমবে না, কৃষির ফলন নিয়ে ভয় অহেতুক। দুই, অনেক ক্ষেত্রেই যাঁদের জমি নেওয়া হচ্ছে, তাঁদের ওই জমি থেকে বিশেষ আয় হত না, আয়ের নিশ্চয়তাও যথেষ্ট ছিল না, সুতরাং তাঁদের বেশি ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া, জমির বদলে বিকল্প জমি, নগদ টাকা, কর্মসংস্থান, স্বনিযুক্তির সুযোগ, প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত ইত্যাদি নানা ধরনের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং—মা ভৈঃ।

স্পষ্টত, তর্কটা এখানে শেষ হয় না। সরকারি জবাবের প্রত্যুত্তরে পাল্টা প্রশ্ন ওঠে—যাঁদের ক্ষতি হল তাঁরা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন কি? প্রশ্ন ওঠে—যাকে ক্ষতিপূরণ বলা হচ্ছে, তা কি সত্যিই ক্ষতিপূরণ? ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর উদ্যোগে 'উন্নয়ন'-এর পরিণামে যে গ্রামবাসী কৃষিজমির মালিকানা হারিয়ে বা বর্গা খুইয়ে হাইওয়ের ধারে একটি চায়ের দোকান দিতে পারবেন, তাঁর ক্ষতি কি এতদ্দ্বারা পূর্ণ হবে? রাজারহাটে নতুন কলকাতার কল্যাণে বাস্তুচ্যুত এবং জমিহারা পরিবারের যে ঘরনি সেই উপনগরীর আবাসনে 'কাজের

লোক' হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন বা পাবেন, তাঁর ক্ষতিপূরণ হবে? এ সবই প্রশ্ন, যাকে বলে খোলা প্রশ্ন। উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় যাঁদের পুরনো জীবন ভেঙে যাচ্ছে, পাল্টে যাচ্ছে, তাঁরা সবাই স্থিতাবস্থার খুব সুখে ছিলেন বা আছেন, এমন কথা নিশ্চয়ই মনে করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্থিতাবস্থা ভেঙে নতুন অবস্থায় পৌঁছনো যদি উন্নয়ন হয়, সেই উন্নয়নের লাভ-লোকসানের ভাগ-বাঁটোয়ারা কী ভাবে হচ্ছে? এবং এই ভাবে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রশ্নটা নিছক জমির নয়, প্রশ্ন একটা সামগ্রিক জীবনযাত্রার—জমির মালিকানা এবং ব্যবহার যার একটি অঙ্গ।

প্রশ্নটা জরুরি। কেবল তাত্ত্বিক ভাবে জরুরি নয়, কেবল উন্নয়নের চলতি মডেলের বিশ্লেষণের জন্য জরুরি নয়, নিতান্ত ব্যবহারিক কারণেও জরুরি। ক্ষতিপূরণের দাবি তোলা হয়েছে বলেই, (অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় এবং খণ্ডিত পরিসরে) সেই দাবি নিয়ে কিছুটা শোরগোল হয়েছে বলেই দেখতে দেখতে পশ্চিমবঙ্গের সরকার তথা শাসক রাজনৈতিক গোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে ক্ষতিপূরণের কিছু কিছু বন্দোবস্ত রাখছেন। সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে শিল্পাঞ্চল এবং পরিকাঠামো নির্মাণের যে প্রাথমিক চুক্তি তাঁরা করেছেন তার বৈশিষ্ট্য হিসাবে বহুমাত্রিক ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের শর্তগুলিকে তাঁরা বড় করে বিজ্ঞাপিত করছেন, করাটাই স্বাভাবিক, রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কিন্তু স্পষ্টতই, এই শর্তগুলি আকাশ থেকে পড়েনি, অহৈতুকী শুভবুদ্ধি থেকেও জন্মায়নি। এগুলি উপরোক্ত শোরগোলের ফল। উন্নয়ন এবং ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন—দুইই প্রবলভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। সেই রাজনীতি থেমে যাওয়ার নয়, নিরন্তর চাপ দিয়ে চলার। তাই বলছিলাম, তর্কটা শেষ হয়নি, শেষ হতে পারে না।

কিন্তু প্রশ্ন হল, তর্কটাকে কী ভাবে দেখা হবে। যাঁরা কৃষিজমিতে শিল্পায়ন বা নগরায়ণের বিপক্ষে, তাঁরা এই যুক্তিই দিচ্ছেন যে, এর ফলে কৃষি ও কৃষকের ক্ষতি হবে এবং সে ক্ষতি পূরণ করা যাবে না বা পূরণ করা হবে না। তার ফলে তর্কটা ক্ষতি এবং ক্ষতিপূরণের তুল্যমূল্য বিচারে সীমিত থেকে যাচ্ছে। আমরা বলেছি, সে বিচার তুচ্ছ নয়, বস্তুত ব্যবহারিক দিক থেকে দেখলে, আন্দোলন গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে সেটা অত্যন্ত গুরুতর বিচার। কিন্তু তর্কটা এইখানে সীমিত রাখলে শেষ পর্যন্ত সরকারি উন্নয়ন নীতির মূল কাঠামোটির মধ্যেই থেকে যেতে হবে, সেই কাঠামোটি নিয়ে, তার গভীরে নিহিত উন্নয়নের ধারণাটি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

এই ধারণাটিকে খুব সংক্ষেপে বুঝতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর একটি সাম্প্রতিক মন্তব্য উল্লেখ করলেই চলে। তিনি জানিয়েছেন : গ্রাম থেকে শহর, কৃষি থেকে শিল্প, এটাই তো উন্নয়ন। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ। শুধু তা-ই নয়, সাধারণ ভাবে অধিকাংশ মানুষই এই কথা একবাক্যে মেনে নেবেন। আর সেই কারণেই কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। উন্নয়নের এই ধারণা এক অর্থে রাজনৈতিক শিবির-নিরপেক্ষ। গত প্রায় এক শতাব্দীতে রাজনীতির বিচারে যে দুটি ভিন্ন শিবিরের রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা দেখেছি, তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই উন্নয়নের অর্থনীতি একটা জায়গায় মিলে গেছে। কি ধনতন্ত্র, কি 'সমাজতন্ত্র', দুই মডেলেই শিল্পায়ন তথা

নগরায়ণকে উন্নয়ন তথা প্রগতির সমার্থক বলে গণ্য করা হয়েছে এবং উন্নয়নের নীতি ও কার্যক্রমও সেই অনুসারেই নির্ধারিত হয়েছে। সেই উন্নয়ন কী ভাবে হবে, তার প্রক্রিয়ায় বাজারের ভূমিকা কী হবে, রাষ্ট্রের ভূমিকাই বা কী হবে, সে সব প্রশ্নে নিশ্চয়ই এই দুই শিবিরের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু উন্নয়নের অর্থ নিয়ে তর্ক ছিল না। বস্তুত, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্রুত উন্নয়নের যে পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার, বিশেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে ওঠা। ধনতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ উন্নয়ন সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার ধারণাটিকে স্বীকার করে নিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম ইউরোপের উন্নয়ন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের উন্নয়ন, এই দুই উন্নয়নের ইতিহাসের দিকে নজর করি তা হলে দেখব, এক কথায় তার নাম : গ্রাম থেকে শহর, কৃষি থেকে শিল্প।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়করা যখন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ খুঁজলেন, তখন উন্নয়নের এই 'দিগ্বিজয়ী' ধারণাটিকেই সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিলেন। ভারতীয় যোজনার নেহরু-মহলানবীশ মডেল তার স্পষ্ট প্রমাণ। ওই মডেলেও প্রকট ছিল পশ্চিম দুনিয়াকে আদর্শ বলে গণ্য করার মানসিকতা, সেই দুনিয়া যেভাবে যে পথে উন্নত হয়েছে, তাকেই উন্নয়নের একমাত্র পথ বলে গণ্য করার মানসিকতা। বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নেই গান্ধীজির অর্থনীতি-চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতি-চিন্তার একটা মৌলিক বিচ্ছেদ ঘটে যায়, যে বিচ্ছেদের চরিত্র তার অনেক আগেই—ত্রিশের দশকে নেহরুর উদ্যোগে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি কাজ শুরু করার সময়েই—স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং তাঁর সহকর্মীরা, বিশেষত বল্লভভাই পটেলের বিদায়ের পরে, অর্থনীতির পরিচালনায় গান্ধীর পথ থেকে সম্পূর্ণ সরে আসেন, 'খাদি' ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর আদর্শের প্রতি একটা মৌখিক বা বড়জোর প্রতীকী শ্রদ্ধা নিবেদন করে পশ্চিমী মডেলটিকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করে নেন।

স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দু'তিন দশকে ভারত সরকারের উন্নয়ন নীতি নিয়ে বামপন্থী দলগুলির বিস্তর সমালোচনা ছিল। বস্তুত, তাঁদের সমালোচনার বিভিন্ন ধারা ছিল, যে ধারাগুলি অনেক সময়েই পরস্পর মেলেনি, তার ফলে বাম দলগুলির মনোমালিন্য, এমনকী বিভাজনও ঘটেছে। কিন্তু উন্নয়ন কাকে বলে, সেই মূল প্রশ্নে তাঁদের কোনও ভিন্নমত ছিল না, শিল্পায়ন এবং নগরায়ণই যে উন্নয়নের একমাত্র পথ, সেটা তাঁরাও কখনও অস্বীকার করেননি। বস্তুত, এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে, অন্য কোনও ভাবে ভাবা যেতে পারে, এটাই তাঁরা মনে করেননি।

আমরা এ কথা মোটেও বলতে চাইছি না যে, শিল্পায়ন তথা নগরায়ণ খারাপ কিংবা অপ্রয়োজনীয়। সেটা হবে বাতুলের কথা। 'দাও ফিরে সে অরণ্য' গোছের রোম্যান্টিকতা কেবল অবাস্তব নয়, গরিব দেশের পক্ষে অনৈতিকও বটে—অধিকাংশ মানুষ জীবনের ন্যূনতম সুখস্বাচ্ছন্দ্য না পেলে অরণ্য ফিরে চাওয়ার অধিকার কারও থাকে না। উন্নয়নের একটি ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অর্থ উন্নয়নের বিরোধিতা করা নয়। এ ক্ষেত্রে গান্ধীজির ধ্যানধারণা নিয়েও অবশ্যই প্রশ্ন তুলতে হবে, তাঁর চিন্তার অসম্পূর্ণতা বা অসংগতিগুলিকে

লক্ষ করতে হবে। কিন্তু আমরা বলতে চাইছি, শিল্পায়ন তথা নগরায়ণকে উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত এবং রূপ হিসেবে দেখাটা এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। যদি এই দৃষ্টিভঙ্গির দাসত্ব ছেড়ে অন্য ভাবে দেখতে চাই, তা হলে প্রথমেই প্রশ্ন করব : কৃষি-থেকে-শিল্প মানেই কেন উন্নয়ন বলে গণ্য হবে? গ্রাম-থেকে-শহর মানেই কেন অগ্রগতির অন্য নাম বলে পরিচিত হবে? এর একটা বহুলপ্রচলিত উত্তর এই যে, শিল্পায়ন না হলে আয় যথেষ্ট বাড়বে না, শিল্পজাত পণ্য ছাড়া জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হবে না, শুধু চাষবাস করলে চলে? একই ভাবে বলা হবে যে, ভাল ভাবে বাঁচার জন্য নগরজীবনের সুযোগসুবিধা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য জরুরি, গ্রামে বসে থাকলে সে সব মিলবে না, মিলবে না বাইরের জগৎটাকে ভাল করে চেনাজানার সুযোগ, বাইরের জগতে উন্নততর জীবন সন্ধানের সুযোগ।

কথাগুলো ফেলে দেওয়ার নয়। কিন্তু কথাগুলোকে একটু ভেঙেচুরে দেখলেই অন্য দু'একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এক, আয়বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি মাপকাঠিগুলিকে অনিবার্য ভাবে শিল্পায়ন বা নগরায়ণের সঙ্গে একাকার করে দেখার কোনও যুক্তি নেই। আয়বৃদ্ধি গ্রামেও সম্ভব—ভারতেও বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিতে আয়বৃদ্ধি হয়েছে। নগরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বলতে যা বোঝানো হয়, তারও অনেক কিছুই গ্রামে পাওয়া সম্ভব। সুশিক্ষা, সুচিকিৎসা, ভাল রাস্তা, বিনোদন ইত্যাদি গ্রামে থাকতেই পারে, হরিয়ানা বা কেরলের মতো রাজ্যে বহুলাংশে আছে-ও। হরিয়ানার পাশাপাশি কেরলের দৃষ্টান্তটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। হরিয়ানার তুলনায় কেরল আয়ের বিচারে অনেক দরিদ্র রাজ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে রাজ্যের গ্রামের সাধারণ অবস্থা ভারতের অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় অনেক ভাল, বামফ্রন্টের দীর্ঘমেয়াদি শাসনে ধন্য পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় তো ভাল বটেই। এটা বুঝিয়ে দেয় যে, উন্নয়নের প্রচলিত ছকে যথেষ্ট সফল না হয়েও, বিনিয়োগ আকর্ষণের দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে থেকেও একটি রাজ্য (বা দেশ) সাধারণ মানুষের জীবনমানের মাপকাঠিতে অনেকটা এগিয়ে থাকতে পারে। আমেরিকার গ্রামে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে, সেটা বড় কথা নয়। কেরলের গ্রামে পারে, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। সুতরাং উন্নতির জন্য গ্রাম ছেড়ে, কৃষি ছেড়ে বেরোতেই হবে, এই ধারণাটি একটি ধারণা মাত্র, হয়তো তা অনেক ক্ষেত্রে ঠিক, হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ভুল। ধারণা হিসেবেই তাকে বিচার করতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে, নির্বিচারে, বিনা প্রশ্নে এই ধারণাকে মেনে নেব কেন? যদি মেনে না নিই, তা হলে আর তাকে উন্নয়নের সমার্থক বলার কারণ থাকে না।

দুই, ভাল থাকা বলতে সচরাচর যা বোঝায়, সেটাও আমরা উপরোক্ত ধারণা থেকেই গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে ভোগ্যপণ্য এবং বিনোদনের যে অমিত বিস্তারকে আমরা উন্নত জীবনের আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করি, তা কোনও ভাবেই স্বাভাবিক নয়; টেলিভিশনে শত শত চ্যানেল কিংবা সাবানের শত শত ব্র্যান্ড আমাদের ঠিক কী ভাবে কতখানি ভাল থাকতে সাহায্য করে, বোঝা মুশকিল। আমরা এই ভাল থাকাকে, জীবনযাত্রার উন্নতির এই ধারণাকে প্রশ্ন করি না, তার কারণ আমরা এটাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিই, মনে করি যে এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, অন্য রকম হতে পারে না। এটাই ধারণার আধিপত্য।

এই আধিপত্য এমনই প্রবল যে আমরা তার উল্টোদিকের সত্যগুলোকে দেখেও দেখি না, দেখতে চাই না।

ভোগ্যপণ্যকেন্দ্রিক, বিনোদনসর্বস্ব উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সামাজিক তথা পারিবারিক জীবনে নানা ধরনের সংকট উপস্থিত হয়েছে এবং উত্তরোত্তর তীব্রতর হয়ে চলেছে। তার নানা লক্ষণ অহরহ দেখতে পাচ্ছি। 'সুখ কাকে বলে', তা নিয়ে উন্নত দুনিয়ার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। প্রতি বছর নিয়ম করে বিভিন্ন দেশে সমীক্ষা হচ্ছে, কোন দেশের মানুষ কত সুখী। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সুখ বস্তুটি ক্রমশই আরও দুর্লভ হয়ে উঠছে। মানসিক অসুখ, বিশেষত না-পাওয়ার হতাশাজনিত মনোবৈকল্য আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, ঘরের কাছেই তার প্রকোপ ভীতিপ্রদ। অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়ার সমস্যা এখন পরিসংখ্যানের বিচারে দারিদ্রের সমস্যাকে ছাড়িয়ে গেছে বললে ভুল হবে না, কারণ (এই প্রথম) অস্বাভাবিক মেদবহুল (obese) মানুষের সংখ্যা হতদরিদ্রের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। (লক্ষণীয়, এখানে দুটো রোগ আছে : মোটা হয়ে যাওয়া এবং মোটা হয়ে যাওয়াকে সমস্যা বলে মনে করা। সহজ করে বললে, প্রথমটি শারীরিক ব্যাধি, দ্বিতীয়টি মানসিক। তবে দুটি স্পষ্টতই পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, ঠিক যেমন শরীর এবং মন।) এই সবই বহুলাংশে উন্নয়নের সমস্যা, সমৃদ্ধির পরিণাম। সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই, তাই অস্বীকার করা হয়ও না। নানা ভাবে এই সব সমস্যার মোকাবিলার আয়োজন হয়। যেমন, মনস্তাত্ত্বিক উপদেষ্টা, যেমন হতাশা কাটানোর ওষুধ, যেমন ফ্যাট-ফ্রি ডায়েট কিংবা লো-ক্যালরি কোক-পেপসি। এই সব আয়োজনকে কেন্দ্র করে আবার বিরাট বাণিজ্য গড়ে ওঠে। তার ফলে আয় আরও বাড়ে, উন্নয়নের পরিসংখ্যানে সেই আয় যোগ হয়। কিন্তু কখনও বলা হয় না যে, উন্নয়ন বা সমৃদ্ধির ধারণাটিতেই গোলমাল আছে, এই সমস্যাগুলি তার লক্ষণ মাত্র। এখানেই ধারণার আধিপত্য।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি নায়কদের চিন্তায় ও আচরণে এই আধিপত্যের লক্ষণ খুব স্পষ্ট। তাঁরা কৃষি থেকে কত একর জমি সরিয়ে নিয়ে শিল্পে বা উপনগরীতে দিতে চাইছেন সেটা নীতিগত ভাবে বড় প্রশ্ন নয়, মৌলিক প্রশ্ন নয়। কৃষি ও শিল্প, গ্রাম ও শহর— কালক্রমে এদের বিবর্তন ঘটেছে, ঘটছে, দুইয়ের অনুপাত বদলেছে, বদলাচ্ছে। এটা একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়া থেমে যাবে না। কৃষি থেকে এক ইঞ্চি জমি নেওয়া চলবে না, এমন কোনও দাবি করার মানেই হয় না। কৃষি এবং শিল্পে জমির ব্যবহারের ভবিষ্যৎ ঠিক কেমন, তা-ও আগে থেকে বলা সম্ভব নয়, উন্নয়নের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই তা নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু যাঁরা নীতি নির্ধারণ করছেন তাঁরা যদি শুরুতেই ভেবে রাখেন যে উন্নয়নের বিচারে কৃষির চেয়ে শিল্প উঁচুতে, গ্রামের চেয়ে শহর এগিয়ে, তা হলে বুঝতে হবে, উন্নয়নকে তাঁরা নতুন করে, নিজেদের মতো করে ভাবতে রাজি নন। আমরা বলেছি, তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নয়নকে দেখছেন, সেটি পশ্চিম দুনিয়া থেকেই সংগৃহীত। উন্নয়নের এই ধারণাকে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে আমরা পশ্চিম দুনিয়ার আধিপত্যকে মেনে নিয়েছি। লক্ষণীয়, যাঁরা কথায় কথায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন, তাঁদের চিন্তায়

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের এই আধিপত্য এক অর্থে চমকপ্রদ।

উন্নয়নের এই ধারণা কী ভাবে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিকে প্রভাবিত করে, সেটা এ রাজ্যের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গের শাসকরা গত কয়েক বছরে উন্নয়নের যে মডেল অনুসরণ করতে চাইছেন এবং যে মডেলের সপক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন, তার মূলে আছে বিনিয়োগ। উন্নয়নের জন্য উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি জরুরি। উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ জরুরি। সুতরাং উন্নয়নের জন্য চাই বিনিয়োগ, আরও বিনিয়োগ। যেমন, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ, নতুন শিল্প নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ, শহরের আধুনিকীকরণের জন্য বিনিয়োগ, পরিকাঠামো সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ। সব ধরনের বিনিয়োগকে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে না, শিল্পোন্নয়ন এবং নগর উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিনিয়োগকে উন্নয়নের আবশ্যিক উৎস বা চালিকাশক্তি বলে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন নেই। অর্থাৎ, উন্নয়নের যে ধারণাটি আধিপত্য বিস্তার করেছে, তার মধ্য দিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে বিনিয়োগের ধারণাও। সেই কারণেই, উন্নয়নের এই ধারণাকে আপাতত বলতে পারি বিনিয়োগ-কেন্দ্রিকতা।

এই বিনিয়োগ-কেন্দ্রিকতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নী কর্মকাণ্ডে মূর্ত হয়ে উঠছে। এই কর্মকাণ্ডের প্রধানতম অঙ্গ হল বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ। কী ভাবে রাজ্যে বিনিয়োগ আনা যাবে, সেটাই সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। তাঁরা খুব জোর দিয়ে প্রচার করছেন যে,পশ্চিমবঙ্গে নির্ভরযোগ্য পরিকাঠামো, অনুকূল পরিবেশ, তৎপর প্রশাসন, শস্তা এবং দক্ষ কর্মী, শান্তিপূর্ণ শিল্প-পরিবেশ ইত্যাদি নানাবিধ সুবিধা পাওয়া যাবে, সুতরাং বিনিয়োগকারীরা এই রাজ্যে লগ্নি করুন, নিরাপদে ব্যবসা করতে পারবেন, ভাল লাভও পাবেন। স্বভাবতই, এই প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টা করতে হচ্ছে তাঁদের। ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, উপনগরী, গল্‌ফ কোর্স, আই টি শিক্ষার আয়োজন ইত্যাদি তার একটি দিক, আবার অন্য দিকে আছে, 'কর্মসংস্কৃতি'র উন্নতি, শ্রমিক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ, সরকারি (এবং দলীয়) পরিসরে বিনিয়োগকারীর প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন ইত্যাদি। এই সব আয়োজনের ফলে অন্য আয়োজনে ভাটা পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে আই টি শিক্ষা নিয়ে যত শোরগোল, সাক্ষরতা নিয়ে তার এক শতাংশও শুনতে পাই কি? আই টি শিক্ষার প্রসারে জোর দিতে গেলে সাক্ষরতা কর্মসূচিতে ঢিলে দিতে হবে, এমন কোনও সাধারণ নিয়ম নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু কোন উদ্যোগে কতটা জোর পড়বে সেটা সচরাচর মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। এখানেই বিনিয়োগ-কেন্দ্রিকতার গুরুত্ব। বিনিয়োগ আকর্ষণই যদি সরকারের প্রধান বা একমাত্র লক্ষ্য হয়, তা হলে তার আচরণে সেই লক্ষ্যের প্রভাব পড়বে, তার অগ্রাধিকারের ধারণা সেই অনুসারে প্রভাবিত হবে, তার মানসিকতা সেই ভাবে চালিত হবে, এমনটা অস্বাভাবিক নয়। নামজাদা আই টি কোম্পানির বড়কর্তা নতুন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি চাইলে সরকারের বড়কর্তা সেই চাহিদা বিরল তৎপরতায় এক লহমায় পূরণ করে দেন, অথচ গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নতুন বাড়ি তৈরি হওয়ার পরেও প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার ফলে সেখানে রোগীদের থাকার জায়গা হয় না, তাঁদের খোলা

মাঠে অপেক্ষা করতে হয়। কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ আচরণের পিছনে বিনিয়োগ টানার তাগিদ কতটা কাজ করেছে তা নিয়ে তর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে, সরকারি মানসিকতার ও আচরণে এই ধরনের বৈষম্য বিনিয়োগ-কেন্দ্রিকতার পরিবেশে খুব মানিয়ে যায়।

দুটি তর্ক উঠবে। প্রথম তর্ক, উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি তো সত্যিই জরুরি, তা বাদ দিয়ে উন্নয়ন হবে কী করে? আর বিনিয়োগ না বাড়লে উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানই বা বাড়বে কী ভাবে? বরং দেখতে হবে, উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়ায় যাতে দরিদ্র মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারেন, তাঁদের সে জন্য সক্ষম করে তুলতে হবে, যেমন, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের আধুনিক কাজের বাজারে প্রতিযোগিতায় সমর্থ করে তুলতে হবে। দ্বিতীয় তর্ক, উন্নয়নের জন্য, বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য যদি কারও ক্ষতি হয়, তা হলে সেই ক্ষতি পূরণ করে দেওয়া সম্ভব, সে জন্য যা করার করতে হবে, কিন্তু সেই যুক্তিতে উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করা যায় না, বিনিয়োগের স্বার্থহানি ঘটানো চলে না।

বিনিয়োগ চাই না, এমন কথা বলার কোনও প্রশ্ন নেই। সমস্যা বিনিয়োগ নিয়ে নয়, সমস্যা বিনিয়োগ-কেন্দ্রিকতা নিয়ে। উন্নয়নের নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করতে গিয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে অন্য সমস্ত লক্ষ্যের ওপরে স্থান দিতে হবে, অন্য কোনও যুক্তি দিয়ে বিনিয়োগের যুক্তিকে প্রশ্ন করতে পারব না—সমস্যা এই অবস্থানটি নিয়ে। বিনিয়োগের যুক্তি হিসেবে যে কথাটা ক্রমশই আধিপত্য বিস্তার করছে তা হল এই যে, অন্যদের সঙ্গে (অন্য দেশের সঙ্গে, অন্য রাজ্যের সঙ্গে, অন্য শহরের সঙ্গে ইত্যাদি) প্রতিযোগিতা করে বিনিয়োগ আনতে গেলে প্রশ্ন তুললে চলবে না, প্রশ্ন তুললেই বিনিয়োগ অন্যত্র চলে যাবে। এই যুক্তির তাত্ত্বিক ফাঁকটা নিতান্ত সহজবোধ্য। সবাই যদি অন্যদের ভয়ে প্রশ্ন না তোলে, তা হলে প্রশ্ন উঠবে না, আর সবাই যদি একটু সাহস করে, তা হলে প্রশ্ন উঠবে।

কিন্তু, অবশ্যই, সবাই প্রশ্ন তোলার সাহস পাবে না, সেটা প্রত্যাশিত নয়। প্রশ্ন চিরকালই কেউ কেউ তোলে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সেই কেউ-কেউদের অংশ হবেন কি না, এটাই প্রশ্ন। এবং তাঁদের আচার আচরণ দেখে মনে হয়, তাঁরা প্রশ্ন তোলা থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে চান। বিনিয়োগের যুক্তি, বিনিয়োগ-কেন্দ্রিকতার যুক্তি তাঁদের গ্রাস করেছে। হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির প্রতিবাদে বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দায় তাঁরা অন্য কথা বলে চলেছেন, কিন্তু সেটা মুখের কথা। কাজের কথা যখনই ওঠে, তখনই তাঁরা 'বিনিয়োগ স্বর্গ বিনিয়োগ ধর্ম' মন্ত্র জপ করেন। একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। নরম পানীয়ের বোতলে কীটনাশকের অভিযোগ নতুন করে প্রচারিত হওয়ার পরে কেরলের বামফ্রন্ট সরকার সে রাজ্যে কোক-পেপসির উৎপাদন ও সরবরাহ নিষিদ্ধ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সে পথে হাঁটেননি। সেটা বড় কথা নয়, নিষিদ্ধ করার পক্ষেও যেমন যুক্তি আছে, বিপক্ষেও যুক্তির অভাব নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শাসক গোষ্ঠীর কর্তাব্যক্তিরা এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পাছে বিদেশি

বিনিয়োগকারীরা ক্ষুব্ধ হন এই আশঙ্কায় তাঁরা শঙ্কিত। রাজ্যের নতুন শিল্পেও, যেমন দুর্গাপুর আসানসোল এলাকায় ইস্পাত কারখানায় শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না, তাঁদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, এমন অভিযোগ গোড়া থেকেই শোনা গেছে, সরকারি কর্তারা এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা প্রকারান্তরে তা স্বীকারও করে নিয়েছেন, কিন্তু 'দেখছি, ব্যবস্থা করছি' ইত্যাদির বেশি কিছু শোনা যায়নি, বিশেষ করে যে শিল্পমালিকরা এমন অন্যায় ব্যবস্থা জারি রেখেছেন তাঁদের সম্পর্কে একটিও কটুকথা বামপন্থী শাসকদের মুখে উচ্চারিত হয়নি। পাছে বিনিয়োগের ক্ষতি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনীতির পক্ষে এই বিনিয়োগ-কেন্দ্রিকতার পরিণাম কী দাঁড়াবে, সেটা এখনই বলে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এর ফলে একটি প্রবণতা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজ্য সরকারের অর্থনীতি-চিন্তায় একটি বিকল্প সন্ধানের যে তাগিদ ছিল, সেটা খুব দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক, কারণ পশ্চিমবঙ্গে একটি বিকল্প অর্থনীতি রচনার কিছু প্রস্তুতি ছিল, সেই পথে আমরা কিছুটা অগ্রসরও হয়েছিলাম। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের রাজনৈতিক সাফল্যের পিছনে একটি বড় কারণ ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর। জমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন সেই রূপান্তরকে চালনা করে এবং তার রাজনৈতিক গতিপথটিকে দিশা দেয়। পঞ্চায়েতি রাজের মাধ্যমে আর্থ-রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ এই রূপান্তরকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়, আবার এই রূপান্তরকে প্রভাবিত করে। জমি ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রধানত দুটি মাত্রা : বর্গার নথিভুক্তি এবং ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টন। দুটি ক্ষেত্রেই অনেক সমালোচনা, অনেক অপূর্ণতা, কিন্তু এ কথা কার্যত সর্বজনস্বীকৃত যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

আমাদের প্রশ্ন হল, এই পরিবর্তনের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ কি একটা অন্য ধরনের গ্রামীণ অর্থনীতি রচনা করতে পেরেছে? যদি তা না হয়ে থাকে, তা হলে ওই পরিবর্তনগুলির পরিণাম কী দাঁড়াল? এবং ওই পরিবর্তনগুলির সুফল কি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে? এটা অনেক বড় প্রশ্ন। আমরা এর একটি মাত্র দিক নিয়ে আলোচনা করব। জমির অধিকার এবং ফসলের অধিকার—এই দুটি মাপকাঠিতে পরিবর্তনগুলিকে বিচার করতে পারি আমরা। ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টনের ফলে দুটি অধিকারই জমির প্রাপকের হাতে পৌঁছয়। অন্য দিকে, অপারেশন বর্গার ফলে ভাগচাষি জমির মালিকানায় ভাগ পান না, কিন্তু ফসলের অধিকারের ক্ষেত্রে আইনি (এবং রাজনৈতিক) নিরাপত্তা পান। কিন্তু এই অধিকার থেকে গ্রামীণ অর্থনীতির একটা নতুন ভিত তৈরি হয়েছে কি? এবং তা যদি না হয়ে থাকে, তা হলে শেষ অবধি এই অধিকার সুরক্ষিত থাকবে কি?

গ্রামীণ অর্থনীতির নতুন ভিত তৈরি করার জন্য কেবল জমি এবং/অথবা ফসলের অধিকার থাকলে চলে না, প্রয়োজন হয় জমি এবং ফসলের সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাটিকে ধারণ এবং পরিচালনা করার জন্য একটি সামগ্রিক পরিকাঠামো। কেবল বস্তুগত পরিকাঠামো নয়, একটি সামাজিক পরিকাঠামো। গোলাঘর, হিমঘর, বাজার, পরিবহণ, ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি যেমন জরুরি, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ জমি ও ফসলের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বর্গের

মানুষের পারস্পরিক যোগসূত্রগুলি, যেমন চাষি এবং ফসলের বিক্রেতার সম্পর্ক, বিক্রেতা এবং ঋণদাতার সম্পর্ক। পশ্চিমবঙ্গে এই দুই ধরনের পরিকাঠামো নির্মাণ তুলনায় সহজ কাজ, রাস্তাঘাট বা হিমঘর নির্মাণ মূলত অর্থ সংস্থানের প্রশ্ন, সুতরাং জটিল কিছু নয়। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক? আর একটু গভীরে গিয়ে ভাবলে, কৃষি অর্থনীতির সামাজিক পরিকাঠামোর সামগ্রিক বিন্যাস? সেটা এক দিনে পালটানোর নয়। এবং, সেখানেই এই রাজ্যে বড় রকমের পরিবর্তন জরুরি। একটি উদাহরণ যথেষ্ট। কৃষি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে। সরাসরি সমবায় প্রথায় চাষ থেকে শুরু করে, ঋণ, বিপণন, কৃষিভিত্তিক শিল্প ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে সমবায়ের বিস্তর সম্ভাবনা থাকে, অনেক দেশে, ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলেও সেই সম্ভাবনা পূরণের নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের ইতিহাস বামফ্রন্ট আমলে এক কথায় লজ্জাকর। আজও যে এই রাজ্যের কৃষকদের শস্য বিপণনের জন্য প্রধানত বড় আড়তদার/মহাজনদের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়, সেটা এই লজ্জার একটি প্রকাশ মাত্র।

কেন এই পরিস্থিতি? আমরা এই প্রশ্নের বিশদ উত্তর সন্ধানে যাব না, এখানে সে অবকাশ নেই। আমরা শুধু একটা কথা বলে আপাতত এই আলোচনা শেষ করব। এ দেশের গ্রামসমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকে মিলে কাজ করার একটা ধারা ছিল, আজও তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়নি। সেই সমবেত প্রক্রিয়ার মধ্যে অবশ্যই বিস্তর অসম্পূর্ণতা, বিস্তর ত্রুটি, কিন্তু প্রক্রিয়াটি চালু ছিল। একটি বামপন্থী দল এবং সরকারের একটা বড় কর্তব্য ছিল : এই সমবায়ের প্রক্রিয়াগুলিকে উৎসাহ দেওয়া, তার পথের বাধাগুলি অপসারণের চেষ্টা করা, সমাজের অন্তর্নিহিত বিভাজনগুলিকে, যেমন জাতপাতের বিভাজনকে দূর করে গ্রামসমাজকে যথার্থ সমবায়ের পথে চালিত করা। জমি বা অন্য সম্পদের সম-বন্টন কিংবা ভাগচাষির ফসল-ভাগের নিরাপত্তা—এ সবই ওই সমবায়-উদ্যোগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারত। সম্পদের সাম্য বা দরিদ্রের আয়ের নিরাপত্তা সমবায়ের আদর্শকে জোর দিত, সেই আদর্শে চালিত প্রক্রিয়াগুলিকে উৎসাহিত করত।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা ঘটেনি। গ্রামীণ অর্থনীতির সংস্কারের পুরো প্রক্রিয়াকে দেখা হয়েছে সম্পত্তির মাপকাঠিতে। ভাবা হয়েছে যে, দরিদ্ররা সম্পত্তির অধিকার বা আয়ের নিরাপত্তা পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হয়নি, হওয়ার কথাও ছিল না। উদ্বৃত্ত জমির বিচ্ছিন্ন প্রাপকেরা অনেকেই জমি ধরে রাখতে পারেননি, কারণ চাষ করার উপযোগী উপকরণ তাঁরা জোগাড় করতে পারেননি। ফলে বহু জমি ফিরে গেছে, যাচ্ছে। যাকে বলে বিপরীত ভূমিসংস্কার। বহু ভাগচাষির অবস্থাও তথৈবচ। অথচ একটা যথার্থ সমবায়ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারলে ওই সমস্যা এ ভাবে দেখা দিত না।

কিন্তু বামপন্থীরা কেন সমবায়ের প্রতি মনোযোগী হলেন না? তাঁরা কি চাননি, পশ্চিম-বঙ্গের গ্রামে সত্যিকারের সমবায় জোরদার হোক? তা হলে তাঁদের দলীয় আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে, তাই এই অনাগ্রহ? সম্ভব। খুবই সম্ভব। কিন্তু সম্ভবত তার বাইরেও একটা মৌলিক কারণ আছে। সেটা মানসিকতার সমস্যা। গ্রামকে অনাধুনিক, অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ

বলে ভেবে নেওয়ার সমস্যা। এই মানসিকতা যদি থাকে, তবে গ্রামীণ অর্থনীতির নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনাগুলি নজর এড়িয়ে যাবেই। এবং এই মানসিকতাই 'গ্রাম থেকে শহর'-এ যাওয়াকে উন্নয়ন বলে ধরে নেবে। পশ্চিমবঙ্গে এখন সেটাই ঘটছে। সম্প্রতি সিঙ্গুর এলাকায় কৃষিজমিতে মোটরগাড়ির কারখানা নির্মাণের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে কিছু বিক্ষোভ, আন্দোলন ঘটেছে। সেই আন্দোলনের মোকাবিলা করতে গিয়ে শাসকবর্গের নেতারা প্রধানত যে যুক্তি পেশ করেছেন তা হল এই যে, কৃষির উৎপাদনশীলতা কম, শিল্পের উৎপাদনশীলতা বেশি। উৎপাদনশীলতার এই হিসেবটা বাজারের হিসেব। জমির উৎপাদনশীলতার এই বাজারনির্ভর হিসেবের বাইরেও জমির একটা সামগ্রিক ব্যবহারিক মূল্য থাকে, যে গৃহপালিত গরু বা ছাগলটি ঘাস খাচ্ছে তার মূল্যও সেই মূল্যের অন্তর্ভুক্ত, পুকুরধার থেকে যে শাক তুলে এনে গৃহিণী রেঁধে দিচ্ছেন তার হিসেব বাদ দিলেও চলে না। বাজারের হিসেবে এই সব উপযোগিতার খবর থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে জমির ব্যবহারের প্রশ্নে বাজারের হিসেবকেই শেষ কথা বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। সেই কারণেই নতুন নীতি : পুঁজি যার, জমি তার।

বড়দিনের রাত

কার্তিক লাহিড়ী

হারিত অনেক কসরত করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না

প্রথম শুরু করে গল্প দিয়ে, তাতে কিছু হয় না, তারপর লেখে উপন্যাস, তাতেও কিছু না, তারপর লেখে প্রবন্ধ, শেষে সব ছেড়েছুড়ে কবিতা ও ছড়া, কেন

যে কিছু হয় না, বুঝতে পারে না হারিত, এটি র‍্যানডম্ অনেক পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠায়, একটাও ছাপা হয় না, তাতে খেপে গিয়ে ঠিক করে একেবারে বই আকারে বের করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে

কয়েকজন ছোট বড় প্রকাশকের সঙ্গে কথাও বলল সেই সুবাদে, তারা ছাপানোর জন্য যে হিসেব দিল, তাতে চক্ষু চড়কগাছ, এত টাকাই যদি দিতে হয়, তবে সে নিজেই ছাপাবে নিজের লেখা, কিন্তু তা করতে গিয়ে একটু থামে, আর ভাবে

নিজের লেখা সেভাবে নিজে ছাপলে তাতে প্রেস্টিজ পাংচার হবে, পাঠক লেখাগুলোকে করুণার চোখেই দেখবে, তাই সে এক বড় পাবলিশার্স-কে টাকা দিল ছাপার জন্য, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি দিয়ে কয়েকদিন বেশ তুষ্টির ঘোরে কাটল, কারণ তিন-চার দিনের মধ্যে কয়েক ফর্মার প্রুফ পেয়ে গেল, হাঁ...

গভীর তৃপ্তি অবশ্য বেশিদিন টিকল না, কারণ

প্রুফ আর আসে না, গিয়ে গিয়ে হয়রান হয়, এই তো যাবে—এই করতে করতে মাসের পর মাস কাটে, শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে টাকা ফেরত চাইলে প্রকাশক যেন আকাশ থেকে পড়েন, কী বলছেন! ওই টাকা দিয়ে একটা ঢাউস বই বের করা যায়? যে প্রুফ পাঠিয়েছিলাম, তা কারেকশন করে বার বার দেখে ছাপতে ওই টাকা কবে ফুরুত হয়ে গেছে, সে কথা জানবেন কী করে, এখন আপনার কাছেই আরও টাকা পাব আমি, সেগুলো বের করুন, তারপর...

ইত্যাদি শুনে হারিত হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারে না, কেবল বোঝে নিজের বই নিজে প্রকাশ করা ছাড়া অন্য রাস্তা নেই অতএব সে নিজেই বের করবে নিজের বই, যত টাকা লাগুক, কুছ পরোয়া নেই, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, হারিতের বেলায়

গৌরী সেন হচ্ছেন শ্বশুর গোপাল মুখোপাধ্যায়, একমাত্র মেয়ে, তার স্বামী বলে কথা, তাছাড়া টাকা নিয়ে করবেনই বা কী গোপালবাবু, আর জামাই হারিতের জন্য খরচ করলে মেয়ে বেশ সুখে থাকবে, খুটখামেলা হবে না কোনো, কিন্তু

যার কপাল ফাটা, সে যাতেই হাত দেবে, তা...অর্থাৎ

কোনো বই-ই এককপি বিক্রি হল না, ডাঁই করে পড়ে থাকল ঘরের মেঝেতে, একসময় সের দরে বিক্রি করার বাসনা হয়, এবং তা করতে করতে বেশ সময় চলে যায়, এখন হারিতের করার কিছু নেই, একটা কিছু করা দরকার, আর একবার লেখক হওয়ার ভূত ঘাড়ে চাপলে

মরেও সে শান্তি পাবে না, হাত তার নিশপিস করতে থাকবে লেখার জন্য, তাছাড়া মনের মধ্যে একটা জ্বালা কুরে কুরে শেষ করে দিতে থাকে

দীপক গুপ্ত তার চেয়ে বয়সে কয়েক বছরের ছোট, ক-দিনই বা লিখতে শুরু করেছে, কিন্তু এর মধ্যেই সে এমন নাম করে ফেলেছে যে এখন দু-হাত দিয়ে লিখেও কূল পাচ্ছে না, বাড়িতে সিনেমা-টিভির প্রোডিউসার, পত্রিকার সম্পাদক, নামী-দামি প্রকাশকদের লাইন লেগে যাচ্ছে—দীপকবাবুর একটা গল্পের পারমিশান কিংবা একটা লেখা কিংবা ধারাবাহিক যে উপন্যাস বের হচ্ছে তা বই আকারে প্রকাশ করা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে ওরা জড়ো হয়েছেন, আর এসে উপস্থিত হচ্ছে সভার উদ্যোক্তারা—কেউ দীপককে প্রেসিডেন্ট হিসাবে পেতে চায়, কেউ চায় প্রধান অতিথি বা বক্তাভাবে তার উপস্থিতি, অথচ

হারিতের ঘর খাঁ খাঁ করছে, কালেভদ্রেও কেউ আসে না তার কাছে, আর সবদিক থেকে হতাশ হয়ে চুপচাপ বসে গেলে শ্বশুরবাড়িতেও তার মানমর্যাদা তেমন অটুট থাকছে না, শালারা বাঁকা চোখে তো দেখছেই, শাশুড়ি পর্যন্ত তাকে অপদার্থ ভাবছেন, স্ত্রী মোহনা আর কত সামাল দেবে

হারিত সব বুঝছে, এরকম চলা উচিত নয়, কিছু একটা করা দরকার, কী করবে, ভাবতে ভাবতে টিভি দেখতে বসে যায়। খবরের কাগজ টেনে পড়তে থাকে, আর ভাবতে ভাবতে দেখতে দেখতে পড়তে পড়তে হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে টিভি-র সুইচ্ অন্ করে, এবং চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইংরেজি হিন্দি হাল-আমলের বাংলা ছবি দেখতে থাকে—ইয়েস, এইসব খুন জখম ধর্ষণ রাহাজানি মারদাঙ্গা প্রতারণা লোকে গিলছে খুব, খবরের কাগজ খুললে সেইসব খবরের ছড়াছড়ি, অতএব আর দেরি নয়

হারিত হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাগজের উপর, যে খবরটা প্রথমে চোখে পড়বে তাকে বেস্ করে লিখে ফেলবে দারুণ একটা কিছু, এবার দেখব কে কাকে ঠেকায়, একবার ক্লিক করলে তখন কে দেখে, পয়লা রাতেই মারতে হবে বেড়াল, তখনই তার চোখ গিয়ে পড়ছে—পুলিশের খপ্পরে চারজন, এমন শিরোনামের একটি খবরে—

২

এক সুদর্শন যুবক নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে বাঁচালো একটি যুবতীর ইজ্জত। যুবকটি নিহত হচ্ছে দুষ্কৃতকারীদের হাতে। মহিলাটি মুক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে তার বহনকারীর সঙ্গে মোটরবাইকে, ফিরেও তাকায় না, এমনকি নিহত ব্যক্তির বন্ধুরা এগিয়ে আসে না দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে মুক্ত করতে। জানা যাচ্ছে, নিহত যুবকটি এক সরকারি কর্মচারী...

খবরটা পড়তে পড়তে হারিতের মুখ দিয়ে স্ফুট হয়ে যায়—

বড়দিনের রাত...বাল্মীকির কবিত্বলাভের মতো মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ—উচ্চারণের মতো বড়দিনের রাত এই উচ্চারণ হারিতের এতদিনের না লেখার কপাট খুলে দিচ্ছে এক লহমায়, কাগজ কলম টেনে নিয়ে সে লিখতে শুরু করে বিনা চিন্তায় কোনো বাধা বিপত্তির মুখোমুখি না হয়ে, সে লিখে চলে

বড়দিনের রাত

প্রথম প্রহরের হই-হুল্লোড় হইচই হল্লা চেঁচামেচি স্তিমিত হয়েছে, গাড়িঘোড়া ভ্যানরিকশা

অটো ইত্যাদির চলাচল কমে এসেছে, এমনকি মানুষজনের, শুধু কোথাও কোথাও টুনি বাল্‌ব আপন মনে জ্বলছে নিবছে, এবং

কিছু মদ্যপ স্খলিত পায়ে চলতে চলতে ঢলে পড়ছে রাস্তায়, আর আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে শুয়ে পড়ছে

রাস্তা নির্জন, ফাঁকা, এবং শান্তও বটে

কচিৎ দু-একটা গাড়ি হুশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, একটা কুকুর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, মানুষজন তো কোন ছার, কেবল টুনি বাল্‌বের জ্বলা নেবার আলো-ছায়ার অন্ধকারে চারজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কারো-র জন্য কি অপেক্ষা করছে তারা? দেখে মনে হবে পেটে তাদের দু-চার ফোঁটা মদিরা মজুত আছে, চোখ কিঞ্চিৎ ঢুলু ঢুলু তার টানে, চারজন ছায়ান্ধকারে চোখ বিঁধিয়ে কিছু দেখতে চেষ্টা করছে না, কেন দাঁড়িয়ে আছে কী জন্যে সে সব তাদের মাথায় নেই, শুধু দাঁড়িয়ে আছে মাত্র, তখন

একটা মোটর-সাইকেল ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে আসতে থাকে

চালক ছাড়া পিলিয়নে বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা, চালক হেলমেট পরা, মহিলাটি হেলমেটহীন

হেলমেট পরা বলে চালকটি যুবক না মধ্যবয়েসি বোঝা যাচ্ছে না, তবে মেয়েটি যুবতীই বটে এবং সুশ্রী-ও, এরা এসময় কোথা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না, যাচ্ছে কোথায়—তা-ও না, এরা কি কোনো বন্ধু বা আত্মীয়-র বাড়ি থেকে বড়দিনের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছে, নাকি কোনো রেস্তরায় ডিনার সেরে? ফিরছে বাড়িতে কি? এরা কি স্বামী-স্ত্রী, নাকি মেয়েটি চালকের গার্লফ্রেন্ড? নাকি কলগার্ল? কিন্তু

দুজনে যেভাবে বসেছে ও চলছে, তাতে মনে হচ্ছে এরা স্বামী-স্ত্রী, এবং বিয়ে হয়েছে বেশ কিছু দিন, ফিরছে বড়দিন সেলিব্রেট করে, 'ক্যান্টন্'-এ চাইনিজ খেয়ে

চালক মন্থর গতিতে বাইক্ চালাচ্ছে, বেশ স্পিডে চালাতে পারত, কিন্তু বেশি জোরে চালালে মহিলাটি ভয় পায়, তার কড়া নির্দেশ—বেশি স্পিডে বাইক চালানো চলবে না, তাহলে সে যাবে না, কিংবা যখন-ই স্পিড দেবে, সেই মুহূর্তে সে নেমে পড়বে, অতএব

তেমন গতিতে চলছে মোটর-সাইকেল, কিন্তু এই গতিতে চললে বিপদে পড়তে পারে, তা আঁচ করা যে-কোনো জনের পক্ষে কঠিন, এরাও পারেনি, তাই...

সেই মুহূর্তে রাস্তার উপর মোটর-সাইকেলের সামনে এসে দাঁড়ায় চার দুষ্কৃতকারী, চালক যান থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়, থামিয়ে সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে জানতে চায়, এর মানে কী? ততক্ষণে

এদের মধ্যে একজন মহিলা-কে বাইক থেকে টেনে নামিয়েছে, টাল সামলাতে না পেরে সে ওই লোকটির শরীরের উপর পড়ে যায়, তার ফলে দুজনেই ধরাশায়ী হয়, তখন

আরেকজন দ্রুত এগিয়ে এসে মহিলার শাড়ি ধরে টানতে থাকে, তৃতীয়জনও সবুর করতে না পেরে দ্বিতীয়জনের মতো মহিলার পরিধেয় টেনে খুলতে চেষ্টা করে, প্রায় বিবস্ত্র করার মুখে ভগবানের আশীর্বাদের মতো যুবকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে দুষ্কৃতকারীদের উপর

যুবকটি চার বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিল বড়দিনের ফুর্তি করতে, মুনলাইট রেস্টুরেন্টে খেয়েদেয়ে

সামান্য এক এক পেগ গিলে আবার বেরয় মৌজ করতে, দিব্যি আসছিল, ঠান্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়েও যাচ্ছিল, সেই আমেজে একজন গানও ধরে—হাওয়া মে উড়তা যায়ে মেরে লাল দোপাট্টা...

গানের মধ্যে নজরে পড়ে ওই কাণ্ড

একজন মহিলাকে ধর্ষণ করতে চাইছে চার গুন্ডা, সে তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামাতে বলে, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর, তারপর যা হওয়ার হয়, খবরের কাগজের ভাষায়—

চারজন দুষ্কৃতি আক্রমণকারীর উপর পাল্টা ঝাঁপিয়ে পড়ে, শেষে গলা টিপে তাকে খুন করে। কিন্তু যার জন্য এত কাণ্ড, সেই মহিলাটিকে আর দেখা যায় না। সঙ্গী চালক তাকে নিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়। পুলিশ শেষে চারজন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে। ভদ্রমহিলা কিংবা তার সঙ্গী চালকের কোনো খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি, তবে পুলিশ অনুসন্ধান জারি রেখেছে।

পুলিশ চারজনের বিরুদ্ধে দারুণ দারুণ অভিযোগ দায়ের করছে, তাদের বিরুদ্ধে চার্জ হচ্ছে :

মার্ডার অর্থাৎ খুন

জঘন্য নরহত্যা, ক্যালপেবল্ হোমিসাইড, কিন্তু

পুরো চেপে গেছে নারীঘটিত ঘটনা, খবরের কাগজের যেটা ছিল মুখ্য বিষয়, কেন পুলিশ এটা চেপে যাচ্ছে তা বেশ ধাঁধার মতো লাগছে, অবশ্য পরের দিন কাগজে এ রকম কিছু বেরয়, পুলিশ অথচ নির্বিকার, তারা

এদের খুনি হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়, এখন প্রশ্ন

এদের সঙ্গে কি ওই থানার পুলিশদের কোনো শত্রুতা আছে, নাকি তোলা দেবার ব্যাপারে এরা আপত্তি করেছে, কিংবা তোলা দেয়ইনি মোটে? তাই

পুলিশ এদের ফাঁসাতে চাইছে খুনের মামলায়, এর সঙ্গে ধর্ষণের ব্যাপারটা জুড়ে দিলে তো ওদের বিরুদ্ধে কেস্‌টা দারুণ জোরালো হয়ে উঠত, সরকারি উকিল তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এ-ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কাউকে পাওয়া যায়নি

দ্বিতীয়ত এবং সেটাই মূল—যে মহিলাকে নিয়ে ঘটনা তাকে পাওয়া যায়নি, কখনও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, তাই একজন খুন হয়েছে, এবং পুলিশ খুনিদের গ্রেপ্তার করেছে, আর কিছু প্রমাণ জোগাড় করেছে এদের বিরুদ্ধে, সরকারি উকিল

জোরালো সওয়াল করলেন, ওদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলেন, এবং মহামান্য আদালতের কাছে আবেদন রাখলেন আসামিরা যেন কড়া-সে-কড়া সাজা পায়—ফাঁসি-র হুকুম দিতে না পারলে যেন যাবজ্জীবন হয়, উকিল বিজয়ী গর্বে তাঁর কালো জোব্বা গুটিয়ে বসে পড়েন, তখন

শান্তশিষ্ট চারজন তাদের আসামি বলাতে আপত্তি তোলে, আর সারাক্ষণ নিশ্চুপ থেকে এবার নিজেদের কথা বলার জন্য মহামান্য বিচারকের কাছে আবেদন পেশ করে

মহামান্য বিচারক একটু চিন্তা করে চারজনকে তাদের বক্তব্য বলার অনুমতি দেন এক এক করে

একের পর এক তারা যা বলে, তার বয়ান প্রায় হুবহু এক, সেই বয়ান এরকম :

আমরা নির্দোষ। বরং আমাদের উদ্ধারকারী বলা উচিত। একটা মেয়েকে আমরা বাঁচিয়েছিলাম ধর্ষণের হাত থেকে। সেদিন বড়দিন। বড়দিনের লাইটিং দেখে ফিরছিলাম। রাত তখন কত হবে, হয়তো এগারোটা। নির্জন রাস্তা, জনপ্রাণীশূন্য। রাস্তার আলোও তেমন জ্বলে জ্বলে। এক জায়গায় টুনি বাল্‌ব জ্বলছিল নিবছিল, তা পেরিয়ে অন্ধকার রাস্তা। দেখি একজন যুবক একটি মেয়েকে মোটরবাইক থেকে টেনে নামিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি ওই যুবকটির উপর। তার হাত থেকে মেয়েটিকে টেনে বার করতে চেষ্টা করি, তখন ধস্তাধস্তি হয়। সেই সময় মেয়েটিকে সরিয়ে আনতে ছেলেটিকে সরাতে চেষ্টা করি, তখন হয়তো ধাক্কা লেগে যুবকটি টাল সামলাতে না পেরে রাস্তার উপর পড়ে যায়। মাথায় চোট লাগে। আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, একটা গাড়ি পেলে হয়তো বাঁচানো যেত, কিন্তু ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে একটি গাড়িও পাওয়া গেল না, ফলে সব শেষ হয়ে গেল।

আমরা তাকে শুধু শুধু খুন করতে যাব কেন? ওকে আমরা চিনি না, জানি না, ওই প্রথম দেখছি। ওকে আমরা কেন খুন করতে যাব? একটা উদ্দেশ্য তো থাকতে হবে খুনের। যেটা আকস্মিক ঘটনা, তাকে পুলিশ খুন বলে ধরে নিচ্ছে, আর মেয়েটির ঘটনা বেমালুম চেপে যাচ্ছে, কারণ তারা মেয়েটিকে বা মোটর-বাইকের চালককে ধরতে পারেনি, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে ধরেনি। আদি কারণ বাদ দিয়ে অন্য একটা কারণে আমাদের অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

ধর্মাবতার, এবার বিচার করুন আমরা দোষী কিনা?

মহামান্য বিচারক এদের শাস্তি দেবার পক্ষেই ছিলেন, কিন্তু খুনের প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রমাণ না থাকায় একটু মুশকিলেই পড়ছিলেন, সরকারি উকিল অবশ্য সারকামস্টেনসিয়াল্‌ এভিডেন্সের উপর জোর দিয়ে সওয়াল করেন, মাত্র তার উপর ভিত্তি করে কি কঠিন শাস্তি দেওয়া যায়? আর

-এদের বক্তব্য যদি সত্যি হয়, কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? সেই মেয়েটির চিহ্ন পর্যন্ত নেই, এমনকি সে থানায় এসে ঘটনাটা নথিভুক্ত করেনি। তাহলে কী করে দোষ দেওয়া যাবে ওই যুবকটিকে, যে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল, তবু...

এদের বক্তব্য ফেলে দেওয়া যায় না

কিন্তু তবু ইত্যাদি মহামান্য বিচারক-কে একটু দ্বিধায় ফেলে দেয়, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর বিচারক ঘোষণা করেন, আগামী ২৮ তারিখ পর্যন্ত তিনি রায়দান স্থগিত রাখছেন, তারপর

মাননীয় জজসায়েব আদালত কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান নিজের খাস কামরায়...

মাননীয় বিচারক কী রায় দেবেন? হারিত গল্পটা শেষ করতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে—

উনি কি ওদের দোষী ঠাওরাবেন? নাকি-বা ইজ্জত রেহাই করে দেবেন?

শাস্তিটা কঠিন হবে, না অল্প? নাকি—

হারিত কোনো মীমাংসায় আসতে পারছে না, কারণ আইনকানুন সম্বন্ধে সে কিছু জানে না, তাহলে?

হঠাৎ মনে হয়, ব্যাপারটা পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলে কেমন হয়? সঙ্গে সঙ্গে লেখে—

পাঠক! একটু ভাববেন কি? লিখেই সে চিৎকার করে ডাকে, মোহনা শুনে যাও, আমি পাঠককে লেখক করে তুলছি, দারুণ ব্যাপার, শীঘ্রি এসো তবে...

অনধিকারে ভূমিস্বত্ব

অমলেন্দু চক্রবর্তী

হাকিমের এজলাস থেকে বেরিয়ে কুযুক্তির মিথ্যেগুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলার নিয়মেই উকিলবাবুরা যেভাবে বাধ্যতার কালো জামা খুলে ফেলে অন্যসব ভদ্রলোকের ভিড়ে মিশে যান, মূলত একা-একা বিছানায় শুয়ে থেকে দুঃস্বপ্নের রাতটা যে কখন ফুরিয়ে গিয়ে ভোর হলো বাইরে, দীর্ঘ অনিদ্রায় চোখ খোলা রেখেও কিছুমাত্র ঠাহর পেলেন না শশিভূষণ। ফার্স্ট ট্রেন গড়িয়ে চলে যাচ্ছে দূরে। জন্মভিটের গ্রামে এত এত বছর কাটিয়েও তার একঘেয়ে দীর্ঘ আওয়াজ, মনে পড়ে না, শুনেছেন কোনোদিন। শুনলেও কচিৎ কদাচিৎ। সাধারণত তাঁর রাত ফুরোয় ছটায় সাড়ে ছটায়। আজ আর রাত ফুরোবার ঝামেলা ছিল না। ঘুমভাঙাও নেই। কাল রাতে ঘরদোর-আলমারি ভাঙাভাঙি তছনছের পর দুর্লভ ঘুমটুকুও ভেঙে দিয়ে গেছে। দুটো চোখের পাতা ঝিমিয়ে পড়ে গভীরে ডুবে যাবার অনেক আগেই।

বেলা গড়াচ্ছে। কটা বাজে এখন? বাপের আমলের একটা পুরনো সাহেবি দেয়ালঘড়ি। আজও দেয়ালে ঝুলছে। ঘন্টায় ঘণ্টায় জানান দিত দিন আর রাতের সময়-নির্ঘণ্ট। পেন্ডুলামটা ঘুরছে না অনেক বছর। একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে স্থির। আজ যেমন তাঁরা নিজেরাই দুই বুড়োবুড়ি। নিজেদের প্রাচীন ভদ্রাসনে অনাথ বাপ-মা। মনে পড়ে ছেলেবেলায় বাবা, এমন কি, বুড়ো বয়সেও একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের হাতে দম দিতেন রোজ সকালবেলা। বাবার পর তিনি নিজেও দিয়েছেন কয়েক বছর। তারপরই জরায় ধরল কলকব্জায়। এর মধ্যে বিদ্যুৎ এল গাঁয়ে। ঘরে টেলিফোন এল, টেলিভিশন এল। কিন্তু বাতিল ঘড়িটাকে কলকাতা কি বর্ধমান নিয়ে গিয়ে সচল করবার কোনো চেষ্টাই করল না কেউ। ওর কাঁটাগুলো যদি হাঁটতে শুরু করত আবার, হয়তো তিনি নিজের হাতে পায়েও কিছুটা জোর পেতে পারতেন আগের মতো। পুরনো দিনের দেশগাঁয়ে বড় খানদানি গৌরব ছিল ঘড়িটার। বাবার বড় ভালোবাসার, আরো বড় রকমের একটা অহঙ্কারের সম্পদ। বিপুল গর্জনে ওর ঘণ্টা বাজলে, এক সময় রাস্তার মানুষও থমকে দাঁড়িয়ে হিসেব শুনত, বেলা কত গড়াল এখন।

জানালায় ভোরের আলোয় ঘরের অন্ধকার কাটে নি তখনও। শিয়রে বালিশের পাশে টর্চটা খুঁজে নিয়ে, আলো ফেলে দেখলেন, ঘড়িটা আছে, যেখানে যেভাবে থাকার কথা। পুরোপুরি থেমে যাবার আগে ওর শেষ সঙ্কেত—দুটো একুশ বা বাইশ। দিন বা রাত নির্দেশ নেই। আশ্চর্য। কাল রাতে এ-রকম সময়েই লোকগুলো ঢুকেছিল এ-ঘরে। কালের প্রহরী কত বছর আগে চিহ্নিত করে রেখেছিল সে-সময়? শশিভূষণ নিজেই বুঝে উঠতে পারেন নি সঙ্কেতবার্তা? ওদেরও নজরে পড়ে নি সেদিকে। কিংবা পড়েছিল। ছোঁয় নি। ওরা চেনে—গিল্টি আর সোনা। খাটের ওপর উঠে বসলেন সোজা হয়ে। পাশেই হাত-

পা সিঁধিয়ে গোটা শরীরে দলা পাকিয়ে বুড়ি পড়ে আছে নিঝুম। কাল রাতে ওরা চলে যাবার আগেই সেই যে ভয়ে আতঙ্কে হাড়মাসের কাঁপুনিতে ঠাকুরের নাম জপতে এক ঝটকায় আছড়ে পড়েছিল মেঝেয়, আর কোনো কথা ফোটে নি মুখে। কান্নাকাটি আবেদন নিবেদন, এমন কি কাতর গোঙানিটুকুও থেমে গিয়েছিল। ওরা একটু থমকে গিয়েছিল মাত্র। পেশায় অবিচল থাকতে গেলে বুঝি এ-রকমই হতে হয়। হওয়া দরকার। এসব ফালতু মাসিপিসিঠাকুরমাদিদিমাদের জন্যে এ-রকম এক মিনিটের নীরবতাই যথেষ্ট। নিজেদের কাজগুলো চটজলদি গুছিয়ে নিতে হলে আর সব মানুষকে ইঁদুরআরশোলার বেশি পাত্তা দিতে নেই। নইলে ওরা নিজেরাই অচল। এত অসম্মান এত অপমানের পরও ছেলেগুলোর দিকে ভ্যাবলা চোখে তাকিয়ে থেকে শশিভূষণ তাঁর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতায় ভাবতেই পারছেন না এটা আদৌ সম্ভব? দু-বেলা পোস্ত কলাইয়ে ভরপেট খেয়ে দেশগাঁয়ের কোনো ছেলে নিজের শরীরটাকে এমন শক্ত মুগুর বা এতটা অমানুষ করে তুলতে পারে? কৃতবিদ্য মানুষ হবার জন্যে যে-পরিশ্রম, তার চেয়ে বোধ হয় সেটা কিছুমাত্র কম নয়। মনে মনে ওদের পেশাগত নিষ্ঠায় প্রচ্ছন্ন তারিফ এবং একই সঙ্গে ক্রোধ ঘৃণা বা ভ্রূকুটি থাকলেও বুড়ির হতচেতনে দিককূল হদিশ না পেয়ে মেঝেতে বসে পড়েছিলেন ঝপ করে। নিজের স্ত্রীকে দু-হাতে আগলে রেখে নিজেরই ঘরে নিজেকে বড় অসহায় বড় নির্বোধ মনে হচ্ছিল তাঁর। ডাকসাইটে কড়া হেডমাস্টার বলে এক সময় খ্যাতি বা অখ্যাতি দুটোই তাঁর ছিল। হয়তো ধারণাটা আজও বহাল আছে জনশ্রুতিতে। আসলে সবই অর্থহীন বিলাপকথন। এসবের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব, সাতপুরুষের ভদ্রাসনও আজ আর কারুর নিরাপদ আস্তানা নয়। বিজলী বাতি টেলিফোন সবই আজগুবি সুরক্ষা। মাঝরাত্তিরে কারা এসে ঢুকে পড়ল তাঁর বাড়ির ভেতর? চতুর কৌশলে তাঁকে বোকা বানিয়ে একেবারে শোবার ঘরে। যথারীতি হাতে পিস্তল ছিল। সেটা খেলনাপুতুল নাকি সত্যি-সত্যি—যাচাইয়ের অবকাশ ছিল না। শিষ্ট অভিধানে দুর্লভ ওদের বুলিতে ধর্ষিতা মাতৃভাষায় ওদের বাচন যে যুতসই ফিলমি কায়দা হয়ে ওঠে নি, সেটা বুঝেছিলেন শশিভূষণ। ওরা হয়তো ভেবেছিল, দুটো বুড়োবুড়ির জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। ভুল ভাবে নি কিছু। শুধু ভেলকিতেই হাত বদলে চলে গিয়েছিল চাবির গোছ। এর পর যা ঘটল, সবই মালিক-মালকিনকে সামনে রেখেই।

বিছানার বাইরে পা দুটো গড়িয়ে দিয়েছিলেন আগেই। ঘাড় ফিরিয়ে আরো একবার তাকালেন বুড়ির দিকে। এমনটা হয় না কোনোদিন। তিনি ভোরবেলা ঘুমের আলসেমি ছেড়ে উঠবেন, অথচ মেনকা শুয়ে থাকবে? আজ প্রায় একটানা ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ বছর একসঙ্গে ঘর করবার পর মনে করতে পারছেন না এমন ব্যতিক্রমী ভোর। নিচু হয়ে টর্চ জ্বেলে পরখ করলেন। ঘুমোচ্ছে? নাকি অন্য কিছু? মাথায় আলতো হাত রেখে বা নাকের তলায় আঙুল ছুঁয়ে ঘন নিশ্বাসের বাতাস পেয়েও অক্ষয়কে ডাকবেন কিনা একবার, ভাবলেন। নারু গুইঁর মেজছেলে অক্ষয় এম.বি.বি.এস. করে এখন দেশের বাড়িতেই থাকে। চেম্বার করেছে বাজারে তেঁতুলতলায়। সকালের দিকে বাড়িতে থাকলে টেলিফোনেই

পাওয়া যেতে পারে। দেরি হলে বেরিয়ে যাবে। খাট থেকে নামলেন শশিভূষণ। বড় অলস দেহভার।

যে-দুঃস্বপ্নের রাত তাঁর বিনিদ্র নিশিযাপনের বিভীষিকা, মেনকার এত বেশি নিশ্চিত নিদ্রা বরং সেখানে কিছুটা অস্বাভাবিক। কাল রাতে ঘরে যখন মুষলপর্ব চলছে, তখনই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে বুড়ির শরীরটা অসাড় হয়ে পড়েছিল। স্ত্রীকে দু-হাতে ধরে থেকে ওর হাতের মুঠো আর ঠোঁট ফাঁক করে দাঁতের পাটি পরখ করেছিলেন বারবার। এর চেয়ে অবোধ কান্না বা গোঙানি বরং ছিল ভালো। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় ছিলেন। ওরা চলে যাবার পর যখন একা, ক্ষয়ক্ষতির হিসেবটিসেব তুচ্ছ, বুড়িকে নিয়েই ভাবনা। অথবা বুড়ির ভাবনায় বা পতনের হেতু যে তিনি নিজেই, সেটা জানেন বলেই আরো বেশি আত্মিক পীড়নে দগ্ধ বার্ধক্যের গ্লানি বা লজ্জা বা অন্তর্দাহ। ঘর জুড়ে ছেলেগুলোর যে-দৌরাত্ম্য চলছিল, চোখ মেলে সবই দেখছিলেন বুড়োবুড়ি। সইছিলেন অসহায়। একটানা পঁয়ত্রিশ বছর জন্মভিটের মাটিতে গ্রামের একমাত্র বড় ইশকুলে যাঁর শিক্ষকতা, যার মধ্যে পাক্কা পনের বছর প্রধান শিক্ষক, শেষ বয়সে এসে যেভাবে তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হলো, সেটা কি শশিভূষণের নিজেরই ভুলে যাবার কথা? অবুঝ হাতটা অকারণ ওপরের দিকে উঠে আসে। খোঁচা-খোঁচা গালে অকারণ হাত বুলোয়। সুগভীর ক্ষত। রক্তপাত নেই, তাৎক্ষণিক ব্যথাযন্ত্রণা যা ছিল, সবই ফুরিয়ে গেছে। পরিচ্ছন্ন জীবনের ক্ষত। সে-কি এভাবেই আদৌ মুছে যাবার? কত আর বয়স হবে ওদের? আঠার কুড়ি বাইশ? বড়জোর পঁচিশ? মাথা থেকে থুতনি অব্দি ফেট্টি বেঁধে নাকমুখগালকপাল ঢেকে শুধু দুটো চোখ ভাসিয়ে রাখা। এতে কি আর ঠিকঠাক বয়স চেনা যায়? তবু ওদের চলাফেরায় আনাড়িপনায় ফিসফাসে গলার-স্বরে এ-রকমই কিছু একটা বয়স মনে হয়েছিল তাঁর। শুধু একজন। চাবিটা হাতে পাবার পর আলমারির দখলদারির সবটাই যে-ছোঁড়া নিজের কব্জায় রেখে দিয়েছিল, নির্ঘাৎ পালের গোদা, ওর বয়সটা হয়তো খানিকটা। তাই বা কত হবে? পঁয়ত্রিশ চল্লিশ। নাকি তারও বেশি? হবেও বা।

এগোলেন শশিভূষণ। মগজটা থেমে থাকে না। হাঁটে পায়ে পায়ে। ওদের বয়স ভেবে কী লাভ? ভাবনাটা থেকেই যায়। তাঁর চার বছরের নাতির খেলনাগুলোও তো পিস্তল বন্দুকট্যাঙমিশাইল। ব্যাটারিতে সবই আগুন ঝলসায়। বুক উজাড় করে একটা গাঢ় নিশ্বাস। তাঁর দুঃস্বপ্নের রাত শুধু একটি রাত নয়। সেটা অনেক বড়, আরো দীর্ঘতর।

কাল রাতে একটি ছেলে তাঁর চোখে চোখ রেখেছিল। আকস্মিকতায় আঁতকে উঠেছিলেন শশিভূষণ। দুটি চোখেই তীক্ষ্ণ জ্বালা ছিল। একটা বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতার সেই জ্বালা অন্য অর্থে ভিন্নভাবে নিজের মধ্যে চারিয়ে যেতেই কালো কাপড়ে মুখোশঢাকা মুণ্ডুর কোটরে চোখ দুটো দেখেই কী মনে হয়েছিল তাঁর, বলেই ফেলেছিলেন—'তুই? তুউউউ...' সত্যি বলেছিলেন কি? কী জানি, কী মনে হয়, হয়তো বলেননি নি। কিন্তু ওর দৃষ্টিটা বিঁধে আছে বুকে। সেটা থাকবে। কোনোভাবেই ভুলে যাবার নয়। কোন ফোরেন্সিক একস্‌পার্ট অ্যাদ্দুর আসবেন এই পচা ঘুঁটেগোবরের দেশগাঁয়ে? এলেও ঘরের দরজাজানালায়,

মেঝে বা আলমারির হাতলে হাতের ছাপ পায়ের ছাপ খুঁজবেন। কিন্তু মানুষের গালে কোনো ছাপ? এর চেয়ে তিনি যদি ওদের পিস্তলে গুলিবিদ্ধ হতেন? বরং ছিল ভালো। কিছুটা মর্যাদা জুটত। শহর পর্যন্ত টানাহ্যাঁচড়া হতো শরীরটা নিয়ে। ছুরিকাঁচির রক্তপাতে খাঁচাবন্দী একাধিক বুলেটও নাকি বের করে নিতে পারেন সার্জেনরা? মৃত্যুটাও কত সহজ হয়ে যেতে পারত তাহলে।

যুদ্ধশেষে ভগ্নস্তূপে নিজের বিধ্বস্ত বসতভূমিতে ফিরে এসে বিশেষ কোনো অন্তরঙ্গ প্রিয়সামগ্রী খুঁজে দেখা লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে পারে না সর্বশূন্যতার হাহাকারে। সে-চেষ্টা করছেনও না তিনি। ওপাশে জানালার দিকে ভোরের আলো অনেকটা উজ্জ্বল। আলমারিটা আছে, যেমনটি থাকার কথা। ধর্ষিতাকে যেভাবে দেখা যায় মূর্ছায় অচেতনে, নিদ্রিত শবাসনে রক্তপাতহীন। অপরাধের অপরাধীর চিহ্নমাত্র নেই। বন্ধ আলমারি। চাবির গোছ বাইরের দিকে ঝুলছে। সেটা তো গেরস্থের নিজেরও ভুল হতে পারে। জড়বস্তুকে নিয়ে আরো এক মুশকিল এদের কোনো পোস্টমর্টেম নেই।

আরো একবার টর্চ ফেললেন শশিভূষণ। ওদের নিশানা কী ছিল, কেন এসেছিল, তিনি জানেন। কাল সকালেই গ্রামের একমাত্র ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনা পঁচিশ হাজার টাকার তিনটে বান্ডিল। বোধ হয়, ওতেও লোভ মেটে নি। আরো ক্ষুধা ছিল। আলমারির থাকে-থাকে আর যা কিছু ছিল—বছর বছর ছেলেমেয়েদের দেওয়া পুজোর শাড়ি, তাঁর নিজের কিছু ধুতিপাঞ্জাবি ছাড়াও পুরনো কাপড়চোপড়ের পোঁটলাপুঁটলি কাঁসাপেতলের বাসন হাবিজাবি সবই টেনেহিঁচড়ে বাইরে এনে ফেলে রেখে গেছে সব। মুষিক বা মার্জারস্বভাবে বেঁচে থাকার অভ্যাসে গুছিয়ে রাখার বাড়তি দায় ওদের নয়। সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে মেঝেতে। আপদবিপদে এভাবেই রেখে দেওয়া নিয়ম। কর্তাব্যক্তিরা আসবেন কেউ। দেখবেন। কাকে ডাকবেন শশিভূষণ? দেশের সবাই খুব ভালোমানুষ নয় বলে থানাপুলিশের আয়োজন। পুলিশের কর্তারা লাঠিবন্দুক নিয়ে আসতেন অপরাধী বেপাত্তা হলে। ক্ষত ও ক্ষতি অভাজনদের। আশ্বাসের কোন্ মলমে কতটুকু প্রলেপ দিয়ে যাবেন প্রভুরা? এঁদের কারোরই বোধ হয় কোনো দোষ নেই। দেশজোড়া, শুধু দেশ কেন, দুনিয়া জুড়ে চক্রজালে কারা যে কোথায় কোন্ বিধাতা ছক সাজিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের ফন্দিতে, সবই ইচ্ছাময়ী তারা, তাঁরই ইচ্ছার অধীন ঘুঁটিগুলো খেলে যাচ্ছে নিয়মমতে। বরং পঞ্চায়েতের মাতব্বর ঝিলতলির আমজাদ নয়তো অঞ্চলপ্রধান সুখচরের দুলাল বাগুইকে বলা যেতে পারে। ওরা দুজনই তাঁর পুরনো ছাত্র। জানেন অবিশ্যি ওদের দিয়েও হবে না কিছুই। আসলে কিছুই হবার নয়। তবু কিছুটা নিয়ম মেনে চলা। অনেকটাই নীলের উপোস, অম্বুবাচীর মতো বিধিপালন।

শান্ত পায়ে দরজার দিকেই এগোলেন শশিভূষণ। আমজাদ আর দুলাল ওদের নম্বরগুলো দিয়ে গিয়েছিল বছর দুই-তিন আগে। শুধু তো ওদেরই নয়। অক্ষয়কে ডাকতে হবে আগে। বিভুকেও তো জানানো দরকার। কিন্তু এখন বাজেটের সময়। সরকারি দপ্তরে গেজেটেড অফিসার। ওরা বড় ব্যস্ত থাকে এ-সময়। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই নাকি

রাত্তির হয়ে যাচ্ছে রোজ। ওকে বিব্রত করাটাও কি ঠিক হবে এখন? কিন্তু বড়ছেলে। মনু বা শুনুর মতো দূরেও থাকে না। কলকাতায় সাহাপুরে অফিসের ফ্ল্যাট। হাওড়া থেকে রেলগাড়িতে মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের পথ।

ঘরে ডাকাত পড়লে সত্যি-সত্যি বড় রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় যাদের বা দেশগাঁয়ে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে, অতশত বিত্তসম্পদ তাঁর অবশ্যই নেই। লুটে নেবার কিছুই ছিল না, অথবা যেটুকু ছিল, সেই পঁচিশ হাজার টাকা, আলমারির চাবিটা স্বেচ্ছায় হাতে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধহীন সেটুকুও সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু আত্মসম্ভ্রম? কোনো উপশম নেই জেনেই ক্ষতস্থানে, বাঁদিকের গালে, আস্তে আস্তে হাতের তেলোয় প্রলেপ বুলোতে থাকেন অনেকটাই অনাবিষ্ট অবচেতন তাড়নায়। জন্মভিটের গ্রামটাকে বড় ভালোবাসেন তিনি।

দরজাটা বন্ধ ছিল। কাল রাতে ওরা চলে যাবার পর সেটা খোলা থাকারই কথা। মনে পড়ল, বুড়ি যখন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে নিঃসাড় পড়েছিল, দিশেহারা শশিভূষণ কী করবেন হদিশ না পেয়ে একা, যেখানে বাইরে বেরুলেই আঁধার রাতে গোল্লায়-যাওয়া ছেলেগুলো কে কোথায় ওত পেতে আছে, কী করছে, কিছুই জানা নেই। নতুন করে কোন্ শয়তানের খপ্পরে পা? সরাসরি এগোতে ভরসা পান নি খুব। অথচ অসম্মানের যন্ত্রণাটা জ্বলছিল ভেতরে ভেতরে। নিভে-যাওয়া সেই জেদ, বয়সকালে একদিন যা ছিল—ভয়কে ভয় পেতে নেই। কলতলা থেকে এক বালতি জল আনার জন্যেই দরজাটা খুলেছিলেন একবার। ঘরে ফিরে সেটা নিজেই বন্ধ করেছিলেন।

দরজায় খিল তুললেন। ওপরের ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরুতেই এক ঝটকায় খাঁচা ভেঙে এক ঝাঁক পায়রার আকাশ পেয়ে যাবার মতো চারপাশ জুড়ে অকৃপণ ভোরের আলো, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস। চারদিকের গাছপালায় হরেক পাখির ডাক। কাকের ডাকও কর্কশ নয় নিশ্চয়ই। বারান্দায় চড়ুইয়ের ছুটোছুটি কিচিরমিচির, উঠোনে ঘুরে ঘুরে দানা ঠুকছে শালিক, দেশী ফুল গাঁদাদোপাটিতেই মৌটুসির ঝাঁক। চোখে পড়ছে বলেই তিনি দেখছেন সবকিছু। নিজগৃহে পর্যটক নন।

টেলিফোন বা খাতায় লেখা ওদের নম্বরগুলো বাইরের ঘরে। সেদিকেই যেতে হবে জেনেও উঠোনে নেমে এসেছিলেন শশিভূষণ। প্রতিদিনের ভোর, একই ভোর জীবনভর দেখতে দেখতে আজই যেন মনে হচ্ছিল অন্যরকম। মনে হচ্ছিল, বুঝি কোথাও বেড়াতে এসেছেন। কোনো পাহাড় বা সমুদ্রের দেশে যেভাবে এই একই ভোর ভিন্ন স্বাদে আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়। মনে হচ্ছিল, গিন্নি নন, তিনি নিজেই বুঝি কোনো হাসপাতালে কোমায় ছিলেন দীর্ঘকাল। একরাত নয়, একমাস অনেক মাস, হয়তো-বা বর্ষাকাল। অতর্কিতে আরোগ্যলাভ। টর্চটা হাতে না থাকলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কালকের রাতটা বাস্তব ছিল। দিনে আর রাতে কেন এত তফাত? ছুটোছুটি আর কাজেকর্মে দিনের ঘাম ঝরবে তো রাতের ঘুমটুকু কেন থাকবে না মানুষের? বিশ্রামও তো কাজ।

ঘরে ফেরার পথে রাতটাকে মনে পড়ছে তাঁর। রোমাঞ্চকর কোনো গোয়েন্দাকাহিনী

হতে পারে সেটা, কিংবা রোমহর্ষক ভূতের গল্প অথবা অপরাধ আখ্যান। চুম্বকি টানটা আগাগোড়া আঁটোসাটো। কেননা সেটা শুধু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণমাত্র নয়। পিস্তলের নিশানা থেকে বেঁচেবর্তে ফেরা অলৌকিক পরমায়ু যদি নিজেই কথক।

মধ্যরাত পেরিয়ে রাত তখন কতটা গড়িয়েছে, কোনো হিসেব ছিল না। একটানা ঝিঁঝির-ডাকের শুনশান নিঝুমে ঘুমিয়েছিল নিশুতির চাঁপাডাঙা। ঘুমিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষ। একশো কোটি মানুষের দেশে যদি এখন সবটাই ঘুম, কোথায় কোন্ অতি তুচ্ছ অণুপরমাণুতে দুই বুড়োবুড়ি তাঁদের ঘরদোরগোয়ালমরাইপোয়াল আগলে একা-একা নিঃসাড় পড়ে আছে, জানার কথা ছিল না কারুর। শীত যাই-যাই করেও এখনও ফুরোয় নি পুরোপুরি। রাতের ঠাণ্ডায় বন্ধ দরজা জানালার ঘরে মশারির তলায় হালকা চাদরমুড়ি নিদ্রা হয়তো কিছুটা ওম পেয়ে আরাম সেঁকছিল। কিংবা যে-ঘুমে নতুন করে স্বপ্ন দেখার কিছু নেই, বার্ধক্যের নিদ্রা গাঢ়তর হয় না কিছুতেই।

বাইরে থেকে দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ ছিল মৃদু। কাঠের পাল্লার গোটাকতক চাপড়। মৃতবৎ স্তব্ধতার যেখানে ঝিঁঝির-ডাক ছাড়া অন্য কোনো ধ্বনি নেই, আচমকা টিকটিকি ডাকলেও চমকে উঠতে হয়, রাতদুপুরে ঘন কুয়াশার অন্ধকারে বাইরে এভাবে কড়া নাড়বে কেউ? কিংবা সেটাই প্রথম আওয়াজ কিনা, অকস্মাৎ হাল্কা ঘুমের আবাহনে তন্দ্রার আবেশটুকু ছিঁড়ে যাবার পর দ্বিধায় সংশয়ে হকচকিয়ে উঠেছিলেন শশিভূষণ। হয়তো মনেরই ভ্রম। কিংবা নিশুতির রাতে একবার ডাকলেই সাড়া দিতে নেই কখনও, সাবেকি নিয়মে উৎকর্ণ থাকার পর যখন ঘটনাটা ঘটল আরো বারদুয়েক একইভাবে, যদি সত্যি কোনো ভুল নেই, গা থেকে চাদরটা সরিয়ে বুড়ো বয়সের হাড়গোড় ভেঙে উদ্বেগপিষ্ট উঠে বসলেন খাটের ওপর। মেঝেতে পা ফেলতেই দুটো পায়ের পাতায় কামড়ে ধরল ঠাণ্ডা। স্লিপারটা খুঁজবেন অন্ধকারে পা ঘষে ঘষে অথবা সুইচটা টিপবেন? পায়ের চাদরটাও বড্ড জরুরি। এবং চশমাটা। একটি মাত্র খোলা জানালার ফাঁকে কীভাবেই যেন একটা জোনাকি ঢুকে পড়েছিল ঘরে। মশারির বাইরে সারা ঘর জুড়ে কাঁথা-সেলাই গোছের আলোর নৃত্য। মশারি ফেলে দু-চার পা এগিয়ে, অন্ধকারে, দেয়ালে হাত বাড়াতেই টাইপরাইটিং বোর্ডে অভ্যস্ত অক্ষরচয়নের মতো ঠিক-ঠিক সুইচে আঙুল পড়ে যায়। জোনাকি থাকে না। বাইরে আকুল কড়ানাড়া, করাঘাত তীব্র হয়ে উঠছিল। শ্লথ পায়ে সেদিকে এগোতেই, কখন জেগে উঠেছে মেনকা, ছুটে এসে ঝাপটে ধরল হাত—'কোথায় যাচ্ছো?'

'সেই তো কথা...' শশিভূষণ তখনও সেই উচিত-অনুচিতের মধ্যবর্তী এবং একই দ্বিধায়—'দেখি কার আবার কী হলো। জ্ঞাতিপড়শি ছেলেরাই হবে কেউ।'

'কেনে গো, এত রাত্তিরে ডাকবে কেনে এমনধারা?' শীতে বা আতঙ্কে কাঁপছে মেনকা। তাকানো যাচ্ছিল না চোখ দুটোর দিকে। বিজলীবাতি সইতে না-পারা দুটো ঘষা-মার্বেল স্থির হয়ে আছে। শুকনো জিভে টাকরায় কথা ফুটছে না। সর্দিকাশি নেই। অথচ গলার নলিতে ভারি কফের দলা—'কেনে গো? কোনো বেপদআপদ?'

'সে-রকমই হবে কিছু একটা। রাতদুপুরে হার্টস্ট্রোক কি কলতলায় পড়ে গিয়ে কেউ হাড়গোড় ভাঙে তো করবে কী বাড়ির লোক? ছুটে তো আসবেই। ডাক্তার চাই তো একজন।'

'তো কী? এটা কি ডাক্তারবাড়ি নিকি?'

'ডাক্তারবাবু চাইছে কে এখেনে?' শশিভূষণ বিরক্ত এবার—'টেলিফোন। বুঝলে টেলিফোন করতে চাইছে কোথাও। আমাদের অক্ষয় নয়তো হালদারপাড়ার সুখেন ডাক্তার।'

মেনকাও কিছুটা চড়ায়—'সে-চায় তো গাঁয়ে আর কারুর ঘরে টিলিফোন নেই না-কী? দিনের মধ্যে দশবার এখেনেই আসতে হবে মুখপোড়াগুলোর? কেনে? জোয়ানমরদ ছেলেগুলো কেউ সাইকেলে চেপে যেতে পারে না এটুকুন পথ?'

'তা পারবে না কেন?' শশিভূষণ খুবই আস্তে, দরজায় কাঠের পাল্লা ছুঁয়ে এপারে-ওপারে দুপারে কান পাতলে হয়তো দু-তরফেরই বাতচিৎ শোনা যাবে মনে ভেবে যথোচিৎ ধরা গলায়—'এই এত রাত্তিরে অন্ধকারে গাঁয়ের ভাঙাচোরা রাস্তায় গিয়ে সদর দরজায় ধাকিয়ে ডাকাডাকি কাউকে বের করে আনতে যা সময়, একটা টেলিফোন পেলে ততক্ষণে লুঙ্গি পরে, উদোল চাদর জড়িয়ে অক্ষয় এসে যাবে রোগীর ঘরে...'

'কি জানি বাপু, আমার মনটা ভালো বলছে নি...' পিছুটানে অসহায় মেনকা। চেনে না জগৎব্রহ্ম—'দিনকাল ত ভালো নয় আগের মতো। কী সব আকথাকুকথা বলে সব্বায়...'

খিল তুলতে হাতটা বাড়িয়েছিলেন শশিভূষণ। থমকে গেলেন। কথাটা সত্যি। দিন কয়েক আগে কালীচক লেভেল ক্রশিংয়ের ধার ঘেঁষে জঙ্গলের মধ্যে দুটো লাশ পাওয়া গেছে ভোরবেলা। বছর দুয়েক আগে একটা লোকসভা নির্বাচন হয়ে যাবার পর যেভাবে মারদাঙ্গা খুনোখুনি বেড়ে গেছে গাঁয়েগঞ্জে চারপাশে, ঘুম নেই গেরস্তদের। শান্তি নেই। সন্ধে গড়ালেই সদরের দরজা খুলে রাখতে ভয়। পাড়ায় পাড়ায় পালা করে পাহারার ব্যবস্থা রাতভর। একটা পুলিশচৌকিও নাকি বসেছে হাইওয়ের ধারে পানবাজারে তেঁতুলতলায়? সে-অনেকদূর।

ধৈর্যের আগল ভেঙেছে দরজার ওধারে অন্য তল্লাটে। পাল্লাদুটোর ওপর চাপ বাড়ছে—'দরজাটা খুলুন মাস্টারমশাই।'

খটকা লাগল। এ-গ্রামে তাঁকে বা কোনো শিক্ষককেই "মাস্টারমশাই" ডাকে না কেউ। অনেক কাল ধরেই শব্দটা দাঁড়িয়ে গেছে 'মাশ্যাই'। অবিশ্যি সমবয়সী বৃদ্ধেরা অনেকেই মাস্টারমশাই-ই বলেন স্পষ্টভাবে। খিলটা নামিয়ে ছিটকিনির দিকে হাত তুলেছিলেন শশিভূষণ। নাছোড় আতঙ্কে সামনে এসে আছড়ে পড়ল মেনকা—'শোনো, একবারটি শোনো আমার কথা...'

ছিটকিনিতে আঙুল রেখেই শশিভূষণ থমকালেন কিঞ্চিৎ।

'বাইরের ঘরটা তো বন্ধ ভেতর থেকে। সদরের দরজা আমি নিজে বন্ধ করে এসেছি সন্ধেবেলা। চাদ্দিকে পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। ঢুকল কী করে ওরা? একেবারে শোবার ঘরের

দোরে? পাঁচিল টপকে? এই রাতদুপুরে পাঁচিল টপকে যারা গেরস্তবাড়ি ঢোকে...'

'প্রাণের টান। বুঝলে? বাঘে যদি তাড়া করে, ল্যাংড়াখোঁড়াও গাছের মগডালে গিয়ে ওঠে...'

ছিটকিনির আংটায় আঙুলটা আটকে ছিল। বুঝি পিস্তলের ট্রিগারে তৈরি থেকেই দোমনা দ্বিধাভাবনা। অসতর্কতায় আঙুলটা নড়ে উঠতেই এক দমকা ঝড়ের ধাক্কায় পাল্লাদুটো সশব্দে কাঁপিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল কারা? মানুষ নিশ্চয়ই কিংবা ভিন্ন গ্রহের মানবসদৃশ ত্বরিতগতি কোনো প্রাণী। সংখ্যায় কতজন, এক ঝটকায় বোঝা যায় নি সবটা। পেন্টলুনের ওপর ছেঁড়াময়লা পুরনো সোয়েটার, নয়তো শহুরে কায়দায় রেক্সিন কি চামড়ার কিংবা অন্য কিছুর জার্কিন-না-কী-বলে বুকে এঁটে—নাক নেই মুখ নেই নাক নেই গাল নেই গলা নেই থুতনি নেই কপাল নেই, মাফলার বা চাদরে আগাগোড়া মুণ্ডুতে ব্যান্ডেজ বেঁধে শুধু চোখদুটো ভাসিয়ে রাখা কবন্ধ পরাক্রম। দল বেঁধে ভেতরে ঢুকেই, বুঝি বা যুদ্ধশেষে পরাক্রান্ত বিজয়ী সৈন্যরা শত্রুঘাঁটির দখল নিতে তৎপর।

একটা খাট আর অন্যদিকে একটি টেবিল, দুটো চেয়ার, পাশে খাটো টেবিলে পোর্টেবল ছোট টেলিভিশন, একটি স্টিলের আলমারি ছাড়া অন্য আসবাবপত্র বিশেষ কিছু থাকে না এ ঘরে। মেঝেটা অনেক বড়। ভেতরে ঢুকেই চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোটা ঘরটাকে জরিপ করে নিলো ওরা। তড়িঘড়ি ব্যস্ততায় উবু হয়ে খাটের তলায় টর্চ ফেলে, টেবিলে ছাত্রদের খাতাপত্তর বা দেয়াল-আলমারির তাকে বইটই যা ছিল নির্মমভাবে টেনে টেনে সবই লণ্ডভণ্ড তছনছ। কত অনায়াসে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেতে পারে 'বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র' শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'? ওদের তুমুল তোলপাড়ে বুদ্ধিভ্রংশ শশিভূষণ একপাশে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে—যেহেতু এটা ছাত্রবিশৃঙ্খলা নয় বা তিনি নিজেও আর হেডমাস্টার নন, কী করবেন বা কী করা উচিত—মতিভ্রমে নেহাতই নিশ্চল নির্বাক। শিরাধমনী বা প্রতি রোমকূপে শরীরটা জ্বলছিল আগুনে আগুনে। বাইশ-বত্রিশ, এমন কি পঞ্চাশের পাগলা ঘোড়া একইভাবে ছুটতে চায়, হাতেপায়ে দেহের ভাঙনে ভাঙনে আজ বুঝি সবই ভেজা বারুদ। চারপাশের সব ভাঙনেও টিকে আছেন শুধু এই মগজটা নিয়ে। বুদ্ধি বিবেক এবং কিছু পোকামাকড়।

ওদের প্রবেশের প্রথম মুহূর্তেই যেভাবে ডাক ছেড়ে আঁতকে উঠেছিল মেনকা, ওদেরই মধ্যে কে একজন, হয়তো সর্দার, তেড়ে উঠল—'বহুৎ ক্যাঁচাল ক্যা বুড়ি। ধর, মুখটা চেপে ধর আচ্ছা করে।'

'লাতি গ ঠামা। লাতজামায়েরা এয়েচি সব্বায়...' কুড়ি-বাইশ বছরের একটি ছেলে মেঝেতে-লুটিয়ে পড়া ঠাকুমার শাড়ির আঁচল টেনে যেভাবে চেপে ধরল, বাড়তি কিছু করল না। শুধু হয় দেখিয়েই ছেড়ে দিলো একটু পরেই। কিছুই করবার ছিল না শশিভূষণের। অন্তত একজনের হাতে খোলা পিস্তল। অন্যদের হাতে বিজলী চমকানো ভোজালি, লম্বা লোহার ডাণ্ডা গোছের কী একটা? একেই কি পাইপগান বলে? জানেন না। দেখেন নি কোনো কালে। এ-সবই শহর থেকে দেশগাঁয়ে নতুন চালানি। দেশে বিদ্যুৎ ছড়ালে এরা

অন্ধকারে বাড়ে।

এভাবেই অতর্কিতে কোনো বিষধর সাপ বা ক্ষ্যাপা শেয়াল বা অন্য কোনো জানোয়ারের নাগালে পড়ে গেলে স্থিরতার ধৈর্যে আত্মসংযমই যদি প্রাকৃতিক বিধি, নিশ্চল শক্ত পায়েই দাঁড়াতে চেয়েছিলেন শশিভূষণ। শরীরের মাপ বা গড়ন বা চালচলন বা ছুটোছুটিতে খুব বাড়তি বয়সের মনে হচ্ছিল না কাউকেই। একেবারে মুখোমুখি পিস্তল উঁচিয়ে আছে যে-ছেলেটি, আগাগোড়া ব্যান্ডেজ-বাঁধা মুণ্ডুটার দাড়িগোঁফের রোঁয়া উঠেছে কিনা বোঝা না গেলেও চাহনিটা কিছুমাত্র ভয়ঙ্কর নয় ওর পিস্তলের মতো। কিছুটা ছন্নছাড়া। এপাশে-ওপাশে সাঙাতদের দিকে চোখ টেরিয়ে তাকাচ্ছিল বারবার। গ্রামের ছেলে। গলায় পৈতে ঝুলিয়ে মুরগি জবাইয়ের হাত বেচারির। হিরো হবার শিক্ষানবিশিতে যেটুকু তালিম পেয়েছিল ভুলে যাচ্ছিল।

'মালকড়ি সব কোথায় বাপ?' যাকে সর্দার বলে মনে হচ্ছিল, ছেলেটি কাছে এগিয়ে এসে কাপড়-চাপা মুখে কিছুটা খাটো গলায়, অথচ ভারিক্কি হাঁকার তুলে—'ছাড়ুন ছাড়ুন...'

শশিভূষণ সব রকম টেনশন থেকে সাবধানে আড়াল রাখতে চাইছিলেন নিজেকে। উর্ধ্ব রক্তচাপ তাঁর নিত্যব্যাধি। যথেষ্ট সংযত থেকেই স্বাভাবিক ঋজুতায়—'যা আছে সব তো দেখতেই পাচ্ছো। নিয়ে যাও...'

'ফালতু নিমকিবাজি ছেড়ে লাইনে আসুন দিকিন...' মাথাটা বাঁকিয়ে কানের কাছে মুখ এনে সেই যুবক—'বড় মাশ্যাই ছিলেন বড় ইশকুলে। দেশগাঁয়ে মান্যি করে দশজনে। আমরাও বেশি ক্যাঁচাল করব নি কিছু। আজই নগদা মোটা বান্ডিল তোলা হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে। মিছে ভানতারা না করে ছাড়ুন। ছেড়ে দিন ভালোয় ভালোয়...'

'সবই যদি জানো, তবে বাকিটুকু আমার কাছে কেন?'

'আরে! এ-ত বহুৎ ধুর পাবলিক শালা...' হাত বাড়িয়ে সাকরেদের হাত থেকে পিস্তলটা নিজের কব্জায় তুলে নিয়েছে ওদের ওস্তাদ—'আবে অ্যাই...অ্যাই বুড়ো, বেশি বেগরবাই করবি ত দেখচিস হাতে এটা কী? একবারটি চমকায় ত খামোকা খর্চা হয়ে যেতে হবে...'

স্থানীয় ভাষার একটি ইতিহাস থাকে। ভূগোল থাকে। এ-কোন্ ভাষায় কথা বলছে এরা? এত সব ভেবে দেখার সময় নয় তখন। বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে ওরা যেভাবে ঘিরে আছে তাঁকে, নিজগৃহে নিরাশ্রয় শশিভূষণ নিজেরই বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে থেকে মেনে নিতে পারছেন না বিপুল আত্মগ্লানি বা মানসিক চাপ। এরা কি বাইরে থেকে এসেছে সবাই? অথবা এ-গাঁয়ের অথবা আশেপাশের গাঁয়ের ছেলেরা? স্কুলে পড়েছে কখনও? প্রাইমারির উর্ধ্বে যদি দু-চার ধাপও উঠে থাকে, নিদেন সেভেন-এইট...নির্ঘাৎ তাঁর ছাত্র ছিল কোনোদিন। আশেপাশের গ্রামে আর বড় ইশকুল নেই।

মুণ্ডুহীন কবন্ধগুলোকে শনাক্ত করা যাচ্ছে না আপাতত। যেহেতু মানব প্রজাতিরই কেউ, বড়জোর অমানুষ বলা চলে। মানবেতর নয়। অথবা তদ্রূপ। খুবই কাছাকাছি দেয়াল ঘেঁষে স্টিলের আলমারিটা প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব। পিস্তল-হাতে ওদের ওস্তাদ ছেলেটা এর আগেও শক্ত হাতে হাতল ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করেছিল। ঘোরে নি। এবার কী খেয়াল হলো

সজোরে লাথি মারল বারদুয়েক। নিশুতি কাঁপিয়ে বীভৎস আওয়াজ। কিন্তু টসল না কিছুই। ধনবানের সম্পদ এত ভঙ্গুর নয়।

সেটা নিশ্চয়ই ওরাও বিলক্ষণ জানে। পরের সম্পদে ভয় দেখিয়ে বাঁচার রণকৌশলে এই বাঁকা আওয়াজটুকুও বোধ হয় একইভাবে জরুরি। কৌশলটা অনেক কালের প্রাচীন। আসুরিক উল্লাস আর পেশীর হুঙ্কারে ঘোড়সওয়াররা ঝাঁকে-ঝাঁকে ছুটে এলে সাধুসন্তদের শাস্ত্রপুঁথি তিব্বতে পালায়।

সামনে দাঁড়িয়েছিল যে-ছেলেটি, ধৈর্য হারাল—'কী হলো? চাবিটা দিন।'

চাবি? রুদ্ধশ্বাসের স্থবিরতা ভেঙে নড়ে উঠলেন শশিভূষণ। ঘর জুড়ে তোলপাড় এরই মধ্যে তিনটে চারটে ছেলে ছত্রখান করে তুলেছে চারদিক। কোনোরকম প্রতিরোধ না পেয়ে হয়তো একটু বেশি রকমরেই বাড়াবাড়ি। ওদিকের খাটে শিয়রের দিকে বিছানাটা লেপবালিশশুদ্ধু উল্টে দিয়েছে। গিঁট ছিঁড়ে মশারির একটা দিক গড়িয়ে পড়েছে বাঁকা হয়ে। দেয়ালের তাক ঘেঁটে অনর্থক বইগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে মেঝেতে। টেবিলে, টেবিলের ড্রয়ারে কাগজপত্র যা ছিল, সবই খামচেছে। আশ্চর্য! গোটা মাসের প্রেশারের ওষুধ কেনা থাকে যে-ছোট প্লাস্টিকের কৌটোয়, সেটাও তো খোলা? তবু পেল না চাবিটা? আরে বাপু, এসব কুকর্ম করতে হলে পুলিশি কুকুরের কাছে নিদেন এ-বিদ্যেটুকুর যে তালিম নিতে হয়, জানে না মুখ্যুগুলো?

'কী হলো মাশ্যাই? হলো কী আপনার? দাঁতেমুখে যে শাটল মেরে রয়েচেন। চাবিটা দিন...'

'সবই তো দেখলে লণ্ডভণ্ড করে।' কিছুমাত্র কাঁপুনি নেই গলার স্বরে। শশিভূষণ স্থির।

'সে-ত দেখবই। দেখতেই হবে। যার যা কাজ...'

'তাই বলে পরের ঘরে ঢুকে রাত্তির বেলা?'

'গাঁয়ে বসে পরের ঘরের ছেলেদেরকে নিয়ে বেশ ত পণ্ডিতি চালিয়ে বড় বড় লোট কামালেন বছর বছর। মোটা মোটা মালকড়ির বস্তা ভরলেন ব্যাঙ্কের গুদোমে। এবারে এট্টু ছাড়ুন। বাঃ রে, পয়সা কামাবেন আর ট্যাশকো দেবেন নি? এ-কেমনধারা কতা? আমরাও ত পরের ছেলে...'

'অ্যাই কী ভাট বকচিস। গুণীমন্যি ভদ্দরলোক আমাদেরকে ট্যাকশো দেবেন কী? সে-ত শালা গবেরমেন্ট নেবে। না দেয় ত পোঁদে রক্তামাশা ছুটিয়ে দেবে হারামিরা...' কী জানি কী হলো, ওদের মধ্যে একজনই সহৃদয় মনে হলো—'না দাদু, ট্যাকশো কেনে হবে? চাঁদা। মাইরি বলচি, পিতি বরে আমরা এই একবারই আসি। যেমনটি হিসেব, আদায় উশুলের বুঝ নিয়ে পালাই। অনেকটা এই যা বলে, ইশকুলের মাশ্যাইদের মতো। পরের ছেলেদের পিঠে বেত মেরে, চড় থাপ্পড় মেরে হাতের সুখ মিটিয়ে আঙুলের ডগায় জিভের থুতু টেনে হকের বেতন গুণেবেছে নেয়া..'

থেমে যেতেই হয় বৃদ্ধকে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঝিমঝিম, অস্থির ভার-ভার। চিটচিটে ঘাম শীতের রাত্তেও।

'কেনে আর বকাচ্ছেন অত? ওসব চালাকি ছেড়ে কাজের কথায় আসুন...' নাকের ডগায় আঙুলে-আঙুলে পিস্তলটা নাচাচ্ছে ওদের ওস্তাদ—'লোক ডেকে বহুৎ জ্ঞান ঝাড়বেন কাল সকালবেলা—দেশটা গেল, গোল্লায় গেল সব। চাকরি পেলে কাজ করবে নি, কাজকাম না জুটলে ভোটের কেন্তনে পার্টির লিডর হবে, নয়তো রাতবিরেতে গেরস্তের ঘরে ঢুকে খুনখারাপি বেয়াদপি করবে বজ্জাতগুলো। তা বলুন, যা মন চায় বলে দিন সাফ করুন। এখানে ভালোয় ভালোয় ছাড়ুন দেখি আমাদের। নইলে দেখছেন, হাতে এটা কী? একটা ছাড়পোকা টিপতে এটা লাগে না।'

'কিন্তু একটা ছারপোকাও তো মস্ত মানুষের গায়ে হুল ফোটায় বাবা...' উদ্যত পিস্তলের মুখোমুখি তখনও শক্তই ছিলেন শশিভূষণ।

'এমনধারা চুটুলিপুটুলি কত আর চলবে বড়ো? আমাদের টাইম কি খাম্‌কা নিকি?' একেবারে পেছন থেকে এগিয়ে এসে একটি ছেলে সরাসরি আলোর তলায় দাঁড়িয়ে এবং কিছুমাত্র জানান না দিয়ে অতর্কিতে সপাট থাপ্পড় বাঁ-গালে—'বেশি রস বেড়েছে তোমার বুড়ো? মজাকি? দিন, বের করুন। কোথায় চাবি?'

রুদ্ধবাক শশিভূষণ স্তম্ভিত পাথর। বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকেন। কী মনে হয়, বলে ফেলেন—'তু...তু...তত্তুই...'

দংশনশেষের বিষ ঢেলে গোখ্‌রো-চিতি যেভাবে ওদের ফণা গুটিয়ে অবশতায় ঢলে পড়ে, হেঁটমাথায় সরে যাচ্ছে সেই ছেলে।

কাওয়ার্ডস। আরো কিছু উৎপাত গজিয়ে উঠছে নিরিবিলি গাঁঘরে। আসলে কাপুরুষ। হাতের পিস্তলটাও আসল কিনা সন্দেহ হয়। গুলি করার, গুলি করে মেরে ফেলার মতো বুকের পাটা শিলনোড়া হয়ে উঠতে পারে নি এখনও। রক্তপাত হলেই বিপদ। দুষ্কৃতি। থানাপুলিশ জেলহাজত আইন আদালত ফাঁসি যাবজ্জীবন হাজারো হুজ্জুতি। তার চেয়ে অনেক সহজ কাজ, নাতির বয়সী ছোকরার হাতে একটা থাপ্পড়। রক্তপাত নেই প্রমাণ নেই। অপরাধ নয়। এফ.আই.আর.-ও বড় দুর্বল। লুটপাট ঠিকই, কোনো নির্যাতন নেই।

যেহেতু ডান হাতের চপেটাঘাত, বাঁ-হাতটা উঠে আসে বাঁ-দিকেরই গালে। আঘাতের ভর যত তীব্রই হোক, চামড়ার জ্বলুনিটা সাময়িক। সর্বাঙ্গীণ কোষে কোষে দুঃসহ দাহ। সকালের সেভিংয়ের পর এত রাতে শুকনো ত্বকের আপাত মসৃণে প্রলেপ বুলোতে বুলোতে আঙুলগুলো যদি থেমে যায় স্পর্শের অসারতায়, মুখের হাঁ-টা বাক্‌শূন্য অবশ হয়ে থাকে। ঘোলাটে চোখের মণি দুটো নিষ্পলকে কোনো স্থির লক্ষ্য খোঁজে। মেঝেতে লেপটে-বসা মেনকা ভাঙা হাড়গোড়ে উঠে বসেছিল। গোঙাচ্ছে তখনও। ডানে বাঁয়ে ঘাড় ফেরাবার অবকাশ থাকে না শশিভূষণের। শিরদাঁড়ায় শক্ত টান। আবার নতুন করে পায়ের তলায় মেঝেকে শক্ত ভিত মনে ভেবে সোজা গায়ে দাঁড়াবার বেপরোয়া জেদ এক ধরনের। সরাসরি চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকার স্থৈর্যে কী এক সম্মোহ—ছোবলানির পর ফণা-গুটনো খরিশের অবশ চোখ সরিয়ে নিয়েছিল যে-ছেলেটি, আঁটোসাঁটো কাপড়ে-জড়ানো ভূতুড়ে মুণ্ডুর ভেতর উজ্জ্বল চোখজোড়া বা চোখের চাহনি বা গলার স্বর খুবই

যেন চেনা-চেনা মনে হয়েছে তাঁর। নেহাতই মনে হওয়া এবং মনে হওয়ার দুর্বিপাক—তিনি চেনেন, দেখেছেন কোথাও। হয়তো ছাত্র ছিল একদিন। গ্রামেরই ছেলে, কিংবা আশেপাশের গাঁয়েই থাকে কোথাও। অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে তো শুধু শ্রীমান নয়, ওর বাপজ্যাঠার ঠিকুজিকোষ্ঠি সবই তাঁর জানা। ভুল জায়গায় মিথ্যে থাপ্পড়টা যদি শুধু তাঁকেই সইতে হবে, ওর ক্রোধ বা ঘৃণা বা আক্রোশ, ধিক্কার বা অবিশ্বাসকে চিনে নেবার আগে ক্লান্ত জরার শেষ বেলায় নিজেরই জন্মভিটেয় দাঁড়িয়ে এতদিনের সমস্ত বোধবুদ্ধি বিষয়সম্পদ, কৃতী সন্তানদের পিতা হবার অহঙ্কার সবই দেউলে মনে হয়। সবই যদি তাঁর একারই নিরাপত্তা, নিজস্ব জীবনবীমার গ্যারেন্টি, হয়তো প্রিমিয়াম শোধ হয়নি কোথাও। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া বা এনকেফ্যালাইটিসের মারণরোগে অন্যায়ভাবে মরে যাবার আগে হতভাগা কি জানে, কোটি কোটি মশার ওড়াউড়িতে কোনো একটি তুচ্ছ বিষাক্ত দুর্বৃত্ত সর্বাংশে প্রাকৃতিক নয়।

অন্যদিকে আরেক তুলকালাম। মূর্ছা ভেঙে উঠে বসেই একেবারে পিস্তলের মুখোমুখি মানুষটাকে দেখেই বোধ হয় আর সামলাতে পারে নি। দিশেহারা ক্রোধের মাত্রা ছাপিয়ে দুর্বল শরীরে নানাভাবে টাল সামলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় শাপশাপান্তির মরিয়া ভয়ঙ্করে যেভাবে...চিৎকার করে উঠল মেনকা, সেটা কোনো ভাষা নয়, কথন নয়—গলা চিরে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ এক ধরনের। বদ্ধ ঘরের জানালাদরজা কাঁপিয়ে ঝমঝমিয়ে উঠল নিশীথ রাতের স্তব্ধ প্রহর। কাঁচা ঘুম ভেঙে নাড়া খেতে পারে গোটা তল্লাট।

ওরা গিয়ে হামলে পড়ল গেঁয়ো অবোধ এক বুড়ির ওপর মামাসিঠাকুরমাদিদিমাদেরও যদি নিস্তার নেই ওদের দস্যুতা থেকে এবং শশিভূষণ নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতেও অক্ষম এমন কুশ্রীতা থেকে, শান্ত পায়ে গুটিগুটি এগোলেন টেবিলটার দিকে। ওষুধের কৌটোটো ড্রয়ারেই থাকে। ওদের তল্লাশিতে এখন বাইরে। গোটা মাসের নানা-রকম ওষুধের ট্যাবলেটের পাতাগুলো। নাড়াচাড়া করেছে সেখানেও ফাঁকি। সবটা দেখে নি। ওষুধের কাইলগুলোর একেবারে তলানিতে জরুরি চাবির গোছ থাকে। চাবিটা ওদের হাতে তুলে দেবার জন্যেই পিছু ফিরেছিলেন। মেঝেতে আবার লেপটে বসে পড়ে চড়া গলায় তখনও কী সব বকবক বকেই যাচ্ছে মেনকা। জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতায় ভয় পাচ্ছে না, এমন কি, পিস্তলকেও। বুঝি মরতেই চাইছে বুড়ি। পিস্তলটা একবার গর্জে উঠলে কেঁপে উঠবে না গোটা গ্রাম? ছুটে ছুটে আসবে না মানুষ?

'চোপ্...একদম চোপ্...' চকিতেই দাঁতমুখের খিঁচুনিতে পিস্তল উঁচিয়ে ওদের সেই নেতা, সেই উদ্ধত যুবক—'ফালতু বাওয়াল করবেন নি একদম। বেশি নকশাবাজি করবেন ত বাইরে লোক ফিট করা আছে। সব কিচাইন হয়ে যাবে...'

ইচ্ছে ছিল, লম্বা হাতের সেই ছেলেটি, তাঁর জীবনের সব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিগুলো মিথ্যে করে দিয়ে নিজের স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে, ওরই হাতে ছাবির গোছটা তুলে দেবেন। আরো একদফা পরখ করবেন দুটো চোখ, চোখের মণি, চাহনির ঢঙ। তাঁর ছাত্র বা ছাত্র নয়? চেনা মনে হলেও কতটুকু চেনা? ফিরতি বলকে যদি অন্য রকম হয়? পায়ে পায়ে এগোলেন

শশিভূষণ। ছেলেটিকে কাছাকাছি নাগালে পেয়েও হাত বাড়ালেন না সেদিকে। দলনেতা পিস্তল ছোঁড়াকে ডেকে সমর্পণ করলেন তাঁর নিজের সর্বনাশ।

ঘরে'ফুটবল জেতার উল্লাস। চেঁচামেচি নেই। সবই চোখের ভাষায়, ইঙ্গিতে, ইসারায় ইসারায়। চাবির গোছা হাতে পেয়েই আলমারির দখল নিয়ে ফেলেছে লিডারসাহেব এবং মেষ চরিত্রের যা নিয়ম—পালের গোদা ছুটে যেতেই সাঙাতরা তার পিছু পিছু। একগুচ্ছ চাবি হাতে নিয়ে একেবারে প্রথম বাছাইয়েই আলমারিটা খুলে যাবার পর পাশাপাশি দুটো লকার। সেখানেও ভুল নেই। যেন তালাটা গেরস্তের, চাবি ওদের। ওদের অনেক কালের চেনা।

স্ত্রীর পাশে গিয়ে বসলেন শশিভূষণ। অস্ত্রশস্ত্রের দাপাদাপিতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়েছিল মেনকা। বসে থাকতেও পারে নি বেশিক্ষণ। দাঁতেমুখে খিল তুলে যেভাবে ঠাণ্ডা বনে আছে বুড়ি, শেষ পর্যন্ত ফুসফুসটা ধকল সইতে পারল কিনা, উবু হয়ে পরখ করলেন একবার। এর বেশি অন্য কোনো ভাবনার অবকাশও নেই। লকার খুললে সামনেই পঁচিশ হাজার টাকার তিনটে বাণ্ডিল। টাকা ছাড়াও দু-চারটে কৌটোকোটা যা আছে, ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে সবই। বউমার গয়নাগাটি প্রায় সবই কলকাতায় একটি ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছে বিভু। তবু অল্পসল্প কিছু সোনাদানা তো থাকেই গেরস্তঘরে। মেনকার প্রাণভোমরা। সবই এখন ওদের পকেটে পকেটে।

কাজ ফুরলো কবন্ধদের। ওরা ঘর ছেড়ে বেরুবার আগে উঠে দাঁড়ালেন শশিভূষণ। যাকে ওদের সর্দার মনে করে এসেছেন, সে নয়। অন্য এক যুবক, কী মনে হলো, লাফিয়ে এসে টিপ করে পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়াল মুখোমুখি—'গণ্যিমান্যি মানুষ আপনি মাস্টারমশাই। যা হলো, তাই নিয়ে হল্লাগোল্লা করবেন নি বেশি। কোনো ক্ষতি করতে চাইনে আপনেদের...'

এবং সেই সর্দার—'আপনি ভালো লোক মাশ্যাই। পুলিশ-পঞ্চাইত নিয়ে ঘোঁট পাকাবেন ত ফেনে খচ্চা হয়ে যাবেন খামকা? দাদারা সব্বায় বাইরে থাকেন। মাঝেমধ্যে গাঁয়ে ত ফেরেন সন্ধেবেলা...'

মিনিট কুড়ি-পঁচিশেকের নিখুঁত অপারেশন। একেবারে শেষ পর্বে মেনকা কিছুটা গোলমাল বাঁধিয়ে দিয়েছিল। নচেৎ নির্ঝঞ্ঝাট আদায়উশুল। নিশ্চিতই দুর্নীতি নয়। অবশ্যই অপরাধ। দুর্নীতির পাণ্ডা কেউ আছেন কিনা অন্তরালে, জানা নেই। এতসব কর্মকাণ্ডের কোনো বিধাতা?

নতুন শহুরে কায়দায় সাবেকি নিয়মের ঘরদালান ভেতরবাড়িতেই নিয়ে গেছে ছেলেরা। রোজকারমতো সেখানকার খিল তুলেই উঠোনে নেমেছিলেন শশিভূষণ। ফিরে এসে দেখলেন বাইরের-ঘরটা খোলা। শুধু এটুকুই নয়। ভেতরে ঢুকে দেখলেন, রাস্তার ওপর দরজাও হাটখোলা? সে কী, সারারাত খোলাই ছিল এভাবে? কী অদ্ভুত। সবটাই ধাঁধা। ওপাশে ভেতরবাড়িতে ঢোকার সদর দরজাটা আছে নিয়মমাফিক। সেটা তিনি উঠোন

থেকেই দেখে এসেছেন। তাহলে ওরা কাল রাতে ঢুকল কী করে ভেতরে? একেবারে শোবার ঘরের দরজায়? যাক গে ছাই। গায়ে অনিদ্রার ক্লান্তি। মেনকাকে টেনে খাটে তুলতে কাঁধেকোমরে ব্যথাটাও আরেক বাড়তি দিগদারি। হিসেবমতো অক্ষয়কে খবর দেবেন বলে ঘাড়টা ঘোরাতেই দেখলেন, আস্ত টেলিফোন সেটাই উধাও। এক সেকেন্ডের জন্যে হলেও কিছুটা ধাঁকা লাগল বুকে। বুড়ো বয়সে ওটা বড় জরুরি ছিল। শোবার ঘরের টিভিটা নিয়ে গেছে মাথায় বয়ে। টেলিফোনটাও গেল? যাক, সব যাক। সবই সম্ভব। হয়তো পায়ের তলার জমিটুকুও কোনো একদিন।

হাহাকার বিলাপ নিরর্থক। ধাতেও সয় না। যা হবার, বোধ হয় এভাবেই হয় সব। এটাই নিয়ম। রক্তচাপ নিয়ে ভাবনাটা ছিল বলেই হয়তো সতর্কভাবে শান্ত থাকার, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা। রাস্তার ওপর খোলা দরজা পেরিয়ে বাইরের একফালি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রাস্তার ওপরে পৈতৃক ভিটেমাটিতে জ্ঞাতিভাইদের ঘর। সহোদর বড়দার একতলা পাকা দালান। পায়ে পায়ে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন শশিভূষণ। ওদের সদর খুলে সাইকেল নিয়ে বেরুচ্ছিল জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলে। ডাকলেন—'এই নেপু এত ভোরে কোথায় যাচ্ছিস তুই?'

'বাজারে।'

'যাবি একটু বাদে। আয়, একটু শোন্ এদিকে...' এবং ন্যাপা অনুগত বাধ্য ছেলের মতো এগিয়ে এলে—'এই বাইরের-ঘরে দরজা দিয়েই ভেতরে গিয়ে সদরের দরজাটা খুলে রাখ্। শেতলা দুলে আসবে। গাই দুটো দুইয়ে ওকে গোয়ালটা সাফ করতে বলবি। দেখবি, উঠোনটা যেন ঝাড় দেয়। আমি তোদের বাড়িতেই যাচ্ছি। আসব এক্ষুনি।'

বারান্দার মাদুর পেতে প্রাণায়ামে বসেছিলেন বড়দা। উদোল গায়ে হাঁটু অব্দি লুঙ্গি গুটিয়ে মুদিত নয়ন। কথা বলা যাবে না এখন। ওদিকে মেটেঘরের হেঁসেল থেকে দালানঘরের দিকেই আসছিলেন বউদি। মাঝপথেই থমকে গেলেন—'কী গ, তুমি এই সাতসকালে? কী মনে করে?'

'এলুম। একটা কথা বলব তোমাদেরকে...'

'বলো না, বলো...তোমার কতা? সে ত শুনলেও কিছু জ্ঞানগম্যি হয় মানষের।'

'মেনকাকে একা রেখে এসেছি। ঘুমুচ্ছে এখনও।'

'ঘুমচ্ছে? সে-কী গ, কোনো অসুখবিসুখ? কী হয়েছে ওর?'

'না, হয়নি কিছুই। কিছু হয়েছে কিনা তা-ও জানিনে। তবে হতে পারত অনেক কিছুই। শোনো, এসো এদিকে...' বললেন শশিভূষণ। দু-চার কথায় যতটা সংক্ষেপ সম্ভব, সবটুকুই।

'অ্যাঁ। সে-কী কতা গ? ড্যাকাত পড়ল ঘরে আর ঘরের মানুষ আমরা জানলুম নি কেউ? এট্টা হাঁক দিলেনি একবারটি? আমরা ত আছি, না কি মরে গেছি?'

'হাঁক দেব কী? আমরা দুজনই তো তখন পিস্তলের ডগায়।'

'অ্যাঁ, পিস্তল-বন্দুক? সে-কী কতা? আমার ত শুনেই কাঁটা দিচ্ছে গায়ে। বুকটা কেমন কেমন করছে...'

ঘর উঠোন কাঁপিয়ে এমন তারস্বরে আর্তনাদ বড়-বউর, উঠোনের চারপাশ ঘিরে মেটে ঘরগুলোর দাওয়া থেকে, ঘরের ভেতর থেকে, যে যেখানে ছিল, কাজকাম ফেলে ছুটে ছুটে আসতে শুরু করল জ্ঞাতিভাই বউ-ঝি কাচ্চাবাচ্চা ছেলে বুড়ো সকলেই। সে-আরেক বিভ্রাট। কিন্তু বউবউর ভয়-কাঁপুনির বহ্নিদাহ। তাড়া-খাওয়া বেড়ালের মতো উঠোন থেকে একলাফে বারান্দায় উঠে হামলে পড়ল নিরীহ মানুষটার ওপর—'সব্বোনাশ হয়ে গেল ঘরে আর তোমার কী ছাই বেয়াম না বয়ম। খালি-খালি নাকের নিশ্বেস আর ভুঁড়ির কসরত্তি।'

ধ্যানভঙ্গে বিরক্ত প্রভাভূষণ। চোখ খুলে গাঢ় গলায় খিঁচুনি—'কেনে, কী হলো? কাক-চিলের পারা চিল্লাচ্ছ কেনে?'

'চিল্লাছি কি সাধে? শোনো, ভাইয়ের মুখে স্বকন্নে শোনো হয়েচেটা কী...' ভাইয়ের মুখের শোনার আর অবকাশ থাকে না কিছু। যা ঘটেছে বা যতটুকু, বড়বউর গলায় তার কোনো সারাংশ নেই। যা ঘটেনি বা যা-বা ঘটলে ব্যাপারটা আরো বিভীষিকা হয়ে উঠতে পারত, সেভাবেই ঘটনাটা অঘটনের দিকে লম্বা হতে থাকে। চারপাশ থেকে জ্ঞাতিঘরের স্বজনদের ভিড় বাড়ছে। পড়শিরাও এসে পড়েছে অনেকেই। কোনো রহস্যরোমাঞ্চের গল্প শোনার কৌতূহল শোনার কৌতূহল নয়। নিজেদের ঘরেই আগুন, পোড়ানির জ্বালাটা সমানভাবে সকলের। ঘুরেফিরে চোখগুলো শশিভূষণের ওপরই এসে পড়ছে নানাভাবে।

ভিড়ভাট্টাজটলার হৈহল্লা ছেড়ে আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে নিজের নিভৃতি দিয়ে পাকাদালানের ভেতরের ঘরে ঢুকলেন শশিভূষণ। অক্ষয়কে টেলিফোন করলেন। আমজাদকে। সবশেষে অঞ্চলের ডাকসাইটে নেতা দুলাল বাখুণ্ডীকে ডায়াল করে পেয়েও গেলেন ঘরে। আমজাদের মতো একই সুরে, প্রায় একই ভাষায় দুলাল—'কী বলছেন স্যর, শেষ অব্দি আপনার ঘরে? এ-যে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। থানায় খবর দিয়েছেন?'

'না, ওতে কী হবে? যা হবার সে-তো হয়েই গেছে।'

'না স্যর, তবু ওদের জানানো দরকার। একটা এফ.আই.আর...' একটু থেমে—'থাক, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমিই যাচ্ছি, চাই কি ফোর্স নিয়ে এক্ষুনি যাচ্ছি আমরা। এক্ষুনি যাচ্ছি। নাহ্ এর একটা হেস্তনেস্ত কিছু একটা করতেই হবে এবার। বড় বেশি বাড় বেড়েছে ওদের। কাগজে কাগজে যাচ্ছে তাই লেখালেখি হচ্ছে সব। কিছুর মধ্যে কিছু না। আপনাকে ডিসটার্ব করবে এভাবে? না না, আপনি বিশ্রাম করুন। আমরা দেখছি। কিছু একটা করবই আমরা...'

রিসিভার রাখলেন শশিভূষণ।

পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল প্রভাভূষণ। গর্জে উঠলেন—'কী র‍্যা, ঘরে এতসব কাণ্ড ঘটে গেল, আর তুই রাত পুইয়ে এখনে এসে খবর দিচ্ছিস তুই? তা নগদা পঁচিশ হাজার ট্যাকা তুই ঘরে রেখে দিয়েছিলি কোন আক্কেলে? ট্যাকা বেশি হয়েছে তোর। দে, বিলিয়ে দে গরিব দুঃখীদেরকে। তবু যা-হোক এট্টু পুণ্যি হবে...'

'ওভাবে বলছ কেন? কেন টাকা, কীসের টাকা সে-তো তুমি জানোই। প্ল্যানপ্রোগ্রাম

তোমরাই করেছ। শ্রাবণ মাসে মনুর বিয়েটা যদি দিতে হয়, তুমিই বললে, হাতে মাসে চারেক সময় আছে, দোতলায় একটা ঘর হয়ে যাবে। সেজন্যেই তো...'

'কাজ কি তুই শুরু করে দিয়েচিস নিকি?'

'সে-আমি করবার কে? সব তো তোমাকেই দেখভাল করতে হবে। তুমি সেদিন হানিফ মিস্ত্রিকে ডেকে ছাদের মাপজোক করলে, খরচাপাতির দরদস্তুর করলে। জিতেন ভট্চাযকে ডেকে পাঁজা ফেলার দিনক্ষণ স্থির করলে। আমিও তো সেই ভেবে আর দেরি করলুম না। হাজার ত্রিশেক ইটের একটা ফেলব বলে কালই সকালে টাকাটা তুলে এনেছি ব্যাঙ্ক থেকে।'

'একসঙ্গে এত ট্যাকা তুলেচিস ওরা জানল কী করে?'

'সেটাই তো প্রশ্ন। এ-তো কারুর জানার কথা নয়।'

'ট্যাকাটা যখন হাতে নিচ্ছিলি, আশেপাশে কেউ ছিল? চেনাজানা কেউ?

শশিভূষণ স্মৃতি হাতড়ায়—না্না্হ্, সে-রকম কাউকে মনে পড়ছে না তো।'

'ছিল ছিল। খুবই চেনাজানা কেউ হবে। চেনাজানা বলেই হেসে দুটো কতা বলেচে, আর তুই ভাবলি হেডমাস্টার বলে তোকে বেশি তোয়াজ করচে। ওই যে কতায় বলে না—তোষামোদের হাসি বাজায় মিষ্টি বাঁশি। এ-হল গে তাই। হেডমাস্টার না হাতি। হ্যাঁদারাম, হদ্দ বেকুব। ওই লোকটাই খবর দিয়েচে। শয়তানের বাচ্চা সব। কী না পারে ওরা? সব পারে। হাসতে হাসতে যে-কাউকে খতম করে দেয়...' ঘর জুড়ে প্রভাভূষণের দুঃশাসন মূর্তি। অস্থিরতায় ছুটে গিয়ে, আবার ফিরে এসে কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে—'টেলিফোন করছিলি কাকে? পুলিশকে জানিয়েচিস? বিভুকে?'

'পুলিশকে বলে কী হবে? একবার এসে ঘুরে যাবে। ব্যস, এটুকুই। ডিউটি টাস্ক...।'

'বিভু?'

'বছরের এ-সময়ে যে নাওয়া খাওয়ার সময় থাকে না ওদের। অফিসের কাজ...'

'অপদার্থ। দুর হ, দুর হ এখেন থিক্যে। ধ্ত্আআ...' ভয়ঙ্কর প্রভাভূষণ। কাঁপছে ছাদদেয়াল—'বছর বছর পরীক্ষায় পাশ দিয়ে বিদ্যের জ্যাহাজ হয়েচ? মাথা কিনেচিস বাপঠাকুদ্দার? ছেলের আপিশ দেখাচ্ছিস? বাপ-মায়ে যে ঘরে থেকে চিতেয় পুড়ে মরে যাচ্চিল। যদি মরেই যেত তখনও কি আপিশ দেখাত নিকি তোর রোজগেরে ছেলে? ঝ্যাটা মারি অমন রোজগারে। ড্যাকাত পড়বে ঘরে, পুলিশে খবর দেব নি? বাঃ, শোনো কতা বিদ্যেসাগরের। ঘরে ড্যাকাত পড়বে ত থানায় যাবনি? গভোরমেন্টের অমন তাবর বড়সাহেব ছেলে, ওকে বলবি নি? তবে কাকে বলবি? আমাকে? আমি গিয়ে ট্যাকা উদ্ধার করে দেব? একি রামায়ণের সীতা উদ্ধার নিকি? হ্যাঁ তাই হবে। আমিই হনুমান। যা যা, ঘরে যা। ঘরে যেয়ে বইপুঁথি মুখস্ত কর নচ্ছার। যা, আমার চোখের সামনে থেকে চলে যা। এসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে নি কিছু। যা যা করার, যেমন যেমন, ব্যবস্থা নেবার সব আমিই করব...'

'আঃ, কী হল তোমার? ওকে এমনধারা দাঁত ঝাড়ছ কেনে। বেচারির সব্বোনাশ হয়ে গেল। কোথায় একটু রসিয়ে ভালো কথা বলবে, শান্তি দেবে...'

'চোপ, একদম চোপ। আর এটু মুখ ফুটবে ত তোমাকে ঘাড় ধরে বের দেব বাড়ি থিক্যে। আশবাড়িতে এসে পিস্তল দেখাবে, ট্যাকা লুটে নিয়ে যাবে এত সাহস? শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে পাকড়াব আমি, হাজতে পুরব। হ্যাঁ, তবে আমার শাস্তি...' ঝাঁ করে একটা পাক ঘুরে এসেই প্রভাভূষণ আরো বেশি খিঁচুনিতে—'হবে হবে। এসবই তো চলবে এখনে। দেশগাঁয়ের আর আছেটা কী? সব ভোট। ভোট আর পোলিটিক্স্। অমুক দাদা হবেন রাজা, ড্যাং ড্যাঙা ড্যাং বাদ্যি বাজা। খাও, বাদ্যি ত বাজছে। ভোটবাবুদের চেলাচামুণ্ডারা সব নন্দীভিরিঙ্গির নেত্য করচে যাও, বছর বছর ভোট দাও আর পাছা তুলে নেত্য কর...'

'আ মরণ। কত্তার কী ছিরি...' আরো বিচ্ছিরি করে ঠোঁট ভ্যাংচাল বড় বউ—'তুমি চল, চল ত ঠাকুরপো। ঘরে যাও। চল আমিও যাচ্ছি। একা-একা মেনকা যে কী করচে...'

এবং বাইরে এসে—'তুমি কিছু মনে করো নি ভাই। তোমরা জানো ত ওঁকে। এই বদমেজাজের জন্যেই ত মানুষটা হল নি কিছু। শুধু মার খাচ্চে চাদ্দিক থিক্যে। সব্বায়কে এমনধারা শত্তুর বানিয়ে দিয়েচে...'

'তুমি কদ্দিন ধরে মানুষটাকে চেনো বউদি? আমি এই এটুকুন বয়েস থেকে এসব দাঁত খিঁচুনি শুনে আসছি। তবু এই দাদাটা ছিল বলেই তো এখনও আছি। নইলে কোথায় ভেসে যেতুম...'

রাস্তায় নেমে—'একটা কথা বলব বউদি?'

'বলো।'

'তুমি যাও। মেনকাকে একটু দেখো। আমার আর এখন একটুও মন চাইছে না। আমি বরং একা কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘুরি। যদি কিছুটা স্বস্তি পাই।'

'সেই ভালো। তুমি বরং একটু ঘুরেটুরে ঠাণ্ডা হতে চেষ্টা করো। ঘরের জন্যে ভাববে না। আমরা সব্বায় ত আছি...'

'অক্ষয়কে বলেছি। ডাক্তারবাবু আসবে এক্ষুনি। কী বলে শুনে রেখো। অষুধপত্তর দেয় তো কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়ো...'

রাস্তাটা বড় একা। নিঃসঙ্গ পায়ে মেঠো পথ ভেঙে এগোতে এগোতে সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত গোটা জীবনের প্রাত্যহিকে জড়িয়ে থাকা রাস্তাটাকে এত আপন বা ঘর উঠোনের মতো ঘনিষ্ঠ করে চিনে উঠতে পারেন নি কোনোদিন। আজ নিজের মধ্যেই বড় বেশি মূল্যবান হয়ে উঠতে থাকে। গ্রামের উত্তর দিকে প্রান্তিক সীমায় বলেই হয়তো এদিকে সারাদিনই লোকচলাচল খুব কম। সাতসকালে...সকালেই বা কেন, ভোরবেলার হালকা আলোর রেশটুকু মুছে দিয়ে কড়া রোদে দু-পাশের ঘরবাড়ির ছায়াগুলো লম্বিত হয়ে ওঠার আগেই শশিভূষণ, এক নিঃসঙ্গ পথিক, একা একা ধীর পায়ে এগোতে থাকেন। হয়তো একা নন। সুবোধ নন্দীদের জাঁকালো দোতলা বাড়ি, বিশু কব্‌রেজ, বাদল নন্দী, নন্দ ঘোষালদের পাকা দালানবাড়ি ছাড়াও আরো অনেকের কাঁচা বাড়ি মেটে ঘর নানা ধরনের বিত্তসামর্থের বসত। বসত মানেই সংসার। সংসারের হরেক নারীপুরুষ কাচ্চাবাচ্চা,

অনেক সুখদুঃখ সুখ আনন্দের পাঁচালি। এঁদের সঙ্গেই আছেন জীবনভর। জোড় লেগেছে কোথাও, কখনও লাগে নি। কিন্তু বিরোধ ছিল না কোনোদিনই। যেন বিশাল অরণ্যে শক্ত পায়ে স্থির থেকে নিঃসঙ্গ বেঁচে থাকা অন্য সব বৃক্ষের সঙ্গে সমদূরত্বে, সমান হৃদ্যতায়।

জোড়ামন্দিরতলা। কত কত বছরের ইঁট কাঠ পাথরের প্রাচীন কীর্তি। কত কত ইতিহাসের সাক্ষী নীরব শক্তিমান? সব প্রাচীনত্বই ভেঙে পড়ছে এবার। খসে খসে পড়ছে টেরাকোটার অলঙ্কারগুলো। না-কি অন্ধকার রাতে সবই চেঁছেপুছে নিয়ে যায় কোনো নিশাচর? বিদেশে চালান? নগদা ডলার? যদি সবই ধ্বসে যায় একদিন? সেদিনও হয়তো আগাছার জঙ্গলে শূন্যতার নিরবয়ব অস্তিত্বে থেকে যাবেই কিছু একটা। একইভাবে নিয়মিত পুজোআচ্চা দেবারতি হবে দু-বেলা। নীলের উপোস বা শিবচতুর্দশীর সন্ধেয় বাবার মাথায় জল ঢালার ভিড় এয়োতিদের। অনেক কালের অনেক যুগের পিতামহী-প্রপিতামহীদের যারা আছে যারা থাকবে সংসারে।

হাঁটেন শশিভূষণ। হাঁটতে থাকেন একইভাবে পৌরাণিক পথে। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই শিশুটিকে। বগলে স্লেটবই নিয়ে এ-পথ ধরেই ভোলা বাঁড়ুজ্যের পাঠশালায় যেত সে। তখনও এ-রকম গা-ঘেবাঘেবি এত বাড়িঘর হয় নি গ্রামে। অনেক খোলামেলা, এদিককার সবই মাঠ। অনেক গাছগাছালি ছিল সেদিন, অনেক পাখি। ছেঁড়া-ছেঁড়াভাবে গেরস্তদের ঘরউঠোন। গোটা গাঁয়ে কটা আর পাকা দালানবাড়ি ছিল। সবই মেটেঘর কিংবা খড়ের ছাউনিতে কাঁচাবাড়ি। কিংবা সেই অবোধ বালক। বইখাতা নিয়ে বড় ইশকুলে সে গেছে বছরের পর বছর। ভালো ছেলে বলে বেশ বাহাবা ছিল সকলের। কিংবা তারও পরে এক যুবক। গাঁয়ের বড় ইশকুলের মাস্টারমশাই। এরও কিছুকাল বাদে হেডমাস্টার এবং তখনও সাইকেলে চেপেই এ-পথে নিত্যি যাতায়াত তার। আজ আর ফিরে পাওয়া যাবে না কাউকেই। কিন্তু এই রাস্তার স্মৃতিবৃত্তে ওরা সকলেই একজন হয়ে আছে এবং সে আজও সে হাঁটে। সকাল সন্ধেয় হেঁটে যায়, হেঁটে ফেরে। শেষপর্যন্ত একজন পরাজিত মানুষ। মিথ্যে গৌরবের অহঙ্কার নিয়ে গোটা গ্রাম থেকে বড়ই বিচ্ছিন্ন ছিল সে। বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা। এ-পরাভবও বোধ হয় তার প্রাপ্যই ছিল।

সামনের দিকে সাইকেল চেপে আসছিল একজন বয়স্ক মানুষ। কাছাকাছি এসে শশিভূষণকে দেখেই নেমে এক পাশে দাঁড়াল। মাস্টারমশাইদের দেখলে এভাবে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ানো গ্রামে অনেক কালের শিষ্টাচারবিধি। শশিভূষণ চিনলেন—হাতিয়ারার কানাই। পুরনো ছাত্র। এখন চাষবাসে, বিশেষত আলুর মরশুমে হাজার হাজার টাকার বাণিজ্য। বিস্তর বিষয়সম্পত্তি। একপাশে সাইকেল রেখে এগিয়ে এসে প্রণাম করল। বয়স ষাটের ওপর নির্ঘাৎ। লম্বা টাক, এদিকে ওদিকে যেটুকু চুল আছে, সবই প্রায় শাদা। কিন্তু কানাইয়ের মাথা নয়, চুল নয়, ওর ভালোমন্দ কিছু নয়। সোজাসুজি মুখে মুখ রেখে গভীর নিরীক্ষণে দেখতে চাইলেন ওর দুটো চোখ। দুটো চোখে চোখ রেখে পুরো কানাই নামক অস্তিত্বটিকে কি সত্যি চেনা যায়? এভাবে শনাক্ত করা কি সম্ভব আদৌ?

'কী দেখছেন মাশ্যাই?'

'না, কিছু না...' শশিভূষণ হকচকিয়ে নিজেকে বিন্যস্ত করে—'তুই যা, সাবধানে থাকিস বাবা। দেশগাঁয়ে যা সব হচ্ছে আজকাল।'

কানাই চলে যাবার পরও কিছুটা পথ গিয়ে শশিভূষণ পিছু ফিরে তাকালেন একবার। কিছুটা সঙ্কোচবোধের অস্বস্তি। বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছে খানিকটা। ছেলেমানুষিই হয়তো। শশিভূষণ নিজের মধ্যেই নিশ্চিত হতে পারছেন না এখনও। অথচ মুখোশঢাকা মুণ্ডুর কোটরে তাজা দুটো চোখের স্পষ্টভাবে গেঁথে আছে তাঁর চোখের মণি দুটোয়। ক্যামেরার লেন্স যেভাবে সেলুলয়েডে টেনে নেয় বাইরের ছবি। সে-চোখে ক্রোধ ছিল, লোভের তাড়না ছিল। ঘৃণা ছিল কি? যদি থাকে, তাঁর গোটা জীবনের ক্রিয়াকর্মগুলি, সমুদয় শান্তি স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যায়।

যাদব পোরেলের ছেলে বিল্টু। হেলে চাষার ছেলে একটা জীবন চেয়েছিল। এগোতে পারে নি বেশি দূর। প্রাইমারির পর বছর দুয়েক ফেল করে মাঝপথেই স্কুল ছুট। লেখা পড়ার সেলাম ঠুকলেও বাহাদুর ছেলে। ট্রাক্টরের দিনে হাললাঙলে পেট ভরবে না জেনেই কেষ্টা মিস্তিরির চেলা বনে গিয়েছিল সময়মতো। গ্রামে বিদ্যুৎ আসার পর কেষ্টাই ছিল গেরস্তদের একমাত্র ভরসা। গুরুর কাছে তালিম নিয়ে ইলেকট্রিসিটির খাঁজখুঁজ এমনভাবে হাতের কব্জায় ধরে ফেলল ছেলে, এরপর গুরু-মারা বিদ্যেয় বিল্টুর জন্যেই গেরস্তদের হাঁকাহাঁকি। শশিভূষণের কাছে সে-ছেলেই প্রথম পছন্দের হয়ে উঠেছিল একদিন। ডাকলেই চলে আসত। অনেকদিন, অনেকবার। তাঁর ঘরের আনাচেকানাচে খুঁটিনাটি সবই জানা ছিল। সেই ছেলে হঠাৎ গ্রাম থেকে উধাও প্রায় বছর তিনেক। অসুবিধা সকলেরই। কিন্তু এর জন্যে হাহুতাশ খোঁজখবরের চাড়ও ছিল না কারুর।

কিন্তু কাল রাতে হঠাৎ সে ছেলে। অন্যভাবে, আলাদা মূর্তিতে? মুখোশের চোখ সত্যি যদি বিল্টুই হয়?

অশান্ত শশিভূষণ। হাঁটতে হাঁটতে কখন বটতলা, রাসমন্দির, শঙ্কর ঘোষের মস্ত ডাক্তারখানা পেরিয়ে অশ্বথতলার বাজারে পৌঁছে গেছেন, হদিশই ছিল না। রোজকার বাজার বেশ জমে উঠেছে সাতসকালেই। মানুষের জটলায় বিস্তর কোলাহল। কাল রাতের ঘটনাটা নিশ্চয়ই এখনও চাউর হয় নি গাঁয়ে। তাহলে তাঁকে ছেঁকে ধরত চারপাশ। একই গাঁয়ে নিত্য বসবাসে বা প্রতিদিনের বাজারে যাঁদের সঙ্গে নিয়মিত দেখাসাক্ষাত, কুশল প্রশ্ন বা পেন্নাম-নমস্কারের ঘটা আর সেখানে থাকে না সেভাবে। তবু কিছুটা সম্ভ্রমের মৃদু হাসি বা কিঞ্চিৎ সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দেবার বিনীত আচরণ—কোনো কিছুতেই কিছুমাত্র দৃকপাত নেই বৃদ্ধের। চেনা-অচেনা মানুষের ভিড় জটলা কাটিয়ে ছুটছেন শশিভূষণ। বাহাত্তরের শরীরে হাড়মজ্জাকলকব্জাগুলো আর বইতে পারছে না এক নাগাড়ে এতটা পথ হাঁটার জেদ।

ঘরের দাওয়ায় বসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল যাদব পোরেল। শশিভূষণকে দেখেই একলাফে নেমে এল নিচে—'পেন্নাম, পেন্নাম গ মাস্টারমশাই...'

শুধু কথা নয়। যথাযথ প্রণামের জন্যেই হাত বাড়িয়ে নুয়ে পড়েছিল মানুষটা।

শশিভূষণের ভ্রূক্ষেপ নেই—'তোমার ছেলে কোথায় যাদব?'

আজ্ঞে কার কতা বলচেন? বিন্টু? অ্যাই দেখুন দিকিন, আপনার গাঁয়ের দশজন গণ্যিমান্যি জন এখনও কষ্ট করে এসে বিন্টু-বিন্টু করেন। তা ওই মুখপোড়া কি আর বোঝে এসবের ময্যাদা?' দুটো হাত কচলে ছেলের হয়ে সাফাই গাইছে বাপ—'মিছে কতা বলব নি গ মাশ্যাই। ছেলে এখন মান রেখেচে। রোজগারপাতি করচে বেশ।'

'দেশে আসে না?'

'আসবে নি কেনে? ছুটিছাটায় নয়তো রোব্বার সকালবেলা এসে বিকেল-বিকেল চলে যায়।'

শিরদাঁড়ায় সোজা হলেন শশিভূষণ। গাঢ়তর গলায়—'কাল রাতে ও কোথায় ছিল জানো?'

'কেনে গ মাশ্যাই। কেনে এমনধারা বলচেন?' ভয় পেল যাদব। গলাটা ছুঁচলো করে বাড়িয়ে—'কাল ত রাত্তিরের ডুটি ছেল।'

'রাতের ডিউটি? মানে...' শশিভূষণের সংশয়—'সে-তো যারা করে, তাদের। ওতে ওর কী? ও যে নাইট ডিউটি বলে সেটা কী তুমি জানো যাদব? সাংঘাতিক। একবার ফাঁস হয়ে গেলে...'

'কেনে গ মাশ্যাই? কী বলচেন? বধ্ধমান মানপ্পিটির চাকরি। আমি ত গিছলুম গ, নিজে দেখে এয়েচি...'

'বর্ধমান মিউনিসিপালিটির চাকরি? নিজে দেখে এসেছ?'

'নইলে আর বলচি কী আপনেদের। আপনেদেরকে মিছে বললে জিভ খসে পড়বে নি আমার? সব...সব ওই গোবিন্দর ইচ্ছে...' জোড়া-হাত কপালে তুলে আকাশের দিকে মুদিত নয়ন। মর্ত্যধামে চোখ মেলল যাদব—'আর আপনেদের দশজনের আশীব্বাদ গ মাশ্যাই। দিনেমানে হয়, সে-তবু এক রকম। রেতের ডুটিতে বড্ড কষ্ট গ বাবু। শহরের রাস্তায় আলো জ্বলে না সারা রাত্তির? তার দেখভালের কাজ। রাতভর আর সবার সনে জেগে বসে থাকতে হয়। কোথায় কী বিগড়েচে খপর এল ত যন্তরপাতি আর লম্বা মই নিয়ে ছোটো সেখেনে। অতিশ্যি আরো জনা দু-তিন মিস্তিরি থাকে সঙ্গে। এই দেখুন না, কাল গোটা রাত্তির জেগে একেবার ফাস্ট টেরেনে চলে এসেচে ছেলে...'

'বিন্টু এসেছে?' বদলে যাচ্ছেন শশিভূষণ। সবটা বিশ্বাস করতে কুণ্ঠা ছিল যদিও, কিন্তু যাদব যা বলছে, যেভাবে বলছে, এখনও পরখ জরুরি—'কোথায়? ঘরে আছে? ঘুমচ্ছে নাকি?'

'না গ, এই ত বাজারে গেছে। আসবে এক্ষুনি...' বংশানুক্রমিক মাথা-ঠিকনো মানুষ, বিনয়ে আরো বেশি ভেঙে পড়েছে যাদব—'ছোট মুখে আপনার মতোন বড় মানুষকে ত বলতে পারিনে মাশ্যাই। আজই আমার শুভ কাজের দিনে ঘরের দোরে পায়ের ধুলো পড়ল আপনার? ছেলেটার ভাগ্যি। ঘরে এসে বসবেন নি একবারটি? এট্টু মিষ্টিমুখ করে যাবেন নি?'

'কেন? কী হচ্ছে তোমার ঘরে?'

'বিন্টি ত বিয়ে করচে গ। আজ দুফুরের টেরেনে ওনারা আসবেন ছেলেকে আশীব্বাদ করতে...'

'সে-তো খুব ভালো কথা। সুখের কথা। তা তোমার কী। তুমি এত মুখে বেজার করে আছো কেন?'

'কী জানি, আম যেন কেমনধারা মন কইচে। শ'রের মেয়ে, পয়সাওলা ঘর।'

'শহরের লোক হলেই বুঝি পয়সা থাকে খুব? আর সে-যদি থাকেও ওরা তোমার ঘরে কাজ করতে চাইলে, তুমি এ-রকম কিন্তু-কিন্তু করবে কেন?'

'হ্যা হ্যা হ্যা....' দুটো হাত দু-পাশে তুলে অবাধ্য ছাত্রের মতোই বুড়ো কান মুলে জিভ বের করে—'না ম্যাশ্যাই বিশ্বেস করুন, এ-আমি কাউকে বলি নি। বিন্টুর মাকেও না। আজ শুভদিনে আপনি এলেন। কাছে পেলুম। বললুম।'

'না না, তোমার কোনো ভাবনা নেই যাদব। মিছিমিছি ভেবো না এসব। মাত্তর এই কটা বছরে তোমার ছেলে কী করেছে, কত বড় মানুষ হয়েছে, দশগলা করে সেইটে বলো সবাইকে। গাঁয়ের দশজনে শুনুক দেখুক শিখে নিক—মানুষ কী না পারে? বাহাদুর ছেলের বাপ তুমি। কিচ্ছু ভাববে না। এ-ছেলে বেইমানি করবে না কোনোদিন।'

কথাগুলো বললেন শশিভূষণ। অনেকটা ধর্মকথা বলার ঢঙে পুরুতঠাকুরের মতো। নিজের কাছে নিজেরই কথাগুলোয় সত্যিমিথ্যের ফ্যাকড়া থেকে যায় অনেক। সহাস্য প্রসন্নতায় জোড়হাত বুকে নিয়ে নুয়ে এসেছে যাদব পোরেল—'তা'লে একবারটি মাশ্যাই...'

'না না, শোনো যাদব, শোনো। আজ আর ঢুকব না। আমার ঘরে আজ সকালেই আমজাদ আর দুলাল বাগুই নেতাদের সব আসার কথা আছে। আসার কথা কী? বোধ হয় এসেও গেছে...' বাঁ-হাত তুলে কব্জিঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে—'তোমাদের কাজটাজ মিটুক ভালোয় ভালোয়। আমি আসব। আমাকে তো আসতেই হবে। তোমার বাহাদুর ছেলেকে তো দেখে যেতেই হবে। দেখি, যদি শরীরটা ভালো থাকে, আজ বিকেলেই...'

ফিরলেন শশিভূষণ। ঘর ছেড়ে বেরুবার পর যেভাবে ভূতের তাড়া ছিল, অস্থির ছোটার মতিচ্ছন্নতায় বুকের দম দেউলে হয়ে এসেছিল প্রায়। যাদবের ঘরের দাওয়ায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও বিশ্রামে প্রকৃতির দেনা শোধ হয় নি পুরোপুরি। এই বয়সে এতটা গোঁয়ার্তুমিও বোধ হয় ঠিক বয়সোচিত সুবিবেচনা নয়। পা দুটো জোর পাচ্ছে না খুব। বড় মন্থর। মাথার উপর রোদ চড়ে যাচ্ছে। যেতেও হবে অনেকটা পথ। কেমন ঘোলাটে লাগছে সব। নেতারা কারা আসবে বা আসবে না, কিচ্ছুমাত্র প্রত্যাশা-উদ্বেগ নেই। যাদব পোরেল বা বিন্টু? যেভাবে কথাগুলো বলল যাদব, নিরক্ষর মুখ্যু মানুষ, শুধু মাঠে-মাঠে খেটে আর এর-ওর বাড়ি ঘরামি করে দিন কাটে যার, মনে হয় না সাজিয়ে-গুছিয়ে খুনেডাকাত ছেলের জন্যে সে মিথ্যে বলতে পারে।

বাজারের কাছকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন শশিভূষণ। থমকে গেলেন। দু-হাতে দুটো ব্যাগ ভরে বাজার করে তেজী পায়ে এগিয়ে আসছে এক যুবক। দেখেই কী মনে হলো, কাল

রাতে এ-রকম ভয়ঙ্কর একটা কাজ করে এসে কোনো ছেলে এভাবে সেই গ্রামেই সকালবেলা হাজারো মানুষের ভিড়ে বাজার করে এত খোলামেলা ঘরে ফিরতে পারে না কখনও। অসম্ভব। দেবতা নয় সে ছেলে। বৃত্রাসুর হওয়া আরো কঠিন।

বিল্টু। সামনে এসে দাঁড়াতেই ভরাট গালে খুশি ছড়িয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল সেই ছেলে—'ভালো আছেন স্যর?'

'কী রে, তোর যে পাত্তাই নেই এতকাল। সবাই বিল্টু-বিল্টু করে। কোথায় তুই?'

'বধ্ধমানে একটা চাকরি পেয়েছি স্যর। মিউনিসিপালিটির কাজ।'

'কী করতে হয় তোকে?'

'দিনে রাতে রাস্তার লাইটপোস্টগুলো, লাইনের তার ছিঁড়ে গেলে জোড় দেয়া, ট্র্যান্সমিটারে গড়বড় হলে টেলিফোন আসবে আপিশে। ছুটে যেতে হয় তক্ষুনি...'

'বাঃ এ-তো খুব ভালো চাকরি রে। এ-বাজারে এরকম একটা কাজ জুটিয়ে ফেলেছিস তুই। সাবাস। কী করে সাবাস দেব, সেই তো ভেবে পাচ্ছি না...' চোখে চোখে রেখে সে-ছেলের চোখ নয়, চোখের কোল নয়, মুখোশের মানুষ বলে আর কোনো অসম্মান নয়। নিজের মধ্যেই বিচ্ছিরিভাবে কুঞ্চিত হতে থাকেন। কাল রাত থেকে কী কুচ্ছিত সব চিন্তা করে আসছেন তিনি? কত বড় অন্যায়? পাপ?

অথবা কিছুমাত্র পাপ নয়। দুষ্কৃতি ভাবনা থেকেই অন্য এক বিল্টুকে আবিষ্কার করে ফেলেছেন অতর্কিতে। এই গ্রাম, গ্রামের মানুষ বা পঞ্চায়েতে, নেতা-মাতব্বররা কেউই এর মূল্য দেবে। লেখাপড়া শেখেনি বিল্টু।

'দেখলি তো, হাতের কাজ শিখে ফেললে কী হয়। এর কোনো মার নেই রে। তোর চাকরি না থাকলেও তোর হাতটা তো থাকবে। ইলেকট্রিসিটিও থাকবে। আরও বাড়বে। তোকেও চাইবে সবাই...' থামলেন শশিভূষণ—'তোকে তো মেয়ের বাড়ি থেকে আশীর্বাদ করতে আসছেন সবাই। বাঃ খুব ভালো। দেখিস বাবা, বউভাতটা যেন ভালো করে হয়। আমিও আশীর্বাদ করছি বাবা, দীর্ঘজীবী হ তুই । কল্যাণ তোর...'

বিল্টু লজ্জা পেল। মুহূর্তে, দু-হাতের ব্যাগদুটো মাটিতে রাখতেই রাস্তার ওপরই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল আনাজপত্র। কোনো হুঁশ নেই। সর্বাঙ্গে নুয়ে পড়ে প্রণাম বিল্টুর।

স্তম্ভিত শশিভূষণ। চোখ বুজে পায়ের পাতায় বিল্টুর হাতের স্পর্শ অনুভব করলেন শশিভূষণ। দেহের অণুতে অণুতে, দেহের হাজার কয়েক নার্ভের শাখায়-উপশাখায় সঞ্চারিত হয়ে একটা ঠাণ্ডা শিরশির উঠে আসে স্নায়ুতে শীর্ষরেখায়। শরীরটা ঝিমিয়ে আসে। কাল রাতে একটা চপেটাঘাত ছিল বাঁ-গালে। ডান গালে হাতটা উঠে আসে অবশভাবেই—'ইশকুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন স্যর। তবে আজ কেন আশীর্বাদ হতভাগাকে?'

কেন রাগ হয় না?

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

এখনও বৃষ্টি নামে নি। কিন্তু নামতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। আকাশে কালচে রঙ নামলে টিপটিপিয়েই নামবে। ঝমঝমিয়ে নামার সময় নয় এখন। কলকাতায় একটু শীত শীত পড়েছে। পড়ারই সময় এখন

ভিআইপি দিয়ে তীরের বেগে এসে বাঁ দিকের ঢালু পথে নেমে বাইপাসের দিকে ঘুরতেই বাইকটা বেঁকে যায়। কাত হতে হতে যেন শুয়েই পড়তে চায় বাঁ পাশে ফিরে। হাঁটু প্রায় ছুঁয়ে দেয় রাস্তা। ভিকির মনে হয়, দিব্যি করেছে রাস্তাটা। একটাই শুধু অসুবিধা। বড্ড অল্প জায়গায় একটু বেশি ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর একটু ছড়িয়ে, আরও জায়গা নিয়ে, আর একটু চওড়া করে করলে বাইকের স্পিড কমাতে হতো না। এমনি করেই উড়ে যেত। হিরো হন্ডা অ্যাচিভারের যেমন যাওয়ার কথা, যাওয়া উচিত। কিন্তু বড় করে ঘোরাতে হলে, রাস্তাটা আরও চওড়া করতে হলে,' ওই ঝুপড়িগুলো...ঠিক ঝুপড়ি নয় বাড়ি। বাড়ি হলেও ঝুপড়ি ঝুপড়ি বাড়ি। খালপাড় নয় বলে টালির নালা নয় বলে কিংবা হয়ত লম্বা লম্বা স্কাইস্ক্র্যাপারে ঘেরাও হয়ে আড়ালে পড়ে আছে বলে কারও চোখে পড়ে না। চোখে না পড়লেও পথে তো পড়ে। গাড়ির গতি কমে যায়। যাবেই। কিংবা হয়ত কোনও দাদার প্রোটেকসনে...এ পার্টির কিংবা ও পার্টির। ফলে বাইকের...মোড়ে মোড়ে কত রঙের হোর্ডিং, পথ তো শুধু চলার জন্যে নয়, প্রগতির জন্যে। প্রগতির জন্যে চাই গতি। গতির জন্যেই তৈরি হচ্ছে বড় বড়, ভালো ভালো রাস্তা, ব্রিজ, ফ্লাইওভার। রাস্তা পেরোবার জন্য ওভারব্রিজ। শুধু ঝুপড়ি নয়, ঝুপড়ির মতো বাড়ি নয়, রাস্তায় লোক পড়লেও তো গতি কমে যায়। কলকাতার লোকজন তো রাস্তায় হাঁটতেই শেখেনি এখনও। বোকো ঠ্যালা। বয়েস কত হলো কলকাতার।

জব চার্নক তো কাল আসেন নি। এখানে তাঁর পদার্পণ দিয়েই শুরু কলকাতার পথ চলা। এবং কলকাতার পথে চলা। তারপর তো কতজন এল। লর্ড ক্লাইভ। ওয়ারেন হেস্টিংস। লর্ড কার্জন। হলওয়েল। অকটোরলনি। এমনকি টেগার্টও। সেই তো শুরু কলকাতার আধুনিকতার। আধুনিক যুগের মানুষজন, মাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিউনিস্টরাও... তাদের উৎসাহে উদ্যোগেই তো স্থির হয়ে গেছে জব চার্নক যেদিন এখানে পায়ের ধুলো দিলেন সেদিনই জন্ম হলো কলকাতার। তিনশ বছর পরে সেই দিনটায় কত উৎসব হয়েছে। সভাসমিতি, গানবাজনা, ঘোড়ায় টানা ট্রাম, খানাপিনা। সাহেবমেম সেজে সেই ট্রামে বসে হাওয়া খাওয়া। খেতে খেতে বাজি পোড়ানো। এইসবই তো আধুনিকতা। পরমাণু শক্তি দিয়ে আলো জ্বেলে উড়োজাহাজ-রকেট ওড়াতে ওড়াতে ভট করে ঘোড়ায় টানা ট্রাম ঢুকিয়ে দেওয়া। জীবনানন্দের ধানসিঁড়িতে শক্তি চাটুজ্জের 'লাথি মারব পোঁদে'। তার চেয়ে বরং খাও চোয়ালে থাপ্পড়, কথা শোনো, এই তো। লক্ষ্মী ছেলে। আর লাথি খাওয়াখাওয়ি নেই, না পশ্চাদ্দেশে, না অন্যত্র। এবার যাও, বাইকে ওঠো। উড়ে যাও অ্যাচিভার। এই তো অ্যাচিভমেন্ট।

শামি তার বগলের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে বুকে এমন চাপ দেয়, দুই বুক এমন করে ডলে, বুকের বোঁটাদুটো শক্ত হয়ে আসে। ডিকি ফিস্‌ফিস করে আর্তনাদ করে, উফ্‌ফ্‌ফ্! শামি, তলায় গেঞ্জি নেই।

শব্দগুলো বাতাস হয়ে আসে, বাতাসেই মিশে যায়। শামি তার গলায় গাল ঘসতে আরম্ভ করে।

বাপ্পাব্বাঃ! তোমার তো দেখছি সবই মুখস্থ। কী করে পড়তে বলো তো হিস্ট্রি! আমার এমন বোওরিং লাগত, আমি তো...

'আমার বাবার...

তাই তো বলছি, বেঙ্গলি আর হিস্ট্রি পড়তে গিয়ে পোয়েট্রি আর কিং-কুইনদের বাবার নাম মুখস্থ করতে করতে আমি আমার নিজের বাবার, মাই ওউন ড্যাডির নাম ভুলে যেতাম।

মেঘ দেখে বৃষ্টির কথা মনে হচ্ছিল। এখন তো কুয়াশা পড়ার কথা। মেঘ নেমে আসার কথা ভিআইপিতে, সল্টলেক সিটিতে, বাইপাসে, নিউ ক্যালকাটায়, পার্কসার্কাসে ফ্লাইওভারে, তারাতালায়...

বাবার হিস্ট্রি। আগে ধোঁয়া জমত। বাড়ি বাড়ি রাতের রান্নার আয়োজন হতো। ঘুঁটে, কেরোসিন, কয়লা, হাতপাখার বাতাস। একটু পরেই গলগল ধোঁয়া। রান্নাঘর থেকে শোয়ার ঘর, সে-ঘর থেকে ঠাকুরঘর। তারপর গলিতে, রাজপথে, বাতাসে, আকাশে। বড় একটা মেঘের টুকরো যেন ঢেকে ফেলত কলকাতাকে। চোখ জ্বালা করত। জলও পড়ত মাঝে মাঝে। বাবা কারখানা থেকে ফিরত সেই মেঘের মধ্যে দিয়ে। সাইকেল চালিয়ে। সাইকেল হ্যালান দিয়ে রেখে বারান্দায় জমিয়ে বসত কাসতে। জমিয়েই কাসত। কাসতে কাসতে বেঁকে যেত এক একদিন। বড় গেলাসে আদা দেওয়া চায়ের তলানিটুকুও খেয়ে তবে সোজা হতো।

কবে যে এই ধোঁয়ার হাত থেকে মুক্তি পাবো? ভোরবেলা যাই, তখনও। সন্ধেবেলা ফিরি, তখনও।

তেমন শীতকাল কবে আসবে, বনলতা?

কয়লাখেগো, কয়লাহাগা হাড়হাভাতেগুলো বিদায় নিলে, তবে।

চায়ের গেলাস নামিয়ে দিয়েই দৌড়তে হয় হেমলতাকে। উনুনটা খালি খালি জ্বলে যাচ্ছে। চা-দেওয়ার তাড়ায় কিছু চাপিয়ে আসা হয় নি। যে-কথার উত্তর নেই, উত্তর আসে না, অর্থ কী সে-কথার? দরকারই বা কী? কী হাল হয়েছে বনলতার? এর জন্যে কবিতা লিখতাম এককালে? এর জন্যে?

কী মনে হয়, উইল ইট রেইন?

উঁহুঁহুঁ!

গলায় গাল।

আরে এখন থেকেই...ডিসকো...আমরা পথে! প্লিজ শামি...

একটু একটু মেঘ আছে দূরে দূরে। ছাড়া ছাড়া। জমাট বাঁধলে কী হবে কে জানে। তবে...

এখনও কুয়াশা নেই। আরও দিন দশবারো পরে জমবে হয়ত। কুয়াশার শ্বাসে নাকি ফুসফুস তেজী থাকে। সেইজন্যেই কার্সিয়াং-এ টিবি স্যানেটোরিয়াম বানিয়েছিল সাহেবরা। বাবা গিয়েছিল কাঁচরাপাড়ায়। ভিক মানে বিবেকানন্দ। আইটি-র লোক। তার অফিসের গোটা বাড়িটাই এসি। শামি হলো শ্যামলী। কাঁচরাপাড়ার রিলটা নিয়ে তার ধারণা একটু আবছা আবছা।

সে যাই হোক, সেই ধোঁয়া আর নেই। এখন কলকাতার বাতাস কত ক্লিন। মানে আগের তুলনায়। এখন বাড়ি বাড়ি গ্যাস। কোথায় রাশিয়া, কোথায় ইরাক, কোথায় মক্কা, সিলিন্ডারে ভরে ভরে তাদের গ্যাস চালান হয়ে বাড়ি বাড়ি। গড়িয়া উল্টোডাঙা তেঘরিয়াতেও ধোঁয়া নেই। ইরানের পাইপ গ্যাস এসে গেলে তো, ব্যস! যে যাই বলুক, এগোচ্ছে। দেশ এগোচ্ছে। কলকাতাও পিছিয়ে নেই। এগোচ্ছে! এগোচ্ছে।

এগোতে এগোতে চিংড়িহাটার ফ্লাইওভার। সাউথ ক্যালকাটা থেকে আসছ? সোঁওঁওঁ চলে যাও নিউ টাউনে। সেখান থেকে সিক্স্‌লেন ওয়ান ওয়ে ধরে, পনেরো মিনিটে এয়ার পোর্ট। ভাবা যায়? কলকাতায় সিক্স্‌লেন। ওয়ান ওয়ে। একেই তো বলে অটোবান! দেশটা জার্মানিই হয়ে গেল। জার্মানরাও আসছে। জাপানীরা এসে গেছে। সেক্টর ফাইভ। একেবারে টাটকা নতুন শহর। সবে নেমেছে কড়াই থেকে। মুচমুচে।

এই, একদিন নিয়ে যাবে?

কোথায়?

রাইডে—এই ফ্লাইওভার...নিউ ক্যালকাটা বাইপাস, ভিআইপি হলদিরাম, নন স্টপ। ওয়ান ফিফটি, ওয়ান এইটি, ইয়াহুউউউ।

হলদিরামে গরমাগরম পনীর চপ।

এনি ডে। বলো তো আজই...ঘুরিয়ে নেব?

নো, নো, নট টুডে। ওরা এসে যাবে। আই ওআন্ট টু জয়েন ফ্রম দ্য ফার্স্ট নাম্বার। আর একদিন। অন্যদিন হবে।

সেক্টার ফাইভ এখন সল্ট লেকের বাইরে। পৃথক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আই-টি সিটি। ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আইন কানুনও ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ধোঁয়া নেই, ঝুপড়ি নেই, ভিখিরি নেই। মিছিল নেই। স্ট্রাইক নেই। সব খুশ। সবাই খুশ। খুশখুশ। খুশবুশ। হ্যাঁ বুশ সাহেব। রোজই সেখানে যেতে হয় ভিকিকে। রোজই দেখে নতুন একটা বাড়ি গজিয়ে গেছে। কী সব বাড়ি! আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কী চায় এরা? সিলিকন সিটি? কলকাতায়? হতেও পারে। পারে। পারে! যেভাবে এগোচ্ছে।

চিংড়িহাটার জলের পাশ দিয়ে বর্শার ফলার মতো চলে যেতে যেতে ভিকি-র মনে হয়, এই রকম জলই তো ছিল সল্ট লেকে। গোটা সল্টলেকে। শুধু জল আর জল। জলে মাছ আর মাছ। গোটা কলকাতাকে মাছ খাওয়াত সেই জল। জলের পাড়ে ছিল শুধু গুটিকয় ঘর, রিফিউজি আর ঘটিদের মিলমিশ আস্তানা, দত্তাবাদ। যেতে আসতে কাদায় ডুবে যেত

পা। জল নেই। সেখানে আস্ত একটা সিটি। সল্টলেক সিটি। কিছুতেই বিধাননগর নয়। কেমন বোকা বোকা লাগে নামটা। ময়দানব যেন সেই জলের একেবারে তলায় হাত চালিয়ে দিয়ে ঠেলে তুলে দিল একটি আস্ত নগরী। সিটি। কী একটা সিটি। কীসব রাস্তা। সবুজ গাছ। কত পার্ক। গ্রীন ভার্জ। চোখজুড়োনো বাড়ি। সুন্দর সুন্দর মানুষজন। পোশাক আশাক। হাউ মডার্ন। কত বাড়ি থেকে সকালেই বেরিয়ে যায় গাড়ি। কোনও কোনও বাড়িতে বউ একা। পা থেকে সবকিছু নামিয়ে দিয়ে এ-সি চালিয়ে শুয়ে থাকতে পারে চিৎ হয়ে। কাত হয়েও। রিমোটে মিউজিক সিস্টেম। বা ডিভিডিতে সেই সিডি। এক একটা বাড়িতে ওই সিডি চালিয়ে দিয়ে, হালকা মিউজিকও চলে, বসে যায় মধুচক্রও। মধুচক্র, আ আ আ আ। শব্দটা থেকে কেমন মধু ঝরে। ভেসে যায় দুই উরু। উরুযুগলের আশ্লেষ করি যদি স্তনযুগ মরে কেঁদে!...চীন, চীন। কবে লিখেছিলেন চীনা কবি। কত এগিয়ে গেছে চীন।

কিন্তু মধুচক্রের ইংলিশ ওয়ার্ডটা কী? ইংলিশ?

আহ্‌হ্‌হ্‌হ্‌।

তুমি জানো, শামি?

শামি গলা থেকে গাল তুলে ভিকির কান চাটে। কানের লতি কামড়ে দেয় আলতো করে। কোনওমতে উচ্চারণ করে,

কী হানি?

জিভের আগুন মাথা ভেদ করে বুক হয়ে পেট চিরে তলপেটে পৌঁছতেই কেমন আগুন আগুন জ্বালা ভিকির সর্বাঙ্গে। আর তখনই ঘটে যায় ব্যাপারটা। এক মুহূর্তের চেয়ে কম সময়ে।

ভয়ংকর ঝাঁকি। কীসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগে। ওয়ানটেন। ওয়ান টোয়েন্টি। বাইকের সামনের চাকা পিছলে যায়। বাইক ছিটকে যায় রাস্তার একপাশে। পিচ ছাড়িয়ে মাটিতে। মাটি ছাড়িয়ে পাশের খালে পড়তে পড়তে, পড়ার আগেই কোনওমতে সামলে নেয় ভিকি। সমস্ত শক্তি দু'হাতে জড়ো করে পিচের ওপর চাকা তুলতে তুলতে চেঁচিয়ে ওঠে,

হোল্ড অন, বেবি।

শামি দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ভিকিকে। বাইক ছিটকে বেরিয়ে যায়।

শামি একবার পেছনে তাকায়।

কিন্তু ভিকি, লোকটা...

হোলড অন টাইট। উই ফ্লাই নাউ।

কিন্তু ভিকি, লোকটা হয়ত এখনও...

ভিকি থামার কথা ভাবেও না। সে জানে এখন থামলেই, হিউম্যানিটি ফিউম্যানিটির সেন্টু দেখাতে গেলেই সন্ধেটা যাবে। সেই সাথে যাবে এক কাঁড়ি টাকা। তার পরেও বাইকটা জ্বালিয়ে, আমাদের ছালচামড়া ছাড়িয়ে নিতে পারে...

নো বেবি, নো। হোলড অন টাইট। অ্যান্ড ডোন্ট লুক ব্যাক, নেভার এভার লুক ব্যাক। উই ফ্লাই। ওই হ্যার্গাডদের তুমি চেনো না।

এই তো আধুনিক ভাষা। এই তো আধুনিকতা। এই তো আধুনিক কলকাতা। ভিকি আর শামিদের কলকাতা। ওরা যেমন কলকাতার, কলকাতাও তো ওদেরই।...ওয়েল ডান ভিকি! ফ্লাই অন! কিপ ফ্লাইং! আর তুমি, শামি, হোল্ড অন, হোল্ড টাইট। ছেড়ো না, আলগা দিও না! যা তোমার এবং যা তোমার নয়, যতটা পারো সবটুকু কামড়ে, আঁকড়ে ধরে থাকো। যেমন করে পারো থাকো। এই থাকাটাই, যেমন করে হোক থেকে যাওয়াটাই ইয়ুথের লক্ষণ, ইয়ুথের ধর্ম। আর তোমরাই তো ইয়ুথ। আধুনিক জীবনের ইয়ুথ। এই তো জীবন। এখন, এই তো সময়।

ফ্লাই মানে উড়ে যাওয়া। উড়েই গেল ওরা...আকাশ পানে আকাশ বেয়ে, যেন পাখি...যেন বাজ। আসলে তো পিঁপড়ে, এক দানা চিনিতেই ডানটানা গজিয়ে, লাল লাল, এক পাল!

ফ্লাই মানে পালিয়ে যাওয়া। পুড়ে যাওয়া। পুড়ে গেলে আর ডানা থাকে না। ভিকি, শামি, সোহন, নেহা, করণ, সঞ্চি, রথী, ইতি, সুচরিতা সবাই গেল। কোথায় যাচ্ছে, কোথায় গেল কে জানে। কিন্তু গেল।

লোকটা পড়ে থাকে রাস্তার মাঝখানে। তার কপিগুলো পড়ে থাকে তাকে ঘিরে, টাটকা, যেন জ্যান্ত। একটা গাড়ি কোনওমতে দাঁড়িয়ে যায় তার গায়ে উঠে পড়তে পড়তে।

তার পেছনে একটা। তার পেছনে আর একটা। তার পেছনে জ্যাম হয়ে যায়।

এক একটা লোক থাকে, কিছুতেই মরে না। পা ভেঙে দিলে, কোমর ভেঙে দিলে, এমনকি মাথা ভেঙে দিলেও মরে না। হয়ত একটু ল্যাংচায়, একটু হাঁপায়, একটা হাত একটু ঝুলে থাকে, একটা চোখ বন্ধ, তবু ঠিক এসে দাঁড়িয়ে যায় বাইপাসের ধারে। হাতে আবার সেই চারটে কপি বা ছ-টা মুলো অথবা গুটিকয় কচি ভুট্টা।

যদি গাড়িবাবুরা থামেন। যদি গাড়ির বিবিরা...এগুলো খুব ফ্রেশ। জানো তো, একেবারে গার্ডেন ফ্রেশ। তা ছাড়া খুব শস্তাও, এরা তো চাষী, নিজেদের ফার্মের...শেষ কথাটা বলতে হয় গলাটা একটু নামিয়ে, শুনতে পেলেই বাড়িয়ে দেবে দাম, এমন বদমাইশ লোকগুলো। গাড়ি দেখলেই এমন দাম হাঁকে।

ইনো হোআট ই ডু?

কীঈঈঈ...

গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে যাই। তরপর হেঁটে ফিরে আসি...

তারপর?

দশ টাকারটা আট টাকা চায়। সেট্‌ল্ হয় ছ'টাকায়। আই অ্যাম গেইনার বাই...

হাউ ক্লেভার! ইউ আর রিয়্যলি সো...

তা ছাড়া উপায়ই বা কী! জিনিসের দাম যেভাবে, পঁয়তাল্লিশ থেকে এক লাফে আটচল্লিশে তারপর আর এক লাফে একান্নতে চলে গেল পেট্রল। হাউ ওয়ান উড...মানুষ বাঁচবে কী করে।

তবু বাঁচে। বেঁচে যায়। মরতে মরতেও মরে না যেমন মাধো। মাধোর ভালো নাম কী?

পুরো নাম? কেউ জানে না। মাধো নিজেও জানে না। দরকারই বা কী জানার? কয়েক বছর পরপর হয়ত একবার দরকার হয়। বিডিও অফিসে ডাক পড়ে। জে এল আর বাবুরা আসে। টেবিলে ম্যাপ ফেলে, কাগজ দেখে, খাতা দেখে হাঁক দেয়, মাধবচন্দ্র...বাইরে বসে ডাক শোনা যায় না বলে বাইরে, মাঠে এসে, পঞ্চায়েতের লোক ডাক ছাড়ে, মাধবচন্দ্র পৈড়্যা...পিতা নধরচন্দ্র পৈড়্যা...

মাধো নড়ে না। দ্বিতীয়বার ডাক পড়লে বড় জোর পাশের লোকটির মুখের দিকে...

কারে ডাকে?

তিনবারের বার পাশের আলের ওপর বসে থাকা আফজল চাচা চ্যাঁচায়,

এই শালা নধোর গো মাধো, নিজির নামডা ভুইলে খাইচিস খাইচিস, শালা বাপের নামডাও কি...

আফজল চাচার পেট ছোঁয়া ধবধবে শাদা দাড়ি বাতাসে উড়তে উড়তে তাঁর কাঁধ ছাড়িয়ে উড়ে যেতে চায়। ফ্লাই! ফ্লাই! কিপ ফ্লাইং!

এসব পুরাণের গল্প। সে আফজলচাচাও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। উড়ে পুড়ে গিয়েও মাধোর বাপের দেড় বিঘের জমিদারির যেটুকু ছিল, তার ওপর তৈরি হচ্ছে নিউ টাউন, নিউ ক্যালকাটা, রাজারহাট প্রকল্প। মাধোর বসত বাড়িটাও...তারও ওপাশ দিয়ে, আরও পুবে আর একটা সিক্স লেন, নাকি টেন লেন, বারাসত রায়চক কুঁকড়াহাটি-হলদিয়া রোড...যা একখানা রাস্তা হবে না, বিবেকানন্দ আর শ্যামলীরা ভিকি আর শামি হতে পারলেই একেবারে উড়ে-যাবে। বাইকের চাকা আর রাস্তায় ছোঁয়াতে হবে না...

এখন মাধো গাড়ির পাশে পাশে ছুটছে। বাঁ পা-টা একটু টেনে টেনে, এক হাতে কপি, আর এক হাতে মুলো। বিক্রি করতে পারলেই কেনা দামের ওপর যেটুকু থাকবে সবটুকুই...

হয়ত লোকটা মাধো। হয়ত মাধো নয়। এপারের গাড়িবাবুর হাতছানি দেখে ছুটে আসতে গিয়ে...আসার আগেই আর কোনও শালা পৌঁছে না যায়, কমিশনটা সে শালা গিলে খাবে...তারপরেই ছিটকে পড়ে হয়ত পা-টা বা চোখটা বা হাতটা...যদি মাথার পেছনটা ডিভাইডারের পাথুরে কোনায় লেগে মাথার খুলি খসে, ঘিলুটিলু ছিটিয়ে, রাত থেকেই কাকে ঠুকরে খেত, নেহাৎ বাইপাস বলে, লাল বাতিওলা গাড়ির আলো যাতে রাজারহাটের শবের ওপর না পড়ে, আফটার অল, নিউ টাউন ইজ দ্য শো পিস, সিম্বল...প্রগতির প্রতীক, নতুন কলকাতার, নতুন জীবন আর অগ্রগতির...এইসব আর কী...তাই দ্রুত পুলিশ। দ্রুত জমাদার, দ্রুত কালো গাড়ি, গাড়ি না পাওয়া গেলে রিকশা ভ্যান...সে ভ্যান ওখানে বেআইনি, কিন্তু পুলিশের কাজে তো আইন খাটে না, এমনকি ব্রিটিশ আইনেও লেখা আছে, দ্য কিং অথবা কুইন ইজ অ্যাবাভ ল!

মাধো তাই মৃত। মাধো তাই চিৎ হয়ে ভ্যানে শুয়ে চলে যায়। ঘিলুতে রক্তে মাখামাখি ভ্যান, ভ্যানওয়ালার খিস্তি। সে-সব শুঁকে, সে-সব শুনে কারই বা জুড়োয় না প্রাণ? মাধো মৃত, তবু মাধো এ-গাড়ির, ও-গাড়ির পাশে পাশে ছোটে, কপি আর মুলো হাতে নিয়ে।

ডেডবডির পাশ কাটিয়ে কালো রঙের গাড়িটা সাঁ-আঁ-আঁ বেরিয়ে যেতেই পেছনের

গাড়িগুলো পথ পেয়ে যায়। পুলিশ আসতে আসতে জ্যাম প্রায় কেটেই যায়।

তীরের বেগে লম্বা ল্যান্সার পরমায় মোড় ছাড়াতেই নিশ্চিন্ত। এবার আর ধরার কেউ নেই। ধরার পথেই নেই। গাড়ি আরও জোরে ছোটে। ছুটতে ছুটতে...এভাবে বেরিয়ে এলে? লোকটা যদি...

লেকিন স্যার, দাঁড়িয়ে গেলে আমাদের কেউ সেভ করত না। আপকো ভি নেহি, মা-জি কো ভি...

রহমান পুরোনো ড্রাইভার। সে এভাবে কথা বলতেই পারে। কোম্পানি মাইনে দেয়, কিন্তু চালায় তো বাড়িরই গাড়ি। প্রায় বাড়িরই লোক। কথাটাও সত্যি।

তবু কি জানো। লোকটা যদি বেঁচে থাকে...হাসপাতালটাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারলে হয়ত...

সো হয়ত হতো...কিন্তু তার আগেই আমাদেরই হসপিটালমে...

ড্রাইভার কথা বাড়ায় না।

ক-টা নিয়ে নেবে নাকি?

ল্যান্সার তখন চীনাপাড়ার মুখ ছাড়িয়ে, স্টিল জংশান পার হয়ে...কীসব ফার্নিচার, ভাবা যায় না। টাটাদের ব্যাপারই আলাদা। কিন্তু তাই বলে তো শ্বশুরের দেওয়া মেহগনি আর বার্মা টিকের...তারপরেই মারুতির শো-রুম। ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা। জাপানীরাই যত নষ্টের গোড়া। তার সঙ্গে এখন জুটেছে চীনারা। শস্তা করতে করতে গাড়ির জাতটাই মেরে দিল। ফোর্ড আসুক, শেভ্রলে আসুক, মার্সিডিজ আসুক, ব্রিটিশ, আমেরিকান, জার্মান, এদের জাতই আলাদা। শস্তা গাড়ি, হালকা গাড়ি, ফুয়েলসেভার! ছদোমার্কা, চপ্পলপরা লোকগুলোও এখন গাড়ি চড়ে! ব্যাংকগুলোও তেমনি। চেকবই বগলে পেছন পেছন ছুটছে। চাকরবাকরকেও চেপে ধরছে, গাড়ি কিনুন। গাড়ি কিনুন। জিরো পার্সেন্টে লোন। হারামজাদারা সবাই মিলে গাড়ির পাইস্ট মেরে দিল। গাড়ি চড়ার খানদান, আলাদা জাত, অন্য ক্লাস...কিছুই আর রইল না।

কী নেবে?

রোজ রোজ ওই মুসলমানের হাতের খাবার...

আহা, তোমার ঠাকুরঘরে তো যাচ্ছে না। ওরা ভালবাসে, বলে এরকম রোল নাকি কলকাতার আর কোথাও...

না-আ-ও। তবে রহমান যেন সামনের সিটে রাখে। আমার ওসব ছোঁয়াছুয়ি...

যাও, দশটা নিয়ে এসো। এগ-চিকেন।

দুটো একশ টাকার নোট এগিয়ে দেন তিনি। রহমান বলে,

লাগবে না স্যার, আগে কা পয়সা হ্যায় না।

সব সময় পার্স বের করতে ভালো লাগে না। ড্রাইভারের কাছে তাই হাজার দুয়েক টাকা দেওয়া থাকে। ফুরিয়ে গেলে আবার...

সার্কাস অ্যাভিনিউ থেকে ফ্লাইওভারে উঠতেই মেজাজ খুশ। ঘড়িতে মেপে দেখেছেন স্যার। ঠিক দেড় মিনিটে লাগে ভিকটোরিয়ায় পৌঁছতে। দেড় মিনিট। ভাবা যায়? আগে

লাগত আধঘন্টা। নীচে দিয়ে যারা যায়, বাস-মিনিবাস-সাইকেলটাইকেল, তাদের এখনও লাগে। তিরিশ মিনিট হয়ে গেছে দেড় মিনিট। গতি একে বলে। এরে কয় প্রগতি।

কিন্তু ভিকটোরিয়ায় এসেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।

এই রহমান; দাঁড়া! দাঁড়া! সাইড কর!

নাহ! ঘুরছে না। পরী ঘুরছে না। ভিকটোরিয়ার টাকের মতো গোল মাথায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে পরী। কেন রাগ করে।

খুব এগোচ্ছে দেশ! কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিং, সফটঅয়্যার, হার্ডঅয়্যার, বায়ো টেকনোলজি, হাইটেক কমিউনিকেশন, স্যাটেলাইট, অগ্নি ত্রিশূল, নিউক্লিয়ার বম্ব! খুব এগোচ্ছে দেশ। মেট্রো রেল, এক ডজন ফ্লাইওভার, তিন ডজন আন্ডারপাস, ডজন ডজন শপিং মল, আইনক্স্, হীরের দোকান। খুব এগোচ্ছে দেশ। ছাই এগোচ্ছে। যে-দেশ একটা পরী ঘোরাতে পারে না, তার এগোন আবার এগোন!

কেন ঘোরে না পরী? পরী, তুমি ঘোরো না কেন? পরী তো আর হ্যাপি প্রিন্স নয়! অসকার ওয়াইল্ড-ও নেই যে তার কথা বুঝবেন। পরী নীরব। ফলে কমিটি হয়। কমিশন হয়। মধ্যপ্রদেশ থেকে এক্সপার্টরা আসেন। কিছুতেই কিছু হয় না। পরী ঘোরে না। শেষ পর্যন্ত যাদবপুরের ক-জন ছোকরা এনজিনিয়ার এল। তারা পুরোনো মোটর সারিয়েটারিয়ে চালু করল। মোটর ঘুরল। কিন্তু পরী ঘুরল না। তখন তারা বলল, পরীটা ওলড হয়ে গেছে, নিউ টেকনোলজি চলবে না। পুরোনো টেক... মিস্তিরি, বাঁশ বাঁধো। চলো ছাদে। বিষ্টি পড়ছিল। ওরকম গোল ছাদ। ভয়ংকর পিছল! পা পিছলে একটা মিস্তিরি গড়িয়ে পড়লেই সোজা সাইকেল ভ্যানে চিৎ।

রিপোর্ট এল। মোটর ঘুরছে। কিন্তু জাঁতার মতো যেটার ওপর পরী দাঁড়িয়ে, সেটা ঘুরছে না। পরীর পা তাতে বাঁধা। তাই পরীও ঘুরছে না। কিন্তু জাঁতা কেন ঘুরছে না? কেহ বা কাহারা কে জানে, তার ফাঁকে ফাঁকে সিমেন্ট দিয়ে জমিয়ে দিয়েছে। পরীর ঘোরা আটকে দেওয়ার, দেশের অগ্রগতিতে বাঁশ দেওয়ার চক্রান্ত ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। কারা করে থাকতে পারে এই সাবোতাজ? ছ-রকমের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে জবাব এল ছ'রকম, যার মানে একই। এটা আল কায়দার কাজ হতে পারে, লস্কর-এ-তৈবার হতে পারে, সিমিও থাকতে পারে এর পেছনে, কিংবা মাওবাদীরা, বাংলার বা নেপালের, আলফা অথবা মণিপুরী বা নাগা জঙ্গিরাও থাকতে পারে। তবে যে বা যারাই থাকুক, পেছনে যে আই-এস-আই আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের উচিত অবিলম্বে...

ধ্যাৎ। এ শালার দেশের কিস্সু হবে না!

আবার মুখ খারাপ করছ তুমি? বাড়িতে ছেলেপিলে, নাতিনাতনি...

না, না, পরী ঘোরানো এদের কম্ম নয়। ও এক সাহেবরাই পারে। তাদেরই ডেকে আনতে হবে। o

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয় নি, কোত্থেকে উড়ে এসে একজোড়া পরী ডানা জুড়ে বসল তাঁর গাড়ির দুই কাঁধে। রহমান চাবি ঘোরাতেই ল্যান্সার উড়ে গেল আলিপুরের দিকে।

শোনো, কাল একবার কালীঘাটে যাব। তুমিও...সকালে উঠে কিছু খেয়ে ফেলো না যেন।

হঠাৎ কালীঘাট?

আহা একটা অপঘাত তো...

গাড়ির চাকায় যে রক্ত লেগে আছে এবং তিনি সেই চাকার ওপরেই বসে আছেন, তা না জেনেই কথাটা বলেন ধর্মপ্রাণা গৃহিণী।

চারপাশ ঝলমল করছে আলোয়। যেন দিন। পথে গাড়ি চলছে ফুল স্পিডে। দু'পাশে লোকে লোকারণ্য। এরোম দিশ্য কি ছাড়া যায়।

চ্যাত্তামতো লোকটা হঠাৎ উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। ফোল্ডিং চেয়ার, ডেকরেটররা আউটডোরের লোকেশনে যেমন চেয়ার সাপ্লাই করে। লম্বা লোকটার পাজামা ঢলঢল করে, শার্টের হাতার বোতাম খোলা, বুকেরও একটা-দুটো। ধীরে ধীরে রাস্তার মাঝখানে পৌঁছে সামনের হেডলাইটের দিকে হাত দুটো তুলে লোকটা পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। তার আগেই দু'দিক থেকে চারপাঁচজন ছুটে আস। দাদা...দা...দা...কী করছেন। কী করছেন? হাই স্পীডে...যদি সামলাতে না পারে...ভয়ংকর একটা...

আপনি কেন বুঝতে...

সেইটেই তো বুঝতে চাইছে।

লোকটার গলাটা ভারি। গলায় দানা আছে। সহকারীরা চুপ হয়ে যায়।

লোকটার হাতে ভূতের রাজার মন্ত্র আছে। গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে যায় পর পর।

দাদা দাঁড়িয়েই থাকেন দু'হাত তুলে। এক হাতে একটা পাঁইটের বোতল, ধোঁয়াটে কালচে রঙের, আদ্দেকটা তখনও ভর্তি। আর এক হাতে আঙুলের ফাঁকে একটা বিড়ি। ততক্ষণে নিভে গেছে।

এবার তা হলে...

একবার গড়িয়ে নাও। দ্বিতীয়বারে শট।

ছেলেটি ছুটে যায় পেছন দিকে। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজনকে টেনে আনে রাস্তার মাঝখানে।

তোমার নামই তো মাধো?

আইজ্ঞে।

চারপাশ থেকে প্রতিবাদ ওঠে,

না স্যার, না স্যার। ও মাধো না। ও আফজল। মাধো তো কবেই...ওওই যে, উউই জাগাটায় লাশটা...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো আমার ভ্যানেই ডেডবডি নিয়ে...হেঁ হেঁ স্যার, আমার নিজের ভ্যানে...

তোমার নাম আফজল?

জি।

উফ্। তোমার কি আরও নাম...

আইজ্ঞে আছে। বিবেন।

কিন্তু টাইটেলে তো অত যাবে না। একটা নাম...

ইসমাইল।

লেখা হবে কী নাম?

সবিতা, জুলেখা, পাঁচুও...

ইমপসিব্‌ল্‌! দাদার মত...রিয়্যালিটি...মাটির গন্ধ...শালার মাটির ইয়ে করি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমিই দিয়ে দেব একটা...

তাই ভালো। ভালো দেইখে এট্টা...

তার হাসির দাঁত চোখে পড়তেই ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের চোখ চলে যায় তার গেঞ্জিতে।

কিন্তু তুমি এই গেঞ্জিটা...খোলো! খোলো। খুলে ফেল।

কিন্তু এই গেঞ্জিটা আমারে গত পুজোয়...না, না, ঈদে...

খোলো। খোলো। বেশ, এই তো। বুকটা...এবার মন দিয়ে শোনো।

জি।

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলবে ডায়লগটা। যে-ই দাদা বলবেন অ্যাকশন। ওমনি তুমি বলবে...

কী বলবো?

ডায়লগ বলবে।

সেটা কী?

সে তোমায় ভাবতে হবে না, আমি বলে দেব।

আইজ্ঞে।

বলার সময় ওই যে বাড়িটা দেখছ, ওই যে বড় বাড়িটা সতেরো-আঠারো তলা, দেখছ তো?

ও তো পেত্যেক দিন দেখি।

ওই দিকে হাত তুলে, আঙুল দিয়ে দেখাবে। চোখ কিন্তু ক্যামেরায়। বলবে...

কী বলবো?

বলবে, ওইখেনে ছিল আমার বাড়ি। ব্যস। একটু রেগে বলবে, বুকের পাঁজরগুলো যেন...

হয় না। দু'তিনবারের চেষ্টাতেও হয় না।

ধ্যাৎ। তোমার তো গলাই শোনা যাচ্ছে না। মাইকে ক্যাচ...

বিরক্ত হয়ে ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট চলে যায়। সেকেন্ড আসে। সে আরও ছোকরা।

শুনুন। আপনার রোলটা...আপনার জমি গেছে। বাড়ি গেছে, রান্নাঘরও গেছে। আপনার খুব রাগ। সেই রাগে। মানে রেগে গিয়ে আপনি বলবেন...

রাইগে গেলি কীরম কইরে বলতি হয়?

না, না, শুধু রাগ নয়। রাগের সঙ্গে মিশে থাকবে দুঃখ, শোক, বেদনা, আবার যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে, কাজেই কিছুটা উদাসীনতা, যেন নির্বিকার...

লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সেকেন্ডের দিকে। সেকেন্ড ব্যাপারটাকে আরও প্রাঞ্জল করতে চায়।

অনেকটা যে-রকম পদ্মার পাড়ে দাঁড়িয়ে অবিনাশ পদ্মার ও-পারটা দেখিয়ে, হাতটা সোজা করে, তর্জনীটা বর্শার ফলার মতো করে, বলেছিল, ওইখানে ছিল আমার দেশ। কোমল গান্ধারে। ঠিক তেমনি। এবার তো বুঝলেন।

লোকটার হাঁ বন্ধ হয় না। ততক্ষণে ফার্স্ট আবার এসেছে। সঙ্গে স্যার।

একবার ভেবে দেখুন স্যার, অত রিয়্যালিস্টিক...অন্তত, এই রোলটার জন্যে মিঠুনকে, অন্তত প্রসেনজিৎকে, স্যার, স্যার...

অত স্যার স্যার করো না তো। যাও। এখান থেকে যাও তোমরা। তোমাদের বিদ্যে বোঝা গেছে।

লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ান তিনি। ভারি চশমাটা খুলে ফেলেন।

তাঁর মুখে চেনা গন্ধ পেয়ে ইসমাইল লাজুক লাজুক হাসে।

আপনাকে ওরা যা বলেছে ভুলে যান।

জি।

আচ্ছা, আপনার তো জমি-বাড়ি সব ছিল ওইখানে, যেখানে এখন ওই বড় বাড়িটা...

আইজ্ঞে না, ঠিক ওখেনটা না। ওখেনে ছিল মাধোদের...

আপনার বাড়ি...

এট্টু দূরি। এই আধমাইলটাক। যেখেনে জলের কল হচ্ছে ওর পুব দিকি।

তা আপনার বাড়িতে কী কী ছিল?

আবদুর হেসে ফেলে।

বাড়িত্তি যা যা থাকে সবই ছিল। ঘর ছিল, ঘরে জানলা ছিল, তিনদিকি দাওয়া ছিল, উঠোন ছিল, আমগাছ ছিল, পিয়ারা গাছ ছিল, পিছনদিকি জমি ছিল। কুয়ো...না, মিথ্যে কথা বলবো না, কুয়ো ছিল না। তয় গোর ছিল, বাড়ির পাশে...

গোর? কার গোর?

আবার হেসে ফেলে আফজল।

যাদের থাকে। বাপের, দাদার, কুড়ুভাই-র, নানার নানীর, আমার ছেইলেরও ছিল।

সে সব তো গেছে।

আইজ্ঞে।

তা সেসব গেছে, তার ওপরে বড় বড় রাস্তা হচ্ছে, বাড়ি হচ্ছে, দেখেশুনে আপনার রাগ হয় না?

পাঁচু চুপ করে থাকে।

কী, হয় না?

হয় যে না, তা...তয়, উরা তো টাকা দিয়ে কিনে নেছে। কিনার পর উরা কী কইরল...

সে টাকা কী করলেন...

আফজল আবার হেসে ফেলে। ভাবে, এত বড় এট্টা লোক, সে-ও এরোম বুকা বুকা কথা বলে।

খায়ে ফেলিচি।

কী খেয়েছেন?

ফ্যান, ভাত।

ও!

অমন দাপটের ডিরেক্টারও নির্বাক। নিজেকে তাঁর কেমন বোকা বোকা লাগে। তবু তিনি চেষ্টা ছাড়েন না।

তা ওদিক দিয়ে যখন যান আসেন, কষ্ট হয় না?

হয়।

দুঃখ হয় না?

খুব হয়।

রাগ হয় না?

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে মাধো।

কী, হয় না?

নীরবে মাথা নাড়ে আফজল।

কেন হয় না?

কী জানি। খুধায় খিদের চোটে।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন ডিরেক্টর। মন্বন্তর নিয়ে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের কথা মনে পড়ে। 'কেন কেড়ে খায় নি।'

খাবারের দোকানে খাবার। হোটেলে হোটেলে মাছভাত। বাড়ি বাড়ি চালডাল। ফ্যান দেবে মা, ফ্যান? মা-আ-গো, একটু ফ্যা-অ্যা-ন...না-খেয়ে না-খেয়ে মরে পড়ে গেছে টুপটুপ করে, গাছের হলুদ পাতার মতো, তবু কেড়ে খায় নি। কেন কেড়ে খায় নি? উত্তর খুঁজেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তেষট্টি বছর পরে যেন জবাব পান ডিরেক্টর। কেড়ে খেতেও জোর লাগে। খিদে সে জোরটুকুও খেয়ে ফেলে।

মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড় নাড়তে নাড়তে ফিরে আসেন ঋত্বিক ঘটক।

তাঁর দু'পাশ দিয়ে বর্ষার বেগে বেরিয়ে যায় বড় বড় হেডলাইট, প্রতি দু'সেকেন্ডে তিনটি করে গাড়ি।

মহিমা হালদার ও কিস্‌সা বুড়ির ছানাপোনারা

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

জীবনে বিস্তার বলে কিছু নেই এদের। এক মুখে জন্ম, অন্য মুখে মৃত্যু—আঁতুড়ঘর আর শ্মশান-গোরস্থান—সত্য বলতে শুধু এই। এই দুই অনিবার্যতার মাঝখানে যা ঘটে, তার ওপর ইচ্ছার কোনো জোর খাটে না। তাদের হক শুধু শ্রমে। খাঁ-খাঁ শূন্য মাঠে সবুজ-হলুদের ঢল আনে এরাই। তা খামারজাত করার দায়ও এদেরই। তারপর, রিক্ত মাঠের মতোই বুকজোড়া হা-হা শূন্যতা নিয়ে ঝিম ধরে থাকা। কুমির, কামট, বাঘের পরোয়া না করে জল-জঙ্গল ছেঁকে মাছ, মধু আনে যারা, বনবিবির বাহনের হাতে মারা যায়, বা, বাকি জীবন খুঁতো হয়ে থাকে, তাদের সংসারে অনটন, বারোমাস।

অথচ, এই বন, এই বনভূমির খ্যাতি দেশে দেশে ছড়ানো। বাইরে থেকে লোকও আসে কম নয়। ওপর-ওপর কিছু দেখে খুশি হয়ে ফিরে যায়। গল্প করে, 'সুন্দরবন দেখে এলাম।'

এ-সব আবিল্লি কথায় বলা চটে যায়। ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে,—মনে মনেই বেশির ভাগ—'সোদরবন বলতে কী বুঝলেন, কন দেহি, বাবুরা?'—কয়েক মগ জল, দশ-বিশটা গাছ আর—দ্যাহেন, কি, না-ই দ্যাহেন—দ্যাড়-দুইখান বাঘ। বস!—আর, মানুষ, তারা?—তারা ফালতু! অরে আমার দেখনেঅলা আচাভুয়ার দল।'

গুরু তার মহিমা হালদার, কিস্‌সার রাজা। সে যাকে ডাক দেবে, সে যে-ই হোক, সোদরবনে এমন কোনো মরদ নেই যে বলবে না, 'পেয়েছেন ছার—এই যে, এহানে—' বলতে হবে। বলতে বাধ্য। এ কী যে-সে ডাক, বাপরে বাপ! শেকড়-বাকড় সমেত উপড়ে-আনা ডাক। এ-সোদরবনের খাস সাকিন হচ্ছে কিস্‌সার রাজা মহিমা হালদারের কপাটের মতো চওড়া বুক। মায়া দিয়ে, মমতা দিয়ে, অশ্রু উত্তাপ কল্পনা দিয়ে, একটু একটু করে একে তিনি গড়ে তুলেছেন।

একদিন, তখন তার বয়স আর কত হবে—দশ-এগারো, মার এল কেঁপে জ্বর, মনসা পুজোর কথা এখন কে বলে। কথা বলা চাই-ই, না হলে পুজোর ফল নেই। খুড়ি-জেঠিরা তাকেই ধরে বসল, 'তুই ছাড়া আর কে বলবে! ঠেকা কাজ কোন রহমে চালায়ে দে, বাপ।' মা-ও সায় দিয়েছিল। সেই শুরু।

তাদের বাড়িতে গল্পের আসর বসত সন্ধ্যায়। সেদিন হর্তুকিবুড়ির পালা। বুড়ির হর্তুকি খাওয়ার বাই ছিল, তাই হর্তুকি বুড়ি। ফরমাশ হলো, 'আজ বাঘের গপ্‌প—' বুড়ি তার মশলার কৌটো খুলতে খুলতে ঝামটায়, 'ভাতারকে বলগে যা।' সে-ও কম যায় না, চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'আমার কি আর সে-কপাল আছে গো। ভাতার আমার রোজ রাতে বাঘের গপ্‌প শোনানোর নাম করে বেইরে যায়, ফেরে রাত কাবার করে। পকেট থে একদিন, বুইলে, এই অ্যাত্ত হর্তুকি বেরল—'

হাসাহাসি খিতোলে বুড়ি গল্পে চলে যায় : এক ছিল কন্যে। রাজার দুলালি। দুদ-আলতা

রং। বিশ্বকম্মা দশ মাস দশ দিন ধরে নিজের হাতে নরুন দিয়ে কুঁদে কুঁদে সে-কন্যের মুক বানাল। সে-মুহের কতা বলার জন্য বম্মাকে ধরেছিল বিশ্বকম্মা। তিনি বললেন, 'এটা আমার খ্যাম্‌তায় কুলোবে না। সরস্বতীরে ধর।' এই খবর শুনে হাঁসের পিটে চেপে সেই যে সে উড়াল দিল, ফেরার নামই করে না আর। নেকাপড়া দ্যাশ থে কি এমনি-এমনি উটে যেতে বসেছে।'

'হাঁসের ডিমের দামও সেজন্যই বেড়ে গেল, কীগো?'

'এই যে ডিমসুন্দরী, তুমি শশীঠাইরেনের আসরে যাও। ডিমের দাম, হাঁসের দাম, মুরগির দাম, মাছের দাম, মাইনষের দাম, সব জানতে পারবা।—হচ্ছে নেকা-পড়ার কতা, না, ডিমের দাম ক্যান বেড়ে যায়! যায় তুই বিয়োচ্ছিস না বলে! মাগির কতা শুনলে তিনশ বচ্ছর পরমায়ু কমে যায়।'

'পেছন ফিরে বস। শালি পাছা দেখুক, আর ডিমের হিশেব করুক।'

হস্তুকিবুড়িও হেসে ফেলে। তারপর অনায়াসে গল্পে ঢুকে যায়। মনেই হয় না, সুতোটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। মূল বুনন একজনার, ঠিকই। কিন্তু, তার চারপাশে, হয়তো বা, ভেতরেও, শ্রোতারাও বুনে দেয় কতরকম ফোঁড়, কতরকম নক্‌শা, মূল টানাপোড়েন ব্যাহত না করেই।

গুরু বলত, 'মনে রাকবা, যারা শুনছে, তারা যদি মেন্দামারা হয়, সাত চড়েও রা করে না গোছ, তবে জানবা, কিস্‌সার তোমার বারটা, জমছে না। তারা দাপটে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে, দু-পাঁচটা কতা গুঁজে দেবে খুশিমতো, খোঁচাখুঁচি দেবে, তবে না কিস্‌সার আসর। তবে, খ্যাল রাকতে হবে, আশ্‌কারা পেয়ে তারা য্যান তোমার মাতায় চড়ে না বসে। তাহলে, গপ্‌পের টিকিও আর খুঁজে পাবে না। ধমক-ধামক দিতে হবে, চোক রাঙাতে হবে, আবার, আশকারাও দিতে হবে। তবে না আসর টগ্‌বগিয়ে ছুটবে তোমার সঙ্গে—'

'এই হলো তার মুহের বেত্তান্ত।'—হস্তুকিবুড়ি কিস্‌সার সুতো তুলে নেয়।—'যে-মুহের বাখানি বম্মার সাদ্ধে কুললো না, যার ভয়ে সরস্বতী ডুব দিল, তার কতা আমার বলা ভাল দ্যাহায় না। সতে তাদের খাটো করা হয়। মুহের কতা এই পজ্জন্ত। কন্যের নাম ছড়াল তার চুলের জন্য। মেঘবরণ, সেজন্য না। কন্যের চুল লম্বায়, কী কব, চানের পর তা শুকোতে দিত পুরা সোদরবনের গাছপালার উপর দিয়ে। নম্বা কত, বুঝে নাও। আর, তার গোছের কতা যদি বল, তা ভেদ করে যে রোদ নামবে, সে জো ছিল না। সে চুলের জালে রোদ আটকা থাকত, যত্‌খন না কন্যের চুল শুকোচ্ছে, তার খোঁপা বাঁদার তোড়জোড় হচ্ছে। সে ওক, সোদরবনে অমাবস্যার ঘুটঘুটে আন্ধার।'

কিস্‌সা এই পর্যন্ত এগোতেই ছুটে এল তার নাতি হাঁপাতে হাঁপাতে, 'ঠারে, সেদ্দ বুড়ি এসেছে। তোকে ডাকছে।' সেদ্দবুড়ি দশ পাড়ায় ধান সেদ্ধ করে বেড়ায়। তাকে পাওয়াই ভার। তা ফেরানোর কথা ওঠে না। বুড়ি লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। 'ওরে, তোরা কেউ আজকের মতো চালায়ে নে—' বলে হাঁটাদৌড় লাগাল।

কেউ মুখ খুলতে চায় না। আসর ভাঙে-ভাঙে। তখন বলা হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি বলি?'

আর ছাড়ে কেউ। বলতে গিয়ে দেখে, গোটা কিস্‌সাটাই কে যেন সাজিয়ে রেখে গেছে ভেতরে। কে সে, কে? সে-উত্তর আজও মেলেনি। সে শুধু অবাক হয়ে দেখে কে যেন তাকে দিয়ে গল্প বলিয়ে নেয়। কে, তা জানে না। কিন্তু ঘটে, ব্যাপারটা ঘটে। এক এক সময় মনে বড় খেদ জাগে। গল্প বলিয়ে হিসেবে এই যে তার নামডাক, তা যেন তার পাওনা নয়। সেই যে পরের ধনে পোদ্দারি বলে না, এ যেন তাই। খুব খারাপ লাগে। ঝিম মেরে থাকে কদিন। একসময় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে, সে-ই হয়তো তুলে দেয়। অবাক হয়ে দেখে, আসরেই ফিরে এসেছে আবার, কলকলিয়ে উঠছে গল্পের ছানাপোনারা। হুবকিবুড়ির ছেড়ে যাওয়া গল্পের ভেতর ঢুকে যেতে যেতে একধরনের মুগ্ধতা পেয়ে বসেছিল। আজও তার রেশ কাটেনি।

'খোঁপা বাঁদা হতেই আন্ধার কেটে যায়। রোদ নামে, ঝলমল। ঝেকমা-ঝেকমি কোটর থেহে বেরিয়ে আসে। রাজা বাঘ চোক কচলে উটে বসে। এক নেংটি ইঁদুর বেরিয়েছিল হাওয়া খেতে। রাজারে দেহেই একখান পেন্নাম ঠুহে ঠকঠক করে কাঁপতে নাগল, 'পেন্নাম, রাজামশাই।' রাজা কতা বলে না। সাত-সকালেই অযাত্রা। ব্যাটা এক দাঁতের খদ্দের না, কিন্তু কতার বহর দ্যাহ—'পেন্নাম, রাজামশাই।' এক টুনটুনি ডালে দোল খেতে খেতে বলে, 'রাজামশাই, পেন্নাম।' এক ব্যাটা কেস্নো শরীল সামনে ঠেলতে ঠেলতে হাঁপধরা গলায় বলতে বলতে এগোয়, 'রাজামোয়াই, চি চরণে গুড মর্নিং।' গায়ের রং তার নাল তো। ব্যাটা নিজেরে মনে করে য্যান জাত সায়েবের বাচ্চা! রাজা তিতিবিরক্ত হয়ে উটে পড়ে। 'ই বনের ভদ্দর-নোকগুলা গেল কৈ। বনটা ছোটনোকের আড্ডা হয়ে উটল, ছি-ছি!' দু-চার পা এগোতেই দ্যাহে, গাছের উপর থেহে ঝুড়ি মতন কী য্যান ওঠে আর নামে। একেই তো মনখান খিঁচে ছিল, তার উপর ওই ঝুড়ির নাচানাচি দেহে সে ভাবল, এ নেচ্চয় ওই ছোটনোকগুলার তারে জব্দ করার কোনো কারসাজি। মাতা গ্রম হয়ে উটল—এক লাফ। ধরেও ফেলল। কে যে কারে ধরল বোঝা গেল না। এক সময় দেহা গেল, টান দিয়ে রাজারে কে য্যান তুলে নিয়ে গেল। রাজার মনে হলো আন্ধারের এক জালের মধ্যে সে আটকা পড়েছে, চারপাশে সে কী বিষম চাপ। দম বন্ধ হয়ে এল তার, কলজে ফাট্‌ফাট।—টুনটুনি বেটি ভাবে, রাজা, সে গেল কই। ভাবতেই, উড়াল। ডালে বসতেই যা নজরে এল, বুঝল, রাজার হয়ে গিয়েছে! ঝুড়ি ভেবে ফাল দিয়ে সে যা ধরেছে, তা হলো কন্যের একগোছ চুল। রাজা মরেছে এবার। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, রাজা বলে কতা। পরজা হিসেবে তারে বাঁচানোর দায় তার উপরও বর্তায়। যা ভাবা, সেই কাজ। এক উড়ালে কন্যের কাছে। কন্যে বলে, 'কিরে টুনি, ভালো তো? বস।' সে বলে, 'আমার যে একখান জরুরি কতা ছিল—' কন্যের চারশো দাসি একসঙ্গে ধমকে উটল, 'চুপ, কোনো কতা না। খোঁপা বাঁদা হচ্চে। এহন কোনো কতা না। চুপ করে বসে থাহ' তো, সে আর কী করে। বসেই রইল। খোঁপা কি অত সহজেই বাঁদা পড়ে। কন্যের চুল, নম্বায়, না-হোক না-হোক করে, হ, গোসাবা থেহে ক্যানিংতক তো হবেই। তারে বাঁদা কি মুহের কতা। তা সে-ও একসময় বাঁদা পড়ল। থুতু দিয়ে উড়ো চুল বাইরে ফেলে দিয়ে কন্যে এবার টুনটুনির দিকে মন দিল, 'নে, কী বলবি?' টুনটুনি হাউহাউ করে ওঠে,

'কন্যেগো, আমাদের রাজা যে তোমার খোঁপায় জড়ায়ে থাকল। তারে ছেড়ে দাওগো—' কন্যের চোক তো আকাশে। দাসীরা কয়, 'সে নচ্ছার কন্যের খোঁপায় সেদল কী করে, অই?' খুলে বলতে হলো সব কতা। কন্যে বলল, 'দাঁড়া, দেহে নিই।' সেই রাক্ষুসে খোঁপা টিপেটাপে দেহে বলে, 'হুঁ, এই তো ঘ্যান মনে হয়।—হুঁ, ন্যাজ—এই তো পা—বেশ গুটোয়ে রেহেছে।—ইটা কী?—মুক! হাঁ করে আছে! পারলে খায়।—তা তো হলো। কিন্তু টুনি, খোঁপা খোলার যে জো নাই। একবার বাঁদা হয়ে গেলে, সেই চানের আগে ছাড়া এরে আর খোলার জো নাই। খুলতে নাগবে দুই ঘন্টা, বাঁদতে নেবে সাড়ে চার ঘন্টা। অত সময় নাই আমার। থাক না, ভালোই থাকবে। ভাবিসনি। কাল সকালই ছেড়ে দেব। ব্যাটা জিরোক। জিরোবার সময় আর পায় কই—'

রাজা খোঁপা বন্ধ হয়ে জিরোতে থাকল।

গল্প শুনে খুশি হয়েছিল সবাই। কাতুবুড়ি গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ফোকলা মুখে গলগল করে হাসি বরিয়ে কী খুশি, কী খুশি। তারপর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, 'তুই একদিন দশ গাঁয়ের 'এক ডাকের বলিয়ে' হবি। কয়ে থুলাম।'

শেষ চমকটা এল একেবারে শেষে। সবাই তখন উঠি-উঠি। আসরের শেষ দিক থেকে উঠে দাঁড়াল সে। লম্বা, খয়া-খয়া, ধোঁয়া-ধোঁয়া এক আচ্ছন্নতা তাকে ঘিরে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল কাঁচাপাকা; তুলনায়, দাড়ি-গোঁফের বাড় কিছুটা কম। ঘনও নয়। পরনে হলুদ রং, লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি আর ধুতি। পায়ে কিছু নেই।

মহিমা হালদার। ভেতরে যেন বিদ্যুৎ চমকাল। ছুট, ছুট। মহিমা দু-হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ জড়িয়ে রাখল। বলার মনে হয়, এখন, সেই ঘনিষ্ঠ উত্তাপে খোলস ভেঙে সে-রাতে জন্ম নিল এক নবীন কথক।

মা-ও ছুটে এসেছিল। তার দিকে চেয়ে মহিমার মুখ কৌতুকে ঝলমল করে উঠেছিল, 'ছেলেকে দিয়ে এই বুড়োটারে জব্দ করার ফন্দি তো ভালোই এঁটেছ গো। প্যাটে প্যাটে যে তোমার এত প্যাঁচ তা তো বুঝিনি।'—বলে, হা-হা হাসিতে আসর ভরিয়ে দিয়েছিল।

মা প্রণাম করে উঠে বলেছিল, 'আপনে অরে আশীব্বাদ করেন, দাদা—'

'কউঠান, ব্যাটার জন্ম তোমার সরস্বতীর বংশে। কিস্সা শোনানর জন্যই 'বিদ্যামা' ওরে পাঠিয়েছে। কাতুবুড়ি ঠিক বলেছে, আমিও বলছি, ছেলে তোমার রাজা হবে, কিস্সারাজ।'—তারপর বুড়ির গলা নকল করে খুব জোর দিয়ে বলল, 'কয়ে থুলাম।'

বাবা গিয়েছিল কালীনগর, ধলাজেঠার সঙ্গে। রাতে ফেরার কথা ছিল না। ফিরলও না। খেয়েদেয়ে পশ্চিমদুয়ারি ঘরের দাওয়ায় পাটিতে গা বিছিয়ে আমারে বলে, 'একটা কিস্সা শোনা।'

কয় কী! পারলে ছুট লাগাই। চুপ করে রইলাম।

একটু পরে বলল, 'একটা পান খাওয়া। খয়ের কম, চুন মাঝারি, বোঁটায় খানিক, দোক্তা হাতে—'

সেজে দিল মা-ই। মৌজ করে চিবোতে চিবোতে বললে, 'এই তো বেশ পারলে। মহিমা

হালদারের পান বলে আছাড় খেলে না, পা ভাঙলে না, আর কিস্‌সার নামে মুখে কুলুপ! বোকা ছেলে! বস।—আসরে কি আর এক ধরনের লোক থাকে রে বাপ! ডাক্তার, মোক্তার, হাকিম, চোর, ডাকাত, দুশ্চরিত্র, সাধু, পণ্ডিত—কত সব নামী-দামি লোক পাবে। তাদের মানি বলে তাদের সামনে সিটকে মেরে থাকতে হবে। বস।'

বসতে বসতে বলেছিল, 'আপনার সামনে আমি মুখ খুলতে পারব না।'

'এই তো পারলা। আটকালো কোথাও?—'

কথাটা আর এগলো না। হঠাৎ এসে পড়ল 'ওইটা'। ওই দিমা। তার আসল নাম তেতুলি। বাবার দেশের লোক। একসঙ্গেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল এখানে। এ-গাঁয়েই ঘরগেরস্তি। ছোটবেলায় কেন যে তাকে 'ওইটা' বলে বলে ডাকতাম, মনে নেই। তা আর পাল্টানো হয়নি। এখনও 'ওইটা'-ই।

ওইটার স্বামী নেই। মাতলায় ডুবে গেছে, নৌকো উল্টে। দিনকয়েক আগে কালাচের ছোবলে মারা গেল তার একমাত্র ছেলে। তারপর থেকেই ওইটা পাগল-পাগল। পাড়াময় ঘুরে বেড়ায় অকারণ, বকবক করে নিজের সঙ্গেই, খিদে পেলে, বা, খাবার কথা মনে পড়লে যে বাড়িতে খুশি পাত পেতে বসে যায়।

ওইটাকে চেনা যায় না। কী এক অদৃশ্য চাপের ভারে যেন, সে নুয়ে পড়েছে। হাঁটা-চলায় কোনো ছন্দ নেই। চলতে হয় বলেই চলা। বড় ক্লান্ত, অবসন্ন দেখায়। আর, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না, মন, সে বুঝি তাকে ছেড়ে চলে গেছে। রেখে গেছে শরীর নামক এক ধ্বস্ত কাঠামো শুধু।

দাওয়ায় উঠে এল, নিঃশব্দে। মহিমার পাশে খপ করে বসে পড়ল, চেয়ে রইল অপলক।

মহিমার অস্বস্তি হয়। তবু, সহজ থাকতে হয়। এতো গল্পের ছেলে হারা মা নয়, ওরো ধরা থাকে মুঠোয়, কোনো এধার-ওধার করার জো নেই। কিন্তু শোকের এই ধূসর প্রতিমার সামনে বড়ই অসহায় মনে হয়।

তবু হাসতে হয়, বলতে হয়, 'কী গো মা, ঘুম আসছে না? রাত কিন্তু অনেক হলো।'

ওইটা চোখ নামিয়ে নেয়। চিবুক নেমে আসে কণ্ঠার কাছে। পর মুহূর্তেই চোখ ভেঙে নেমে আসে শ্রাবণের ঢল। তা তাকে বসে থাকতে দেয় না, একটু একটু করে ভাঙতে থাকে। তারপর, বুকের গভীর থেকে উঠে আসে নাড়িছেঁড়া এক আর্তনাদ, মহিমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। পা সরিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ঠাণ্ডা, শীর্ণ দুটি হাত নেমে আসে তার ওপর। কিছু হয়তো বলে, ভেতরকার উচ্ছ্বাসে কথাগুলো তলিয়ে যেতে থাকে। বার কয়েকের চেষ্টায় ধ্বনিগুলো শব্দের আদল পায়, শব্দ জুড়ে জুড়ে কথা—'তোমার কাছেই এসেছি গো। এমন এট্টা গপ্‌প বলো যাতে বুকের আগুন নিবে যায়। এট্টা কিচ্ছা, তুমি পারো, তুমিই—'

মহিমা বজ্রাহত। তারই হাতে নাকি সেই জাদু যা দিয়ে সে পুত্রশোকও ভুলিয়ে দিতে পারে। কী ভাবে তাকে এরা? 'আমি কি ভগবান নাকি হে—'

বলতে যাচ্ছিল, তখনই গুরু নিতাই হাজরার গলা ভেসে আসে, 'এদের জন্ম দুঃখে,

মরণ দুখে। এরা জানে, জগৎ-সংসারের সবখানি দুঃখ, শালা একচোকো ভগবান, এদের জন্য মেপে রেখেছে। তোমার কিস্‌সায় এই দুখী নোকগুলায় হারা নাই। জীবনের সব সাদ-আহ্লাদ তাদের ফুলে ফলে বাসনায় ভরে উটুক তোমার গপ্‌পে। তুমি জেতার গপ্‌প বলবা, বাপ। তোমার নড়াই কিপ্টে ভগবানের সঙ্গে। সে-শালি দেখুক, যাদের সে বরাবরের জন্য হেরো বানিয়ে রেখেছিল, তাদের জিতিয়ে দেচ্ছ তুমি। তা যেদিন পারবা না, কিস্‌সা বলা ছেড়ে দেবে।'

সে তো এখনও কিস্‌সা বলে। তবে। ওই যে মা, শেষ অবলম্বন জেনে তার কাছে ছুটে এসেছে, গল্পেও যদি তাকে জিতিয়ে দিতে না পারে, তবে সে 'লোমের কিস্‌সা বলিয়ে'। ছেড়েই দেবে, ছেড়েই দেবে অর্থহীন এই ভেড়া-প্যাচাল—

তখনই ভেতরে কোথাও বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। আর, দেখতে পায় জগৎ-সংসারের তাবৎ কিস্‌সার আদি মাতা, কিস্‌সাবুড়ি, তার একরাশ ছানাপোনা নিয়ে দুখীর মতো বসে আছে। তাকে দেখতে পেয়েই বুড়ি উতলা—'অ মহিম, এই তোর মনে ছিল। আমারে ছেড়ে দিবি, বাপ।'

গুছিয়ে বসে। ওইটাকে বলে, 'কিস্‌সা হবে। উঠে বসদিন, মা। বলা, তোরে চ্যালা করে নিলাম। আয় তো, যম আর তার শাকরেদ কালাচ ব্যাটার দৌড়টা দেহে আসি।'—বলতে না-বলতেই গলাখানা তার শিঙা হয়ে ওঠে, 'যমরাজ হে, আমরা আসছি, সামাল। খ্যামতা থাহে তো আটকাও—' .

স্তব্ধ রাত থরথর করে কেঁপে ওঠে।

এক পাড়াগাঁ। ছোট। বিশ-তিরিশ ঘর বসতি। গরিব-গুর্বো। অভাব আছে। কিন্তু তা নিয়ে কোনো নালিশ নেই। অভাব থাহে অভাবের মতো, এরা থাহে এদের মতো। আরে, জেবনের বাড় কি অভাব আটকাতে পারে। তারা গাই-বাছুর চরায়, গান গায়, বাঁশি বাজায়, কিস্‌সা শোনে, শোনায়—গাও তোলপাড় করে।

এদের এই না-পরোয়া ভাব দেহে অভাব ব্যাটার বুক টাটায়। যার সঙ্গে দেহা হয় বলে, 'আরে, মান্যি কর আমারে। পাবি, দু-চার হাতা আমানি দিব। গড় হয়ে টিপ-পেন্নাম করে বল যে—'

ঘণ্টা। বয়েই গেছে তাদের। এক ছোকরা মলো, মহা ফাজিল, রঙ্গ করে কয়, 'আমাদের টিপ করার জো নাই গো। সে এক কেচ্ছা। আমার বট্‌ঠাউরদা, তার বট্‌ঠাউরদার বাপের আমলের কতা। ঘুরতে ঘুরতে নারদ একদিন সেহানে এল। একরাত থাকল। খেলোদেলো। ঘুম থেহে উটে কন্টিকারির ডাল দিয়ে দাঁত মাজল, কুলকুচি করল, জিব পোষ্কার করল, একখান আনারস সাঁটাল। তাপর বলে, 'কমবেশি আট পহর থাকলাম তোমাদের এহানে। তা কারোরে তো একবারের জন্যও নারিয়নের নাম করতে শোনালাম না। কী গো?' সেই বাপ, সে কয়, 'নারিয়নই বললা তো? সে কে? আমরা কারোরে খাজনা দেই না। আসে যান, ঠ্যাং ভেঙে দেব।' এই না শুনে, নারদ তো একটা কান দিয়ে ঢেহিতে চেপেই—

সেই যে গ্যালো, তো গ্যালই। কিন্তু, ব্যাটা একটা খতি করে গেল। অভিশাপ দিয়ে গেল, 'আজ থেহে আর সাজা ভাঙতে পারবি না তোরা। নারিয়নরে যেদিন ফুল দিবি, সেদিন মাজা খুলবে।'

তা, আমাদের ফুল জোটে তো মাজা টাটায়, মাজা ভালো থাহে তো ফুল জোটে না। মাজাও খোলে না। টিপ করার জো নেই আমাদের।'

অভাব বড় বড় ঠ্যাং ফেলে নারিয়নের কাছে গিয়ে বলল, 'এরা এহনো তোমারে পুজো করে না। মাজা নাই বললেই চলে, তবু গোঁ ছাড়বে না।' নারিয়ন জানতে চাইল, 'তুমি কী করতে বলো?' সে বলে যে, 'এদের শায়েস্তা করা একা আমার কাজ না। আমার সঙ্গে যদি মারি-মড়ক, সাপ, বন্যা, খরা, ঝড়, বিষ্টি, এরা সব থাহে, তবে ব্যাটাদের আমি একাই পেড়ে ফেলতে পারি। মাজা ভাঙা শিকায়ে দেবরে, বান। রেগে গেলে মাতার ঠিক থাহে না। যাকগে। নারিয়ন পূজার ধুম করে বলে দেকবে—'

মানুষের কষ্টের আর শ্যাষ রইল না। এতগুলা শত্তুরের সঙ্গে নড়াই করা, করে টিকে থাহা—জেতার কতা বাদই দাও—সোজা নাহি। কিন্তু সে টিকে রইল। পুজো যে করল না, তা না। করল নিজের মতো করে। কতা ছিল নারিয়ন পুজোর—তার সঙ্গে জুতে দিল এক মুসলমান পিরকে, সত্যপির। সত্য-নারিয়নের পূজা রমরমিয়ে চলতে লাগল। দু-একজন এ-কতা তুলেছিল যে, নারদের চক্রান্তে নারিয়ন জাত খোয়াল। কিন্তু নারিয়ন বলেই তা বেশিদূর এগলো না। ধামাচাপা পড়ল।

মাজার খিল তো খুলল। কিন্তু মানামানির কোনো বালাই রইল না। বান-বন্যা-খরা, ঝড়-বিষ্টি, অভাব সঙ্গে সঙ্গেই থাকল, কিন্তু পেড়ে ফেলতে পারল না।

লোকেরা, কোন্ মন্তরের জোরে কে বলবে, দিব্য টিকে থাকল। অভাব ব্যাটার মুক দেহানো ভার হয়ে উটল।

সে বলে, 'ভালো রে ভালো, জ্যাজ মরে না এহনো! হচ্চে তোমাদের।' বলে, এক কাঁদি গাছপাকা মর্তমান কলা আর এক কলসি দুধ নিয়ে মনসার কাছে হাজির হলো। সাষ্টাঙ্গে পেন্নাম করে, এ-কতা সে-কতার মদ্যে, তাল বুঝে, আসল কতাখান গুঁজে দিল।

সে তো রেগে টং। ফোঁস করে উটল, 'নারিয়নের কতা আর বোলো না। আমাদের অনন্ত, ভালো মানুষ, সাত চড়ে রা নেই, তারে সে তার বিছানা বানায়ে রেহেছে! খির তোরে আশ মিটায়ে খাওয়াবো রে, বজ্জাত! কোন মুহে সে পূজা চায়, শুনি?'

অভাব দেকল, চিন্তির হলো! কিচ্‌লেমিতে সে-ও কম যায় নাহি! মুকে ন্যাকা-বোকার পর্দা টেনে বলে, 'অমা, এ-কতা তো জানি না। ছি-ছি! বাদ দ্যাও তার কতা। তারা তো তোমারেও গেরাজ্যি করে না গো। পুজোপাট তোমার তো একরহম বন্দই। বলে, কানি বেটিরে কানারা পুজো করবে। আমরা কানা নাহি। এই সমস্ত আবাতুরো কতা বলে।

মনসার মেজাজ এমনিই সপ্তমে চড়ে থাহে। এ-কতা শুনে বেটি তো দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উটল, 'কী, এত বড় কতা! দেহাচ্ছি।' বলেই হেঁকে উটল, 'কালাচ—'

সে তহন সবে একখান ব্যাঙ মুহে পুরেছে, জবাব দ্যায় কী করে! বদলে শোনা গেল

ব্যাঙের কোকানি। সে-বেটি নাহি তা শোনে! চেঁচিয়ে পাড়া মাতায় তুলে ফেলল, 'তুই কি মরেছিস? লাশ দেহা।'

ব্যাঙ রেহে কালাচ ছোটে।—'মা—'

'কচ্ছিলে কী? দিনদুপুরে কালাচির সঙ্গে, উঁ—'.

নজ্জায় তার মাতা নুয়ে পড়ে। মিন্‌মিনিয়ে বলে, 'একখান ব্যাঙ ধরেছিলাম মাত্তর। রেহেই দৌড় দিলাম।'

'অমা, তোর খাওয়া বাদি হলাম! তা কতাখান কলা যাচ্ছিল না! আজকালকার ছেলেমেয়েদের ভাব-গতিক বোঝা ভার। বস। দুদ, কলা রুচবে? অভাব মেসো এনেছে। খেয়ে আমারে ধন্য কর—'

মা আর ছেলের সংসার। বাপ নেই। ফুটফুটে চাঁদপানা ছেলে। সবে দুদ দাঁত ফুটে বেরচ্ছে। নাম তার মঙ্গল। তোলা নাম। চালু নাম গলা। তারা থাকত গাঁয়ের একটেরে, পাঁচমেশালি এক বনের গা ঘেঁষে, টুটাফুটা এক বাড়িতে। গলা ছিল মার চোহের মণি, অন্দের যষ্টি। চোহে হারায়। মাটিতে রাকলে পিঁপড়ে খায়, জলে কুমির, দোলনায় থুলে বাজ-শকুনে ঠোকরায়। তালে করা কী? শ্যাব পজ্জন্ত চুলের মদ্যে গুঁজে থুলো। তাতেও শান্তি নাই। যদি উকুন খায়, বজ্জাত নিকির দল যদি চেপে ধরে, তহন? রক্তখেকোরা কিছু আর রাকবে তার। বেবাক রক্ত চুষে খেয়ে নেবে না!

তহন, ভেবেচিন্তে সে বাঘের কাছে গেল। সে সব কতা শুনে কলল যে, 'আমি রাকতে পারি। কিন্তু, ভরসা পাই না। কার মনে কী আছে, বাইরের যে কিছু বোঝার জো নেই। কিছু এট্টা যদি হয়ে যায়, তহন?'

ছেলেরে নিয়ে মা চলে এল। ঝিলের ধার ঘেঁষে আসছে, শোনে, কে য্যান কলছে, 'এমন একটা ছেলে যদি পাই, পাপড়ি-পরাগের ওম দিয়ে তারে মানুষ করি।'

কে বলে? কারোরে নজরে পড়ে না। ঝিল জোড়া পদ্মবনে বাতাস বয় শন শন।

'কে গো?'—মা জানতে চায়।

'আমি।'—কলসের মতো একখান পদ্ম জল থেহে উঁকি দেয়।—'দেবা, বইন, তোমার ছেলেরে? পালপোষ করে তোমারেই ফিরায়ে দেব। ছেলে মানুষ করার বড় শক আমার। দিবা?'

'দিতে পারি, যদি তিন সত্য করে বলো, 'ছেলে তোমারে ফিরায়ে দেব।'

তিন সত্যের বাঁধনে নিজেরে সে বেঁদে ফেলল।

'এর মদ্যে যদি দ্যাহার ইচ্ছা হয়?'

'দেকবা। ওইখান থেহে হাঁক পাড়বা, 'পদ্ম বইন'—তিনবার। ছেলে কোলে তক্ষুনই চলে আসব। তিন সত্য করে কলছি।'

মা একটু ভাবে তবু। এক কতায় ছেলে দেওয়া যায় অমনি। তারপর বলে, 'ধরো। মানিক রেহে যাচ্ছি তোমার কাছে।'

হীরে করে ফেরত দেব। দাও।'—পাপড়ি খুলে দিল।

তার ভেতর ছেলেরে বসায়ে দিতেই তারা তারে ঢেকে ফেলে জলে নেমে গেল। চোক ফেটে জল এল মার।

পলাদের বাড়িখান কালাচের পছন্দ হয়ে গেল। একটেরে, নিঝুম, চারপাশে গাছপালার ঘের। ঘর বলতে একটি। চালে খড় পড়েনি অনেকদিন। মাটির মেঝে জলে থকথক। রোদে শুকোয়, খটখট। জ্যোৎস্নার মায়াবি ঢল ভাঙা ঘরে রাতভর কত রকম আলপনাই না আঁকে।

কালাচ বোঝে বাড়িতে লোকজন বিশেষ নেই। বিছানা একখান, মাদুরে মোড়া, গুটনো। জিনিসপত্তর, বলবার মতো, কিছু নয়। এককোণে একখান মাটির কলসি, মুক ঢাকা। দু-খান মাটির থালা।

এই ঘরেই ইঁদুরের করে রাহা এক গত্তে 'জয় মা বিষহরী' বলে সে ঢুকে পড়ল। কয় দিন কাটল শুয়ে-বসে। দেকল, থাহে বটে এক বেটি রাতে, কিন্তু চোহে ঘুম বলে কিছু নেই। সারা রাত ফোঁপায়। বিছানার মতো বিছানা গুটনো থাহে। রান্নাবাড়ি বলে কিছু নাই। বেটি খায় কী, করে কী, সে বুঝতে পারে না। ইচ্ছা করলে এরে সে শুইয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু, ভাবে, বেটি তো মরেই আছে একরহম, তার উপর সে ক্যান খাঁড়ার ঘা দিয়ে বদনামের ভাগী হয়। ঠিক করল, এহানে আর থাহা নাই। কিন্তু এ-ও ঠিক করল, চলে যাওয়ার আগে দেহে যেতে হবে, বেটি সারা দিন করেটা কী, রাতভর কাঁদেই বা ক্যান?

পরদিন তার পেছন পেছন বেরল। সারাদিন সে টল দিয়ে বেড়াল। খেল, কি, খেল না, ধরতে পারল না। সন্ধেয় বাড়ি ফিরে কাঁদতে বসল। এমনি করে তো কদিন কাটল। একদিন, সে দ্যাহে, বেটি, চেনা রাস্তা ছেড়ে অচেনা রাস্তায় হাঁটা দিল। সে-ও পিছু ছাড়ে না। যেতে যেতে, সেই পদ্মবিল—এহানেই, কোনো একটা ফুল আলো করে আছে, তার সাতরাজার ধন এক মানিক। চারপাশ ভালো করে দেহেশুনে সে ডাকে, 'পদ্মবইন—'

জল কেটে বইন আসে। মার কাছে এসে মুক বাড়িয়ে পাপড়ি মেলে দেয়। মা ছেলেরে তুলে নেয়। মা হাসে, বেটা হাসে, বইন-মা হাসে। বিলজুড়ে ছড়িয়ে থাহা পদ্মমাসিরা মা-বেটার সোহাগের ছোঁয়ায় হেসে কুটিপাটি। দিন পড়ে এলে, বইনের কাছে ছেলেরে জমা দিয়ে মা বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

দূর থেহে কালাচ বেটা এ-সব দেকল। ঠিক করল, ছেলেটারে কাটা আছে, যে করেই হোক। কাটল, অথচ, কারো বুক ভাঙল না, অমন কাটায় সুক না।

পরদিন, ভরদুপুরে কালাচ ব্যাটা বিলপাড়ে এসে ডাক পাড়ে, 'পদ্মবইন—'

পাড়ের পদ্মরা হাঁ-হাঁ করে উটল, 'না, না—' বইনমার বুক ছ্যাঁৎ করে ওটে। নালে ভর দিয়ে মেঘের দ্যাশে মেঘরাজকে বলে, 'আমার তো নিচু হওয়ার জো নেই। এট্টু যদি দেহে দাও, আমারে ডাহে কেটা—'

মেঘরাজ একটা টুকরা মেঘেরে ডাক দিয়ে বলল, 'যা, দেহে আয়, কী ব্যাপার—'

সে উড়ান দিল। ছেলে বলে, 'বইন মারে, মেঘের দ্যাশে এট্টু ঘুরে দ্যাকতাম—'

রাজা বলে, 'তোমারই তো দ্যাশ, বাপ, এটা। যেহানে খুশি ঘুরে বেড়াও।'

ছেলে এ-মেঘ, সে-মেঘ করে বেড়াতে লাগল। একখণ্ড কাজল মেঘ দেহে তার কাজল পরার শক হলো। সে-কতা বলতেই শাঁখের মতো ধবধবে এক মেঘকন্যা সেই মেঘ থেহে চাঁপার কলির মতো তার আঙুলে কাজল তুলে ছেলের ভোমরার মতো ডাগর চোহে তা এঁকে দিয়ে বলল, 'আজ থেহে আমরা ভাইবোন হলাম। যত দূরে, যেহানেই থাক, ডাক দিলেই আমারে পাবে, সোনাভাই।' বলতে না-বলতেই বাতাসের দোলায় সে কালো মেঘে মিশে যায় আরে বিষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। তারে দেকতে না পেয়ে সোনাভাই চেঁচিয়ে ডাকে, 'সোনাবইন, তুমি কোথায়?' শাদা মেঘেরা তার চারপাশে ঘিরে আসে, 'সোনাভাই, এই তো—' ভাইয়ের মুহে হাসি ফোটে।

তহনই সেই টুকরা মেঘ এসে মেঘরাজারে বলল, 'মহারাজ, এক ব্যাটা কালাচ সোনাভাইয়ের মার গলা নকল করে হামলাচ্ছে।'

রাজা বইনমারে বলে, 'সাবধানে থেহো, বাছা। ভয় পেও না। আমরা আছি।'

কালাচ বুঝল, এ-রহম করে হবে না। সে তক্কে-তক্কে থাহে, মা কহন পদ্মবিলের পত ধরে। কালাচ যে ছেলের পেছনে লেগেছে, সে-খবর সে-ও পেয়েছিল। বিলের কতা মন থেহে মুছে ফেলল। 'ভালো থাক, বাছা। না-ই বা দ্যাকলাম।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, বছর ঘোরে—কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত শরৎ, কত হেমন্ত, কত শীত, কত বসন্ত চলে যায়, যাবার নামও করে না মা। কালাচও নড়ে না। গোঁ ধরে পড়ে থাহে সেহানে।

এদিকে, দিন, মাস, বছরের টানে ছেলে বাড়তে বাড়তে একদিন জোয়ান হলো। তহন বইন-মা তারে কয়, 'তোমার ভার যে আর বইতে পারি না, বাপ। ইবার যে—' পরান ফেটে যায়, শ্যাষ করতে পারে না।

ছেলে বোঝে, বইন-মারে ছেড়ে যাওয়ার সময় এল। না হলে তার ভারে বুড়ি নাহি মরেই যায় একদিন। কিন্তু, যাওয়া বললেই কি আর যাওয়া হয়! শ্যাওলা জড়ায়ে ধরে, শাপলারা টানে, মাছেরা চারপাশে ঘুরপাক খায় আর বুজকুরি কাটে— 'যাবা ক্যান, কই যাবা।'

পদ্মবন থুম ধরে রইল কদিন। তারপর, তোলপাড়। আছাড়িপিছাড়ি, নাল ছেঁড়া বিলাপ, 'ক্যান তুই বড় হতে গেলি রে বাপ, ও বাপ! জলে ভাসায়ে চলে গেলি রে, বাপধন—'

এক পদ্মবুড়ি আর এক বুড়ির কানের গোড়ায় ফিস্ফিসিয়ে ওঠে, 'মাগির কতা শুনলে। আছিস তো জলেই। নিজগুণেই ভেসে আছ, মা। নতুন করে কে আর ভাসায় তোমারে—'

'চুপ কর না—' পাল্টা ধমকে সে আর রা কাটে না।

বইন-মা কোনো কতা বলে না। বুকজোড়া থমথম কান্নার ভারে ভেঙে পড়তে-পড়তে সে যে কতবার সামলে নিল, তার ঠিক নেই। ফ্যালফ্যাল করে ছেলের দিকে চেয়ে থাহে আর মনরে বুঝ দেয়, 'ভালোয় ভালোয় ছেলেরে এই যে মার কাছে ফেরত পাটাতে পারছ, সে কি কম কতা! রাকতে পারলা না, সে তোমার কপাল!'

যাওয়ার দিন সকালে সে ছেলেরে সাজাতে বসল। মুহে, বুকে, হাতে কত রহম করেই

না পরাগের আল্পনা এঁকে দিল। খানিকখন চেয়ে চেয়ে দেকল। ছোট্ট করে চুমা খেয়ে বলল, 'ভালো থেহো, বাপ। মারে দেহেশুনে রেহো। আর, মনে রাকবা, কালাচের বিষ-নজর তোমার উপর। সাবধান রে, বাপ। এহানে সবাই রইলাম আমরা। মন করলে, এসো।'— আর সে ধরে রাকতে পারে না নিজেকে, হা-হা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

সেই দুদের ছেলে গলা হয়ে ফিরে এল। মা খুশি। গাছগাছালি, পাখপাখালি খুশি। তার ফিরে আসার খবর বাড়ি বাড়ি বিলিয়ে এল চড়াই। পড়শিরা খুশি। এমনকি, কালাচ যে কালাচ, সে-ও খুশি।

কদিন ভালোই কাটল, পাড়া বেড়িয়ে, এ-বাড়ি সে-বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে। কিন্তু 'আইসে দিনের' চিন্তায় গলার পরান য্যান শুকিয়ে কাট, দিশা পায় না কিচ্ছুর। বুঝতে পারে, জগৎ-সংসারের কোনো কাজই সে জানে না। বইন-মার কোল-কাঁকের ওমে-ওমে তার বেড়ে ওঠা। কিন্তু কাজের সঙ্গে কোনো সম্পক্ক ছিল না। তো, এহন করে কী। ভেবে ভেবে বন্ন তার কালি হয়ে যায়। মার খাটনির খাবার গলা দিয়ে নামতে চায় না।

একদিন দুপুরে গলা শুয়ে আছে মড়ার মতো। নড়াচড়া নাই, য্যান অসাড়। স্বপ্ন দেকছিল। মেঘের দ্যাশে সোনাবইনের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আকাশভরা তারাদের আবছা-আবছা দেহায়। চাঁদবুড়ি সোনাবইনরে ধমকায়, 'অ মেয়ে, এ-অসময়ে দাদুরে নিয়ে এলি। দুটো কতা যে কব, তার জো আছে।—দাদুভাই, ওবেলা এসো, গপ্প হবে।—চুপি চুপি তালে বলি তোমারে। সুজ্জিবেটা মহা হিংসুটে। অন্য কারো দিকে তাকাতে দেকলেই হিংসের ব্যাটা জ্বলেপুড়ে মরে। আমরা কি ওই গুন্ডোটার সঙ্গে পারি। আলো আমাদেরও আছে। যণ্ডাটার ভয়ে বার করতে পারি না, দাদা—'

হঠাৎ, তীব্র এক যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে গলা। দেখে, কালাচ ছুটে পালাচ্ছে। হাতের কাছেই ছিল দরজার ঠাসা, ছুঁড়ে মারে, মাতা চৌচির।

যমদূত দুজনরেই নিয়ে এল যমের কাছে। যমরাজা কালাচরে শুধায়, 'গলারে তুমি কেটেছ?'

সে চুপ করে থাহে।

'কেন?'

চুপ।

যমরাজা বেজায় রেগে গেল। একজন সেপাইরে ডাক দিয়ে বলল যে, 'এই বেটারে অগ্নিকুণ্ডে ফ্যাল। পুড়ুক। পরে ভেবে দেকব, কী সাজা দেয়া যায়।' তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গলার দিকে চেয়ে বলে, 'কোন্ লোকে যেতে চাও?'

গলা হাত জোড়া করে পেন্নাম ঠুকে বলে, 'একখান কতা জানার খুব ইচ্ছা ছিল।'

'বলো। শুভ বর। ভালো ছেলে। বলো।'

'চিত্রগুপ্তরে য্যান দেহি না—'

'সে বহুকাল গুপ্ত হয়ে আছে—লুপ্ত হওয়ার গোছ এখন। ওরে আর কিচ্ছু নাই। বোদভাস্যি

গলে সব জল হয়ে গেছে। তা কলসি বোঝাই করে রাখা আছে। তা নিয়ে এহন গবেষণা হচ্ছে: তার ঝিনুর জল জমাট করে খানকয়েক দেরেস্ত ক্লার্ক বানানোর জোর চ্যাষ্টা হচ্ছে: এ-সব কতা পরে মেলাই শুনতে পাবে। বলো, কোন লোক পছন্দ?'

'আমি'—গলা, একটু চুপ করে থেহে, গলা খুলে বলে, 'আমি মার কাছে যাব।'

যমরাজ তো থ। ছোঁড়া বলে কী। সগ্‌গলোক, বম্মলোক থুয়ে মত্তলোক চাস। বুকার মরণ আর কারে কয়।

মোলায়েম করে তারে বোঝায়, 'থেহে তো এলে অ্যাদ্দিম সেহানে। দেখ্‌লা কী?—খালি নাই নাই, হিংসাহিংসি, ঝগড়া-কাজিয়া, কাটাকাটি—এই তো? তো, কোন্ সুহে আবার যেতে চাও সেহানে? আছেটা কী?'

গলা দেহে, রাজসভার বেবাক লোক তার দিকে হাঁ-করে চেয়ে আছে। একজন তো বলেই ফেলে, মনের কথা চেপে রাখতে পারে না, 'আরে ব্যাক্কলের ব্যাক্কল, সগ্‌গ চা—'

চিল্‌তে খানেক হেসে সে কয়, 'মার কাছে যাব।'

যম আর করে কী? বলে, 'যাও, মার কাছেই ফিরা যাও।'

গলার মুকখান য্যান সুজ্জ হয়ে ওঠে।

ওইটা মা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে জানতে চায়, 'মহিনদাদা, এটা কার কিস্‌সা গো?'

মহিমা কোনো কথা বলে না। ঘনিষ্ঠ চোখে চেয়ে থাকে শুধু, আর ভেতরে ভেতরে কুটতে থাকে, 'ই বেটি কেমন মা। নিজের ছাওয়ালরে—কপালরে কপাল—'

তখনই ওইটার মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে, ভাঁজে ভাঁজে ঘুরপাক খায়, ভাঙে, ছড়ায়। গভীর এক প্রত্যাশার দীপ্তিতে জ্বলতে থাকে মা। চোখ ভরা আলো নিয়ে মহিমার দিকে চেয়ে বলে, 'হ গো, তোমার কিস্‌সার গুণেই মরা ছাওয়াল জ্যান্ত হয়, মার কোলে ফিরে আসে। আহা, কী কিস্‌সাই না শুনালে গো, মহিমদাদা—'

মহিমার চোখ জ্বলে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিস্‌সা বলিয়ের চোখে জল জমতে নেই।

বলা তার পায়ের ওপর নিজেকে ভেঙে দেয়। কিস্‌সু বুঝি বলে যায় বেশিটাই ভেতরে থেকে যায়।

মাথার ওপর নেমে আসে মহিমা হালদারের অলৌকিক হাত।

ফোরেন লাইটার

সাধন চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর জগন্নাথ মাসি বাড়ি যান, রথে চেপে, রশিটানা মানুষের হয়লাপ, কাদা-জলে সে-এক দৃশ্য; তাই প্রতিবছর রথের দিনটিতে বৃষ্টির আকাশ যেন প্রকৃতির বাঁধা নিয়ম। আজ ব্যতিক্রম বলেই হয়তো নিবৃষ্টি। দুপুরের একটি টানটান গগন-গম্বুজের নিচে রোদ তেজের বন্যায় ঝরঝর; মফস্‌সল শহরটির তৃণ-গুল্ম, গাছ-গাছালির কাষ্ঠ-পাতা গর্ভধারিণীর ভাষায় মৃদু বাতাসে চুপচাপ 'অদ্ভুত তো। ফোঁটাখানেকও ঝরল না? খোলের একটা চাঁটি অবধি শুনতে পেলুম না আজ?' কুলদাপ্রসাদ ভাবলেন, 'সত্যিই দিন-কাল পাল্টেছে। মানুষজন নেই আর আগের মতো।'

এখন, ঠিক আড়াইটার সময়, তিনি এন. কে ট্রেডার্স—মস্ত মুদিদোকানটায় হাতের স্লিপটি গছিয়ে, পকেটে পাঁচশো টাকার একটি নোট, ফাঁকা বেঞ্চটায় অপেক্ষা করছিলেন, দেখলেন বহুদিন আগের মোটা ললিতবাবুকে আচমকা শিংয়ে তুলে ষাঁড় আছড়ে ফেলল, পপাতধরণী এবং মৃত। এমনই দুপুর ছিল সেটা—তাই মনে পড়ল।

এখন রাস্তার দু-পাশে বহু বর্গফুট ধরে ছায়া, ছায়ারা শুয়ে থাকে, পাশ ফেরে আকাশের নির্দেশে। মূল পথটার হাফ-কিলোমিটারের দু-পাশে গড়ে উঠেছে ছাব্বিশটা পেল্লাই ফ্ল্যাট, ছায়া জন্মেছে সে-হেতু। এখন অনেক দোকান, অনেক সাটারের নামা-ওঠার কর্কশ শব্দ, অনেক বেশি দুর্ঘটনা-সম্ভাব্য হয়ে পড়েছে মূল পাকা রাস্তাটা। আর যানবাহনের তীব্রতা, গতি এবং শব্দ-শব্দ এবং শব্দ। দুপুরটা টইটম্বুর হয়ে উঠলে এলিয়েপড়া মানুষের ছোটখাট কথা, তাদের কাছে ফেরিকরা সংকেত, হাঁচি-কাশি, দোকানপাটে সাময়িক ঝাঁপি তুলে, বাড়ি ফেরার পথে কথাবার্তা। বিচিত্র ফেরিওয়ালাদের মওকা, যেন রহস্য ও রহস্য গিলিয়ে ফেরিওয়ালাদের দাঁও মারার মতলব। কত কিছু যে নতুন নতুন ফেরির ফর্দে উঠে আসছে, মাথা দিয়ে বেরয়ও।

আজ দুপুরের স্নানাহার, গা-এলিয়ে বিশ্রামের আগে কুলদাপ্রসাদ থলি-টাকা স্লিপটি নিয়ে হাজির। খুবই সন্ধানী ও বিবেচক ব্যক্তি, কিছু হিসেবিও বটে, নইলে এন. কে-তে দিনরাত গাদাগুচ্ছের যে চাপ খদ্দেরদের, ঘণ্টা ধরে হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হয়। চার চারটে মাপুনিয়ারা, কর্মচারী, গুছিয়ে ঠোঙায় ভরে দিচ্ছে এবং মালিক নরেশ দাসকুণ্ডু এমন দক্ষ হয়ে পড়েছে যে ক্যালকুলেটার বেপ্রয়োজন হয়ে পড়েছে। রিটেল বিক্রিটাই বেশি। প্রায় হাজার বর্গফুট দোকানটা দ্রব্যে-দ্রব্যে ঠাসা, থরে-থরে, পাউচে-পাউচে, প্যাকেটের ছড়ায়-ছড়ায় ভেতরে চোখই যায় না, ছেলেগুলো মেপে হাতায়-হাতায় তুলে আনতে, কেমন কুয়াশার মতো অস্পষ্ট, কাঠের সিলিং-এর মাথা পর্যন্ত মালে ঠাসা। যখন পেটি ঘাড়ে কেউ হামাগুড়ি হয়ে নামে, ভুরু ও চোখের পল্লব-ঝাঁটে, আঁশ-আঁশ ঝুল, আর টুকরো ময়লা।

'অবসর বলেই তো আসার সুযোগ।' কুলদাপ্রসাদ ভাবেন। নইলে তেল-জিরে-ডাল কেনা নিয়ে ঘাম-গন্ধ, নানান জিনিসের খদ্দেরদের ফুটকাটায় তাঁর মন কলতে থাকে ব্যক্তি-সময়টাকে

হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে কেউ।

মস্ত ড্রেনের ওপর ঢালাই, টিনের শেড্, সামনে সাইকেল—কাঠের ভ্যানে চচ্চড়ি হয়ে থাকা। বস্তা এবং বস্তা; মাসকাবারে যে-দিন ইঁদুর পিটিয়ে শেষ করতে চায় নরেশ, ধারি ও লাল লাল বাচ্চার কয়েক পেটি ভাসিয়ে দেওয়া হয় ড্রেনের জলে। কিন্তু কাঞ্চন, কুলদাপ্রসাদের স্ত্রী, কিছুতেই বুঝতে চায় না। যতই তিনি বোঝান মাসকাবারের মাল এক-যাত্রায় সেটাও, তবু মহিলা খুচখুচ স্লিপ বানাবে, হপ্তা যেতে না যেতেই। কুলদাপ্রসাদ তাই দুপুরটি বেছে এডজাস্ট করেছেন। 'ধরো আমারটা, বস্।' রসিকতায় কাগজের টুকরোটা হাতে ধরিয়ে, থলি-পাত্র গছিয়ে, 'আজ কটায়?' কুলদাপ্রসাদ চোখ নাচাতে, মাপিয়ে ছোকরা নিতাই যখন বিনিবিনি ঘাম ও ভেজা স্যান্ডো-গেঞ্জিটার ক্লান্ত চোখ-চাউনির উত্তরে বলে 'চারটের আগে তো নয়ই'। নরেশ হাজার হিসেবে ডুবে থেকেও শুনে ফেলে, দরকারের উত্তরটা মিষ্টি-মিষ্টি করে বলে, 'কাল ছুটি খাইছস না?', নিতাই চোখ মেরে দেয় কুলদাপ্রসাদকে। জোরে জোরে বলে, 'বসেন, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।' কুলদাপ্রসাদ তাই পুরনো ষাঁড়টা দেখতে পান, সামান্য নান্দনিক নির্যাস নিয়ে, শ্রান্ত-ক্লান্ত চারপাশ, লম্বা একটা লয়, দুপুর দুপুরই আছে যে এখনও মফস্সল শহরে। দুপুরটা সকাল-সন্ধ্যার ফাস্ট-লাইফের পোশাকের নিচে যেন ময়লা একটি ফুটো-ফুটো গেঞ্জি।

তখনই কুলদাপ্রসাদ ফেরিওয়ালার ডাকটি শুনে চকিত এবং কৌতূহলী। এমন হন না তিনি ইদানীং। ব্যালান্স থাকে। তবু কচিৎ পুরনো দিনের ছেলেমানুষ সাজবার অভ্যেস—যা কখনোই অস্ত যায় না বুকের খাঁচা থেকে, স্মৃতি-কল্পনায় নড়েচড়ে বেশ স্পেস্ তৈরি করে বটে—বুদবুদের মতো ভেসে ওঠে।

ছোকরাটা চৌকোবাক্সের ভ্যান চালিয়ে, প্যাডেলের পা-দুটিতে ভিন্ন-ভিন্ন স্ট্র্যাপের হাওয়াই চটি, হাঁকছিল 'ফো-রে-ন লাইটার।' 'ফো-রে-ন লাইটার!'

নীল পাতলুনটির পায়ের গোড়ায় দু-দুটি ফোল্ড, কালো জামা। কুলদাপ্রসাদ রুটিনমাফিক তাকালেন, স্বরটি ভারি কাব্যিক, যেন নির্জন ঘু-ঘুরু-ঘু। ফো-রে-ন লাইটার।

ছোঁড়াটা বাঙালি নয়, সম্ভবত। 'ফ' বর্ণটি তালে খাড়া থাকত, ও-কার নিয়ে হেলে পড়ত না। কুলদাপ্রসাদের অনুমান এটি। তিনি মনে মনে, চোখের চাউনিতে, ছোকরাটার দিকে কাত হয়েই রইলেন। মাথায় যেন নীলচে তুলোর চুল লাগানো, কাঠের ভ্যানের হ্যান্ডেলের দু-পাশে দু-দুটি হলুদ বেলুন, সুতোয় ফুটতিনেক উঁচুতে বাতাসের সঙ্গে ডলাডলি করছে।

কুলদাপ্রসাদ খুব কাছ দিয়ে ভ্যানটিকে বুঝলেন, প্যাডেল-চাপ খেতে খেতে, ছোট্ট একটা ব্যাটারি 'ফো-রে-ন' ইত্যাদি কথাগুলো রূপ ও ধ্বনি নিয়ে অর্থবহ উঠে আসছে। তাহলে ভাবনাটা ছিল উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। ছেলেটি বাঙালি-অবাঙালি যা খুশি হতে পারে, হিন্দু বা মুসলিম। সামনের ওষুধ-বেচা ছেলেটি বলল, 'নরেশদা, দেখুন র-থ।' নরেশ স্লিপের অর্থমূল্য খাড়াখাড়ি হিসেব কষছিল, কেবল গালের পেশিতে হাসি ফুটল।

'পাঁচশো টাকা, হা-জার টাকার নোট পরীক্ষা হয়।' ফের ভ্যানটি বলতে, কুলদাপ্রসাদ এ-যাত্রা আচমকা 'এ-ই!' আওয়াজ দিয়ে, ইশারায় ডাকেন। ছেলেটা ব্রেক চাপে। দাঁড়ায়।

দু-চার জনের ভিড় হয়। এমন অলস, কর্মহীন ভিড়-টির জমলে দুপুরটাকে খুবই পুরনো কালের দুপুর বলে ঠাহর হয় কুলদাপ্রসাদের, যেমন দেয়ালে জলছোপ ধরলে আঁকিবুকি রেখায় ফুটে যায় আদ্যিকালের কোনো গন্ধ, অনুভব। ইদানীং নাকি ভেজা দেয়ালে কেবল চাঙড় খসে, সুতোর মতো, অথবা ধাবড়া চুন, ভেজা শ্যাওলা—কোনো মূর্তির আভাস থাকে না। কোনো ঘ্রাণ বা প্রাচীনতার স্বাদও নয়। তাই আধুনিক জগতে ডিসটেম্পার চলছে, তাপে ভাজা ভাজা হলে কিস্তিতে এ.সি—শীতল রাখা, নিয়ন্ত্রণে রাখা তাপমাত্রা। ছোকরাটার চারপাশে কৌতূহলী ভিড় জমল। লাইটার তেমন মূল্যবান ও মনকাড়া বস্তু নয় ইদানীং, সি.ডি-হার্ড ডিক্স ক্যামেরা-মোবাইলের মতো, অবিশ্যি যার-যার তার-তার কাছে, কিন্তু ভিড়-করিয়েরা বেশির ভাগই রাস্তার কলে চান, ফোকটের ছায়ায় উনত্রিশ খেলে দুপুর কাটানো, ভোট দেয়া বা বিশ্বকাপে কোনো একটা দেশের উগ্র সমর্থক হয়ে খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করে।

'কিতনা দাম লাইটারের?'

'তিন-তিন টাকা। উঠান, তিন-তিন টাকা।

লাল-নীল-হলুদ-কালো রংয়ের লাইটারের দেহগুলির মধ্যে আগুনের ব্যবস্থা আছে—বিড়ি-সিগারেট ধরানো, বা শক্ত কোনো বন্ধন ছিন্ন করা, প্রদীপ জ্বালিয়ে নৃত্য করতে করতে খড়-ঘাস যে-কোনো দাহ্য মালকে উসকে দেয়া যায়।

কুলদাপ্রসাদ সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে, পকেট থেকে নিজের পাঁচশো টাকার নোটটা বার করে বল্লেন, 'এটা পরীক্ষা করো তো? জাল না আসলি?' ছেলেটা হাত বাড়াল, খুব সন্তর্পণে, যেন মোম মাখানো আছে, গলে যেতে পারে নোটের অক্ষরগুলো। সব ক'টা লাইটারের পেছনে, ছোট্ট ফসফরাসের বিন্দু, জ্বলে সরু রশ্মি বেরোয়। এ-আলো পোড়াতে পারে না, ছটা দেয় মাত্র, গোল বড় একটা টিপের মতো, এবং এটাই নাকি মাপকাঠি—জাল বা আসলি ধরার।

দুপুর এবং অলস ঠুঁটো বসে আছেন বলেই হয়তো কুলদাপ্রসাদের এমন খেয়াল-খেয়াল খেলা, একটু সময় কাটানোর নতুন ছক, বৃষ্টির সম্ভাবনাময় মাসগুলোতে আকাশ অতিরিক্ত আলোকিত থাকলে যা হয়, উনি অবসরপ্রাপ্ত, এন. কে ট্রেডার্স থেকে রয়ে-সয়ে নিরিবিলি কেনাকাটার ভেতরে সামান্য কথা, রস বা দু-চারটে আলাপ আশা করাই যেতে পারে। নইলে তো এখানে সকাল-সন্ধ্যা প্রয়োজনের ঠ্যালাঠেলি কিচ্‌কিচ্‌ করছে। আর এখানের ক্রেতা যারা—ভারতের গঠনতন্ত্র, সংবিধান রচনা করেছেন তারাই; রাষ্ট্রপুঞ্জ, দল ও মন্ত্রি বাছা থেকে ক্রিকেট-ফুটবল-লনটেনিস, সব কিছুতেই মতামত দিয়ে থাকেন। সবারই আপন মাপকাঠি, একটি মত।

এই পাঁচশ টাকার নোটটি দিয়েছিল কাঞ্চন। বউয়ের হাতে তিনি মাসের শুরুতেই মুদি-মশলার খরচার জন্য দু-হাজার গছিয়ে দেন। কাঞ্চনও চাকরি করে, আরও আড়াই বছর করবে, তাই মহিলা নোটে চিহ্ন রাখে না, কোনটা স্বামীর, নিজের অর্জিত কোনগুলো।

ছোকরাটা নোটটা মেলে দিয়ে এ-পিঠ, ও-পিঠ দেখল, একটা লাইটার বার করতেই, চমকে কুলদাপ্রসাদ, 'ধরিয়ে দেবে নাকি?'

হাসল ছোকরাটা।

'লাইটার তো আগুন জ্বালানোর জন্য।'

ছোকরা সামান্য ডোন্টকেয়ার ভাব নিয়ে ফের বলে, 'এ-সব ডবল কোয়ালিটির। পোড়াবে, নোটও ভি চেক করবে।'

এবার টিপের আকারের পেছনের ছটাটি নোটের সাদা জমিনে ধরতেই, সতর্ক ও খুঁতখুঁতে কুলদাপ্রসাদ 'ছোকরাটাকে না-ডাকলেই হত।' ভাবলেন, মনে মনে প্রায়শ্চিত্ত করলেন, 'সবাই হাঁ করে আছে। একটা কিছু মত কুড়িয়ে নিলেই হল।' নোটটা না বার করলেই ভালো ছিল। কুলদাপ্রসাদ আসলে মতলব করেছিলেন, হাতের মুঠোয় এমন যন্ত্র থাকলে, নোট বাছাবাছিতে নিশ্চিন্ত। বিশেষ করে পাঁচশো বা হাজার টাকা, একটা যদি জাল বনে যায় গেরস্তর গচ্চা কম্ম নয়। তাছাড়া পুলিশের ঘরে হেনস্থার ভয় নেই, ওদের কাছে সবাই সন্দেহজনক, বজ্জ ফালতু বনতে হবে। কুলদাপ্রসাদ জানেন, ইদানীং জাল বা নকল নোটে দেশের নানা প্রান্ত ছেয়ে গেছে। জাল ও নকল নোটে নাকি ছয়লাপ। ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, পুলিশ অসহায়। ওস্তাদ শিল্পীদের সবাই কেশস্পর্শ করতে অক্ষম। ফরেন লাইটারের এই সহজ ফরেন কায়দা হাতে পাওয়া মানে চোদ্দআনা সফলতা, কুলদাপ্রসাদের হাতে।

এখন নিছক অভিজ্ঞতা, আন্দাজ, চোখকানে কাজ হচ্ছে না। একটা যন্ত্র পেলে যথাযথ সাফল্য একশোভাগ। নোট—আসল এবং জাল, মূল ও নকল স্ট্যাম্প-কাগজ, দলিল, হাকিমের রায়ের খাঁটি ও মিথ্যা কপি, পর্ষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-কাগজের নানা বিকল্প—সব যেন মিলেমিশে একাকার। তবে, বর্তমান অবস্থায় কুলদাপ্রসাদের বাদবাকিগুলোর আসল-নকল নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু নোট—যা ভুবনময় বাজারে ক্রেতার ছাড়পত্র—চালাও জালরূপ ধারণ করলে, আশঙ্কা তো থাকেই; বাতিল হবার, হেনস্থা হবার, আইনে ছুঁলে আঠারো ঘা—কত কী।

ছোকরার হাতের লাইটারের বিন্দু আলোটি বাঁ-পাশের সাদা অংশের পেছনে খানিক ঘুরে ঘুরে গেল। জলছাপের গোপন গান্ধী মূর্তিটি ছায়া ফেলল। আভাস ফুটল বলা যায়। মৃদু হাসিটি ফোকলা বোধ হচ্ছে। নকল? নিজেকেই প্রশ্ন করলেন কুলদাপ্রসাদ। না! না! নিজেরই জবাব। একজন জানতে চাইল, 'কী? জাল না খাঁটি?'

ছোকরা মিনমিনে গলায় বলে, 'আসলি নোটে ছোট্ট করে ৫০০ লেখা থাকে...এটায় দেখতে পাচ্ছি না।' শুনেই কুলদাপ্রসাদ চট করে নোটটা তুলে নিলেন। বেশ জোর দিয়েই বল্লেন, 'কালই ব্যাংক থেকে তুলেছি, ব্যাটা!...চেক্ করিয়ে।' সত্যি কি তিনি ব্যাংক থেকে তুলেছেন, নাকি প্রেস্টিজ রক্ষায় বললেন? মনে ছোট্ট করে কাঁটা ফুটল। একটু খিঁচ। তাই জোরে হাসেন, পাশের জনকে সাক্ষী মানেন, 'এ-সব ফোরটোয়েন্টি।'

'বার করছে নতুন নতুন ফাঁদ'। একজন বলে, কিন্তু কুলদাপ্রসাদ ফের বেঞ্চিতে এসে বসলেন, টের পাচ্ছেন অনেকেই দুপুরের এই ঢিলেঢালা সময়-বিন্দুর মজাটি উপভোগ করছে। এবং জলের দাগের মতো সব মুছেও দিচ্ছে। সময়-বিন্দু তো একটা হয় না, একটা—পরের একটা, পরের-পরের একটা, এবং পরের...।

এন. কে ট্রেডার্স কিছুটা ফাঁকা হয়ে পড়লেও, টুকটাক খদ্দের আছে। বাইরে কয়েকটা উটকো মজুর ডজনদুই খালি তেলের টিন টার্ন করে বাঁধছিল দড়ি দিয়ে, অন্যান্য সরঞ্জাম এবং মুড়ি ও লবণের বস্তার টালের মাথায় কতগুলো ফাঁকা পেটি—হয়তো সেকেন্ডহ্যান্ড, বাজারে বিক্রি হয়ে যাবে। এ-সব কিনতেও কিছু নিয়মিত পার্টি দুপুরকে বেছে নিয়েছে। যেমন কুঞ্জদাপ্রসাদ হিসেব করে আসেন দুপুরে। নরেশ একজনের সঙ্গে বিতর্কে মগ্ন। গ্রি-কুপন নাকি তিনটে ছিল, দুটো জমা নিয়েছে, হারানো সাক্ষীটি না মেলা অবধি নরেশ তা যথাযথ মানছিল না।

ইদানীং গ্রি-কুপন বা দ্রব্যের মধ্যে মোহর, গিনি বা এ-ধরনের লোভগুলো বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মাল কেনো, আবার কেনো, কুপন জুটুক, গ্রি নিয়ে যাও। কিন্তু বিশ্বাস, চেনাপরিচিতি, মুখের কথা, আস্থা, সততা—হাজার রেফারেন্স দিলেও লাভ হবে না। নরেশ তাই হাসির ছটাতেই হারানো কুপনটিকে অস্বীকার করল।

'বস্, আমারগুলো হয়েছে?' কুঞ্জদাপ্রসাদের সঙ্গে এবার নিতাই প্রায় চোখাচুখি। নিতাই চোখ মেরে বোঝাল, ওই নোট-পরীক্ষার খেলার রেজাল্ট? তবে, দুপুরঢলা দৃষ্টিতে এখন বাড়বাড়ন্ত হাসিটি উধাও; ভাঙা ঢেউয়ে টুকরো প্রতিচ্ছবির মতো। বেলা বাড়ছে, ম্লান, পেট, দুপুরের এই দৃশ্য-শব্দগুলো মাপিয়ে ছেলেগুলোকে বড্ড শ্রান্ত করে তুলেছে। বেঞ্চের ও-মাথায় ছিপছিপে চেহারার এক মহিলা। গৃহবধূর মতো। তবে চোখমুখ বেশ স্মার্ট। কোনো তেল-শ্যাম্পু বা সাবান ট্রেডমার্কের প্রতিনিধি। বাজার সমীক্ষা করছে। হাতে নানা লিটারেচার, সুযোগের তালিকা। সাধারণত মেয়েরা মাঝে মাঝে বেঞ্চে—নানা ব্র্যান্ডের হয়ে কথা বলে। ফুরনে কাজ। কথা বলতে হয়, খদ্দেরের নানা প্রশ্নের জবাব, কৌতূহল, তাদের অফুরন্ত কৌতূহল, তাদের জিজ্ঞাসা, তাদের গায়েপড়া জিজ্ঞাসা এবং এ-সব ছুকরিগুলো সব কিছু প্রশ্নের হাসিমাখা উত্তর জানে। সঙ্গে ছেলে পার্টনার থাকলে, প্রশ্নগুলো ভাগ করে নেয়। ভীষণ স্মার্ট ওরা, মেয়েগুলো নির্বাধায় ভুল ইংরিজি বলে, তারা হাবুবুড়োদের কৌতূহলকে নীতি দিয়ে বিচার করে না, উপরন্তু উস্‌কে দিতে জানে, ছুঁৎমার্গ নেই, শেষ পর্যন্ত জীবনকে লক্ষ্য দেয় না কোনো ছুঁৎমার্গই।

'কী হল? পরীক্ষায় ফল?' নরেশ ব্যস্ততার মাঝেই ফোড়ন কাটল, কুঞ্জদাপ্রসাদ বুঝলেন, ব্যাপারটা নিয়ে সকলেরই মাথাব্যথা, ফো-রে-ন লাইটার।

'পাগোল হয়েছ!...বাজালাম একটু...বসে বসে কী করি!...আরে বাপু কড়কড়ে, ব্যাংক থেকে তোলা।' কুঞ্জদাপ্রসাদ অনেকগুলো টুকরো কথা বয়ে আনলেন। সাজিয়ে সাজিয়ে সামনে তুলে ধরলেন নরেশের কাছে। মহিলাটি নরেশকে বলে, 'পাঁচশো-হাজার খুব ফ্রড হচ্ছে আজকাল।' নরেশ মহিলাকে পাত্তা দিল না। কুঞ্জদাপ্রসাদের মনে হল, তিনি এ-অঞ্চলের যে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি, সৎ, কিছু জ্ঞানের অধিকারী, শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করেন জীবনযাপনের মধ্যে, মহিলা খোঁজ রাখে না। তেমন আগ্রহও নেই। কোম্পানির সরাসরি রিক্রুট কিনা, ফুরনের নয়। তবে দেহে একটি যৌন-গাম্ভীর্য যে রক্ষা করে চলে, তা যেন অনেকটাই কোম্পানির সুনাম ও বিজ্ঞাপনের জোরে। পাত্রভেদে এই গাম্ভীর্যের বদল হয়, বদলাতে হয়, সুন্দর ও

ঠাসা মোড়কগুলো যেমন ঝকঝকে ঝুলে থাকে দেয়ালে, পেরেকে, দড়িতে। তেমন ঝুলতে হয় এ-গাম্ভীর্যকে।

নিজেকে সামান্য অপরাধী বোধ হয় কুলদাপ্রসাদের। মহিলাটির দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও গাম্ভীর্যে মনে হল, স্থির ধারণা করে নিয়েছে, কুলদা জানেন, ভালো করেই জ্ঞাত আছেন, জাল নোটটি সম্পর্কে। খুব বিব্রত হতে থাকেন, উটকো এমন কৌতূহলের খেলায় যোগ না দেয়াই উচিত ছিল তার। দুপুরে, ওই হ্যালাফ্যালা কাঠের ভ্যানটির, ওই নোট পরীক্ষার যন্ত্রটি যদি খাঁটি থাকত, দুনিয়ার তাবৎ প্রভুরা কি গোপনে কিনে রাখতেন না? আচ্ছা, নোট জাল বা খাঁটি—পুরো ব্যাপারটাই তো মেনে নেয়ার মধ্যে সত্য। নোট বাজারে ঘোরে, হাতে হাতে। তার চরিত্র নিয়ে, পরীক্ষার মতলবে মাথা না ঘামালেই হয়। মেনে নিলে বাজারে, আমাদের বাজারে, ডলার-পাউন্ড চলতে পারে। সাদা কাগজ, চিরকুট আইনসিদ্ধ, জাল নোটটিও তাই। কিন্তু রাষ্ট্র বাধ সাধছে। জলপাইগুড়ি কি রাষ্ট্রের নয়? সেখানে একটি অঞ্চলে নির্বিবাদে মানুষ মেনে নিচ্ছে। কুলদাপ্রসাদ বছর দুই আগে সেখানে গিয়েছিলেন, ঢালাও ভুটানি নোট, মেনে নিয়েছে বলেই তো, কেউ চরিত্রের জন্য খুঁতখুঁত করছে না, কোনো ঝামেলাই সৃষ্টি হচ্ছে না। কুলদাপ্রসাদের একমাত্র পুত্র ম্যারেকিয়ায় আছে। এদেশে ফিরতে ইচ্ছুক, কোম্পানিকে অনুরোধ করছে ডলারে মায়না দিতে। মেনে নিলেই চলবে সবকিছু। মূল্যমান? মুদ্রার তুল্য-মূল্য?

'রেডি স্যার!' নিতাই-বস্ বলে।

'কত হল নরেশ?' উঠে কাউন্টারে কুলদাপ্রসাদ।

'মাত্র দুশো একান্ন, বেশি হয়নি।' নরেশ মুখ তুলে হাসতেই, বিশ্বাসচটকানো নোটটি পেয়ে মৃদু নীরব থেকে নোটটির দিকে তাকাল। একবার চোখের সামনে মেলে, আপন চোখের আলোতে, উল্টেপাল্টে দেখে মেনে নিল। তবে কুলদাপ্রসাদ লক্ষ করলেন সাধারণ ড্রয়ারে গুচ্ছের নোটগুলোর মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে নয়, স্বতন্ত্রভঙ্গিতে অন্যত্র গুঁজে রেখে। এ-ভাবেই নোটটির সনাক্তকরণ সহজে হতে পারে যাতে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। কিন্তু লাঠিতে ফাটল ধরল।

'স্যার টিফিনটা করে নেই? ব্যালান্সটা দিচ্ছি।' নরেশের শুকনো হাসি।

'বেশ। বেশ। তাড়া নেই কোনো।' বিনিবিনি ঘামছেন কুলদাপ্রসাদ, ব্যাংকেও জাল বেরোয় ইদানীং, এমন তো হতে পারে কাউন্টারে চোখ এড়িয়ে গেছে, 'এত বেলায় টিফিন সারছ?' উনি সহজ হতে চাইলেন।

মহিলাটি কুলদাপ্রসাদকে নীরবে ভাবছে ধড়িবাজ—শরীরে কাঁটার মতো দংশাচ্ছে। নরেশ বলে, 'আর টিফিন!...মাথা তোলার সময় পেলাম কই?'

'খিচুড়ি টিফিন?' কুলদাপ্রসাদ হাসলেন। দেখলেন চামচে ছোট স্টিলের বাটি থেকে হলদে, ঝুরো ঝুরো প্রসাদের মতো মুখে নিয়ে নাড়াচ্ছে নরেশ, 'কাল বাড়িতে কালীপুজো গেছে!'

'বাঃ!'

'বাৎসরিক থাকে কিনা!'

'হ্যাঁ, কাল তো অমাবস্যা ছিল!' কুলদা বললেন, ভাবলেন, একটু একটু মনে এল শেষ রাতে দূরে কোথাও ঢাক বাজতে শুনেছিলেন।

'বলি হয়?'

'না। না।' নরেশ বলে, 'আধ চালকুমড়ো...আশ্য রক্ষায়।'

'তোমরা কি শাক্ত?' শুনে নরেশ বলল, 'অত বুঝি না। শাক্ত আজকাল সবাই। মানতের কালীপুজো, এইটুকু বুঝি।'

টিফিনটি সেরে, হাতটা মুছে নরেশ বাকি টাকা স্লিপসহ ফেরত দিতে মহিলার দৃষ্টির সোজাসুজি কুলদাপ্রসাদের চকিত সাক্ষাৎ ঘটতেই দেখা গেল, সরু অর্থপূর্ণ হাসি। মহিলা পাকা সমীকরণ করল, লেখাপড়া জানা বয়স্ক লোকটা কেমন জাল নোট ম্যানেজ করল। এবং তার দৃঢ়বিশ্বাস, ৫০০ টাকাটি জেনুইন নয়। তুমি ন্যাকা ভালো করেই জানো, কেবল ছোকরাটাকে ডেকে অভিনয় করলে। হুঁ হুঁ। বাপু! আমরা মার্কেট চরে খাই, মানুষের ভাঁজ বুঝি। সিনিয়র সিটিজেন মানেই বিকৃত, ধান্দাবাজ। এদের কামের দাবিতে বমি আসে। তবু কর্পোরেট ভাবনা মানুষকে গতি দান করে। ডায়নামিক্ বানায়। কোনো ভানের জন্ম দেয় না। মরালিটির নামে ঐতিহ্যের নামে এরা ভান করে। তাড়াহুড়োয় স্লিপ, ফিরতি টাকা পকেটে দলা পাকিয়ে, হ্যাঁচকা টানে থলিটা তুলে নিলেন কুলদাপ্রসাদ।

ঘরে ফিরেই, জরুরি ও টপ্ প্রায়োরিটির গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'নোটটা কি তোমার মাইনের বাণ্ডিলে ছিল?'

কাঞ্চন তেমন গা করল না। খেয়ো দাঁত খুঁটছিল। 'থলিটা রাখো রান্নাঘরে।'

কুলদাপ্রসাদ রান্নাঘর থেকে ফিরে, কপালের ঘাম মুছে, ফের বললেন, 'নোট-টা কি ব্যাংক থেকে এনেছিলে?' কাঞ্চন দাঁতখোঁটার মুদ্রাতেই 'কী—জানি।' বলে ভরা পেটে তুললে ঢেকুর।

ইলিশের গন্ধ। মাছটায় তেল ছিল পর্যাপ্ত। আড়াই শো করে নিয়েছে। পরিচিত মাছওয়ালা, কখনো ঠকায় না কাঞ্চনকে। আজ স্কুলফেরত বাজারে ঢুকতে, মোটা পরেশ গছিয়েছিল। লোকটা ঠকায় না, একটু বেশি দাম নেয় যদিও।

'কেন? এত ফিরিস্তি করছ কেন?' কাঞ্চন এখন আরামে পান খিলি করবে। কুচনো সুপুরি, চুণ, চমনবাহার, একশো বিশ জর্দা। পাউচ্‌টাই ভারি সুন্দর সুবাসের। 'বিষ। বিষ গিলছ মুঠো মুঠো।' কুলদাপ্রসাদের সতর্কবাণী, কাঞ্চনের উদ্দেশে; বউ তা উড়িয়ে দেয়।

'ঠিক আছে। আমি বুঝব তা।'

'নিজে মরবে, আমাকে মারবে... নতুন ৫০০ টাকার একটা নোট দাও।'

'মলে তো বেঁচে যাও তুমি।' কাঞ্চন বলে, 'ভাবো বুঝি না কিছু?'

কুলদাপ্রসাদের রক্তচাপ চড়ে। কাঞ্চন বলে, 'তা নোট দিয়ে কী করবে?'

'শ্রাদ্ধে লাগাব।'

কাঞ্চন থমথমে মুখে, আলমারি খুলে একটা ৫০০ টাকা ছুঁড়ে দিল।

'তোমার মাইনের থেকে তো?'

'জানি না।...মাইনে না তো, অন্যভাবে কামাই?'

কুলদা হাসলেন। কাঞ্চন মেজাজ কমিয়ে বলে, 'উড়ে যাচ্ছে। ধরো।...হ্যাঁ, ব্যাংক থেকে আনা।'

'আগেরটা?'

'মনে হচ্ছে বাজারে পরেশ দিয়েছিল...মাছ কিনে হাজার টাকার নোটটা ভাঙালাম তো?'

'হাজার টাকা নাও কেন ব্যাংক থেকে।...গছালেও নেবে না।' বিরক্তির রেশ কুলদাপ্রসাদের কণ্ঠে।

'বড্ড বেশি বকছ...নেই কি এমনি-এমনি?' গালে পান ঠুসতে ঠুসতে কাঞ্চন জানলার দিকে তাকায়। বাইরে ডুগডুগি বাজিয়ে টুটা-ভাঙা লোহা কিনবার লোকটা চলেছে কাঠের ভ্যান টেনে। গেরস্তর সেকেন্ডহ্যান্ড এখন কিছুই বাতিল হয় না। অথচ বাতিল হওয়াটাই তো সেকেন্ডহ্যান্ড। রি-সাইকেল হয়। যত্ন করা যায়। বিক্ষোভ থেকে দ্রোহ, রুচি-ইচ্ছা-সাধ থেকে সব কিছুই নাকি রি-সাইকেল হয়। কুলদাপ্রসাদ ডুগডুগি শুনে, লোহা কেনার ডাক শুনে, ভাবলেন এ-সব। ডুগডুগি দিশি বাদ্য। মহাদেব, শিব, বাণেশ্বর, মহেশ্বর, ভোলানাথ— ডুগডুগি বাজান সব্বাই।

কাঞ্চন ঠাস-ঠাস শব্দে জানলা দিতে দিতে ভাবে রথের দিনটা নিষ্ফলা যেতে পারে না। ছিটেফোঁটা ঝরবেই। চনমনে, নীলচে আকাশে ঝিঁঝির ডাকের মতো রোদ্দুরের গভীরে গুরু গুরু ডাক শোনা গেল; কোথাও সাদা সাদা মেঘের আড়ালে, পশ্চিমকোণটা বোধহয়, জলগর্ভের কালচে বর্ণ ধরেছে, ডাকছে মাঝে মাঝে। এক আধ পশলা হবেই। ঠাকুরের অমোঘ নিয়ম। এ-বিশ্বাসেই সে বিছানায় পাটি বিছিয়ে বিশ্রামে চলে গেল।

ফের এল কে ট্রেডার্সে ধীঁ ধীঁ হেঁটে আসতে নরেশ অবাক।

'আগের নোট-টা আছে, নরেশ?...আলাদা রাখা?' কুলদাপ্রসাদ স্থির চোখে চাইলেন।

'আলাদা? ড্রয়ারে কি আলাদা থাকে?...এত টাকা রাখছি, কেন বলুন তো?' নরেশ বানিয়ে বলে।

'দেখো না দয়া করে,...খুঁজে পাও কিনা?'

নরেশ ড্রয়ার টানার ভান করে, কুলদাপ্রসাদ দেখলেন, টুক করে বিচ্ছিন্ন করা ৫০০ টাকার নোটটি ভাঁজ অবস্থায় তুলে এনে বলে, 'এটা? আন্দাজে দিচ্ছি। দেখুন তো।'

'তোমার আন্দাজ যন্ত্রকেও হার মানায়...ঠিকই বেছে নিয়েছো।' সূক্ষ্ম খোঁচা দিলেন নরেশকে।

'কি, জা-ল নাকি? নিতাইয়ের সরল, কূটনীতিহীন খোলামেলা জিজ্ঞাসায়, কুলদাপ্রসাদ হাসির ভঙ্গিতে, 'জাল হচ্ছি গিয়ে আমরা।...মানুষ।...কথার ফুলঝুরি আর বিজ্ঞাপনের ঠ্যালায় দেশের মানুষের পকেট কাটি যারা।'

বেঞ্চের কোণের সচেতন মহিলাটি দ্রুত ব্যাগ থেকে ব্যক্তিগত বোতলটির জল গলায় ঢাললন।

উত্তট গরমে দেহের জল শুকিয়ে যাচ্ছে ঘন ঘন। কুলদাপ্রসাদের জ্বালা যেন সামান্য

শমিত হন। নরেশকে বললেন, 'সামান্য ব্যাপার।...নোটটি ব্যাংক থেকে চেক্ করানো...এইসব চারশো বিশদের একটু কড়কানো দরকার...জালনোট ধরার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে থাকে...চারপাশে সবই প্রাইভেটে গজিয়ে উঠলে তো রাষ্ট্রের বিপদ।'

নরেশ হেসে হেসে 'একা প্রতিবাদ জানিয়ে আপনি কী করবেন।...চলতে দিন।' বলেই, নিতাইকে শোনাল, 'কিছুই খেয়াল রাখো না?...বোর্নভিটা ২০০ গ্রামের যে স্টক ফুরিয়েছে, মনে করবে না?' ফিরেযাওয়া খদ্দেরটি সামান্য হেসে চলে গেল। বোর্নভিটা একধরনের স্বাস্থ্যোদ্ধারের পানীয়। ক্যাডবারি দিয়ে নাকি তৈরি। নিট্ ২০০ গ্রাম। তা ভেতরের আসলটুকু নাকি আধার, ঢাকনি, লেবেলের কাগজ—সব কিছু মিলে, বলা মুস্কিল। সারা জগৎ জুড়ে এদের ব্যবসা। এই রাষ্ট্র, বড় বড় শহরে—এদের বাজার, তবে এই-রাষ্ট্রের I.S.I মোহর বা খাঁটির ছাপটির ছাড়পত্র দরকারে লাগে না।

পরদিন নোটটি নিয়ে কুলদাপ্রসাদ প্রথমে মাছের বাজারে, বাতাসে যেখানে আঁশটে গন্ধ, ওটাই নিয়ম যেহেতু, কাঞ্চনের কথামতো মোটা পরেশকে জিজ্ঞেস করতেই ধূর্তের হাসিতে, 'হ স্যার। দিদিমণি আইছিলো...না, না, তারে আমি ৫০০ টাকার নোট ক্যান দিমু!'

'হাজার টাকার নোটটা ভাঙিয়ে দিয়েছিলে?'

'হ, হ দিছি স্যার।...মনে পড়ছে...কিন্তু দিদিমণিরে সব ১০০ টাকা দিছি।...পাল্লা ছুঁইয়া বলি।'

'এ-নোটটা দাওনি? ভেবে বলো?'

'দেখি।' পরেশ খানিক উল্টেপাল্টে, আশঙ্কার আঁচ পেয়ে, হেসে, মাথা নাড়িয়ে ফের দিব্যি কাটল। সে গছায়নি। 'ক্যান স্যার? এইটা অচল?' বলতেই চারপাশের চোখগুলো হামলে পড়ে। যেন জীবনে অচল নোট নামক চাক্ষুষ অনুভূতি প্রথম হচ্ছে। নিষিদ্ধ কোনো ফলের মতো। বা বিস্ফোরণের আগে ল্যান্ডমাইনের তারটি চোখে পড়ল, বা কোনো সমকামী যুগলকে—কর্তব্যরত অবস্থায় যারা ধরা পড়েছে হাতেনাতে, কৌতূহলের সারি সারি দর্শক। নোটটা তেমন পরিস্থিতিতে পড়বার আগে কুলদাপ্রসাদ পকেটে ঢুকিয়ে বেরিয়ে এলেন আঁশটে গন্ধ থেকে।

অভ্যস্ত এবং মাসিক লেনদেনের পরিচিত ব্যাংকটির বাড়িটিতে ঢুকে, কাউন্টারে মুখটা ঠেসে বললেন, 'চ-ন্দ-ন!' ছেলেটি হাসিহাসি, পেশাদারি ভদ্রতায় 'বলুন স্যার' বলতেই, 'শুনবে একটু!'

কুলদাপ্রসাদ মার্জিত গলায় এমনভাবে বললেন, যেন দেয়ালেসাঁটা 'নীরবতা রক্ষা করুন' বিজ্ঞাপনটিকে যথাযথ মান্যতা দিচ্ছেন। এ-কাউন্টার থেকে গতমাসে পেনশনের টাকা যখন তুলেছিলেন, একজন মোটা মহিলা টাকা গুণে দিয়েছিল। স্টাফরা তাকে শ্রীদেবী বলে ডাকে। ভারি অদ্ভুত স্বভাবের, কখনো ভাব দেখান গায়ে পড়তে চায়, দুষ্টু হাসে, চোখ নাচায় কখনো বা, আবার মাঝেমধ্যে এমন কঠিন ব্যবহার করে যেন পেনশনারগুলো বিশেষ খতুর পশুর মতো খোপটুকু দিয়ে স্রেফ তাকিয়েই তার শালীনতা নষ্ট করবে।

'হ্যাঁ, বলুন স্যার।' চন্দন তাড়া দেয়।

'কাল আমার মিসেস' বলেই তিনি ৫০০ টাকার নোটটি এগিয়ে বলেন, 'পেমেন্ট নিয়েছিল। এ-কাউন্টার থেকে দেয়া হয়েছে।'

'কাল এখানে ডিউটি ছিল না আমার।...তো, নোটটার কী হয়েছে?'

'চেক করে দাও তো।...ডাউট্‌ হচ্ছে।'

চন্দন কাউন্টারের তলায় আলোতে, হাতে-যত্নে অনেকক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার নীরবতার একটি সিদ্ধান্তের পর গম্ভীর ভ্যাটকা মেরে রইল। আস্তে উঠে, জালঘেরা দরজাটায় তালা লাগিয়ে, ভেতর দিয়ে গুটি গুটি এসে, কুলদাপ্রসাদকে সামান্য নিরিবিলি সরিয়ে এনে, চোখে চোখ রেখে খুব আস্তে 'নোটটি কোথায় পেলেন স্যার?' বলতে, 'তোমাদের ব্যাংক থেকে' উত্তর এল। চন্দন মাথা গরম করে না। বলে, 'শুনুন স্যার, অন্য কেউ হলে পুলিশকে খবর দিতাম।...এটি জাল...আমাদের ব্যাংক দিতে পারে না।'

'নিজে তো ছাপিনি...আর জাল তো ব্যাংক থেকেও বেরোচ্ছে ইদানীং।'

'মানলাম।...সেজন্যই চেকিং মেশিন বসিয়েছে ওপরওয়ালারা...ধরা পড়লেই বদলে দিচ্ছি...আপনি এটি নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন।...আমিই ডেস্ট্রয় করতাম। আপনার সম্মান আছে, নিজেই পারবেন।'

পরিচিত চন্দন সম্মান দেখানোর মধ্যে কথাগুলোর পিঠে এমন কেমিক্যাল মাখিয়ে দিল, ভেতর জ্বলছে কুলদাপ্রসাদের। আসল কথা, তার মতো কৃপণ ৫০০ টাকা ডেস্ট্রয় হবার শঙ্কায় ধাক্কা খেলেন। পাঁচশো সংখ্যাটি দশ-বিশ নয়। আহাম্মকি হয়েছিল গতকাল, সামান্য আবেগের জন্য। নইলে নীরব সার্কুলেশনে কত মানুষ, কত প্রতিষ্ঠান, কত ব্যবসায় চালান হয়ে যেত নোটটা। অনাবৃষ্টির দুপুরে খোলের চাঁটি শোনেননি, অদ্ভুত দুপুরটিতে এক আলোময় রোদ ছিল বলে। নয়তো নরেশের ড্রয়ার ধরে মসৃণভাবে ব্যক্তি-হোলসেল-প্রতিষ্ঠান, ফ্লাইওভার, হুন্ডা, ভেপার বাতি, মল্ট-প্লাজা—টাকাটা রাষ্ট্রের উন্নয়ন-রক্তে প্রোটিন হয়ে যেত।

কাঞ্চন ব্যাপারটা বিস্মরিত হয়েছে সাময়িক। হঠাৎ মনে পড়লে হয়তো নোটের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবে। সে এখন স্বামীর খুঁটিনাটি সব কৌতূহলে তেমন মাথা ঘামায় না। তাই কুলদাপ্রসাদ ঘরে ফিরে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে, পথে শ্যেনদৃষ্টির খোঁজে, বিশেষত দুপুর-টুপুর, সবুজ চুল ও বেলুন টাঙানো কাঠের ভ্যানটার তক্কে তক্কে রইলেন।

দিন ছয় পর, মিলেও গেল। ছোকরাটার পোশাক ওইরকমই আকর্ষণীয়। উনি রাস্তায় আর কথাটা পাড়লেন না। নিঃশব্দ ইশারায় ডেকে নিয়ে এলেন গলি ধরে, নিজের বাড়িতে, ফোরেন লাইটার কিনবেন হাফ-ডজন, লোভ দেখিয়ে।

'এই নোটটা দেখ্‌ তো!'

ছেলেটি সেদিনের ভঙ্গিতে দেখেটেখে, একই ভাষায় সন্দেহ প্রকাশ করল, একটি সংকেতময় ৫০০ সংখ্যাটি নাকি লেখা থাকছে না, যা খাঁটি হওয়ার গোপন নিয়ম।

'চলবে না?' কুলদা বলতেই ছেলেটি রহস্যে হাসে, 'বি-ল-কু-ল চলবে।'

'নিবি তুই?'

'হাঁ। ৪৫০ টাকায় কিনব...বাটা ৫০ টাকা।'

কৃপণ কুলদাপ্রসাদ যেন জল থেকে উঠে সামান্য বায়ু পেলেন। ৫০ টাকার ক্ষতি তবু পুষিয়ে নেবেন। তিনি চারটি ১০০ টাকা এবং একটি ৫০ নিয়ে বললেন, 'এগুলো ঠিক আছে তো?'

'হাঁ সাব।...জালি তো পাঁচশ, হাজার...ই জাল করে পোষাবে?'

ছেলেটি বেলুন উড়িয়ে সবুজ চুলে ফের ভ্যান টেনে চলে গেল, যন্ত্রে ঘুঘু ডাকল যেন 'ফো-রে-ন লাই-টার।'

এখন কুলদাপ্রসাদের কাছে বিকল্প রাস্তাটি সহজ ও স্বস্তির। পরস্পর মেনে নেওয়া কোনো ছুৎমার্গিতা নয়। একটা সর্বংসহ মার্কেট। ভুটানি-ডলার-কালো সাদা-সচল অচল কোনো কিছুই কাউকে বাতিল করবে না। মসৃণভাবে ব্যক্তি-হোলসেল-প্রতিষ্ঠান-ফ্লাইওভার-হন্ডা-ভেপার বাতি-ছোট গাড়ি-মল্ট-পাপ, ছেলেটার হাত ধরে টাকাটা রাষ্ট্রের উন্নয়ন-রক্তে প্রোটিন হয়ে যাবে।

আজ বিকেলে রাস্তায় কাঁসর ঘণ্টায় উল্টোরথের ছোট ছোট দেবতা ছেলেমেয়েদের হাতে। বাতাসা ছুঁইয়ে পয়সা আদায় একটি মজার খেলা। বৃষ্টি আজও হল না।

মূর্তি

রত্নেশ্বর হাজরা

মধ্যপউষ কুয়াশাময় যখন
কালপুরুষের মধ্যগমনকাল
তোমার মাথার ঠিক উপরে
শিশির ঝরে
   শিশির ঝরে
         শিশির ঝরে পড়ে—
বর্ষাকালে বৃষ্টি ধারাপাতে
তখনও তুমি দাঁড়িয়ে থাক অনড়
   সন্ধ্যাতারা শুকতারা হয় প্রাতে—
কিন্তু তুমি সেই প্রহরী মৃত্যুকে যে দান করেছ জীবন।
এখন তুমি পাথর হয়ে আছ
         তোমার ঘরে আজকে অরন্ধন—

পাথর তোমার মুঠোর তলোয়ার—
কে যেন কাল ছড়িয়ে গেছে ফুল
         ছড়িয়ে গেছে রক্তাভ চন্দন—
তুমি পাথর—পাথর হয়েই আছ
         তোমার ঘরে নিত্য অরন্ধন।

তবুও জানবে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

চারপাশে আজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছি, তবুও জানবে
আমাদের দিন আসছে,
খুব দূরে নয়। ভিতরটা যেনো জ্বলছে,
গভীর গোপন ইচ্ছেটা মাথা তুলছে,
আমাদের নেই বিশেষ কিছুই হারাবার।

পথ খুঁজে আর পাই না, কেবলই এ পথ সে পথ
ঢুঁড়ছি;
কানাগলি থেকে রাজপথ, বাকি রাখিনি;
কোথাও কি আছে পায়ের তলার মাটি কি?
দেবে তা সন্ধান?
আমাদেরই হবে খুঁজতে।

সংকট আর সন্ত্রাস আজ দুনিয়া করেছে কব্জা:
ভোর হয় আজ পাখির ডাকেই, তারপর
কে কোথায় মরে, কিভাবে জীবন
কার ডাকে জোর ছুটছে,
কোনখানে গেলে সামান্য পাবে স্বস্তি—
কেউই জানে না। শুধু হোঁচট
ছুটে মরার চেষ্টা প্রাণপণ;
প্রাপ্তির ঘর শূন্য।

সফল মানুষ জানে পৃথিবীর সাফল্য কোন্ দরজায়।
ঘা মেরে দরজা খোলার মন্ত্রে দীক্ষা
নিয়েছে সফল মানুষেরই কাছে; তারপর
উঠে বসে শুধু হুকুম হাজারো—
সব সম্পদ তার চাই
না হলে লঙ্কাকাণ্ড।

আমাদের আছে শরীরের তাজা সপ্রাণ মৃৎভাণ্ড,
তাই নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে প্রবল ইচ্ছা।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছি, তবুও জানবে
আমাদের দিন আসছে।
সবার সঙ্গে ভাগ করে নেবো ইচ্ছে এবং স্বপ্ন,
এক মহাদেশ গড়তে।

কবি

পার্থ রাহা

জানি, তোমার মায়ের মৃত্যুর পাশে দাঁড় করিয়েছি তোমাকে
জানি, এখন রক্তের মধ্যে অনেক বিষাক্ত বাতাস বাসা বেঁধে আছে
তোমার জন্মদিনে রাত্রি নামে অন্ধ বাদামি
চারপাশের বন্ধুরা এখন শীর্ণ থেকে শীর্ণতর
রোদে ঝলসে ওঠে পায়ের ছাপ
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলির শেষে রাত্রি নামে
ঝড়জলের অন্ধকারময় রাত্রি
মধ্যরাতের কালো রং-এর মতো রাত্রি

তবু তুমি কবি, জ্যামুক্ত তীরের মতো অন্ধকার ছিঁড়ে
জলের গভীরে রূপোলি মাছের আলো
কাঁধে বয়ে আনার দায়
তোমার
সব জেনেশুনেই ঘৃণা আর ভালবাসার ভার বহন করো কবি।

সে যেন আমার থাকে

নন্দদুলাল আচার্য

অনেকেই আত্মহারা,
সে ছিল চমৎকারা।
চোখে চোখ রাখলে, কথা
বলে তার চোখের তারা।

রাত্রে ঘুম আসে না,
বৃষ্টির স্বপ্ন দ্যাখে।
পিঠে তার গজায় ডানা,
ব্যস্ত পাড়ার লোকে।

কাজলি মেঘের ঘরে,
জমিয়ে জলসা করে।

উন্মাদ শ্রাবণ মাসে—
সে যদি আর না ঝরে?

ঝরো রে অঝোর ধারায়,
ভিজিয়ে যাকে তাকে।
যেখানেই রাঁধুক বাড়ুক,
সে যেন আমার থাকে।

শর্ত মনে রেখো

মৃণাল বসুচৌধুরী

যখনই বুকের মধ্যে নৌকাডুবি
অবিশ্বাসী ঝড়
অশ্রুজলে খেয়া পারাপার
যখনই অস্তিত্ব জুড়ে অনৈতিক ছায়া
রক্তপাত
ভিন্নতর আনন্দ উল্লাস
যখনই চোখের সামনে বন্ধ দরোজায়
জমে ওঠে ধুলোমাখা চিঠি
জ্যোৎস্নায় পড়ে থাকে
পাখির পালক
তখনই কোথায় যেন বেজে ওঠে
অস্পষ্ট নূপুর

এসো
শুধু কিছু শর্ত মনে রেখো
শরণ ভিক্ষার আগে
পর্দা ঢাকা মুখ নয়
দেখে নেবো
অলৌকিক চোখের সুষমা
জেনে নেবো
অবিনাশী আত্মার স্বরূপ

দেওয়াল লিখন

উৎপলকুমার গুপ্ত

সারাক্ষণ বিড়বিড় করে মেয়েটি, 'লে না শরীর, লে—তার আগে বল্
কাল পয়সা না দিয়ে পালিয়ে গেলি কেনে?'...
অর্ধনগ্ন, এলোমেলো চুল, কালিঝুলি মাখা শরীর
কোথায় যে হেঁটে যাচ্ছে, জানে না সে;
রাস্তার লোক দেখেও দেখছে না, দেখছে না কীভাবে সময়
ধারালো দাঁতে ছিঁড়ে ফেলছে তাকে
যেন তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস না করে শান্তি নেই তার।

বিড় বিড় করে যাচ্ছে মেয়েটি আর চারদিকে ঘুরে ঘুরে
থুথু ছিটাচ্ছে—
বলছে, এই থুথুটা তোর,...এই থথুটা ওর...এই থুথুটা—
বলতে বলতে এক পাক ঘুরে নিচ্ছে—
কখনও লজ্জার মাথা খেয়ে কত কী করে যাচ্ছে
আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার থুথু
যেখানে যেখানে পড়ার, ঠিকই পড়ছে...।

সে যদি দেয়াল-লিখন পড়তে পারতো, তাহলে দেখতে পেতো
কোনও দাগই ফুটে উঠছে না...।

গরিবের বাড়িতেই

নীরদ রায়

আর কোথাও নয় গরিবের বাড়িতেই বড় হয়ে ওঠে আবেগ—
শেওলা ধরা নামে কেউ ডাকে তাকে সোনামণি
কেউ অন্য নামে লিখে রাখে তার পরিচয়,
যে নামেই ডাকুক সন্ধেবেলা আবেগ উঠোন জুড়ে একটা নাম হয়ে ওঠে,
গরিবের উঠোনে জ্যোৎস্নায় আলোও আসে ঘুরপথে
বৃষ্টির জল এক হাঁটু কাদা হয়ে জমে থাকে দু-একমাস
মাঝরাতে বিবস্ত্রতা দু-একবার করে ডেকে যায়—

কাশিনাথ, কাশিনাথ ভালো আছো—
ভাঙা উনুনের পাশে তখন ঠাণ্ডা হতে থাকে খিদে ও স্বপ্ন,
এগাঁয়ে ওগাঁয়ে আছে কোথাও দু-এক পাতার সুদিন
এই ভেবে একটুখানি ভালোবাসা ময়লা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকে জানালায়
গরিবের বাড়িতে তেমন কোনো গন্ধ থাকে না
শুধু দেওয়ালে আকাঙ্ক্ষার নামে থাকে দু-একটা সাদা কালো ছবি
কোনোমতে বেঁচে থাকার দু-পাশে শিমুল তুলো হয়ে
হাওয়ায় ভাসতে থাকে দু-একজনের লম্বা হাসি ও আশ্বাস
আর মাথার ওপর কুয়াশা চাদর, আকাশের হিম,
এর মধ্যেই গরিবের উঠোনে দু-একটা কালো ভাঁজ,
দু-একটা হাঁচি অভাব অনটনেও বড় হতে থাকে আবেগ।

স্বপ্নের ঘুম

পঙ্কজ সাহা

অদেখা অজানা হাতের স্পর্শে
মুদ্রা ভেঙে অন্য মুদ্রা,
দেশ—দেশের সীমান্ত মুছে
ছন্দ বাজছে হাতে হাতে,
সব পতাকা ঠোঁটে নিয়ে
পৃথিবী পরিক্রমা করছে
ঝাঁক ঝাঁক সাদা পায়রা

আমার এই স্বপ্নের ঘুম
যেন না-ভাঙে।

এলো সর্বনাশ

দীপা বিশ্বাস

সেদিন চৈত্রের মায়াবী বিকেলে
বেরিয়েছিল মেয়ে রঙিন অভিসারে
আহা যেন নেমে এসেছে দ্বাপরের রাই
মোড়ের জটলা—এখনই ওকে চাই
বাইক দাঁড়ানো পাশে প্রতীক্ষায় প্রেমিক
পক্ষীরাজের পিঠে রাজপুত্তুরটি ঠিক
হৃদয়ে বোল তোলে ডমরু ও মাদল
শেষটা দুজনে দিওয়ানা ও পাগল
সাক্ষীও ছিল চত্বরে, আগুনরঙা পলাশ
গোধূলিবেলায় চারটি চোখে নামল সর্বনাশ

মাটি তোমাকে রাখবে

দীপেন রায়

মারবে।
একজনই তাকে মারবে।
সে অপেক্ষা করে না।
মনে রাখে শুধু।

আমাদের মধ্যে আগুনই যা পবিত্র।
তাতে অন্ন বাড়ে।
মানুষই তাকে হাতে ধরে
পরম শ্রদ্ধায় নিয়োজিত রেখেছে।
মানুষই,
তাকে পার্বণে পুজোয় অর্ঘ তুলে দেয়।
আমাদের আর কিছু নেই।
মাতৃগর্ভ ছিল সকল অশুভের বাইরে
একমাত্র
একা থাকার।

আমাদের আর তেমন কিছু সঞ্চয়ও হয়নি।
উদাত্ত গলার ভিতর গমগম করে শুধু
পিতৃপুরুষের বসতবাড়ি।
বড়ো আনন্দের সঙ্গে আমরা আছি।
বড়ো ঢেউয়ের সাগর সাঁতরে আসছি আমরা।
জানতাম,
শেষ পর্যন্ত আমরাই থাকবো।
তারা বাঁধা আর তা খুলে নেওয়ার জন্যই তো
আমরা আছি।
ত্রিপলের শেষ বাঁধন আলগা করে দেব আমরাই।

না, আমরা তাকে কেউ মারব না।
সময়ই তাকে শেষ করে দেবে, তুমি দেখো।
যত চোখের জল বারিয়েছ তা আঁজলা করে
জমিয়ে না রেখে
মাটিকে ঢেলে দাও
মাটি তোমাকে রাখবে।

ত্রিশঙ্কু দুঃখেরা

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

এক দলা ভেজাল আফিং
কেউ খাইয়ে দিয়েছে সন্ধ্যারাতে
নেশা ধরে, কিন্তু তেমন মিষ্টি নয়
মেঘ ভেঙে হেঁড়া চাঁদ
কাঁচা পথে খক্‌কর খক্‌কর সাইকেল
মাঝে মাঝে জাহাজের ভোঁ
সত্তর মাইল দূরে সমুদ্রের জাদুডাক
খড়খড়ি তুলে জীবন দেখার বিভ্রম

বিষ রক্তে মিশে গেলে
স্বয়ং ধন্বন্তরিও হাল ছেড়ে দেয়

নেশা থাকলে সাম্রাজ্যের স্বাদু স্বপ্ন
এখন ত্রিশঙ্কু দুঃখ দেয়ালে আঁচড় কাটবে
ঘুম আর জাগরণ—মধ্যবর্তী কোনো ভূমি নেই
গাছপালার দীর্ঘ ছায়া জ্যোৎস্নার ভিতরে

নেশা যে ফিরিয়ে দেব
কোনো গ্রহীতাই নেই কাঁটাতারের ওপারে
প্রহরীরা পোশাক পালটে শুতে গেছে
এত দিন গেল, এই নির্লিপ্ততা
কখনো দেখিনি

নেশাকে ফিরিয়ে দিতে খুব কষ্ট হবে
কিন্তু সে কি ত্রিশঙ্কু দুঃখের থেকে বেশি!

নয়ানজুলির স্বপ্ন

শ্যামল সেন

একটুকরো ঘর উঠেছে নয়ানজুলির পাশে
কাদামাটি কচুরিপানা জলজঙ্গল ঠেলে
ডহর-স্বপ্ন ভাসে।

যাবে একদিন এইপথে যাবে সুজন পথিক
স্বচ্ছ জলের বুক কাঁপিয়ে ময়ূরপঙ্খী নাও
ধনধান্যে দিগ্‌বিদিক্।

দুইপারে ছেয়ে দিও খড়-বিচুলির চারচালা
খেতি-জিরেতির রসটানে দিও হলকর্ষণ দিন
পরাণসখা গাছপালা।

রাতদিন থাক ঝলসানো চাঁদ সূর্যের বন্দনা
লক্ষ্মীপাঁচালী ঠাকুমার ঝুলি তেরো পার্বণসুখে
সোনাঝুরি দিন গোনা।

সুজনপথিক ঘরে আইসো জোয়ার-ভাটার তালে
রূপার কুচি চাই না আমি মনটারে যেন পাই
আনচান-করা কালে।

ঘুম, কুহকের জাগরণ

প্রবীর ভৌমিক

বিজন প্রকাশ্যে এই ঘুমের ভিতরে
আজ জাগরণ।
আজ ফুলে-ফুলে, জ্যোৎস্নায়
পূর্ণিমার তীব্র আঁধারে—আজ জাগরণ।
বেঁচে ওঠো গানে-গানে
কানে কানে বলা আগুন ও রাত্রির
স্তব্ধ প্রণয়ে—বেঁচে ওঠো স্নানে।

ঘুম বড় প্রিয় তার, জাগরণও
সেই কথা জানে—
জানে ব্যথা ও যন্ত্রণার আনন্দর কথা।
বরষার মেঘ ও রাত্রির স্নিগ্ধ প্রণয়গাথা শেষে,
ঘুম বড় প্রিয় তার,
প্রিয় ঘুম, প্রিয় জাগরণ।

উন্মাদ দেখেছে নদী
অবিভক্ত হৃদয়ের পাশে, দেখেছে সে
নদী আর খরস্রোতা রাত্রির কাহিনী।
ঘুম, জাগরণ তোমরা
নিশীথের সাথে কথা বলো,
রাত্রির সাথে কথা বলো।
তারা জানে আলোড়ন, তারা জানে
কুহক ও তন্ত্র উপাচার।

সেতুবন্ধের গান

অনন্ত দাশ

মাথার মধ্যে চিন্তার শত জট
হৃদ্‌পিণ্ডে হাঁফায় যেন হাফর
চারপাশে ঝুরি নামিয়েছে এক বট
স্মৃতিগুলো সব জমতে জমতে পাথর

যেখানেই যাই শহর কিংবা গ্রামে
সন্ত্রাস যেন পায়ে পায়ে ঘুরে যায়
কোথায় রয়েছে কোন সে হন্তনামে
তরতাজা প্রাণ মৃত্যুর সীমানায়

অমোঘ শান্তি নেই আজ পৃথিবীতে
বারবার ভাঙে বোধিসত্ত্বের ধ্যান
শুনতে পাবো কি আগামী শরতে-শীতে
উজ্জীবনে সেতুবন্ধের গান।

পৃথিবী দুঃখে হয়ে আছে পরিপূর্ণ
সদাচার প্রেম ভরাবে কি সেই শূন্য

নতুন সফর ২৩

ব্রত চক্রবর্তী

এ ওর উর্দি কাড়ার চেষ্টা করছে,
সে তার পাগড়ি।
সে বলল। যে বলল সে আমি নয়।
এর ধাক্কায় ওর কুর্সি চিৎ,
এর ঘুড়ি ওর লাটাই সুতো না ছাড়লে
ঘুড়ি নেই। সে বলল।
যে বলল সে আমি নয়।
কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না,

যে যাকে যেখানে দেখে নেবে বলেছে,
সে সেখানে তার জন্য রাস্তা তৈরি করে বসে থাকে।
হা-পিত্যেশ। দেখে নেবে। সে বলল।
যে বলল সে আমি নয়।
সরিয়ে দাও, নাও, যে যেখানে যতভাবে আছে,
তাকে ততখান থেকে ততভাবে সরিয়ে দাও।
সরিয়ে নাও। এখন এইসব। চলছে। সে বলল।
সে বলল ভালবাসতে গিয়েও না পেলে এখন
নৌকা উলটে দেয় এ ওর।
বৈঠা তুলে মারে। না পারে। যে যেখানে।
সে বলল। যে বলল সে আমি নয়।

অন্য আরেক ব্রতলগ্নের সূচনা

শুভ বসু

দিনান্ত বেলার এই দূরে বয়ে যাওয়া সময়ের স্রোত
দেখতে দেখতে সেই মুখগুলি মনে পড়ে আর হাহাকাররাজী
বুকের গভীরে যে তুফান তোলে, তাকে সান্ত্বনা দেবে যে এমন সুজন কোথায়

এই জিজ্ঞাসা শেষে কি কেবল আর্তি হয়েই থাকবে, সময়?
আর্তি—যা শুধু বুঝিয়ে বলবে, তোর হাতে নেই ভুবনের ভার
নিতান্ত তুই অভাজন, তোর শক্তি ছাড়াই জীবনযজ্ঞ উৎসবে মেতে উঠবে।

এই হীনতার বোধ নিয়ে শেষে জীবনের এই সন্তাপহীন, সংকটহীন মুহূর্তটিতে
তবু সৃষ্টির দুরাশাটুকুকে বুকের খাঁচায় লালন করার এই যে মরিয়া
উদ্যম তা কি শেষ অবধি সেই এলিজাবেথীয় নাটকের ভাঁড় প্রমাণিত হবে?

অথচ আমরা জীবনভরেই শুধু খুঁজে গেছি কোথায় পলাশ রক্তকরবী রঙ্গন
জীবনকে গাঢ় মহিমা রঙিন করার প্রয়াসে সময়সরণী জুড়ে
শুধু ইতিহাসনিষ্ঠ মিছিল পরম যত্নে রচনা করেছে এতকাল ধরে—

সেই প্রয়াসের তুচ্ছতা বোধই বিদায়লগ্ন সমাগত হলে
স্মৃতির শরীরে হাহাকার তুলে বলবে এবার, হায় রে মানুষ
ক্রান্তিকালের যোগ্য ভূমিকা নেবার স্পর্ধা রেখো না কখনো

অথচ শোণিত স্বভাবত উত্তপ্ত এবং স্পন্দনমান, অতএব
তার দায় মেনে জীবনযজ্ঞে আমাদের শ্রম
করে চলাটাই বিকল্পহীন, এই দিন সেই সত্যের সম্মানে
ঘুরে দাঁড়ানোর, রুখে দাঁড়ানোর ব্রত শুরু হোক তবে।

হাসপাতালে

গণেশ বসু

এমন কি রৌদ্র-মেঘ ঠিকঠাক কিছুই রাখে না।

সময় বাঘের পিঠে, অনুভূতি অন্ধকূপ, যান্ত্রিক নিয়ম।
জরুরি বিভাগে পিতা উপেক্ষায় পড়ে থাকে। আর্তনাদ ধাক্কা খায় সিলিংয়ে দেয়ালে।
ব্যস্ততার ভঙ্গি তবু ছায়াগুলি কখনো কখনো হাসি-ঠাট্টায় নিবিড়।

নিরুপায় সন্তানেরা। ছোটাছুটি মাথা কোটে। সেবা কিনে নিতে
সাধ্যে-সাধ্যে মিল নেই। মর্গের ভিতর
একে একে লাশগুলি জেগে ওঠে, ভুলের মাশুল, কেউ কেউ
মানবিকতার নামে মানুষেরই অবহেলা, অন্ধকার জমাট রক্তের।

কীভাবে চিৎকার করি? ঘুরে ফিরে সব ধ্বনি বিসর্জনে বাজে।

ওঠা-বসা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশটাকে সামিয়ানার মতো
যেমন খুশি ব্যবহার করে
আবার ভাঁজ করে তুলে রাখি ঘরে,
গ্রহ-তারা-নক্ষত্র সব কাপড়ে ঢাকা পড়ে।
কাল মেয়ের বিয়ে, সামিয়ানা টাঙাব
পরশু ছেলের বিয়ে, ভাড়া দেব আকাশ
এ-খেলার একটাই নাম : ব্যবসা, একচেটিয়া ব্যবসা
আকাশ নিয়েই যত কথাবার্তা, ওঠা-বসা।
তারপর জবর দখল,
চুরি হয়ে গেল বৃষ্টিও, মেঘ-ভাঙা জল।

ছন্দভুলে

অনির্বাণ দত্ত

ছোঁয়নি বলে সে মেয়েটি, ফিরিয়েছিলাম ভালোবাসা;
সেদিন থেকেই হারিয়ে গেল গন্ধেভাসা স্বপ্নবাগান...।
স্বর্গ-জুড়ে নিঃস্ব খনি, রত্নমণি আর ওঠে না
বর্ষালাগা গন্ধরাজের গোপন ভাঁজে, তারই শাপে।

যে-মেয়েটি হারিয়েছিল কপাট টেনে চোখের পাতায়—
চক্ষু থেকে এখন তাকে বসাই মাথায়, সিংহাসনে;
লক্ষ্মীঝাঁপি উজাড় করে তাকে নিয়েই কাব্য ভাবি...
জাগে না সে শূন্য নদী বন্যাথোরার কূল ঝাঁপিয়ে।

আজকে কত রঙ্গময়ী সঙ্গিনী সব আমায় ঘিরে,
বৈষ্ণবী বা তন্ত্রচারী—কারও মুখে তাকাই না তো;
আমার শুধু মাছির শরীর, ছুঁতে-ছুঁতে অন্ধকারে...
ফেরে যদি তারই আলো, কোনোদিনও—ছন্দভুলে।

প্রিয় বর্ণমালা

জিয়াদ আলী

সমস্ত মুখের প্রচ্ছদে শোভিত হোক মাতৃভূমির মাটি
পাহাড় নদী আর অরণ্যের ছায়ামাখা বিকেল,
রাস্তায় দুপাশ জুড়ে আলোয় ঝলমল করুক মানুষেরই প্রিয় বর্ণমালা।
বিদ্যাসাগর মশাই হই হই করে ছুটে আসুন কারমাটারের সাঁওতালদের নিয়ে
ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে এক মহাভোজের আয়োজন হোক
বামুন চাঁড়াল খ্রিস্টান মুসলমান একসঙ্গে খেতে বসুক লাউচিংড়ি আর
মোচার ঘনটো।
দক্ষিণেশ্বরের চাতালে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠুন—শালা,
ওইসব ওং বং ক্যাচ ক্যাচ রাখ, ওসব কে বোঝে রে,
মা যেমন করে কথা বলে তেমনই করে লোকের কাছে মন উজাড় করে দে
দেখবি সব পাপ ধুয়ে যাবে,
আর তখনই হো হো করে হেসে উঠবেন সিমলের নরেন।
সমস্ত না খেতে পাওয়া শিশু একসঙ্গে হাততালি দিয়ে বলে উঠবে
চল নদীর কাছে যাই প্রবাহিত ভালবাসায়
শুনে আসি ভাটিয়ালি আউল বাউল জারি সারি ভাওয়াইয়া,
চল পাহাড়ের কাছে
পাথরের দেওয়াল খুদে খুদে মাতৃভূমির প্রিয় বর্ণমালা আঁকতে আঁকতে
আমরা সকলে একসঙ্গে পাহাড়ের মতো বড় হয়ে উঠি।

মহাসত্য

রাণা চট্টোপাধ্যায়

কিছুই নির্ণয় হয়নি সবটাই দুর্বোধ্য আর প্রহেলিকাময়।
খাচ্ছি, দাঁচ্ছি, ঘুমোচ্ছি ছান্দোগ্য উপনিষদের কাল থেকে,
কিছুই জানা হয়নি মানুষের।
ট্রেন যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে, বিমান এমনকি রকেট
আনন্দ আর নিরানন্দ পাশাপাশি
নিরবয়ব জগৎ, শ্বাস নিচ্ছি, দুই হাতে কতোটুকু ধরে?
তবু অফুরান চাহিদা, মই বদলাচ্ছে সুবিধাভোগীরা

ছেলে চাষা কখনও খরা বা বন্যায় সব খোয়াচ্ছে,
জমিজমা সব চলে যাচ্ছে বিশ্বায়নের ফাঁদে,
শ্রমিকের দল কারখানার বন্ধ গেটে স্বপ্ন ভাঙছে
পাথর ভাঙার মতো, তখনই সালেমের মুখ চাঁদের মতো
টিভির স্ক্রীনে।

মানুষ কিছুই বুঝতে পেরেছে এতদিনে?
অ্যাকোরিয়ামের ভেতর নিরাপদ লাল মাছ যেন
শৌখিন বিপ্লবীবাবুর মতো মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিয়ে
ঢুকে যাচ্ছে শীততাপনিয়ন্ত্রিত মটোরে
সে-সময় বন্যায় সব খুইয়ে পাঁচু রুইদাস
আর মনিরুল ইসলাম
সত্য খুঁজছে বাঁধের ওপর।

আসলে মানুষের সত্তর ভাগ এইরকম
কাচের গাড়ির ভেতর শবদেহের মতো নির্বিকার।
যে গোছানো সে গুছিয়ে নিচ্ছে
নিদেনপক্ষে অ্যাকোরিয়ামের ভেতর কার লাল মাছ
নিরাপদ আশ্রয়ে—
নিজের মুখে সজোরে লাথি মেরে বেরিয়ে যাব
যেদিকে দুচোখ যায় তাও পারি না।

শিকলে শিকলে বাজা গানে

সুশান্ত বসু

তোমার সিস্‌মোগ্রাফে কি ধরা পড়ছে কাঁপন?
এই জরতী পৃথিবীর? এই জরাসন্ধ বাঁচার?
আস্তিলার রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাওয়া
স্বপ্নের ভাঙা টুকরোগুলো নিয়ে বানিয়ে তোলা
অলীক বাঁচার উপরে ওড়া ছেঁড়া পতাকার দিকে
ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে নিরন্ন শিশুরা।

আমাদের বাচাল বাক্‌বিভূতির দিকে তাকিয়ে থাকে
ভুবনডাঙার বোবা মানুষদের কান্না।
ভব্য পোশাকের ভিতর থেকে হেঁকে ওঠে খড়ের মানুষ।

খেলা জমে আজীরপাট্টার
শিকলে শিকলে বাজা গানে।

শামসুর রাহমান-কে

অরুণাভ দাশগুপ্ত

ছুঁয়ে আছো
আমাদের আক্রান্ত বিবেক
অজর কবিতা আর অবিনাশী গানে।
যে রকম ছুঁয়ে থাকে
শান্ত ঝিরাফের পায়ে বনানীর উৎক্ষিপ্ত, সবুজ
জানালায় ঘনবাষ্প,
পায়ে পায়ে
বিষণ্ণ স্মৃতির চেয়ে দীর্ঘপথ—শহীদ মিনার।

তোমার আঙুলে ঝর্না, সে ঝর্নাধারায়
নব আনন্দে ফের জেগে উঠবে বর্ণমালা,
আমার দুঃখিনী বর্ণমালা—
দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে হোমারের স্বপ্নময় হাতে
যাকে শেষ স্পর্শ করেছিলে।

গাঙুরের ভেলা থেকে

রমা সিমলাই

গাঙুরের ভেলা থেকে শেষ চিঠি লিখেছিল
বেহুলা রূপসী
মৃত স্বামী ধূপকাঠি আর তার অবাক ঘুঙুর
বিনিদ্র দু'চোখে ভয় থমথমে রাত লিখেছিল
থৈ-থৈ বৈঠায় নিজের ছায়ার সাথে যুদ্ধ করে
ক্লান্ত হতে হতে কোনো ত্রিকালের পথে
বিমর্ষ আঙুল থেকে খুলে নিয়ে বিষণ্ণ আংটি
দেনা পরিশোধ ষোড়শীর অঙ্গীকার নষ্টচন্দ্রা তিথিমুখে
মৃদু উন্মাদনা ষড়যন্ত্র বিশ্বকর্মা গূঢ় আয়োজন
চাঁদ সদাগর আর পাথরের দেবতার পায়ে
প্রণামের মতো কিছু উষ্ণ অনুরাগ...

লিখেছিল বাসররাতের সেই ভয়াল নাগিনী
অর্ধেক সোহাগ আর আধা যন্ত্রণায়
কীভাবে মৃত্যুর রোদ নিরীহ বিষাদ
স্বর্গলোক প্রান্তসিঁড়ি এঁকে দিয়ে গ্যাছে
কীভাবে নির্লোভ রাতে কামুক দেবতা
স্বামীর শবের পাশে লালসার আলপনা এঁকে
বিব্রত করেছে তাকে মুদ্রাজয়ী নাচে

মৃতকল্প জীবনের আঙিনায় ফিরে
রক্তাক্ত পা আর স্বামীপুনর্জন্ম নিয়ে
রূপকথা
গাঙুরের ভেলা থেকে লিখেছিল
বেহুলা রূপসী

শহীদ ভগৎ সিং : জন্মশতবর্ষের তাৎপর্য

গৌতম নিয়োগী

সাধারণভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এবং বিশেষভাবে ঐ আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ধারায় ভগৎ সিং (১৯০৭-১৯৩১) যেমন এক অসামান্য উজ্জ্বল চরিত্র, তেমনি সশস্ত্র বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী হ'য়ে নিজস্ব অধ্যয়নের ফলে সমাজতন্ত্রে গভীর বিশ্বাস যাদের মধ্যে জন্মেছিল, তেমন মানুষজনের মধ্যেও তিনি পথিকৃৎ। গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে অনেক জাতীয় বিপ্লবী মার্ক্সবাদের প্রভাবে বামপন্থী তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। ভগৎ সিং ছিলেন এদেরই পূর্বসূরী। তাঁর জন্মশতবর্ষের প্রাক্-মুহূর্তে এই ব্যাপারটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রবাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯২০)। ভারতে সাম্যবাদের চর্চা অবশ্য আগেই শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের গোপন দলিলে আমরা দেখি যে, ভারত সরকার এই যোগাযোগে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আমেদ, এস ভি ঘাটে, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, কে এন যোগলেকার প্রমুখ আদি যুগের নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপে বামপন্থী আন্দোলনের যেমন গণভিত্তি প্রসারিত হয়, তেমনি তিরিশের দশকে বহু জাতীয় বিপ্লবী দলের সভ্যদের উপর মার্ক্সবাদের প্রভাব ও ফলত তাঁদের বামপন্থী সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে যোগদান বাম আন্দোলনকে আরও পুষ্ট করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার পেশোয়ার, কানপুর, মীরাট ইত্যাদি ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করেও এই আন্দোলন দমন করতে পারেনি। শহীদ ভগৎ সিং-এর মধ্যে আমরা দেখি সমাজতন্ত্রে গভীর বিশ্বাস, যদিও কমিউনিস্ট কর্মিবৃন্দের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোনও যোগ ছিল না। আমরা পরে দেখব যে, তাঁর প্রচেষ্টাতেই 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' দলের সঙ্গে 'সোশ্যালিস্ট' শব্দটি জুড়ে 'এইচ এস এর এ' রাখা হয়েছিল।

ভগৎ সিং ও তাঁর দলের তত্ত্ব যেমন বোঝা যায় আর এক বিপ্লবী ভগবতীচরণ ভোরা রচিত 'The Philosophy of the Bomb' পুস্তিকাটি পড়লে, তেমনি তাঁদের মার্ক্সবাদে বিশ্বাস বোঝা যায় ১৯২৫-এ প্রকাশিত একটি ইস্তেহার থেকে (সম্ভবত শচীন সান্যালের লেখা) যাতে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয় "মানুষকে শোষণ করতে পারে এমন সব ব্যবস্থার বিলোপ সাধন।" ভগৎ সিং-এর 'নওজোয়ান ভারতসভা' এজন্য জোর দিয়েছিল শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে যোগাযোগের উপরে। গণসংগঠনের উপরে। শিব বর্মা যে 'Selected Writings of Saheed Bhagat Sing' সম্পাদনা করেছেন তাতে ভগৎ সিং-এর রচনার বহু উদাহরণ রয়েছে। সমর্থন পাওয়া যাবে সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, মন্মথনাথ গুপ্ত প্রমুখের লেখায়। হিন্দিতে মনমোহন সিং ও চমনলাল এক চমৎকার বই লিখেছেন 'ভগৎ সিং আউর

উনকো সাথীয়ো কে দস্তাবেজ' নামে। সেটিও দেখা দরকার। মার্ক্সবাদের প্রভাবেই ধর্মীয় প্রেরণা ও আবেগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন ভগৎ সিং। নতুন দিল্লির জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত Home (Political) proceedings-এর একটি দলিল আমি দেখেছি (F. 130. Q. K. W, 1930) যাতে নওজোয়ান ভারতসভার নিয়মাবলী উদ্ধৃত, যা পড়লে ভগৎ সিং-এর উপর সাম্যবাদের প্রভাব স্পষ্ট হয়। শেষ জীবনে জেলখানায় বসে বসে তিনি যেসব লিখতেন, দিনলিপি সমেত তার প্রতিলিপি আছে নতুন দিল্লির নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে, সেখানে দেখা যায় শুধু মার্ক্স, এঙ্গেলস্ বা লেনিন নয়, আরও একজনের রচনার সঙ্গেও কিছু পরিচয় ছিল ভগৎ সিং-এর, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৃত্যুর আগের দিন রাতে বসে বসে লেনিনের 'The State and Revolution' পড়েছিলেন ভগৎ সিং, সে-কথা জানিয়েছেন দুই সোভিয়েট গবেষক চেলিশেভ ও লিটলম্যান।

ভগৎ সিং-এর পরিবারের মধ্যেই প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, বিপ্লবের ধারা প্রবাহিত। ভগৎ সিংএর ঠাকুর্দা অর্জুন সিং অবিভক্ত পাঞ্জাবের লায়ালপুরের মানুষ। দেশীয় সৈন্য হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ইংরেজ বাহিনীতে। ১৮৫৭-তে মহাবিদ্রোহে ঐ দেশীয় সেনাদের বিদ্রোহী ভারতীয়দের দমন করার জন্য গুলি চালাতে নির্দেশ দেয় গোরা অফিসার। স্বদেশীয়দের মারতে অস্বীকার করেন অর্জুন সিং, ফলে তাকেই লাহোর দুর্গের এক নিভৃত কক্ষে বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছিল। ঘরে তাঁর স্ত্রী জয় কৌর, আর তিন পুত্র কিষেণ সিং, অজিত সিং, স্বর্ণ সিং। প্রতিবাদী পিতার সন্তান তো, তাদের মনেও ব্রিটিশ-বিদ্বেষ। চোখে অত্যাচারী ঔপনিবেশিকদের উৎখাত করে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন উস্‌কে দিয়েছিলেন এক প্রাক্তন বাঙালি বিপ্লবী, অরবিন্দ ঘোষের শিষ্য যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি প্রকাশ্যে রাজনীতি ছেড়ে 'নিরালম্ব স্বামী' নামে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হয়ে পাঞ্জাবে ভ্রমণরত। নিরালম্ব স্বামীই তিনভাইকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই তিন ভাইয়ের অন্যতম কিষেণ সিং-এর পুত্র হলেন ভগৎ সিং।

ভগৎ সিংএর জন্ম পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলার বংগা গ্রামে। তারিখ আমি যতদূর জানি ১৯০৭ এর ১৯ অক্টোবর। অবশ্য আরও দুটি তারিখ পাওয়া যায় ১৯০৭এর ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭ এর ৫ অক্টোবর। পুলিশ রেকর্ড ও মহাফেজখানার দলিলেও ঐক্য নেই; তবে জন্ম সন যে ১৯০৭ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে কারণেই ১৯০৭ তাঁর জন্মশতবর্ষ, এবছরই তিনি ৯৯ পার করে শততম বর্ষে পা দিয়েছেন। বিদ্যাশিক্ষা প্রথমে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। তারপর ভর্তি করা হলো লাহোর শহরের খালসা স্কুলে। কিন্তু বালক ভগৎ-এর স্কুলে যেতে প্রবল আপত্তি। কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে জানায় যে স্কুলে রোজ প্রার্থনা হয় ব্রিটেনের জাতীয় সংগীত : গড সেভ দ্য কিং। ভগৎ সিংকে তাই আবার ভর্তি করা হলো পাশের দয়ানন্দ অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুলে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ পাঞ্জাবেও পৌঁছে গেছে। ইংরেজ চাটুকারিতার শিক্ষা ব্যবস্থার বদলে কোলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মতন পাঞ্জাবেও জাতীয় কলেজ। প্রতিষ্ঠাতা লালা লাজপত রাই, অধ্যক্ষ ভাই পরমানন্দ। ডি এ ভি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে ভগৎ সিং ঐ জাতীয় কলেজে ভর্তি হলেন। সেখানে এফ.

এ (বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিকের সমতুল) ক্লাসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ভবিষ্যতের তাঁর দুই বিপ্লবী সহকর্মী শুকদেব ও রাজগুরুর। সতের বছর বয়সে এফ. এ. পাস করলেন, এবার বি. এ পড়ার ইচ্ছে। বাড়িতে সবাই বিশেষত বৃদ্ধা ঠাকুমার নাতবৌ দেখার ইচ্ছে হওয়াতে তাকে বিয়ের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল; ফলে ভগৎ সিং রাগ করে গৃহত্যাগী হন। বাড়ি থেকে লাহোর, সেখান থেকে দিল্লি হয়ে কানপুর, তাঁর মনের মধ্যে ততদিনে ঢুকে গেছে রাজনৈতিক চেতনা, বিপ্লবের পথে দেশ স্বাধীন করার দুর্জয় সংকল্প, তাতে আত্মত্যাগেও পিছপা হবেন না।

ভগৎ সিং-এর রাজনৈতিক জীবন মাত্র সাত বছরের, ১৯২৪ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত। সম্প্রতি নানা সূত্র থেকে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে নতুন মালমশলা যেমন আমরা পেয়েছি, তেমনি ভগৎ সিং সম্পর্কেও। এখানে অতি সংক্ষেপে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে। দিল্লিতে এসে তিনি বলবন্ত সিং ছদ্মনামে 'অর্জুন' দৈনিক সংবাদপত্রে সংবাদদাতার কাজ নেন। পরে চলে যান কানপুরে, সেখানে চাকরি নেন দৈনিক 'প্রতাপ' পত্রিকার। এখানেই ১৯২৪-এ তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় দুই বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ এবং বটুকেশ্বর দত্তের। অবিলম্বে তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন। এরপর তিনটি ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। (১) তিনি তাঁর পুরানো বন্ধুদের অনেককেই বিপ্লবী দলে টেনে আনলেন, (২) জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর যোগাযোগ সাধনে উদ্যোগী হলেন, (৩) মার্কসবাদী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকলেন। আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ১৯২৪-এ ব্রিটিশ সরকার যে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করেছিল, ভগৎ সিং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। তবে ভগৎ সিং যখন কানপুরে তখনই ঐ শহরে অর্থাৎ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দেই রামপ্রসাদ বিসমিল, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী প্রমুখরা যে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' (HRA) নামে বিপ্লবী দল গঠন করেন এবং ভগৎ সিং ঐ দলেরই সভ্য হন। যেমন হন তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু রাজগুরু ও শুকদেব সহ যশপাল এবং ভগবতীচরণ ভোরা।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ভগৎ সিং ও শুকদেব মিলে গঠন করেন 'নওজোয়ান ভারতসভা'। সারা পাঞ্জাবে তার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং যিনি নিজে লাহোর খ্রিস্টান কলেজের ছাত্র ছিলেন, সেই অধ্যাপক বিপান চন্দ্র (জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়) এর কাছে শুনেছি যে লাহোরের বিখ্যাত দ্বারকাদাস গ্রন্থাগারে দীর্ঘকাল নিয়মিত পাঠক ছিলেন ভগৎ সিং। তাঁর মতো কম বয়সে এত বেশি পড়াশুনা-করা কর্মী তখন কেউ ছিল না। তবে নওজোয়ান ভারতসভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের বাণী যুবসমাজ, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। কারণ জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু মানুষের সশস্ত্র রোমান্টিক কার্যকলাপ জঙ্গি হতে পারে, প্রকৃত বিপ্লবী কাজ হয় না। বস্তুত জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের উন্নতি হয় না—একথা বুঝতেন ভগৎ সিং।

লায়ালপুর নওজোয়ান ভারতসভার অধিবেশনে আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে (?) ভগৎ সিং গ্রেপ্তার হন, কিছুদিন পর মুক্তি পেয়ে কানপুর যান, সেখান থেকে ফিরে

অমৃতসরে ছিলেন, দু'একটি পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজও করেছেন, যেমন 'কীর্তি', যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিপ্লবী ও উত্তরকালে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সোহন সিং যোশ। ১৯২৬-এর অক্টোবরে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় একবছর জেলে ছিলেন। মুক্তির পর লাহোর যান, প্রকাশ্যে দুধের ব্যবসা করতেন, আড়ালে চলত বিপ্লবী সংগঠনের কাজ। নওজোয়ান ভারতসভার কাজ বাড়ছিল, বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রভাব। এ প্রসঙ্গে যাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল এবং যিনি উত্তরকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত) সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন, সেই অজয় ঘোষ তাঁর 'Bhagat Singh and His Comrades' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ভগৎ সিং ও তাঁর কমরেডরা "formed the Nawjawan Bharat Sabha to propagate socialist ideas, preach the necessity of direct action against the British rule and serve as a recruiting centre for the Terrorist Party. The Sabha become tremendous popular in the years that followed and played leading role in the radicalisation of the youths in Punjab." একদিকে জাতীয় বিপ্লবী দলের জন্য যুবসমাজের প্রতিনিধি সংগ্রহ ও অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব প্রচার অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তি দুই লক্ষ্যই ছিল তাঁর রাজনৈতিক কাজ। তবে 'Terrorist' কথাটি এখন আমরা ব্যবহার করি না।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের শাহেনশা চকে আত্মগোপন করেছিলেন ভগৎ সিং। গোপন যোগাযোগ রাখতেন চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুকেশ্বর দত্ত, রামপ্রসাদ বিসমিল এবং ভগবতীচরণ ভোরার সঙ্গে। শচীন সান্যাল তখন জেলবন্দী। ভগৎ সিং সংগঠন গড়ার জন্য গিয়েছেন কানপুর, বারাণসী, আগ্রা প্রমুখ উত্তরভারতের নানা স্থানে তো বটেই, এমনকি এই কলকাতাতেও এসেছিলেন। একাধিকবার। তার ডাকে সাড়া দিয়েই বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন দাস গিয়েছিলেন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তখন দক্ষিণ কলকাতায় 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'-এর এক শাখা ছিল, যার সঙ্গে যোগ ছিল ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর। এদের ভবানীপুরের মেসেও ভগৎ সিং অনেকদিন ছিলেন।

আবার উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে চন্দ্রশেখর আজাদ সমেত কিছু বিপ্লবীর সঙ্গেও তিনি বৈঠক করেন। তবে সমমতাবলম্বীদের এক বড়ো গোপন বৈঠক হলো দিল্লিতে। সময় ১৯২৮-এর ডিসেম্বর। তখন কলকাতায় মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস-এর লক্ষ্য হিসেবে 'পূর্ণ স্বরাজ' গ্রহণ পর্যন্ত করতে ব্যর্থ। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তখনও আপোসকামিতার পথ ছাড়েনি; জওহরলাল বা সুভাষচন্দ্রকে সামনের সারিতেই আসতে দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতা অর্জন হলে দেশের মুক্তি কোন পথে সে-সব ভাবা দূর অস্ত। সেই ১৯২৮-এ HRA নিজেদের বিপ্লবী দলের নামের সঙ্গে 'Socialist' শব্দটি জুড়ে নতুন করে নাম রাখার সিদ্ধান্ত নেয়—Hindusthan Socialist Republican Association। এদের সঙ্গে যুক্ত সদস্যদের অনেক সময় হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মিও বলা হত। স্পষ্টতই এক বামপন্থী মতাদর্শ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। আর বিপ্লবীরা তো অনেক আগেই ঘোষণা করেছিল তাঁদের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence)। ঐ বছরই ফেব্রুয়ারি

মাসে সাইমন কমিশন যখন ভারতে এসেছিল তখন দেশজোড়া বিক্ষোভ শুরু হয়। ৩০ অক্টোবর সাইমন কমিশন লাহোরে এসে উপস্থিত হয়। কর্মসূচি ঠিক করাই ছিল। পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রাই-এর মতন প্রবীণ নেতা বিরাট এক মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে কালো পতাকা নিয়ে 'সাইমন কমিশন গো ব্যাক' ধ্বনি দিয়ে স্টেশন চত্বর মুখরিত করে দিল। হঠাৎ, বলা নেই-কওয়া নেই পুলিশের বর্বরোচিত লাঠি চার্জ, বুকের মধ্যে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা হলো লাজপত রাইকে। সেই যে তিনি হাসপাতালে গেলেন, শেষপর্যন্ত ১৯২৮-এর ১৭ নভেম্বর হাসপাতালেই তাঁর জীবনাবসান হলো।

এবার পরের মাসে বিপ্লবীরা দিল্লিতে গোপন ডেরায় সভা করে শুধু 'Socialist' শব্দ কাগজে-কলমে যুক্ত করলেন এমন নয়, তারা সক্রিয়ভাবে তৎপরতা বাড়াতে মনস্থ করলেন। এবার নেপথ্য নায়ক ভগৎ সিং সক্রিয় হলেন। আগেই বলেছি, হিন্দুস্থান সোশালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় কর্মীবৃন্দকে 'আর্মি' আখ্যা দেওয়া হত। তাদের সভা বসল ১০ ডিসেম্বর। সিদ্ধান্ত হলো : মারকা বদলা মার, খুনকা বদলা খুন। যিনি ৩০ অক্টোবর লালা লাজপৎ রাইয়ের উপর লাঠিচার্জের অর্ডার দিয়েছিলেন সেই ডেপুটি পুলিশ কমিশনার স্যান্ডার্সকে খতম করতে হবে। ঘটনাটি ঘটলো ১৭ ডিসেম্বর। নিজের অফিসের সামনেই মোটর সাইকেলে ওঠার সময় তিনটি গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন স্যান্ডার্স সাহেব। একই সঙ্গে গুলি ছুঁড়েছিলেন ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ। গোয়েন্দা ও পুলিশ চিরুনি তল্লাশি চালিয়েও তাঁদের খুঁজে পায়নি। ইংরেজ সাহেবের পোষাক পরে ছদ্মবেশে ভগৎ সিং পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ট্রেনে করেই সোজা কলকাতায়।

ডিসেম্বরের শেষ কলকাতা কংগ্রেসের সময় ভগৎ সিং কলকাতায়। তবে কংগ্রেস অধিবেশন বসেছিল পার্ক সার্কাস ময়দানে। সেখানে তিনি যাননি। তিনি উঠেছিলেন উত্তর শহরতলি বরানগরে বিজয়কান্ত বসাকের বাড়িতে। বিজয়কান্ত বসাকও প্রাক্তন বিপ্লবী। তিনিও যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে নিরালম্ব স্বামীর শিষ্য। কিন্তু অচিরেই ভগৎ সিং ফিরে গেলেন দিল্লি। তিনি তো একাধারে জাতীয় বিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী। তাঁরা লুকিয়ে বেড়াবেন কেন? ঠিক হলো এবার দেশবাসীকে তাদের সংকল্প জানাবার জন্য তারা প্রকাশ্যে আসবেন, অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবেন, প্রয়োজনে আত্মবলিদানে পিছপা হবেন না। তাঁর নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' দলের সিদ্ধান্ত মতো ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা অ্যাসেম্বলি ভবনে বোমা নিক্ষেপের দায়িত্ব পেলেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত।

তাঁরা বোমা মেরেও ছিলেন যদিও কাউকে নিহত করার উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতীয়দের অধিকার হরণের জন্য যে 'Public Safety Bill' এবং 'Trade Dispute Bill' নিয়ে আলোচনা হবে, তা ব্যাহত করা। নিজেদের 'ইশ্‌তেহার' ছড়িয়ে দিয়ে বধির কর্ণকে চেতন করা, স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে বিচারশাসনকে তাদের কর্ম ও মতাদর্শ প্রচারের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তারা তৈরি হলেন। ফলে যথাসময়ে ঐ দিন সভায় বোমা নিক্ষিপ্ত হলো। ধোঁয়া কেটে গেলেও এবং হাতে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার না করে স্বেচ্ছায় পুলিশের

হাতে বন্দী হন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত।

তাঁদের দুজনের বিরুদ্ধে শুরু হলো 'Assembly Bomb Case'। অ্যাসেম্বলিতে ধরা পড়ার সময়ই দুজন লিফলেট ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'-বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—স্লোগান দিয়েছিলেন ভগৎ সিং। ভারতীয়রা এই স্লোগান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' আবার শোনে মামলা চলাকালীন। ১২ই জুন অ্যাসেম্বলি কেসের রায় বেরুলো—'দুই বিপ্লবীর দ্বীপান্তর। আপাতত দত্তকে পাঠাও লাহোর জেলে আর সিংকে দিল্লি জেলে'। এদিকে আরও দুটি ব্যাপার ঘটল। একদিকে বিপ্লবীরা ঠিক করে রেখেছিল কারাগারে জঘন্য পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁরা অনশন ধর্মঘট করবেন, সেই মতো দিল্লি ও লাহোরে জেলের অভ্যন্তরে শুরু হলো ধর্মঘট। অন্যদিকে, স্যান্ডার্স হত্যার সূত্র ধরে ব্রিটিশ সরকার শুরু করল 'Lahore Conspiracy Case'। এই মামলাতেও যেহেতু ভগৎ সিং রয়েছেন, তাই তাকে দিল্লি জেল থেকে লাহোর জেলে পাঠানো হলো। এই মামলাতেই কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হলো যতীন দাসকে।

এরপর সব ঘটনা বিস্তারিত বলার পরিসর এখানে নেই তাই সংক্ষেপে লিখি। ১৯২৯-এর ২রা সেপ্টেম্বর কারা অনুসন্ধান সমিতি বন্দীদের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলে তারা অনশন ত্যাগ করলেও, যতীন দাস অনশন চালিয়ে যান। তাঁর কথা, ঐ এনকোয়ারি কমিটি নয়, গভর্নমেন্টকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। দীর্ঘ ৬৩ দিন অনশনের পর, ৬৪ দিনের মাথায় ঐ বছর ১৩ সেপ্টেম্বর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে প্রাণত্যাগ করলেন অমর শহীদ যতীন দাস। ঐ সংবাদ যখন কলকাতায় এলো বাঙালি দুঃখে ভেঙে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। বিচলিত কবি লিখলেন : 'হে ভৈরব শক্তি দাও। সর্ব খর্ব তারে দহে তব ক্রোধ দাহ' গানটি। সে ভিন্ন কাহিনী। ওদিকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা বিচার চলছে ভগৎ সিং, রাজগুরু শুকদেব সহ বহু বিপ্লবীরা, প্রায় তিরিশ জনের বিরুদ্ধে। পুলিশ ভগবান দাস, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগবতীচরণ ভোরা প্রমুখ ছ'জনকে খুঁজে পায়নি। অন্যদিকে রামশরণ দাস, ব্রহ্ম দত্ত, ফণী ঘোষ, জয়গোপাল, ললিত মুখার্জী, মনমোহন মুখার্জী, রঙ্গরাজ বেহরা প্রমুখ রাজসাক্ষী হয়ে গেল। ভগৎ সিং-এর ও তাঁর অনুগামীদের কণ্ঠে রোজই শোনা যেত—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'Down with Imperialism'. 'সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ', 'Long Live the Proletariat'—'সর্বহারা শ্রেণী দীর্ঘজীবী হোক' ইত্যাদি স্লোগান। কখনও বা গান—'সরফরোসি কি তমন্না অব হমারো দিল মে হ্যায়' অথবা 'রঙ দে বাসন্তী চোলা'। বিচারের জন্য তিন সদস্যের ট্রাইবুনাল। সাতজন রাজসাক্ষী, তিনজনকে ধরা যায়নি। যতীন দাস মৃত, বাকি রইলো সতের জন। ৭ অক্টোবর রায় বেরুলো—ভগৎ সিং, শিবরাম, রাজগুরু এবং শুকদেবের ফাঁসির অর্ডার, ৭ জনের আন্দামানে নির্বাসন; দুজনের জেল, চারজনের মুক্তি। শেষপর্যন্ত ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোর সেন্ট্রাল জেলে দুই কমরেডকে নিয়ে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইলেন বীর ভগৎ সিং। এবছর তাঁর আত্মবলিদানের ৭৫ বর্ষ।

এই আত্মবলিদানের তাৎপর্য বুঝতে গেলে এবং ভারতের ইতিহাসে ভগৎ সিং ও তাদের

সহযোগীবর্গের ঐতিহাসিক ভূমিকা বোঝা দরকার। সেজন্য একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে ঐ সময়ের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট, বিশেষত স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন (১৯১৪-১৯১৮) ভারতে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ছিল খড়গহস্ত; বিপ্লবীরা হয় আত্মগোপনে নয়তো ধরা পড়ে গেলে, দ্বীপান্তরে বা ফাঁসির মঞ্চে। আপোসকামী জাতীয় কংগ্রেস ঠিক করেছে তারা যুদ্ধের সময় সরকারকে বিব্রত করবে না, যদিও বালগঙ্গাধর তিলক, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ গড়ে তুলেছিলেন হোমরুল আন্দোলন। সরকার নিলো দু'মুখো নীতি—ইংরেজিতে বলে 'Carrot and Stick Policy'—একদিকে মন্টাগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের নামে ভারতবাসীকে তোষণ অন্যদিকে কুখ্যাত রাওলাট আইনের (১৯১৮) মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনকে দমন। এই রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে গিয়েই ঘটলো জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরোচিত ঘটনা (১৯১৯)। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সরকার বহু বন্দীকে মুক্তি দিলেও শুরু হলো খিলাফৎ আন্দোলন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অসহযোগ। নেতৃত্বে উঠে এসেছেন গান্ধীজী।

১৯২১-এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী দলগুলিকে তাদের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে অনুরোধ করলে বিপ্লবীরা তা মেনে নেন। গান্ধীবাদী গণআন্দোলন তখন তুঙ্গে। অনেক বিপ্লবী এই অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দেন। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনার (১৯২২) পর হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে গান্ধীজী যখন আচমকা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন, তখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জওয়াহরলাল-সুভাষচন্দ্রের মতন তরুণ প্রজন্ম এবং কংগ্রেসের বাইরে জাতীয় বিপ্লবীরা অবশ্যই মর্মাহত হলেন। তাদের অনেকেই অহিংস সত্যাগ্রহের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। এমনকি, চিত্তরঞ্জন দাস, মোতিলাল নেহরুদের 'স্বরাজ্য' রাজনীতির দ্বারাও তাঁরা প্রভাবিত হলেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে একদিকে বাংলায় অন্যদিকে পাঞ্জাব-দিল্লি-বিহার-যুক্তপ্রদেশে শুরু হলো বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯২৪-এ বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর আবির্ভাব।

আরও দুটি ঘটনা জাতীয় রাজনীতিতে তখন প্রভাব ফেলেছিল। ১৯১৭-র রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্রের অবসান। মতাদর্শভিত্তিক এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম ও সাফল্য এবং সর্বোপরি এক বিপ্লবী চেতনা পৃথিবীর অন্য অনেক প্রান্তের মতন ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেও প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয়ত, ১৯২০তে মুম্বাইতে 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (AITUC) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতে শ্রমজীবী আন্দোলনও সংগঠিত রূপ পায়। শ্রমজীবী শ্রেণীও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে শুরু করে।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ, যে সময় ভগৎ সিং-এর রাজনৈতিক জীবন, এবার সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী রাজনীতি তথা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। তবে মোটাদাগের রূপরেখায়। প্রথমেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কথা। এই দল চৌরিচৌরার ধাক্কা সামলে জোরদার আন্দোলন করতে পারেনি। তাদের মধ্যে পরিবর্তন-পন্থী আর পরিবর্তন-বিরোধীদের মধ্যে দলাদলি। প্রথম দলের মধ্য থেকেই

স্বরাজীদের উদ্ভব, তবে ১৯২৫-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাদের শক্তি অনেক কমে যায়। দ্বিতীয় দলের অবিসংবাদী নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি অবশ্য স্বাধীনতার চেয়ে চরকায় বেশি ব্যস্ত। অধ্যাপক সুমিত সরকার ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, "প্রথম নজরে মনেহয়, ১৯২২ থেকে ১৯২৭ অবধি সময়টায় পুরোপুরি কায়েম হয়েছিল এক হঠাৎ আশাভঙ্গের বোধ।" প্রত্যেক প্রদেশেই কংগ্রেসের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল। তবু আশার কথা এই যে, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক টানাপোড়েনে উঠে আসে জওয়াহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের মতন পরের প্রজন্ম, বিশেষত সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলনের পর। ১৯২৮-এর কলকাতা অধিবেশনেও যদিও আপোসকামী 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-ই লক্ষ্য হিসেবে ঘোষিত কিন্তু পরে বছরই ১৯২৯-এ কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে ঘোষণা করে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রস্তাব। আর তার পরের বছর (১৯৩০) স্বয়ং গান্ধীজী লবণ আইন ভঙ্গ করে শুরু করেন বিখ্যাত দণ্ডিযাত্রা এবং সূচনা হয় আইন অমান্য আন্দোলনের।

আসলে ১৯২৪ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে জনগোষ্ঠীয় আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, জাতভিত্তিক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন আর সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সহাবস্থান করতে থাকে। আর উদ্ভব ঘটে ভারতে বামপন্থী নানা দলের, কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও। অধ্যাপক সর্বপল্লী গোপাল দেখিয়েছেন উত্থান-পতন সত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাধারণ অগ্রগতি ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়। আন্তর্জাতিক 'League Against Imperialism' (১৯২৭) সঙ্গে একযোগে ভারতেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা তীব্রতর হয়। শ্রমিক-কৃষক চেতনা নিশ্চিতভাবে বাড়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের দোদুল্যমানতা ও আপোসকামী মনোভাবের ফলে আইন অমান্য আন্দোলনও কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। বিলেতের গোলটেবিল বৈঠকই সার। আমাদের ভাঁড়ার শূন্য। আর বড়লাট আরউইনের সঙ্গে চুক্তির সময় গান্ধীজী ভগৎ সিংদের কথা মনে রাখেননি আদৌ। কংগ্রেসী নেতাদের সম্পর্কে মোহভঙ্গের ফলেই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন নতুন করে মাত্রা পায় বাংলায় ও যুক্তপ্রদেশে (উত্তরপ্রদেশ) ও পাঞ্জাব সমেত নানা অঞ্চলে। বাংলায় পুরানো বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অনেক স্মৃতিকথা ও রচনা প্রকাশিত হয় 'আত্মশক্তি', 'সারথী', 'বিজলী'-র মতো নানা পত্রিকায়। শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত বিপ্লবের পদ্ধতিকে গৌরবান্বিত করে যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী', যা বেরিয়েছিল ১৯২৬-এ। তার আগেই ১৯২৪-এ কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে আর্নেস্ট ডে নামে বেসরকারি এক ব্যক্তিকে গুলি করে মারেন (১২ জানুয়ারি) বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা। ধরা পড়ে তাঁর ফাঁসি হয় (১ মার্চ)। পরিণতিতে ঐ ১৯২৪-এর অক্টোবরে বাংলা সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করে শুরু করেন ব্যাপক ধরপাকড়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বিদেশে, খবর পেয়ে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখলেন :

ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।

শুনছি নাকি বাংলাদেশে গান হাসি সব ঠেলে,
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।

আর ঐ চিঠি-কবিতাতেই তিনি জানিয়ে দেন : "মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,/মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।" ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে বন্দীরা ক্রমে ছাড়া পাওয়ার আগে বাংলায় বিপ্লবী কার্যকলাপ তাই কিছুটা নিষ্প্রভ। আসলে অনুশীলন-যুগান্তরের দলাদলি, অনেক 'দাদা'র নিষ্ক্রিয়তাই এজন্য দায়ী।

তবু তারই মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার মতো ব্যাপার দুটো। প্রথমত, কয়েকটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর অভ্যুদয় যাকে বলা যেতে পারে নতুন চিন্তা-ভাবনার প্রক্রিয়ার ফল। দল গড়ে উঠলো ঢাকায়, চট্টগ্রামে, মেদিনীপুরে। ঢাকায় বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ গড়লেন 'মুক্তি সংঘ', পরে নাম বদলে যা হয় 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'। মেদিনীপুরের দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাঁদের। চট্টগ্রামের নায়ক সূর্যকুমার সেন, 'মাস্টারদা' নামেই তাকে সকলে শ্রদ্ধায় সম্বোধন করেন। চট্টগ্রাম দলের আবার যোগ হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে। আছে অসংখ্য দল-উপদল। ঘটছে নানা রোমহর্ষক কার্যকলাপ। যেমন, দক্ষিণেশ্বর দলের বিপ্লবীরা খতম করে দিয়েছিল ইংরেজ-দালাল ডাকসাইটে এস পি রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জীকে, আলিপুর জেলের মধ্যেই। এই দক্ষিণেশ্বর দলেরও যোগ ছিল উত্তর ভারতের নেতাদের সঙ্গে। যাইহোক, উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। যা বলার তা হলো ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভিত প্রস্তুত বলেই ১৯৩০-১৯৩৪ পর্বে বিপ্লবী আন্দোলন আরও তীব্র হতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো বিপ্লবী দলগুলির অনেক সদস্যের উপর বলশেভিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের প্রভাব, যার ফলেই চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন। ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদ, বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বা ব্যক্তিগত বীরত্বপূর্ণ আত্মবিসর্জনের বদলে মানুষের সার্বিক শোষণ বিলোপের প্রচেষ্টা। বাংলার মতো উত্তর ভারতের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও তিনটি সূত্রের উপর জোর দিতে চাই। প্রথমত, বাংলার মতন উত্তর ভারতেও নানা বিপ্লবী দল গঠিত হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন', যার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন দুই প্রবাসী বাঙালি—শচীন সান্যাল ও যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী। অন্যান্যদের মধ্যে বিখ্যাত নাম রামপ্রসাদ বিসমিল। দ্বিতীয়ত, ওই ধরনের দল চালাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন ছিল, অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। সেই কারণে বাংলার মতন এখানেও ঘটত 'স্বদেশী ডাকাতি'। এই ধরনের ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ছিল ১৯২৫-এর ৯ আগস্ট লখনউ-এর কাছে কাকোরী স্টেশনে ট্রেন ডাকাতি, ফলে খানা-তল্লাশি, গ্রেপ্তার, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা, এবং যাতে শেষপর্যন্ত রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন লাহিড়ী, আশফাকউল্লাহ্ এবং ঠাকুর রৌশন সিংহের ফাঁসি। এই ধরপাকড়, ফাঁসি-দ্বীপান্তর বিপ্লবীদের ধাক্কা দিলেও টলাতে বা দমাতে পারেনি। ফলে উঠে আসে নতুন প্রজন্ম : চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, বিজয়কুমার সিন্হা, শিব বর্মা, জয়দেব কাপুর, ভগবতীচরণ ভোরা, শিবরাম রাজগুরু, শুকদেব, রামকিষেণ, তীর্থরাম, যশপাল, মহাবীর সিং, সুরেশ পান্ডে, সোহন সিং যোশ, সোহন সিং ভাক্না, শার্দুল

সিং, অজয় ঘোষ, জিতেন সান্যাল প্রমুখ। বারাণসীর শচীন সান্যালের 'বন্দীজীবন' বইয়ের হিন্দি ও গুরমুখী সংস্করণ তরুণ প্রজন্মের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ভারতের বাইরে। বহির্ভারতে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল—ব্রিটেনে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে, আমেরিকায় আরও বহু দেশে। আবার রুশ বিপ্লবের পর বহু বিপ্লবী যেমন ঐ বিপ্লবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তেমনি অনেক বিপ্লবী সোভিয়েত রাশিয়া ঘুরে এসেছিলেন। 'গদর' সমেত বিভিন্ন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গে যেমন ভারতের বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল, তেমনি রুশ বিপ্লবের প্রেরণা-পুষ্ট দলের লোকেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। একটি উদাহরণ, রাশিয়া-প্রত্যাগত বিপ্লবী হসরৎ মোহানী ১৯২২ খ্রিস্টাব্দেই জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' না চাইলে, স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থহীন কিন্তু জাতীয় নেতারা তখন সেকথা আমল দেননি।

তাহলে ভগৎ সিং-এর শহীদত্বের ৭৫ তম বছর এবং জন্মশতবর্ষের প্রাক্-মুহূর্তে ইতিহাসের রায় কী? ভগৎ সিং-এর ভূমিকাকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের নিরিখেই বিচার করলে বোঝা যায় তাঁর স্থান স্বতন্ত্র। প্রথমত, তিনি যেমন তাঁর বিচারের সময় বলেছিলেন যে তাঁর কাছে বিপ্লবের অর্থ 'বোমা ও পিস্তলের অর্চনা নয়', বরং সমাজের সর্বাত্মক পরিবর্তন, যার পরিণাম হবে বিদেশি ও ভারতীয় দুই পুঁজিবাদেরই উৎখাত ও সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। সুতরাং 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' তাঁর কাছে মুখের স্লোগান নয়, চেতনা-সমন্বিত গভীর বিশ্বাস। জাতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে এই প্রথম এমন স্পষ্ট উচ্চারণ। দ্বিতীয়ত, জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন ভগৎ সিং-এর দৃষ্টিতে যেমন ব্যক্তিগত সন্ত্রাস নয়, আতঙ্কবাদ নয়, তেমনি তাঁর দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবাদ ধর্মাশ্রয়ী হিন্দু বা শিখ ঝোঁকের দ্বারা আপ্লুত নয়। তাঁর 'কেন আমি নিরীশ্বরবাদী' শীর্ষক উচ্চাঙ্গের রচনাটি এই প্রসঙ্গে আমাদের ভাবায়। বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে এও এক স্পষ্ট প্রথম উচ্চারণ। আর এসব করছেন মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে। ভাবা যায়? আসলে বোধহয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন : 'মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে'।

বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলা : একটি ভূমিকা

বাংলাদেশে শিল্পচর্চা (১৯৫০-২০০০)

মতলুব আলী

> "স্বতন্ত্র দেশ কাল, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও আধুনিক—এই সংজ্ঞা ও বিচার কলাক্ষেত্রের প্রচলিত রীতি এবং তদনুসারে তুলনামূলক আলোচনা সমালোচনা হলেও একটি বড় সত্য উপলব্ধি করা আবশ্যক। প্রথমত, বিশ্বজনীন ভাব সত্ত্বেও প্রতিটি দেশের শিল্পকলা তার স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বরাট। আর দ্বিতীয় হল—বিভিন্ন দেশ ও জাতির শিল্প সাহিত্যের মতই তাদের জাতীয় চরি[illegible] সাধনা সৌকর্যের প্রতিফলন হয়। জাতিগত রুচি প্রবৃত্তি ও ধারণা এই বিষয়ে উপেক্ষণীয় নয়।"
>
> —অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
>
> [বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী'র ভূমিকা]

এলাকা ও অঞ্চল ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য রয়েছে। কোনো দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমির অনুসন্ধান ইতিহাস-ঐতিহ্যের পথ এড়িয়ে সম্ভবপর হয় না। আর কোনো দেশের শিল্পকলা নিয়ে যখন কথা ওঠে বা কেউ প্রবৃত্ত হন কোনো দেশভিত্তিক শিল্পাঙ্গনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে তখন তা ওই প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখেই সম্পন্ন করা জরুরি হয়ে পড়ে, যার সঙ্গে ঐতিহ্যানুগ বিষয়াদির সম্পর্ক ওতপ্রোত।

শিল্পকর্ম মানুষের হাতে গড়া এমনই এক কাজের পরিচয় চিহ্নিত করে, যা আকস্মিক নয় এবং যার পেছনে মানুষের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা নেই এ কথা বলা যাবে না। মানবজাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তার অস্তিত্বরক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদের ধারাবাহিকতায়, এগিয়ে চলার প্রতিটি ধাপে মানুষ জীবনরক্ষার অনুষঙ্গ খুঁজে ফিরেছে—আর ওই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অনায়াসে উৎপাদিত হয়েছে শিল্পকলার তাবৎ উপকরণ। বর্বরদশা থেকে সভ্য মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার খুব সহজ অর্থটি হচ্ছে মানবজাতি সুন্দরের নাগাল ছুঁয়েছে। আহারে-বিহারে, পোশাকে-আশাকে ও সামগ্রিক জীবনযাত্রায়, ক্রমোন্নত মানবসমাজে যতোই sophistication-এর লক্ষ্যপথে এগিয়ে গেছে ততোই তার শিল্পকর্মেরও নব-নব দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলা বিষয়ে আলোকপাতের শুরুতেই সূচনা-বক্তব্য হিসেবে এ কথাগুলো বলে নিচ্ছি আমার আলোচনার পথ সুগম করার জন্য। কেননা আমি এই নিবন্ধের শিরোনামে একটি সুনির্দিষ্ট সময়কাল চিহ্নিত করে নিয়েছি। তার আগের সুদীর্ঘ সময় ও পরের প্রায় অর্ধযুগ সম্পর্কে আমি আগ্রহী নই তা নয়, তবে আমাদের চারুশিল্পের অতীতের ইতিহাসকে আমি চালচিত্র বা পটভূমি হিসেবে নিচ্ছি; সেই ত্রিশ-চল্লিশের দশকের জয়নুল আবেদিন, শফিকুল আমীন, আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, এস এম সুলতান, হবিবুর রহমান ও সফিউদ্দীন আহমেদ প্রমুখের গড়ে ওঠার সময় এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠালাভ

আর কীভাবে তাঁরা বাংলাদেশ শিল্পাঙ্গনের গোড়াপত্তন করেছিলেন সেসব বিষয় কমবেশি সুবিদিত সবাই। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চা ও আধুনিক নিরীক্ষাধর্মী শিল্পকর্মাঙ্গনের প্রতিষ্ঠাও সেই পার্টিশন পূর্বাপর সময়ে তাঁদের সক্রিয় উপস্থিতির মধ্য দিয়েই সম্ভবপর হয়েছিলো এ বিষয়টি আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। এ পর্যায়ে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের মধ্যে একমাত্র সুলতান ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকেই তৎকালীন কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট এ্যান্ড ক্র্যাফ্‌ট্ থেকে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছিলেন এবং তাঁরা সবাই ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক থাকাকালীন দেশভাগ হওয়ার ফলে অপশন দিয়ে পূর্ববঙ্গে (তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে) চলে আসেন এবং আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকায় সরকারি চারুকলা শিক্ষায়তন (আর্ট ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠিত হয়। এস এম সুলতাম চিত্রাঙ্কনের ধরাবাঁধা নিয়মনীতির প্রতি বিরূপ ছিলেন গোড়া থেকেই, চাইতেন সৃষ্টির স্বাধীনতা। তাই ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ সন পর্যন্ত পড়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত হওয়ার আগেই কলকাতার আর্ট স্কুল পরিত্যাগ করে মুক্ত-স্বাধীন শিল্পান্বেষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন—যাযাবরের মতোই দূরের ও কাছের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেছেন এবং তারই মধ্যে চিত্রশিল্পের চর্চাও চালিয়ে গেছেন। সেই সময়ের নামজাদা শিল্পীদের কাজের সঙ্গে নিজের ছবি প্রদর্শনের সুযোগও পেয়েছেন বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, "বাংলা বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টি হলেও তার ঐতিহ্যে সর্বভারতীয় প্রভাব যথেষ্ট। তাই বাংলাদেশ চিত্রশিল্প শিক্ষালয়ে কোনো ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষকগণ ঢাকা গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও সর্বময় কর্তা। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ বা এক কথায় ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের চিত্রকলার প্রশিক্ষণ ধারায় কোনো পার্থক্য নেই।" (বুলবন ওসমান, 'বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নয়ন : সামাজিক পটপ্রেক্ষিত', শিল্পকলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ১১) অর্থাৎ বাংলাদেশের মাটিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তখন যেভাবে শুরু হয়েছিলো তা ছিলো আক্ষরিক অর্থে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলেরই ধারাবাহিকতা। রচনার এই আরম্ভিকা পর্যায়েই আরও একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উত্থাপন জরুরি মনে করি। তা হলো, স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগে দুটি যুগ আমরা কাটিয়েছি হুকুমতে পাকিস্তানী কর্তৃত্বে। বাংলার শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যাদের ছিলো বিস্তর ফারাক। অবাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানীরাই মূলত শাসন ও শোষণ করেছে এদেশ, তাদের সমাজ-পরিবেশ জীবনধারা বা চিন্তা-চেতনা রুচি-পছন্দ কোনোটাই আমাদের সমান্তরাল মানসম্মত ছিলো না। এ বিষয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি "দু অঞ্চলে রুচির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে একদিন মন্তব্য করলেন—ওরা চাঁদ আর গোলাপ ফুলের ছবি আঁকে। ওদের কাছ থেকে কি আর আশা করা যায়।" (তোফায়েল আহমদ, 'শিল্পাচার্য ও একটি লোক নকশার প্রচলন', চিত্রালী ঈদ উপহার, ১৯৮৭, টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৯৩).

এই বিষয়াবলির উত্থাপন এজন্য যে, গোড়া থেকেই আমাদের চিত্রশিল্পাঙ্গনকে একটা প্রতিবাদী চারিত্র্যরূপ নিয়েই অগ্রসর হতে হয়েছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পাঙ্গন মসৃণ পথে চলতে পারেনি সব সময়। তার কারণ ইসলামী

ধর্মবেত্তাগণ অতীতকালে একধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন যে-কোনো রকমের 'ইমেজ' সৃষ্টির প্রতি। যদিও এক পর্যায়ে আবার এমনও সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিলো যে, ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত না করে অবয়ব সন্নিবেশিত করা যাবে; তবুও অন্য সব ইসলামী দেশের মতো আমাদের দেশেও ওইসব নেতিবাচক বিষয়ের প্রভাব কমবেশি এখনও কার্যকর রয়েছে। (তথ্যসূত্র : E. H. Gombrich, Story of Art, The Phaidon Press Ltd, Lontlon. Page 101)

মানুষ ও জীবজন্তুসহ যে-কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা যাবে না, ছবি আঁকতে হলে বা শিল্পচর্চায় বিষয়বস্তু হিসেবে ফুল লতাপাতা ও নক্শী কারুকাজ করা যাবে এমন ঘোষণা ছিলো তাদের। ফলে আমাদের সমকালীন শিল্পীদের বহু কাঠখড় পুড়িয়ে নানান চড়াইউৎরাই পেরিয়ে এদেশে শিল্পযাত্রা সংঘটিত করতে হয়েছে। এজন্য অনেক সময় আমরা নিজেদের দৃঢ়তা ও অঙ্গীকারের পরিচয় তুলে ধরতে উল্লেখ করি 'বাংলাদেশের শিল্পকলার আন্দোলন' এই শব্দবন্ধনী, যদিও আমরা জানি ব্যাপক অর্থে তেমন কোনো জোরালো শিল্পান্দোলন বাংলাদেশ শিল্পাঙ্গনে আজও সংঘটিত হয়নি। আমাদের শিল্পস্রষ্টাগণ শুধুই যে মানুষী অবয়ব দ্বি-মাত্রিক চিত্রপটে এঁকেই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়—এমনকি হিউম্যান ফিগার সরাসরি ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্যরূপেও এই সক্রিয় ও গতিশীল শিল্পাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যদিও এখনও ভাস্কর্যশিল্পের অংশ হিসেবে নয় বাংলাদেশে তা অনেকের কাছেই পূজনীয় মূর্তি হিসেবে চিহ্নিত। সাধারণ দেব-দেবীর মূর্তি বা প্রতিমা-বিগ্রহ ইত্যাদি আর সৃজনশীল চারুশিল্পীর হাতে তৈরি প্রতিমূর্তি যে এক নয় এ বিষয়টা তাদের বোধগম্যতার আওতায় পড়ে না। এক্ষেত্রে একধরনের সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা ধর্মান্ধ মানুষদের মধ্যে ছিলো বা এখনও আছে। বিষয়টি চিন্তা করলে অবাকই লাগার কথা যে, রক্তক্ষয়ী মুক্তি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর অর্জিত যে স্বাধীনতা, প্রায় তিন যুগ অতিক্রান্ত হতে চললো, সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারকস্তম্ভ এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি দেশের অনেক জায়গায়। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ভাস্কর্যের প্রথম ছাত্র স্বনামধন্য ভাস্কর আনোয়ার জাহানকৃত একটি ক্রীড়া-বিষয়ক বড়ো মাপের ভাস্কর্যকর্ম ঢাকা স্টেডিয়াম ও বায়তুল মোকাররম মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়েছিলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রাতের অন্ধকারে কে বা কাহারা ভারী যন্ত্রের সাহায্যে কেটে নিয়ে বা গুঁড়িয়ে দিয়ে তা সরিয়ে ফেলেছিলো, ঘটনাটি খুব বেশিবছর আগেরও নয়—আমাদেরই সমকালীন সুবিদিত ঘটনা। এসব বিষয় স্বাধীনতা বিরোধীদের চক্রান্ত যতোটা না, তার চেয়ে বেশি হচ্ছে মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত শিল্পচর্চাবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ইত্যাদিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ওই সেকশন এখনো মানসিকভাবে মেনে নিতে পারে না। যেমন বাঙালির আল্পনা বিষয়ের প্রতি তাদের একধরনের বীতস্পৃহতা রয়েছে, অথচ দেখা যাচ্ছে সেই গ্রামীণ লোকাচারের সাথে সম্পর্কিত আল্পনা আমাদের শিল্পকর্মীদের কল্যাণে অনায়াসে উপকরণ ও নক্শার মটিফ পাল্টে এখন নগরজীবনের সঙ্গী হয়ে গেছে। বলতে গেলে ইসলামী ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি ছাড়া সামাজিক-সাংগঠনিক কিংবা উৎসব পর্যায়ের কোনো অনুষ্ঠান-আয়োজনই আল্পনা ছাড়া হয় না।

এভাবেই প্রগতির কাছে হার মেনেছে প্রতিক্রিয়া। অমর একুশে উদ্‌যাপনে রাজপথে আল্‌পনা আঁকা দীর্ঘদিন থেকেই তরুণ-যুবা চারুশিল্পীদের একটি নিয়মিত উদ্দীপনামূলক কর্মসূচি। বাংলাদেশে শিল্পচর্চা প্রকৃতিগতভাবেই প্রগতিশীলতার গুণগত মাত্রা সন্নিবিষ্ট এমন এক কর্মানুষ্ঠান তথা কর্মকাণ্ড যা সব সময় এগিয়েই চলেছে, পিছন ফিরে তাকায়নি। আর আমাদের শিল্পাঙ্গন যে খুব সহজেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতায় বিশ্বশিল্পের মূল ধারাসমূহের নিকটবর্তী হতে পেরেছে তার কারণও ওই প্রগতিচেতনা; কখনো তা হয়তোবা স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তা সুসংবত সচেতন প্রয়াস।

একটি বিষয় খুব জোর দিয়েই বলা যাবে যে, বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গন একটি প্রাচ্যদেশীয় অঞ্চলের মধ্যে বিকশিত হলেও কখনোই প্রাচ্য শিল্পধারার অনুশাসন মেনে প্রাচ্যানুগ হয়ে ওঠেনি। সামষ্টিক রূপচারিত্র্যে সে প্রতীচীর আনুগত্যই করেছে। প্রাতিষ্ঠানিকতার শুরু থেকেই এখানে ইউরোপীয় বাস্তববাদী ধারা প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়েছে বলা চলে একশভাগ। এখানে পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে আশির দশক পর্যন্ত, অর্থাৎ চারুকলা ইনস্টিটিউটের সনাতন শিক্ষাকোর্স যতোদিন ছিলো ততোদিন পর্যন্ত দীর্ঘদিন দুই বছরের ফাণ্ডামেন্টাল কোর্স হিসেবে চালু ছিলো ড্রইং-কলরও থেকে নিয়ে অনুশীলনধর্মী যতো কিছু শিক্ষা কার্যক্রম—সবই ছিলো এককথায় প্রাচ্য নিরপেক্ষ। ফলে পরবর্তীকালে যে সমস্ত শিক্ষার্থী হয়তো প্রাচ্যকলা বিভাগে লেখাপড়া চালিয়ে গেছে, তারা আর প্রাচ্য ধারাটিকে সেরকম গুরুত্বসহকারে অন্তরে ধারণ করে এগিয়ে যেতে পারেনি। বরং ক্ষণে ক্ষণে তারা বিষয়বস্তু চয়নে, গঠনে-গড়নে, প্রকাশ-আঙ্গিক ও রচনাশৈলীতে পাশ্চাত্যেরই খবরদারি করেছে। আর এই প্রবণতা গোড়া থেকেই আমাদের শিল্পচর্চায় আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এমনকি এখানে প্রাচ্যকলা বিষয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করেছেন বা এখনও করেন তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম সত্ত্বেও বলা চলে যে, তাঁরা শিক্ষার্থীদের সামনে যথোপযুক্ত প্রাচ্য-দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূলতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন বলে দ্বিধাহীন মেনে নেয়া যায় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা জরুরি যে, বৃটিশ-ভারতীয় আমলে এবং তৎপরবর্তী পাকিস্তানী শাসনামলে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষের জাতীয় পরিচয়ের যে ছাপচিহ্ন ছিলো সামাজিকভাবে জনজীবনে তার প্রভাব যা স্বাভাবিক সেরকমই ছিলো। যেমন বৃটিশযুগে বৃহত্তর বঙ্গভূমির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ অঞ্চল যখন পূর্ববঙ্গ, তৎকালে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে মেধা ও মননে অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকা হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিলো সর্বব্যাপী, বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙালি সমাজ-পরিবেশে আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে প্রচলিত ছিলো হিন্দুয়ানী প্রথাসকল। গ্রামীণ সমাজ জীবনের এরকম একটি স্বচ্ছ চিত্র-সন্ধান দিয়েছেন অধ্যাপক বুলবন ওসমান। লিখেছেন : "লোকজীবনে এবং গ্রামীণ সংস্কৃতিতে হিন্দু বা বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের ধারা সচল ও জোরালো ছিল। যেমন ভাস্কর্য শিল্প মুসলিম সংস্কৃতি-বিরুদ্ধ হলেও বাংলার গণজীবনে টেরাকোটার প্রভাব উল্লেখ্য ও বিশিষ্ট। পীরের দরগায় মাটির ঘোড়া দিয়ে মানতের চল যুগ যুগ ধরে। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে বিবাহ উৎসবে অনেক জায়গায় কলাগাছ ও মঙ্গলঘটের ব্যবহার প্রচলিত, রাঙানো কুলোয় আল্‌পনার নকশা, কনের মুখে

চন্দনের কৌটা কাটা। এছাড়া চিত্রকলায় প্রাণীর অবয়ব নিষিদ্ধ হলেও নকশীকাঁথায় মাছ, পাখী, নারী-পুরুষ অহরহ জায়গা পায়।" (বুলবন ওসমান, 'বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নয়ন : সামাজিক পটপ্রেক্ষিত', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১)

পূর্ব বাংলা যখন সাতচল্লিশ সালে পার্টিশনের পর থেকে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামাঙ্কিত হয়, তখন থেকে এই জনগোষ্ঠীর উপর অনিবার্যভাবে মুসলমানিত্বের খবরদারী শুরু হয়ে যায়। পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি বদলে যেতে থাকে নানা কিছু পূর্বের মতো একই কায়দায়। যেমন আগে হিন্দু-মুসলিম সবার নামের সামনে ইংরেজি ধরনে মিস্টার-মিসেস-মিস ইত্যাদির পরিবর্তে দলিল-দস্তাবেজসহ সকল সরকারি কাজে লেখা হতো শ্রীযুক্ত-শ্রীমান্ সংক্ষেপে শ্রী এবং শ্রীমতি এসব শব্দ, পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশে প্রচলিত হলো জনাব ও বেগম লেখা হিন্দু-মুসলমান সবার নামের সামনেই। এখনও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত হওয়ায় দু জায়গাতেই ওই বিষয়গুলো আগের মতোই কমবেশি চালু রয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গন এই বাস্তব পরিস্থিতিতেই উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে। আগেই বলেছি যে, শুরু থেকেই এই অঙ্গনের এক প্রতিবাদী চরিত্র ছিলো—এখনো সেই বৈশিষ্ট্যে সে অটল। গ্রামীণ লোকশিল্প-সংস্কৃতিতে বা হস্তশিল্প-কারুকর্ম সর্বত্র হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যে ধর্মীয় বিধিনিষেধ নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিভঙ্গীর চর্চা ছিলো, তারই প্রতিফলন এদেশের চারুশিল্পীদের কর্মকাণ্ডে সর্বতোভাবে লক্ষণীয়। সে-কারণে এদেশের চিত্রকলা তথা শিল্পচর্চায় প্রধান বিষয়-উপজীব্য মানুষ, মানুষী অবয়বের সঙ্গে সমাজ-পরিবেশ এবং প্রকৃতি। আর ইসলামী চিন্তাধারার প্রেক্ষিত থেকে তার দূরত্বটা এতোই বেশি যে, কোনোভাবেই তা পাকিস্তানের ভাবাদর্শের অনুকূল নয়। এসব কারণেই পার্টিশন-উত্তর বাংলাদেশে ভাষা-আন্দোলন ছাড়াও যে-কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন ইত্যাদিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক-আন্দোলন, গণ-সংগ্রাম ও যুদ্ধ-সন্ত্রাস বিরোধী গণ-আন্দোলন যা-ই যখন হয়েছে তার সঙ্গে ব্যাপকভাবে শিল্পকর্মীদের সম্পৃক্ততা সব সময় ছিলো। শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের সময় রঙ-তুলির বিক্ষোভের পাশাপাশি সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামেও সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, নিগৃহীতও কম হননি আর শহীদও হয়েছেন। আরও একটি সমর্থিত তথ্য এই যে পঁচিশে মার্চের কালরাত্রিতে গণহত্যা শুরুর আগে, অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত প্রসিদ্ধ ৭ই মার্চের ভাষণের পরও যখন পর্যন্ত যুদ্ধের বিষয়টা কিংবা আমরা যে সোজাসাপ্টা স্বাধীনতাই চাই দেশবাসীর মনে তার প্রতিক্রিয়ার রূপটা ছিলো বিমূর্ত—সেই পরিস্থিতিতে মার্চের মাঝামাঝি সময়ে চারুকলার ছাত্রছাত্রীসহ প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা বিরাট আকৃতির ফেস্টুনজাতীয় প্ল্যাকার্ডে বড়ো বড়ো অক্ষরে 'স্বা' 'ধী' 'ন' 'তা' শব্দটি লিখে গলায় ঝুলিয়ে ঢাকার রাজপথে মিছিল করে। পরদিন দেশের সকল সংবাদপত্রে তার আলোকচিত্র প্রকাশিত হলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো সেই বারতা অনেক আত্মবিশ্বাসী অঙ্গীকারের শক্তিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও আশান্বিত করে তোলে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, কিন্তু এ ঘটনাটি ছিলো চূড়ান্তভাবে এক ব্যাপক রাজনীতি-সম্পর্কিত কার্যক্রম, তৎকালীন পাকিস্তানের মতো তেইশ-চব্বিশ বৎসর

বয়সী একটি দেশের অস্তিত্বরোধকারী আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন অবশ্যই ছিলো এ ঘটনা—যার নেতৃত্ব তিনিই দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই নিবন্ধকারের স্থির বিশ্বাস এ জাতীয় প্রতিবাদী ও কমবেশি বিপ্লবী ভূমিকাই বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের কর্মকাণ্ডে তাদের অগ্রগণ্যতার পেছনে কাজ করেছে। আজ তাই শিল্পকলায় জাতীয় পর্যায়ের সাফল্যের মাত্রা ছাড়িয়ে স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে ও আপন গতিতে সম্প্রসারিত হয়ে আমাদের করিৎকর্মা চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও ছাপচিত্রীদের কর্মগুণ স্থান করে নিয়েছে আন্তর্জাতিক শিল্পাঙ্গনে। বাংলাদেশের অনেক শিল্পী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানাস্থানে প্রবাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছেন শুধু নয়, তাঁরা সে-সব দেশের শিল্পী-শিল্পরসিক ও সংগ্রাহকদের আস্থা অর্জন করে যথাযথ মর্যাদায় আজ সুপ্রতিষ্ঠিতও হয়েছেন। কয়েকবছর আগে লন্ডনে একটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীন প্রথমবারের মতো নিলামে উঠেছিলো বাংলাদেশের মূলধারার শিল্পস্রষ্টা জয়নুল আবেদিন ও আধুনিক নির্বস্তুক ধারার প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়ার ছবি। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র ও উন্নতিকামী বিপদতাড়িত দেশের জন্য এ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় ঘটনা।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে একদল উজ্জ্বল তরুণের সরব উপস্থিতিতে বাংলাদেশের চারুকলা অঙ্গন অগ্রযাত্রা সুনিশ্চিত করেছিলো, যার সূচনা ঘটেছিলো আটচল্লিশের শেষদিকে আবেদিন ও সহযোগী শিল্পীশিক্ষকদের গড়ে তোলা দেশের প্রথম উচ্চতর শিল্পকলা শিক্ষায়তের মাধ্যমে। ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট কোর্স চালু ছিলো তখন। প্রথম ব্যাচটি বের হয়েছিলো ১৯৫৩ সালে। সেই উজ্জ্বল দশকের প্রথমদিকে আবেদিন কমনওয়েলথ সরকারি বৃত্তিতে স্লেড স্কুল অব আর্টস্, লন্ডনে উচ্চতর শিল্পদীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। প্রায় এক বছর সেখানে চিত্র ও ছাপাইছবি বিষয়ে নিরীক্ষাধর্মী কাজ করেন—১৯৫১ সনের আগস্ট থেকে ৫২-র আগস্ট পর্যন্ত সেখানে ছিলেন (তথ্যসূত্র : সৈয়দ আজিজুল হক, 'জয়নুল আবেদিন', নিসর্গ ও মানবের গাথা : জয়নুল আবেদিনের শিল্পভুবন, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৮)। ওই সফর ও সংক্ষিপ্ত শিক্ষাকোর্স থেকে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন স্বকীয়তা বজায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের বাস্তববাদী শিল্পধরন কিংবা তাঁর অনুসৃত ইম্প্রেশনিস্ট ধারা প্রভাবিত ড্রইং-জলরঙ অভ্যাসকে পাশ কাটিয়ে ফরম-ভাঙা ও গড়ন-গঠনে অভিনবত্ব সন্ধানী সম-বাস্তবানুগ শিল্প-সৃষ্টিতে। বাংলাদেশের, প্রচলিত অর্থে আধুনিক নিরীক্ষামূলক শিল্পযাত্রার, শুভসূচনা এভাবে তাঁর মাধ্যমেই ঘটেছিলো। আর লন্ডনে অবস্থানরত তাঁর তৎকালীন কর্ম-সাধনার সবচেয়ে লক্ষণীয় বড়ো দিকটি ছিলো এই যে, বাংলা ও বাঙালি অন্ত প্রাণের এই মানুষটি স্বদেশী বিষয়বস্তুর পাশাপাশি গ্রামবাংলার প্রসিদ্ধ পুতুল বা টেপা-পুতুলের গড়নে লম্বা গলা ইত্যাদিসহ আধুনিক নির্মাণশৈলী বিন্যস্ত চিত্রাঙ্কন করেন। পরবর্তীকালে যে সমস্ত প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তাঁরা অনেকেই পরবর্তী সময়ে দেশের বাইরে গিয়ে হয়তো সময়োপযোগী শিল্পকলা বিষয়ে দীক্ষিত হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে, জয়নুল আবেদিন অনুসৃত ওই আধুনিক শিল্পধারা-আঙ্গিক তাঁদের প্রেরণার উৎসে ছিলো এবং তাঁরা স্বকীয়তা অর্জনের মাধ্যমে আরও অগ্রসর হয়ে এদেশের শিল্পাঙ্গনের অগ্রগতির পথ প্রশস্ততর করেছিলেন।

আবেদিন প্রতিষ্ঠিত সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং স্নাতক সম-মানের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্নকারী শিল্পকর্মীদের মধ্যে যাঁরা বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে হামিদুর রহমান একজন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উৎসপ্রেরণার কেন্দ্রভূমি রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত ভাস্কর্য-বৈশিষ্ট্যানুগ স্থাপত্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অন্যতম নক্শাবিদ, তিনিই প্রথম উচ্চশিক্ষার্থে ইউরোপ গমন করেন এবং সেখানেই (মন্ট্রিলে) অতিবাহিত করেন কৃতিত্বপূর্ণ জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। পরবর্তীতে আবেদিনের সমসাময়িক চিত্রশিল্পী ও দ্বিতীয় প্রজন্মের অনেক শিল্পকর্মীই প্রাচ্য-প্রতীচ্যে গমন করেছেন স্কলারশিপ নিয়ে কিংবা ব্যক্তিগত খরচে। যেমন "সফিউদ্দীন আহমেদ (১৯৫৮) ইংল্যান্ড, মোহাম্মদ কিবরিয়া (১৯৫৯-৬২) জাপান, আমিনুল ইসলাম (১৯৫৩-৫৬) ফ্লোরেন্স, রশিদ চৌধুরী (১৯৪৯-৫৪) স্পেন ও ফ্রান্স এবং আব্দুর রাজ্জাক (১৯৫৫-৫৭) যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে আসেন সরকারি বৃত্তির অধীন তাঁরা সবাই উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছেন এবং শিল্পকলার নানা শাখায় নানা মাধ্যমের প্রসার ঘটিয়ে নতুন প্রজন্মের সামনে বিস্তর সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোলকাতায় এবং ঢাকার তৎকালীন চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সমাপনকারী প্রথম দিকের ব্যাচের অনেকেই ষাটের দশকে বিভিন্ন শিল্প-শাখায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে আসেন শিল্পকলা ও টিচারশীপ কোর্সের অধীন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য : শফিকুল আমীন (১৯৬০-৬১) ইংল্যান্ডে টিচারশীপ কোর্স সম্পন্ন করেন এবং কাজী আব্দুল বাসেত (১৯৬২-৬৩) শিকাগো, জুনাবুল ইসলাম (১৯৬৬) যুক্তরাজ্য ও মীর মোস্তফা আলী (১৯৬৭) লন্ডনে যথাক্রমে পেইন্টিং, কারুকলা ও মৃৎশিল্পে দীক্ষা নেন।" (তথ্যসূত্র : মতলুব আলী, 'সৃজনশীল চারুশিল্প চর্চার পঞ্চাশ বছর', রূপবন্ধ, মানব প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৩২)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মূল ধারার তিন শিল্পীর মধ্যে জাতীয় অধ্যাপকের পদমর্যাদায় ভূষিত জয়নুল আবেদিন-এর নামের সঙ্গে আর যে দুজনের নাম উচ্চারিত হওয়া জরুরি, তাঁরা হলেন পটুয়া কামরুল হাসান ও শিল্পী এস এম সুলতান। কামরুল হাসান পাবলো পিকাসোর ছবির কিউবিক ফরম এবং যামিনী রায়ের চিত্রপটের রঙ তথা লোককলায় ব্যবহৃত বর্ণ-প্রাচুর্য আরোপিত খুবই প্রাচুর্যমণ্ডিত আপনার শিল্পভুবন রচনা করেছিলেন। শক্তিশালী ড্রইং, স্বচ্ছ-অনচ্ছ জলরঙ, ছাপাইছবি ও তেলচিত্রে অসাধারণ মেধা ও মননের পরিচয় রেখে গেছেন তিনি। অত্যন্ত কঠোর সমালোচকের ভূমিকায় প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্যের চিত্রচর্চার মাধ্যমেও একটি স্বতন্ত্র ও স্বকীয়তা সম্পন্ন কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আঁকা তাঁর বিখ্যাত দ্বি-রঙা পোস্টার-চিত্র 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার সামান্য আগে আঁকা 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' শীর্ষক ব্যঙ্গচিত্র দুটি তাঁর প্রতিবাদী মনোভাবের যথার্থ প্রমাণ। মূলধারার অপর শিল্পী এস এম সুলতানের শিল্পদর্শনে কৃষিজীবী মানুষের শক্তির পরিচয় সমুন্নত। প্রথমজীবনে মাতৃভূমি থেকে দূরে সরে গিয়ে ও পরিভ্রমণ করে এবং শিল্পকলাক্ষেত্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও শেষজীবন পর্যন্ত স্বদেশে অবস্থান করে অব্যাহত শিল্প-সাধনার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেন। তিনি সরকার

কর্তৃক দেশের প্রথম রেসিডেন্ট আর্টিস্টের সম্মান লাভ করেছিলেন। দেশী রঙ-উপকরণ ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সুলতান, প্রকাশ-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বাস্তববাদের ধ্বজা উড়িয়ে গেলেও তাঁর চিত্রপটে প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন এক আকাঙ্ক্ষার জগৎ যা আশাবাদের প্রতিভূ। তিনি মানুষকে কখনও ক্ষয়িষ্ণুরূপে দেখেননি, পেশীবহুল স্বাস্থ্যবান বিশালকায় মানুষ নর কিংবা নারী সর্বত্র কর্মে নিয়োজিত—সভ্যতার কারিগর মানুষ সর্বোপরি মহীয়ান। অঙ্কনরেখার কাঠিন্যে সম্পাদিত ঋজু ড্রইং ও গড়নে, আর জড়তাহীন স্বতস্ফূর্ত ভঙ্গিমার গঠন-আঙ্গিকে সৃষ্ট তার বিশাল বিশাল ক্যানভাসে তিনি নিজেকে একজন শক্তিমান শিল্পী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মানুষের মুক্তির সাধনা ছিলো তাঁর, নিজে মানুষ হিসেবে ছিলেন সন্তশ্রেণীর—অকৃতদার এই শিল্পস্রষ্টা প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন, ঐতিহ্য ও অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ভালোবাসতেন মাটির সংলগ্নতা, আর পশুপাখি-জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর প্রেমিক-মন উৎসর্গিত ছিলো ষোল আনা। প্রাতিষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব দেননি প্রচলিত ধরনে, ফলে তিনি শিল্পরূপাকৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে যে বনেদি ও ধ্রুপদী রূপ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন সব মিলিয়ে তা হয়ে উঠেছে মানবকৃতির স্বচ্ছন্দ প্রতিনিধি। ব্যক্তিগতভাবে একজন শিল্পস্রষ্টার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্ট কাজ হিসেবে যেমন, শৈল্পিক গুণে গুণান্বিত সত্তায় গড়ে ওঠা শিল্পকীর্তি হিসেবেও একথা সত্য।

লোক-ঐতিহ্যের প্রাচুর্যময় সম্পদশালী গ্রামীণ শিল্পীদের চারণভূমি বাংলাদেশ। খুবই স্বাভাবিক এখানকার একজন শিল্পীর কাজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হোক, আর সচেতনতার মধ্য দিয়েই হোক লোকজ শিল্পের প্রভাব-প্রতিফলন কিছু না কিছু থাকবেই—আর সেটা প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষভাবেও হতে পারে। এড়িয়ে চলা একরকম অসম্ভবই তার জন্য। ওই প্রভাব বিষয়বস্তু চয়নে আসতে পারে, প্রতীকরূপে আসতে পারে, কিংবা আসতে পারে রঙে-রেখায়—নানাভাবেই তা লক্ষণীয় হতে পারে। বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে গ্রামবাংলার ছাপ থাকবে না এমনটি সাধারণত আশা করা যায় না। দীর্ঘদিন স্পেনে (মাদ্রিদে) বসবাসকারী প্রিন্ট-মেকার হিসেবে সুবিদিত ষাটের দশকের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী মুনিরুল ইসলাম তাঁর বিমূর্ত আঙ্গিকের কাজে নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিশেষত তাঁর জন্মস্থান চাঁদপুরের প্রকৃতি-পরিবেশের ছাপ এখনো এসে যায় বলে তিনি নিজেই দাবি করেন; প্যারিস-প্রবাসী সত্তরের দশকের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন আহমেদ চিত্রপটে আজও বিদ্রোহী স্বদেশভূমিকেই ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট। এরকম উদাহরণ প্রবাসী জীবন যাপন করছেন এমন আরও একাধিক চারুশিল্পীর নামোল্লেখে দেয়া যাবে। সুতরাং নিজবাসভূমে অবস্থানকারী সক্রিয় চিত্রশিল্পীদের ক্ষেত্রে এ সত্য সম্পর্কে সহজেই ধারণা মিলতে পারে।

তবু আমরা জানি শিল্পকলার বাংলাদেশ পঞ্চাশের দশক থেকে চর্চাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিল্পধারা-আঙ্গিকের এতোটাই ঘনিষ্ঠ যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লোকশিল্প আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। যেটুকু প্রভাব আছে তা ক্ষীণ ধারায় প্রভাবিত। আর এ কথাটিও এক্ষণে বলে নেয়া প্রয়োজন যে, আমাদের দেশ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রাচ্য শিল্পকলা-আঙ্গিক বা ধারা কোনোটাই এখানে তেমন লক্ষণীয় মাত্রায় ছাপ ফেলেনি। আর

অন্যদিক থেকে ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানী কোনো স্থানের শিল্পকলার সাথেই বাংলাদেশের সৃজনশীল শিল্পাঙ্গন উল্লেখযোগ্য সাযুজ্য রক্ষা করে চলেনি। প্রাচ্যকলা আঙ্গিক-ধারার অনুসরণ এখানে ঘটবে, এমন কোনো সম্ভাবনা গোড়া থেকেই ছিলো না—কারণ আবেদিন-কামরুল-সফিউদ্দীনসহ এদেশের পথিকৃৎ শিল্পীগোষ্ঠীর কেউই কলকাতা আর্ট স্কুলের ওরিয়েন্টাল আর্ট শাখায় পড়াশুনা করেননি, উপরন্তু বাংলাদেশে গড়ে তোলা চারুকলার প্রথম শিক্ষায়তনের শিক্ষাক্রম তৈরি হয়েছিলো মূলত কলকাতা আর্ট স্কুলের ইউরোপীয় এ্যাকাডেমিক ধরনের কারিকুলামের অনুকরণে। শুরুতে এখানে শুধু খোলা হয়েছিলো একটি ড্রইং এ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ আর একটি কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ—পরবর্তীতে পালাক্রমে অন্যান্য বিভাগ খোলা হয়, তার মধ্যে প্রাচ্যকলা বিভাগও ছিলো, প্রথম ক্লাস শুরু হয় ১৯৫৫ সালে, যার খুব একটা জোরালো ভূমিকা কখনোই লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি বাংলাদেশের শিল্পচর্চার অঙ্গনে। তার কারণ বোধ হয় এই যে দীর্ঘদিন এই শিল্পশাখা মূলত পাশ্চাত্য-আঙ্গিকের চর্চাবিদ, অঙ্কন ও চিত্রণ শাখায় অভিজ্ঞ শিল্পীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। ভারতীয় চিত্ররীতিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুলেরও তেমন কার্যকর প্রভাব প্রায় কখনোই তেমন জোরালোভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি এদেশের প্রথম প্রজন্মের চারুশিল্পীদের কর্মধারায়।

ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে দেখা যায় বিষয়বস্তুভিত্তিক বা বাস্তববাদী ধারার শিল্পচর্চা যখন তুঙ্গে—সেই আমলে, এক্ষেত্রে আমি রবি বর্মা (১৮৪৮-১৯০৬) থেকে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯৪-১৯৪৮) প্রমুখের কর্মকালের কথা বলছি, তখন পৌরাণিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব খুবই ছিলো। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই পুরাণকেন্দ্রিক ছবি কিংবা তান্ত্রিক বিষয়াদি নিয়ে শিল্প সৃষ্টির প্রবণতা প্রায় সব সময়ই লক্ষণীয়। কারণটা স্বাভাবিক—বর্তমানেও তার প্রতিফলন মিলবে; বাংলাদেশে একেবারেই কম ঘটেছে তা, উল্লেখ করবার মতো নয়। প্রসঙ্গত, সবিনয়ে বলি, পশ্চিমবঙ্গে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে পত্র-পত্রিকার আকর্ষণীয় পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হয় ফি-বছর, যাতে প্রতিমা কিংবা দেব-দেবী উপজীব্য হিসেবে গৃহীত ও চিত্রিত হয়ে থাকে। সর্বশ্রেণীর মানুষ খুবই আগ্রহভরে সেসব সংগ্রহ করেন। তার বিপুল চাহিদা সবসময় রয়েছে বাংলাদেশেও। ওইসব প্রকাশনার ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের আঁকা প্রচ্ছদ এবং দুয়েকসময় ভেতরে ড্রইং-স্কেচ ধরনে কিংবা স্বয়ংসম্পূর্ণ পেইন্টিং হিসেবে চিত্রকর্ম ছাপা হয়ে থাকে—দেখা যায় খ্যাতনামা সৃজনশিল্পীরাও তাতে কন্ট্রিবিউট করেন। সমকালে বাংলাদেশের ধর্মীয় উৎসব বা পরবে ওই ধরনের পরিস্থিতি ঘটার কোনো কারণই নেই, ঈদ উপলক্ষে প্রকাশিত বার্ষিক সংখ্যাগুলিতে শিল্পকর্মের নমুনা মুদ্রিত হয়, কখনো শিল্পীদের নিয়েও পরিচিত-প্রতিবেদন থাকে—কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়াদির কোনো সম্পর্ক তেমন থাকে না। এই হচ্ছে বাংলাদেশে শিল্পচর্চার প্রকৃতিগত একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা এ মুহূর্তে জরুরি যে, পাকিস্তানী আমলে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক শিল্পীর মতো ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি ভিত্তিক চিত্রচর্চার প্রবণতা আমাদের পূর্বাঞ্চলেও কিছু কিছু শিল্পীর মধ্যে ছিলো। তাছাড়া নিয়মিতভাবে ধর্ম-কর্মে আত্মনিবেদিত, এমন শিল্পী যেমন ছিলেন বা আছেন—আরবী অক্ষরলিপি নিয়ে চর্চা-গবেষণার মাধ্যমে চিত্রপট রচনা

করেন এমন কর্মরত শিল্পীও খুঁজলে একাধিক সংখ্যক পাওয়া যাবে—শিল্পী সাইফুল ইসলাম এক্ষেত্রে অগ্রণী একজন। যিনি চারুকলার ডিগ্রীধারী নন, কমার্সের স্নাতক এবং শিল্পকলাক্ষেত্রে স্বশিক্ষিত পেশাদার চিত্রশিল্পী—প্রতিকৃতি শিল্পী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত। এ কাজে দেশের অগ্রবর্তী সারির সৃজনশিল্পীদেরও সম্পৃক্ত হতে অনেক সময়ই হয়তো দেখা গেছে—কিন্তু সত্যি বলতে কি বাংলাদেশের বৃহত্তর শিল্পকলাঙ্গনে তা কোনো সামষ্টিক ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যরূপ নিয়ে কিংবা কোনো ব্যাপক রূপ-চারিত্র্যে চিহ্নিত হয়নি—ইনডিভিজুয়াল পর্যায়েই রয়ে গেছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এখানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা ইসলাম ধর্মের সঙ্গে একশত ভাগ মানসিক সম্পৃক্ততার চেতনার প্রেক্ষিতে এই ধারার শিল্পচর্চা যতোটা না করেছেন, তার চেয়ে বেশি তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট এ জাতীয় কাজের চলমান বাজারের দিকে। তার প্রমাণ সাইফুল ইসলামই, কারণ প্রতিকৃতি অঙ্কন যাঁর পেশা তিনিই ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিরও বিশেষজ্ঞ—দুটি দুই মেরুর জিনিস আবার একদিক থেকে পরস্পর বিরোধীও। আমার এই ক্ষুদ্র আলোচনায় এতোসব প্রসঙ্গের অবতারণা শুধুমাত্র একটি কথা বলার জন্য যে, পঞ্চাশের দশকে পাশ্চাত্যের শিল্পধারার অনুকূল যে শিল্পাঙ্গনের ভিত্তি রচিত হয়েছিলো বাংলাদেশভূমিতে, সামগ্রিক অর্থে দেশজ রীতিনিরপেক্ষ যে সৃজনশীল বৈভবের বীজ বোনা হয়েছিলো সেদিন সাড়ম্বরে, তা শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে আজ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চারুশিল্পীদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সুনিশ্চিত হয়েছে একদিকে, আবার অন্যদিকে বাংলাদেশ শিল্পাঙ্গন নিজস্ব পরিচয়ে অভিষিক্ত হয়ে স্বদেশভূমিতেই রচনা করেছে বিশ্ব শিল্পকলার এক ক্ষুদ্রায়তন চারণক্ষেত্র। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি দুবছর অন্তর জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী (১৯৭৫ থেকে), তরুণ শিল্পী জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছে নিয়মিত—তারই পাশাপাশি দ্বি-বার্ষিক আয়োজনে এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে (১৯৮১ থেকে); একটা পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক শিল্প-আবহ তৈরি হয়েছে সব মিলিয়ে। এ ছাড়াও শিল্পকর্মের ভালো একটা বাজারও বর্তমানে আমাদের এ অঙ্গন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক গ্যালারীর উদ্যোগে প্রদর্শনীসহ বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে এখন যা এই বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনকে উজ্জীবিত রাখতে সহায়ক। চারুশিল্পীরা ব্যক্তিগত পর্যায়েও এ থেকে অনুপ্রাণিত বা উপকৃত হচ্ছেন। দেশের বাইরেও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানাস্থানে একক ও গোষ্ঠী প্রদর্শনী করে আসছেন কৃতিত্বের সঙ্গে আমাদের চিত্রশিল্পী-ভাস্করেরা, বিদেশীদের সঙ্গে যৌথ প্রদর্শনীর সংখ্যাও কম নয়।

বাংলাদেশের শিল্পকলা বিকাশের বেশ কিছু টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করার আছে। ওই সমস্ত বাঁক আমাদের শিল্পাঙ্গনকে রসসিঞ্চন করেছে। প্রজন্ম-পরম্পরায় শিল্পকর্মীরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং তারই অনুকূলে পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে এই অঙ্গন। ১৯৪৮-এ চারুকলা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো যখন, ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাতও সেই সময়েই। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, বাঙালির জাতীয় জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা একসঙ্গে ঘটেছিলো। বলাবাহুল্য ওই ঘটনাবলির কোনোটাই ইসলাম-ধর্মীয় চেতনার সমান্তরাল ছিলো না—প্রথমত বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার যে সংগ্রাম তা

ছিলো বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদা দানের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। যেক্ষেত্রে আরবী হচ্ছে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ধর্মগ্রন্থের ভাষা এবং যেখানে অবাঙালিদের এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের অন্যতম প্রধান চর্চিত ভাষা উর্দুর চাপও ছিলো প্রবল, পাকিস্তানের জাতির জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে সেই মর্মে ভাষণ প্রদানকালেই সচেতন বাঙালি সন্তানদের সোচ্চার প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়েছিলো এবং দ্বিতীয়ত ঢাকায় শিল্পচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ কিংবা শিল্পী-সমাজ তৈরির জন্য চিত্রাঙ্কন বিদ্যালয় তথা উচ্চতর চারুশিল্প শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার যে পদক্ষেপ তা ওই সম্প্রদায়ের সামনে তৎকালে একরকম হুমকিস্বরূপই ছিলো। আজ আর নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার প্রয়োজন হয় না যে, সেদিনের সেই উল্লেখযোগ্য দুটো ঘটনার চারিত্র্যরূপে মূলত কোনো দূরত্ব বা পার্থক্য ছিলো না, বরং তাদের মধ্যে নিকটত্বই ছিলো, ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলো তারা। ফলে এই মাটিতে যখন একটি আনকোরা নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শিল্পচর্চার সূত্রপাত ঘটছে তখন তারই পাশাপাশি এক অর্থে ভাষা আন্দোলনের সৈনিকও তৈরি হচ্ছে এটাই আমাদের আজ বিশ্বাস করতে হয়। ভাষা-সৈনিক শিল্পী ইমদাদ হোসেন, মূর্তজা বশীর বা শহীদ মিনারের অন্যতম নকশাকারী এবং একাত্তরে পাকিস্তানী হানাদারদের ধ্বংসকৃত শহীদ মিনার পাদদেশের মুরালস্রষ্টা হামিদুর রহমান প্রভৃতি সেই সৈনিকেরা, আবেদিন-কামরুল-সফিউদ্দীনেরা তো আগের সারিতে ছিলেনই। সুতরাং বৃটিশযুগ পরবর্তী পাকিস্তানী আমলের প্রারম্ভেই সেই প্রথম বাঁকটিরও উৎপত্তি, যা শুরু থেকেই একটি অঘোষিত নির্দেশনামা আমাদের শিল্পচর্চার অঙ্গনে রেখে গিয়েছিলো—যার ফলে ইসলামী ক্যালিগ্রাফী নয় বাংলা অক্ষরের দিকে ঝুঁকেছিলেন চিত্রশিল্পীরা। আর তখন থেকেই প্রতিবাদী ও প্রগতিবাদী শিল্পধারার প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিলো তাঁদের। ড্রইং-স্কেচের মাধ্যমে পোস্টার-ফেস্টুনে শহীদ দিবসের সংকলনসহ সংবাদপত্র-পত্রিকায় অজস্র ছবি এঁকেছিলেন তাঁরা দিনের পর দিন; মূর্তজা বশীরের লিনোকাট স্মরণযোগ্য, ফি-বছর শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত কিংবা গণ-জাগরণমূলক বিষয়-উপজীব্যের, শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার, রফিকুন নবী প্রমুখ ও বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত ভিন্নধর্মী ব্যানার-পেইন্টিং এমনকি তাঁদের আঁকা ছাপচিত্র বা তেলচিত্রকর্মেও ভাষা-আন্দোলনের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যেন শিল্পের নব-জাগরণ সংঘটিত হয়। প্রবীণ থেকে নবীন শিল্পীটি পর্যন্ত অনুপ্রাণিত নবরূপী মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশের স্বরূপ দেখে। সেই কারণে স্বাভাবিকভাবেই শিল্পকলাও নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। বাঙালির দেশাত্মবোধের জাগরণ উৎসারিত অর্জিত বিজয় এ দেশের মানুষের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশেষ করে নাটক ও গানে নতুন চিন্তা-চেতনার জন্ম দেয়। শিল্পকলা ক্ষেত্রে ভাস্কর্য শাখাটি উজ্জীবিত হয় সবচেয়ে বেশি। কারণ সদ্য স্বাধীন গোটা দেশে তখন স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। সেই কাজটি ভাস্করদের সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হতে থাকে। এ ছাড়াও ভাস্কর্য গড়ার কাজটিও নতুনভাবে শুরু হয়। সৃষ্টি হয় গাজীপুর চৌরাস্তার মোড়ে স্থাপিত দেশের অন্যতম পথিকৃৎ ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী আব্দুর রাজ্জাক কৃত 'গ্রেনেড হাতে মুক্তিযোদ্ধা'। হামিদুজ্জামান খানের

'মুক্তিযোদ্ধা' স্থাপিত হয় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে, কিংবা 'সংশপ্তক' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে বসানো হয় সৈয়দ আব্দুল্লাহ্ খালিদের সমধিক পরিচিত ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলা'। শামীম সিকদারের 'স্বোপার্জিত বাংলা'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বজন হারানো শোকের পাহাড় বুকে নিয়ে ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াতে চেষ্টা করে বাংলাদেশ। নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করে এদেশের মানুষ। সেই সমস্ত দুঃখ-বেদনা সুখ ও স্বপ্ন ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে নতুন এক চিত্রভুবনও। এভাবেই বাংলাদেশের চিত্রকলা তথা শিল্পকলাঙ্গন নতুন এক চারুশিল্প অঙ্গনের দিকে মোড় নেয়। চিত্রশিল্পীদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন আহমেদ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে একসার তেলচিত্র অঙ্কন করেন এবং প্রদর্শনী করেন। অন্যান্য মাধ্যমেও নানা শিল্পী নানাভাবে কাজ করেন। জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান এস এম সুলতানসহ প্রায় সব শিল্পীই কিছু না কিছু আঁকেন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়-উপজীব্য নিয়ে। তরুণেরাও আঁকেন, আজও ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে।

এশীয় দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীর সূত্রপাত ঘটার পর বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। নতুন মাধ্যম বা নতুন শিল্পোপকরণ তাদের হাতে উঠে আসে। বাইরে থেকে অর্থাৎ এশিয়ার অন্য দেশগুলো থেকে আসা বিচিত্র মাধ্যম বিশেষত 'ইনস্টলেশন' জাতীয় কাজ এবং বিচিত্র উপকরণসমৃদ্ধ কনস্ট্রাকশন মার্কা কাজ ইত্যাদি শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করে। নিষ্ঠাবান কর্ম-প্রচেষ্টার পাশাপাশি চমক ও স্টান্টসর্বস্ব কাজও দেখা যায়। এগুলো সবই আমাদের তরুণ শিল্পীদের প্রভাবিত করে। কীর্তিমান নতুন প্রজন্মের চারুশিল্পীদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করতে পারলে নিবন্ধকারের হয়তো স্বস্তি মিলতো—কিন্তু বাঙালিমনের আবেগ যদিবা সময়-সুযোগের তোয়াক্কা না করে, একজন নিবন্ধ উপস্থাপকের তো সেদিকে খেয়াল রাখতেই হবে।

মোটামুটিভাবে শিল্পচর্চাক্ষেত্রে যে-সমস্ত শাখা প্রসার লাভ করেছে এবং আমাদের সৃজনশীল শিল্পশাখাসমূহ দেশের চলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে প্রভাবশীল অস্তিত্বে বিরাজ করে, তাঁদের পরিসর নিঃসন্দেহে বিস্তৃত। এ বিষয়ে কিছু আলোকপাতের চেষ্টা করা যাক।

পেন্সিল, চারকোল, ক্রেয়ন, কালি ও কলম, তুলিরেখাসহ একাডেমিক ড্রইং থেকে নিয়ে নিরীক্ষাধর্ম ড্রইং-এর প্রচলন বাংলাদেশ শিল্পাঙ্গনে সব সময়ই আছে। সাধারণ অর্থে চিত্রশিল্পীদেরই ড্রইং-এর দিকে ঝোঁকটা বেশি থাকলেও, শিল্পচর্চাক্ষেত্রে প্রচলিত সব শাখাতেই ড্রইং-এর প্রয়োজন রয়েছে আর ড্রইং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ছাপচিত্রশিল্পীদের এবং ভাস্কর্যশিল্পীদের ড্রইংচর্চা সমধিক, ছাপাইছবি ও কারুশিল্পসহ সকল শাখায় প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিতে প্রচলিত ধারায় রেখাঙ্কন, নিরীক্ষাধর্মী ড্রইং ও স্কেচ্ বাংলাদেশের শিল্পীদের প্রিয় ক্ষেত্র। স্কেচী রেখার সঙ্গে জলরঙ ওয়াশে আবেদিন সাফল্যের চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছিলেন। তাঁকে

অনুসরণও করেছেন প্রজন্ম পরম্পরায় অনেকেই। তবে তাঁর সুস্পষ্ট মৌলিকত্ব বিস্তারি সাদা-মোমরেখার শিল্পিত কন্ট্যুর অন্য কোনো চিত্রশিল্পীর চিত্রপটে ততোটা সাবলীলতায় উদ্ভাসিত হয়নি। আর আবেদিনের নিরীক্ষাধর্মী ড্রইং বৈ এ নয়। কামরুল হাসানও লোকশিল্পের মটিফ কিংবা প্রতীকী রূপবন্ধে তুলি ও কালির রেখায় ছোট মাপের কাগজে শত শত ড্রইং করে গেছেন। তাঁর অঙ্কনরেখার বলিষ্ঠতা ইলাস্ট্রেটিভ সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে সফল ব্যঙ্গচিত্রের ভুবনে অভিষিক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি অসমতুল। ছাপাইছবির দক্ষ কারিগর সফিউদ্দীন আহমেদ কাঠ-খোদাই ও এনগ্রেভিং-এ নিজস্ব ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারের যোগসূত্রে কাগজের উপর চারকোলের রেখা ও টোনে অসাধারণ নিপুণ বাস্তবানুগ শিল্পের স্বাক্ষর রেখেছেন। ড্রইংক্ষেত্রে সমকালে নিরীক্ষার পাল্লাটাকে অধিকতর জোরদার করেছেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম। তিনি শিল্পিত ও কল্পিত রূপের অবস্তুক চিত্রপট তৈরি করেছেন তুলি-কালি সহযোগে অথবা অভিনব শিল্পরূপ ফোটাতে হাতের কাছে প্রাপ্য যে কোনো অবলম্বন দিয়ে। ড্রইংরেখার ব্যতিক্রমী ব্যবহারে মনসুর-উল-করিম তাঁর প্রশংসাধন্য চিত্রাবয়বে এনেছেন ভিন্নতা। বলিষ্ঠ গড়ন-গঠনের বাস্তব অনুসৃত মানবাকৃতি ফুটিয়ে তুলতে জামাল আহমেদের শিল্পিত অঙ্কনরেখার কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। তরুণ প্রজন্মের স্বনামধন্য সফল ব্যঙ্গচিত্রী শিশির ভট্টাচার্য চিকন রেখার বৈভব সম্পন্ন গুণময়তার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে গড়ে তুলেছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্রাবলি। এখানে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম। এই অসম্পূর্ণতার জন্য সঙ্গত কারণে প্রকাশজনিত অতৃপ্তি নিয়েই আমাকে পুনর্বার সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে সবচেয়ে বড়ো শাখাটি হচ্ছে পেইন্টিং বা রঙতুলি ইত্যাদিতে সৃষ্ট ক্যানভাসচিত্র। অধিকাংশ শিল্পীই বলা যায় এই মাধ্যম ও ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তেলরঙ, এ্যাক্রিলিক, মিশ্রমাধ্যম ছাড়াও কোলাজ-আঙ্গিকে শিল্পীরা কাজ করে থাকেন। কাগজের উপর স্বচ্ছ জলরঙে কিংবা গোয়াশ ও প্লাস্টিক রঙেও বাস্তববাদী এবং সম-বিমূর্ত প্রকাশবাদী নিরীক্ষাধর্মী অবস্তুক কাজ ইত্যাদিরও প্রচলন রয়েছে। সকল বয়সী সব শ্রেণীর চারুশিল্পীই এসব মাধ্যম-প্রকরণে কাজ করে থাকেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই চিত্রশিল্পীরা একাডেমিক ধারার বাস্তবভিত্তিক কাজের পাশাপাশি সম-বিমূর্ত ও প্রতীকী ঢঙের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রেখা ও রঙের বিভাজনই তখন চিত্রাবয়ব গড়ে তুলতো। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণশেষে ফিরে এলে পর বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয় আমাদের শিল্পাঙ্গন। ষাটের দশকেই শিল্পাঙ্গনে নির্বস্তুকতার প্রতি চারুশিল্পীদের আগ্রহ-লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়। তবে বিমূর্ত ও সম-বিমূর্ত ধারায় মুর্তজা বশীর-কিবরিয়া-সফিউদ্দীন আমিনুল-বাসেতসহ দ্বিতীয় প্রজন্মের চারুশিল্পীদের কর্মসাফল্য স্মরণযোগ্য। পরবর্তীতে, স্বাধীনতা উত্তরকালে নতুন প্রজন্মের কর্মোদ্যোগ ও তৎপরতায় বিষয়বস্তুনির্ভর কিংবা থিম-নির্ভর শিল্পচর্চার প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রকাশ-আঙ্গিকে খুব একটা পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে চোখে না পড়লেও শিল্পীদের অভিনবত্ব সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। আশি ও নব্বই-এর দশকে চারুশিল্পীদের ব্যাপক সমাবেশে রঙ-নক্শায় বিষয় ও বিষয়ী বৈচিত্র্যে যুক্ত হয় নব-নব মাত্রা। এশীয় চারুকলা দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনীতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বিচিত্র শিল্প-সম্ভার আসে—

তার সরাসরি প্রভাব আমাদের চিত্রাঙ্গনকে নানাপথে ধাবিত করে। এছাড়াও নবীন ও তরুণ প্রজন্মের বহু চিত্রশিল্পী ভারতে এবং চীন-জাপানে গিয়ে উচ্চতর শিল্পদীক্ষা নিয়ে আসে—তাঁদের মাধ্যমে প্রকাশ-আঙ্গিকের বা অঙ্কনশৈলীর বিচিত্র দিকসকল উন্মোচিত হয়, তাৎপর্যমণ্ডিত শিল্পগুণ ও নিপুণতায় তাঁরা অগ্রজদের সাফল্যের ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত করেন। বিষয়-উপজীব্য গ্রহণেও তাঁদের অভিনবত্ব দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। শুধু সুন্দরের আরাধনা নয়, নবীন প্রজন্মের চিত্রশিল্পীরা সমাজের প্রতি সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকাতে শেখেন। তাঁদের চিত্রপটে টেনশন আসে, শ্রেণী-শোষণের প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁরা অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেন। আবার কেউ চান স্বদেশভূমির নিজস্ব পরিচিতিমূলক একটা শিল্পধারার উন্মেষ ঘটাতে। যেমনটি ধারাবাহিক কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আশা করেন নাসরীন বেগম। এছাড়াও মুক্ত স্বাধীন বিন্যাসে, লোকচিত্রের আলোকে কিংবা নবতর চিন্তা-চেতনার আলোকে চিত্রকলার নতুন ভুবন রচনা করতে চান মধ্যবয়সী কিংবা নবীন-তরুণদের অনেকেই। সত্তরের দশকের শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ্ এক্ষেত্রে অগ্রণী চর্চাবিদ।

চারুশিল্পের অতীত ঐতিহ্যের বনেদি ধারাবাহিকতায় অঙ্কন ও চিত্রণের পাশাপাশি সমান্তরাল গতিতে চলে আসা ছাপচিত্র বা ছাপাইছবি বাংলাদেশেও তার ভূমিকা বজায় রেখেছে। কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক-শিল্পী যাঁরা এখানে এসে শিল্পী তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হবিবুর রহমান ও সফিউদ্দীন আহমেদ ছাড়াও জয়নুল আবেদিনসহ অনেকেরই ছাপচিত্রাঙ্কনের অভিজ্ঞতা ছিলো। পরে এসেছিলেন মোহাম্মদ কিবরিয়া। শিল্পী সফিউদ্দীন ও কিবরিয়া পরবর্তীকালে যথাক্রমে বিলেত ও জাপান থেকে এই মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে আসেন। মূলত তাঁদের সবার প্রেরণা ও প্রশিক্ষণেই এদেশে ছাপচিত্রের বিকাশ ঘটে। স্মরণযোগ্য শিল্পী মাহমুদুল হকের নাম। পরবর্তীকালে প্রিন্টমেকিং নামে খ্যাত এই মাধ্যমটিতে আরও অনেকেই উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। গোড়া থেকেই পাশ্চাত্যের প্রভাব ছিলো। বিশেষত ছাপাইছবির আঙ্গিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটি, অঙ্কনরেখা ও কন্টুর বা পরিণাহ প্রতিষ্ঠার দিক—এনগ্রেভিং, এচিং, লিথোগ্রাফ ইত্যাদি সর্বত্রই তা প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের পরিবেশে প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং আধুনিকতা দুই-ই বিকশিত হয়েছে পশ্চিমের ধ্যান-ধারণা কেন্দ্রিক শিল্প-ঐতিহ্যের পথ বেয়ে, সুতরাং ছাপচিত্র বিষয়টিও এই সত্যের বাইরে কখনো ছিলো না বা এখনো নেই। পঞ্চাশ থেকে দু হাজার পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে আমাদের শিল্পাঙ্গনে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে এই শিল্পশাখাটিতে চিত্রকর-ভাস্করসহ সৃজনশীল কারুশিল্পী ও গ্রাফিক ডিজাইনার সবাই আগ্রহী হওয়ায় শিল্পীদের সবার মধ্যে এবং সমঝদারদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা ও কদরও সমধিক। এই মাধ্যমে দেশের বাইরে গিয়েও আমাদের চিত্রশিল্পীরা মর্যাদাসম্পন্ন আসন করে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, এ কথা সুবিদিত।

আমাদের দেশে সামাজিক বা গোষ্ঠীগত প্রতিবন্ধকতা যতোই থাকুক না কেন চারুশিল্পীদের শিল্প-প্রচেষ্টার আন্তরিক তাগিদ এবং নিষ্ঠা-অঙ্গীকারের কাছে তা ধোপে টেকেনি—ভাস্করদের অগ্রযাত্রা আমরা লক্ষ্য করেছি সমধিক মাত্রায়। ঢাকার তৎকালীন চারু ও কারুকলা

মহাবিদ্যালয় ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত হয়। তার পরেই সেখানে ভাস্কর্য বিভাগ খোলা হয়। "...পূর্বে ভাস্কর্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি কারণ এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন না এবং ভাস্কর্যের মতো বিষয় সংযোজনের ক্ষেত্রে সমাজে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে শিক্ষকরা সংশয়ও বোধ করতেন।" (তথ্যসূত্র : বার্ষিক প্রদর্শনী ২০০৪ উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-২২) বাংলাদেশে প্রচলিত শিল্পকলার মধ্যে এই শাখাটিকে সবচেয়ে বেশি স্ট্রাগল করতে হয়েছে। কিন্তু এখন তা বিপুলায়তন। বহু শিল্পকর্মী আজ এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে অনেকেই আজ স্বনামধন্য। অনেকেই ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন এবং মূলত তাঁদের মাধ্যমেই নতুন প্রজন্মের চারুশিল্পীরা অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত হয়ে শিল্পসৃষ্টির বিচিত্র পথে উৎকর্ষ ও সাফল্যের মধ্যে ভাস্কর্য এগিয়ে চলেছে। ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান এনামুল হক এনাম প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। ভাস্কর্যে একাডেমিক শিক্ষা নেই, হয়তো অন্য শাখার ডিগ্রী নিয়েছেন অথবা তাও গ্রহণ করেননি, সামগ্রিক অর্থেই স্বশিক্ষিত এমন শিল্পকর্মীও মানসম্পন্ন ভাস্কর্য গড়েছেন, পুরস্কৃত হয়েছেন। এতোটা ইতিবাচকতার পরেও এবং ক্রিয়েটিভিটির মাত্রার কোনো ঘাটতি নেই এমন পরিচয়ে আমাদের ভাস্কর্য স্বীকৃত হলেও বাস্তববাদী দিকটা তেমন আশানুরূপ চর্চিত হয়নি। আমাদের ভাস্কর্যচর্চার শুরুটাই আধুনিকতা ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। প্রথম ভাস্কর নভেরা আহমদ থেকে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী পর্যন্ত যদি অনুসন্ধানে যাই তাহলে এটাই বলতে হবে যে, শিল্পকর্মের শক্তি ও সাহসের সবচেয়ে বড়ো মাপটি আমাদের দেশে ভাস্কর্যই প্রমাণ করেছে।

"...বৃহৎ বঙ্গে চিত্রকরদের ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বী চিত্রকর থাকলেও আমার অনুসন্ধানমতে একজনও মুসলমান-ধর্মীয় ভাস্কর পাওয়া যায়নি। এই ক্ষেত্রে একটি রক্ষণশীলতা পরিলক্ষিত হয় এবং এই অবস্থা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পর্যন্ত স্থায়িত্ব নেয়।

বাংলাদেশে সমকালীন আধুনিক শিল্প আন্দোলনে প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মূলত চারুশিল্প ভিত্তিক শিল্প সম্ভার ও মনন নিয়ে অগ্রযাত্রা করলেও শিল্প ইতিহাসের অন্যতম জোরালো মাধ্যম ভাস্কর্য বিষয়কে তিনি তাঁর শিল্প-যাত্রার সঙ্গী করেননি। ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে ভাস্কর্য কর্মকে 'মূর্তি' চিহ্নিত করে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং তার থেকে অঙ্কুরেই যাতে এই শিল্পের অগ্রযাত্রায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় তার জন্য এই অধ্যায়টিকে সচেতন ভাবেই হয়তো এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু উপেক্ষিত রাখেননি। ধীরে চল নীতিতে এইক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন, কারণ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়েই ১৯৬৪ সালে ভাস্কর্য বিভাগ খোলেন।

তথাপি বলা যেতে পারে এই প্রতিকূল অবস্থাকে সামনে রেখেই ভাস্কর নভেরা বাংলাদেশে প্রথম আধুনিক আঙ্গিকে ভাস্কর্য চর্চায় এগিয়ে আসেন, যা এদেশের শিল্পী, শিল্প-রসিক ও

জনগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও অনুপ্রেরণার খোরাক যোগায়। নির্দ্বিধায় বলা যায় বাংলাদেশে আধুনিক ভাস্কর্য রচনায় যেটুকুই অগ্রগতি সাধিত হোক না কেন এর প্রথম প্রেরণার উৎসে এককভাবে ভাস্কর নভেরা আহমেদের অবদানকেই স্বীকৃতি দেয়।" (আনোয়ারুল হক, 'নভেরা ও তাঁর ভাস্কর্য, চিন্তা ও চেতনায় সমীকরণ', রূপবন্ধ, মানব প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৯১)

উল্লেখ থাকে যে, ১৯৩০-এ জন্মগ্রহণকারী ভাস্কর নভেরার আদি নিবাস ছিলো চট্টগ্রামে, কলকাতায় থাকতেন, স্কুলের পড়াশুনাও কলকাতাতেই। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে লন্ডনের ক্যাম্বারওয়েল স্কুল অব আর্টস্ এ্যান্ড ক্র্যাফ্টস্-এ ন্যাশনাল ডিপ্লোমা ইন ডিজাইনের চার বছরের মডেলিং ও স্কাল্পচার কোর্স সম্পন্ন করে ১৯৫৬ সালে ঢাকায় আসেন এবং সৃজনশীল ভাস্কর্যের বুনিয়াদ গড়েন। যার মধ্যে ইউরোপীয় আধুনিক ভাস্কর্যের ছাপ ছাড়াও বাংলার লোকশিল্পের প্রতিফলন পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ভাস্কর্যক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের শুরু হয়েছিলো নভেরার সেই কর্মকাণ্ড গ্রহণের অনেক পর, এ কথা আজ সর্বজনবিদিত। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর কথা উল্লেখ করেছি ইতিপূর্বে। তিনি স্ব-শিক্ষিত চারুশিল্পী। সংগৃহীত কাঠ ও গাছের গুঁড়ি শিকড়-বাকড় ইত্যাদি দিয়ে সফলভাবেই গড়ে তুলেছেন ভাস্কর্যের আপন ভুবন। স্ব-শিক্ষিত গুণী ভাস্কর রাসার কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুটিরশিল্পের এক শক্তিশালী ভিত্তি আমাদের গ্রামীণ হস্তশিল্পীরা গড়ে তুলেছিলেন। যুগ যুগ ধরে তা মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন যেমন মিটিয়েছে, তেমনই তার সুন্দরের প্রতি আকর্ষণের তৃষ্ণাও মিটিয়েছে। যে-হাতের যথাযথ ব্যবহার শিখে একদিন মানুষজাতি নিজেকে চতুষ্পদ জীবের পরিচয় থেকে মুক্ত করেছে, যার জন্য বর্বর দশা থেকে সভ্য মানুষের পরিণত হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছিলো সে; প্রবৃত্তির পথ ধরে সেই গড়ে ওঠা মানুষের সেই দুটি হাতই শিশুকাল থেকে সুন্দর কিছু গড়ার নেশায় উজ্জীবিত করেছে তাকে। আর তারই ধারাবাহিকতায় সে হাতের কাজ রপ্ত করেছে, কারুকর্মের মধ্য দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছে। আজ আধুনিক কলাশিল্পের অঙ্গনে সেই আদিকালের কারুশিল্প উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে সময়োপযোগী চারুশিল্পের সীমানায় বিরাজ করে। সুকুমার কলায় স্নাতক-স্নাতকোত্তর কোর্সে পড়ায় আগ্রহী আর্টের শিক্ষার্থীরা এখন আর ভাবতে পারে না যে, কারুকলাটা গ্রামীণ একটা ব্যাপার। কারণ ইতোমধ্যেই তা সৃজনশীল গুণময়তার মধ্য দিয়ে চিত্রশিল্প-ছাপচিত্র কিংবা ভাস্কর্যের মতোই গুরুত্ব পেয়ে গেছে। সেজন্য তা চিহ্নিতও হচ্ছে সৃজনশীল কারুশিল্প হিসেবে। শিল্পকলার অন্যান্য শাখাগুলির মতো এ শাখাটিও বিকশিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম উচ্চতর শিল্প-শিক্ষায়তন কেন্দ্র করে। আশির দশক থেকে এ বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স শুরু হয়েছিলো: মাস্টার্স তার পরে চালু হয়েছে এবং এখন সম্মান কোর্স চলে এখানে। বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্ট ট্যাপেস্ট্রি, কাঠ ও ধাতব বস্তুর রিলিফ-কর্ম আর নক্শী জাতীয় কারুকাজ সবই এখন শহুরে শিল্পীদের হাতে হচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে এ বিষয়ের পথিকৃৎ শিল্পী জুনাবুল ইসলাম তিনি ক্রিয়েটিভ পেইন্টিং-এর সমমানে উত্তীর্ণ করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন সমবিমূর্ত কিংবা বিমূর্ত ধারার চিত্রপটতুল্য বাটিক সৃষ্টিতে। সফলও হয়েছেন। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী আব্দুস শাকুর

শাহ্ কারুকলার মাধ্যম-উপকরণ সঙ্গী করে নিরীক্ষাধর্মী গঠন-বিন্যাস ও উপস্থাপনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অধুনা ইতালী প্রবাসী শিল্পী শফিকুল কবির চন্দন ট্যাপেস্ট্রি মাধ্যমে নকশা-মটিফ কিংবা আলোছায়া বিন্যস্ত পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনা করেছেন যা যে-কোনো একটি ভালো মানের ক্যানভাসে আঁকা তেলচিত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমের চিত্রকর্মের সমতুল্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সৃজনশীল কারুশিল্প মানসম্পন্নতায় এখন স্বীকৃত।

সৃজনশীল মৃৎশিল্পও আমাদের শিল্পাঙ্গনের একটি ক্রম-অগ্রগণ্য শিল্পশাখা। বাংলাদেশে কুমোরবাড়ি কেন্দ্রিক মাটির কাজের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। হাতের কাজের সেই স্তর থেকে হুইলের কাজ এবং তারই ধারাবাহিকতায় পোড়ামাটির উন্নত মানসম্পন্ন শিল্পিত কাজ এবং রঙিন, নিপুণ কারিগরিতা ও সৃজনশীলতার গুণে সমৃদ্ধ মৃৎশিল্প গড়ে তুলেছেন আমাদের আধুনিক মৃৎশিল্পীরা। এক্ষেত্রে অকালপ্রয়াত শিল্পী আবু সঈদ তালুকদারের অবদানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। পোড়ামাটিতে বিষয়বস্তুভিত্তিক কাজ হচ্ছে, নির্বস্তুক ধারার কাজও হয়েছে বিস্তর। অলোক রায় পোড়ামাটির শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রণী শিল্পী। এই মাধ্যমে দেয়ালে ঝোলানো চলে এমন ভাস্কর্যপ্রতিম কাজও হচ্ছে এখানে। বিচিত্রবর্ণের দৃশ্যচিত্র সম্বলিত আধুনিক উচ্চমান সম্পন্ন টাইলস্ শিল্পীরা উপহার দিচ্ছেন। নানারকম শো-পিস সহ বিভিন্ন পাত্র ইত্যাদির শিল্পিত রূপ দিয়ে চমৎকৃত হওয়ার মতো দৃষ্টি আকর্ষণীয় শিল্পকর্মেরও যোগান দিচ্ছেন আজ মৃৎশিল্পীরা। যে সমস্ত কাজ সমকালে ব্যবহারিক মর্যাদার অনেক ঊর্ধ্বে স্থান পেয়ে চলেছে অনায়াসে।

বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে চিত্রকলা ক্ষেত্রে কোলাজ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম— নিরীক্ষাধর্মী কাজের মধ্যে নবতর রূপের সন্ধান করতে গিয়েই শিল্পীরা কোলাজের চর্চা করেছেন। সমাজ-পরিস্থিতি, যুদ্ধ ও শান্তি, সর্বোপরি মানবজগতে চলমান নানা ঘটনা উৎসারিত সুচিন্তিত বিষয়াদি নির্ভর কোলাজ একাধিক চিত্রকরের হাতে শিল্পগুণমণ্ডিত প্রকাশ-আঙ্গিকে সম্পাদিত, প্রধান শিল্পী দ্বিতীয় প্রজন্মের বৈচিত্র্যপ্রয়াসী প্রতিভাবান চারুশিল্পী আমিনুল ইসলাম। অনেক চিত্রশিল্পী কোলাজের সঙ্গে তেলরঙের ব্যবহার করেছেন। নির্বস্তুক চিত্রশিল্পে নিবেদিত শিল্পী আবু তাহের অন্যতম। পঞ্চাশের দশকে জলরঙ ও বাস্তববাদী তেলচিত্রে সাড়া জাগানো বিশিষ্ট গ্রাফিক নক্শাবিদ্ ও বুক ডিজাইনার হিসেবে সুবিদিত শিল্পী হাশেম খান কাগজে কাগজ সেঁটে তার উপর চিকন রেখার ড্রইং আরোপে দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। শান্তির সপক্ষে যুদ্ধবিরোধী, প্রতিবাদী ও প্রগতিবাদী এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন গণহত্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেকেই কোলাজ করেছেন, বর্তমান নিবন্ধকার তাঁদের মধ্যে একজন। সমসাময়িককালে দেখা গেছে চিত্রশিল্পীরা তেলচিত্রের ক্যানভাসগাত্রেও নানাভাবে নানাকিছু সেঁটে বা জুড়ে দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণীয় শিল্প-সম্ভার গড়ার কাজ করছেন। এক্ষেত্রে মোহাম্মদ ইউনুস অন্যতম অগ্রণী শিল্পী। মিশ্র-মাধ্যমের কাজের দিকেও ঝোঁক প্রবল আমাদের চারুশিল্পীদের।

সৃজনশীল কাজের অঙ্গীভূত হিসেবে নানা মাত্রার মুখোশ, কাঠের কাজ, ঝুলন্ত রঙিন মৃৎশিল্পকর্ম, গৃহাভ্যন্তরে বা বাইরের দেয়ালসজ্জা কিংবা ইনটেরিয়র ডেকোরেশন সর্বক্ষেত্রেই

আমাদের চারুশিল্প চর্চার অঙ্গ। আর ওই কর্মসকল কখনো মোজাইকের রূপ নিচ্ছে, টেরাকোটা টাইল্‌স্‌ কিংবা ভাস্কর্যরূপী আদলে সম্পন্ন হচ্ছে—কখনো বা সরাসরি চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যকর্মও ওই সমস্ত জায়গায় আমাদের সৃজনশিল্পীরা ব্যবহার করছেন। আর যেখানে যা প্রযোজ্য, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা অনায়াসে ওইজাতীয় কর্মাঙ্গনে অন্তর্ভুক্ত করছেন নিসর্গদৃশ্য ও পশুপাখি থেকে নিয়ে মানব-মানবীর অবয়ব, যা সহায়তা করছে শিল্পকলাক্ষেত্রের বিরোধী গোষ্ঠীর সামনে ইতিবাচক নমুনা সকল উপস্থাপনে।

'মুখোশ'-এর কাজ নিয়ে দীর্ঘদিন ব্যস্ত আছেন সাইদুল হক জুইস—ব্যতিক্রমী শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিরীক্ষাধর্মী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন ইতোমধ্যেই। এই মাধ্যমে তরুণ ঘোষেরও পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র আকার, বর্ণ ও চিত্রায়ণ সমৃদ্ধ মুখোশ-সম্ভার নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন বাংলাদেশের শিল্পচর্চার অঙ্গনে ভিন্ন মাত্রা এনেছে।

উল্লেখ্য, ব্যবহারিক শিল্পকলার সকল শাখাতেই যেহেতু জড়িত আছেন আমাদের সৃজনশিল্পীদেরই বৃহত্তর একাংশ—সেই প্রেক্ষিতে গুরুত্ব-মর্যাদায় খাটো করে দেখার সুযোগ নেই কিছুকেই। প্রতিটি শাখায় গুণমানের দিক থেকে অগ্রগতি হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। সামগ্রিক অর্থে আমাদের শিল্পচর্চা ক্ষেত্রেরই তা অগ্রগতি। সাম্প্রতিককালে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের এক বর্ধিষ্ণু কর্মশাখা আমাদের চারুশিল্পীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত 'ইনস্টলেশন'। সমকালে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে শিল্পাঙ্গনে। এক্ষেত্রে কৃতিত্বের শিখর স্পর্শ করেছেন সত্তর দশকের শিল্পী অশোক কর্মকার। তিনি মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়-উপজীব্য নিয়ে শব্দ-সঙ্গীতসহ এ-মাধ্যমটির নাটকীয় উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে দেশে ও বিদেশের মাটিতে সুনাম কুড়িয়েছেন। সুইডেনে অবস্থানরত আশির দশকের চিত্রশিল্পী রুহুল আমিন কাজলের তৎপরতা ও উদ্যোগে 'গ্রাফিক আর্ট'-এর একটি শাখা প্রসার লাভ করেছে, ওই সাফল্য উদ্ভূত তাঁর আধুনিকতার সমৃদ্ধ অঙ্কনরেখা ও নকশা সমৃদ্ধ বিচিত্রবর্ণা দেয়াল অলঙ্করণও বিশেষ মাত্রা এনেছে। প্রবাসেই তাঁর পরিচিতি সমধিক হলেও তিনি প্রায়শই দেশে এসে স্বদেশের তরুণ শিল্পীদেরও অনুপ্রাণিত করছেন এ জাতীয় শিল্পচর্চায়। এ ধরনের কাজে ঘুরেফিরে ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকশিল্পের প্রত্যাবর্তন দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চায় দীর্ঘদিন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত আকর প্রতিষ্ঠানটিই স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ছিলো প্রাথমিক পর্যায়ে সেখান থেকে পাশ করা চিত্রশিল্পীদের উদ্যোগ-তৎপরতায় সারা দেশে নানাস্থানে ছোট ও বড়ো শিল্পকলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বিভাগীয় কেন্দ্রসমূহে এবং বড়ো শহর ইত্যাদি স্থানে একাধিক সরকারি ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এখন চালু রয়েছে। যেমন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ফাইন আর্টস্‌ ফ্যাকাল্টিতে সুকুমার কলায় মাস্টার্স শিক্ষাকোর্স রয়েছে, সেখানে পৃথক একটি সরকারি ডিগ্রী কলেজও আছে এবং রাজশাহী, খুলনা প্রভৃতি স্থানেও ডিগ্রী কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ছোট ছোট জেলাশহরে যেমন নারায়ণগঞ্জে স্থাপিত হয়েছে সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়।

প্রচলিত শিল্পধারা সকলের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের বাস্তববাদী কর্মধারাটি বাংলাদেশে এখনও সচল। তার মাধ্যমে কমার্শিয়াল ল্যান্ডস্কেপ এবং প্রতিকৃতি-চর্চা আমাদের পরিবেশে সর্বসময়ের জন্য জাগ্রত একটি অধ্যায়। এই বাস্তববাদী চিত্রধারার সঙ্গে গঠন-সৌকর্যে অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একধরনের সমবিমূর্ত চিত্রশিল্পের প্রচলন হয়েছে এখানে। কখনো যেনো আলোকচিত্রগত পারফেকশন চিত্রপটে খেলা করে। চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ফটোগ্রাফীর সাহায্য নিয়ে বাস্তবানুগ ড্রইং অথবা মডেলিং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতাও ইদানীং বেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শিল্পকলার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে Impressionism বা প্রতিচ্ছায়াবাদী চিত্রধারার প্রবর্তন, যে ধারাটি বিশ্ব-শিল্পকলাঙ্গনে আধুনিক শিল্পের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলো ফরাসী দেশের একদল শিল্পস্রষ্টার মাধ্যমে। ১৮৭০ থেকে ৮০ দশক পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো এই শিল্পান্দোলন। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৮৭৪-এ এবং ছিয়াশি সাল পর্যন্ত মোট আটবার তাঁরা প্রদর্শনী করেছিলেন। পরবর্তীতে নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছিলো ওই শিল্পান্দোলন, আপাতদৃষ্টিতে তার রেশ কাটতে সময় লেগেছে দীর্ঘদিন, এখনো তার প্রতিফলন কিছু যে নেই তা নয়। বাংলাদেশ শিল্পাঙ্গনে ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের অনুসৃত ধারা-আঙ্গিকের ব্যাপক প্রভাব শুরুর দিকে সরাসরি ছিলো, আমাদের তরুণ শিল্পীদের কাজে বুঝে হোক না বুঝে হোক এখনও তার অনুসরণ আছে। বিশেষত স্কেচী ধরনের জলরঙের কাজে বা গ্যালারীর জন্য চিত্রশিল্পীরা এ ধরনের কাজ করে থাকেন। শিল্পকলার ইতিহাসে বাস্তববাদের চূড়ান্ত রূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে রেনেসাঁ শিল্পীদের কাজ থেকে নিয়ে ওল্ড মাস্টারদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ড্রইং, পেইন্টিং, ছাপাইছবি কিংবা ভাস্কর্য প্রভৃতি সকল শাখার শিল্পে। তারই ধারাবাহিকতা যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে প্রাতিষ্ঠানিক বা একাডেমিক নিয়ম-নীতির কর্মধারার আচ্ছাদনে। সোভিয়েত রাশিয়ার একটি বাস্তবানুগ বুক ইলাস্ট্রেশন কিংবা খুব দূরে না গিয়ে ভারতীয় শিল্পীদের কথাই যদি ধরি রেখাচিত্র কিংবা জলরঙে করা তাদের হাফটোন ছবির বাস্তব সমৃদ্ধ মাত্রাটির প্রশংসা করতেই হবে। আমাদের বাংলাদেশে ঠিক তেমনটি ঘটেনি। আমাদের চারুশিল্পীরা তাঁদের কর্ম-সাধনায় পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশের চিত্ররূপদানে কখনোই বিরত থাকেননি, তাঁদের কর্মে ঘুরেফিরে প্রকৃতি এসেছে সমাজ-পরিবেশও এসেছে—কিন্তু তা কখনোই Naturalism বা প্রকৃতিবাদের এমনকি Realism বা বাস্তববাদের পরিপূর্ণ লক্ষণাদি প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় সম্পন্ন নয়। বরং সর্বতোভাবে প্রয়োগ-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে একটা সংক্ষিপ্তকরণের কিংবা প্রতীকী ঢঙের বিস্তার ঘটিয়েছেন এদেশের শিল্পীরা। ওই প্রবণতা নিঃসন্দেহে প্রতিচ্ছায়াবাদের প্রতি ঘনিষ্ঠতার লক্ষণ। অর্থাৎ আমাদের শিল্পাঙ্গন পরিমণ্ডলে রিয়ালিস্টিক ড্রইং যে খুব বেশি আধিপত্য বিস্তার করেনি তার স্বাভাবিক কারণ এটি। সমবিমূর্ত ধারা ও নির্বস্তুক শিল্পধরন এদেশে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনিবার্যতার অন্যতম কারণও এটি। আমরা কথায় কথায় অনেকসময় ভারতীয় শিল্পীদের কাজ দেখে প্রশংসাচ্ছলে বলি 'ওঁরা এখনো ড্রইংএর গুরুত্ব দিচ্ছেন', এশীয় দ্বি-বার্ষিকের ভারতীয় অংশের উপস্থাপনাকে সাক্ষী রেখেই সাধারণত এ জাতীয় কথার অবতারণা। সাম্প্রতিককালে এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে একবার চীন থেকে

যতোগুলো ছবি এসেছিলো তার সবই ছিলো জলরঙের প্রতিকৃতি। অবশ্যই রিয়ালিস্টিক, যেমন তাদের চমৎকার গড়ন তেমনই তাদের বরণ—অর্থাৎ বর্ণবিন্যাস এবং রঙের স্বচ্ছতায় সেই সমস্ত কাজের গুণগত দিকটাই আকর্ষণ করেছিলো বেশি। তাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো তা হচ্ছে হান আমলের চীনা শিল্পীদের বাস্তববাদিতার বোধ। বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় এ দিকটা কোনো ক্ষেত্রেই সমধিক মাত্রায় লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি কখনো। বরং প্রচলিত আধুনিক শিল্পধারা সকল মুখ্য হয়ে উঠেছে সব সময়। ভাস্কর্য সম্পর্কিত প্রসঙ্গেও এ কথা প্রযোজ্য।

পিকাসো-ব্রাক প্রবর্তিত কিউবিজম অনুসৃত হয়েছে, সালভাদর দালির পরাবাস্তববাদ ছায়া ফেলেছে, সম-বিমূর্ত, বিমূর্ত ও নির্বস্তুকতা এসেছে, ও সূত্রপথে ঝাঁকিয়ে বসেছে Expressionism বা ব্যাখ্যাধর্মী প্রকাশবাদী শিল্পধারা। এভাবেই আধুনিক নিরীক্ষাধর্মী শিল্পচর্চার এক ব্যস্ত কলাকেন্দ্র হয়ে উঠলো আমাদের চারু-অঙ্গন। আর নিরীক্ষার অবকাশে চমক সৃষ্টির প্রবণতাও দেখা গেলো শিল্পীবিশেষের কাজে, গিমিক-স্টান্টসর্বস্ব চিত্র ও ভাস্কর্য বিষয় থেকে বিষয়ী পর্যায়ে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সামগ্রিক একটা স্বকীয়তাসম্পন্ন শিল্পভুবন গড়ে তুললো। কারুর চিত্রপটে খেলে গেলো নক্শীধারা, কেউবা ঘটালেন রঙের বিস্ফোরণ, কেউ আকার-গড়নে মনোযোগী আর কেউ চিত্রের জমিন নিয়ে মেতে উঠলেন। এভাবেই বিচিত্র ধারায় এগিয়ে চললো আমাদের চিত্রশিল্প। বিচিত্র মাধ্যমের ভাস্কর্যও একইভাবে গড়নে-গঠনে নানামুখী বাতায়নে ছুটে চললো। আরও একটা ধাপ বাকি ছিলো—পোস্ট-মডার্ন, আধুনিকের পরে সেও বাংলাদেশ শিল্পাঙ্গনের সঙ্গী হয়ে এখন স্বাভাবিক কোর্সের আওতায়। আমাদের লোকশিল্প আধুনিকতার সঙ্গে জোট বেঁধেছে একই চিত্রপটে, বিষয়বস্তু হিসেবে পুরাণের সংযোজন অপ্রসন্ন, গভীর চিন্তা-চেতনার ছায়া কোলাজ-আঙ্গিকে কিংবা প্রতীকী মেজাজে।

উনিশশো পঞ্চাশ থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত সময়কাল—এবং তার পরও পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে, বাংলাদেশে চারুশিল্পীর সমাবেশ এতোদিনে অনেক বেশি জোরদার। প্রতিবছর দেশজুড়ে চারুশিল্পের অঙ্গনে নবীনদের অন্তর্ভুক্তির মাত্রা টানাগতিতে বেড়েই চলেছে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পস্রষ্টাদের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পকর্মীদের উদ্যোগ-প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের শিল্পচর্চার অঙ্গন আজ নজর কাড়া রূপসম্ভারে অভিষিক্ত। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠছে, শিল্প বিকাশের লক্ষ্য-উদ্দেশে। সবটাই ইতিবাচক। তবু এখনও তার সৃজনপথে একান্তই নিজস্ব কিছু সৃষ্টির বিশ্ব-শিল্পাঙ্গনে মৌলিক অবদানের—প্রয়োজনীয়তা ফুরায়নি।*

---

* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪-১২-২০০৫ তারিখে বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে প্রদত্ত বক্তৃতা। বক্তা বিভাগীয় প্রধান, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রুশভাষার দুই কবির কবিতার বাংলা অনুবাদ

সঞ্জয় চন্দ্র

আনা আখমাতভা রুশভাষায় সবচেয়ে বড় মাপের মহিলা কবি—সংযতবাক, লিরিক। রুশবিপ্লবের আগেই তিনি প্রতিষ্ঠিত, বিপ্লবের দিনে তাঁর বয়স আটাশ। মারিনা ৎস্তিতায়েভা অন্য ধাঁচের—লিখেছেন অনেক, প্রকাশ হয়েছে কম। আখমাতভার থেকে বছর তিনেকের ছোট। রুশ মানুবের হৃদয় জয় করেছেন মৃত্যুর কয়েক দশক পরে, যখন 'গ্রোস্ভেতকুন্ত' (কুন্ত হতে কুন্তের মাঝে গত শতাব্দীর ষাটের দশকে যে ফাঁক বা জানালা, তাকে রুশ সাধারণ মানুষ এভাবে অভিহিত করেন, রুশবিপ্লবের পরে পরেই 'প্রোলেতকুন্তে'র কথা মনে রেখে) তাঁর বিদেশে রচিত কবিতাগুলি রুশদেশে প্রকাশ পেতে দেয়। এ দুই কবির বেশ কিছু কবিতা বাংলায় ভাষান্তর করেছেন কৌশিক গুহ : কান্নাভাঙা গান। আন্না আখমাতোভার কবিতা, ত্রী, ১৯৯৬ এবং মারিনা স্ভেতায়েভার কবিতা। ধীমা, ২০০৫। এ দুটি বইয়ের আলোচনাই এখানে রাখা হল মুখ্যত।

সমকালীন কবিদের কথা বারবার এসেছে বই দুটিতে : ব্লক (১৮৮০), পাস্তেরনাক (১৮৯০), এরেনবুর্গ (১৮৯১), মান্দেলস্তাম (১৮৯২), মায়াকভস্কি (১৮৯৩), ইয়েসিয়েনিন (১৮৯৫); বন্ধনীর মধ্যে রাখা তাঁদের জন্মসাল। ১৯৩০ সালে ৎস্তিতায়েভা জানিয়েছেন, এই কিন্নরদলের 'গড় আগলে শেষটা/একাকী পাস্তেরনাক', চলে গেছেন 'ল্সান আলেক্সানিচ' (ব্লক) আর '—গুমিলেভ নিকোলাই?/—গেছে পুবে।/(রক্তমাখা পাতাশয্যা/পরিপূর্ণ সে বিদায়)।' (বারমাস, ১৪১৩) এই গুমিলেভের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন আখমাতভা ১৯১৮ অবধি। গুমিলেভের মৃত্যু কয়েকবছর পরে। ১৯৩০ সালে কবিতা প্রকাশ বন্ধ করেছেন আখমাতভা, এরেনবুর্গ। মৃত ইয়েসিয়েনিন আর মায়াকভস্কির সঙ্গে 'সূর্যোদয়ে'র ভিত গড়তে চেয়ে ৎস্তিতায়েভা লিখেছেন : 'এ রাজ্যের তলাতেই/রেখে দেব বোমাটাই', সে বোমা ফেটেছে মৃতা ৎস্তিতায়েভার সহায়তায় অর্ধশতাব্দীরও পরে, আসেনি কবিতায় কোনো সূর্যোদয়।

গুমিলেভের নেতৃত্বে 'আকমেইস্ট পার্টি'তে শামিল ছিলেন আখমাতভা, ৎস্তিতায়েভা। 'ব্লকের প্রতি' কবিতাটি লিখেছেন ৎস্তিতায়েভা ১৯১৬ সালেই, তবে ব্লক এই কবিকে উল্লেখ করেননি তাঁর ১৯২১ সালে লেখা শেষ প্রকাশিত নিবন্ধে 'বিনা দেব, বিনা-আলোকিত মনে'তে (অন্তঃসার, শারদীয়া ১৪১৩)। আখমাতভা নিয়ে সেখানে লিখেছেন : আকমেইস্টদের 'মধ্যে সত্যিকার ব্যতিক্রম ছিল এক আনা আখমাতভা। জানি না, নিজেকে উনি 'আকমেইস্ট' মনে করেন কিনা। সে যাই হোক, ওঁর ক্লান্ত, পীড়িত, অন্তর্মুখী মহিলা ভংগীতে একদম পাওয়া যেত না "দৈহিক ও আত্মিক বলের স্ফুটন", এই ত সেদিন চুকোভস্কি ওঁর কবিতাকে তপস্যা আর মোটের ওপর মঠের বলে অভিহিত করেন। আখমাতভার স্বরে কেমন যেন সাড়া পড়ে গিয়েছিল।' এরই রেশ ধরে বছর পঁচিশ পরে ঝ্দানভ (পড়ুন, 'ঝানু দানব') আখমাতভার গায়ে তকমা আঁটেন : 'অর্ধেক তাপসী তুমি, অর্ধেক গণিকা'। ব্লকের নিবন্ধে

উপস্থিত মায়াকভস্কি, অনুপস্থিত পাস্তেরনাক, মান্দেলস্তাম, ইসিয়েনিন। এর আগেই ১৯১৮ সালে ব্লক চিহ্নিত করেন এরেনবুর্গকে 'সবথেকে সম্ভাবনাময় কবি' হিসেবে।

কৌশিক ২০০৫ সালের বই-এর গৌরচন্দ্রিকায় জানান, ইংরাজি প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration) বাংলায় বিভ্রান্তিমূলক, তাই 'ধ্বনির রেশটুকু রাখিয়া ঈষৎ পরিবর্তিত হইল' পদবি, কবিতার শিরোনাম বা প্রথম চরণ। এই 'ঈষৎ' কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার ভালো উদাহরণ 'স্ভেতায়েভা'। রুশভাষায় প্রতি শব্দে পূর্বনির্দিষ্ট ঝোঁক আছে কেবল একটি সিলেবলে, তার আগে পরে স্বরবর্ণের উচ্চারণ পালটে যায়। রুশ শব্দ 'ৎস্ভেত' বোঝায় রং, বহুবচনে ফুল। আর 'স্ভেত' বোঝায় আলো, জগৎ। ঝোঁক যখন দ্বিতীয় সিলেবলে, উচ্চারণ 'ৎস্ভিতায়েভা', কৌশিক নিজেই ১৯৯৬ সালে লিখেছেন, 'ৎসিয়েখা' (পৃ. ৮৩), যদিও হবে 'ৎসেখা'। রুশ উচ্চারণ জানেন, এমন কাউকে দেখিয়ে নিলেই অনেক 'বিভ্রান্তি' থেকে ত্রাণ মিলত, বিশেষ করে কবিতার শিরোনামে বা প্রথম চরণে, যার লক্ষ্য তো রুশভাষা জানেন এমন কেউ যাতে মূল কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। কৌশিক নিশ্চয় পছন্দ করবেন না তাঁকে 'কোষিক' বলে অভিহিত করতে থাকলে। মনে পড়ে, মস্কোর এক সভায় 'মিঃ হাণ্ডু'র সঙ্গে আমরাও হাতজোড় করেছিলাম শুধু তাঁর প্রথম নাম ব্যবহার করতে। কারণ, হিটলার তো রুশ উচ্চারণে 'গিটলার', মধ্যস্বত্বভোগী ইংরাজির মারফত প্রতিবর্ণীকরণে সমস্যা কিছু থাকে, তবে উচ্চারণ-সচেতনতা না থাকলে তা যে আরো বাড়ে সেটা বাদ দিলে। মুদ্রণপ্রমাদের দোহাই দেওয়া শক্ত শিরোনামের 'ঈষৎ' পরিবর্তনে, কারণ কপি এডিটিং-এ 'স্ত্রী' আর 'ধীমা'র যথেষ্ট সুনাম আছে। ভালো রুশ-উচ্চারণ জানা কাউকে দেখিয়ে নিলেই হত। পাস্তেরনাক তো জানিয়েছেন, কোনো কবিতা ঠিক কীভাবে পড়া হয় না জানা অবধি সাহস করতেন না কবিতা অনুবাদ করতে।

বর্তমান আলোচক এখনো পারেননি মূল শব্দটি ধরতে : 'ব্রাজিনস্কি' (পৃ. ৩৫), 'বিজিরেন' (পৃ. ৫১) ১৯৯৬র বইটিতে। রুশ 'B' বাংলায় 'ভ', 'ব' নয়। আবার 'ভেসি' (পৃ. ২০), 'ব্রোসিল' (পৃ. ৪২) ইত্যাদিতে 'ভ' সরিয়ে বসবে 'ব' 'জেনতোদেল' হবে 'জেন্‌অতদেল', 'ভেস' অর্থ 'ওজন' আর 'বেস' অর্থ 'শয়তান। একটু যত্ন নিলে এসব ধারা যেত, একটু যত্ন নিলে '১৯৩৮এ' মারা যেতেন না স্ভেতায়েভা (পৃ. ১৭), নিকোলাই হয়ে যেতেন না 'লেভ' (পৃ ২৩)। লেভের তো ১৯৫৬তে মুক্তি হয়েছিল (পৃ ৯০)। এভাবেই ২০০৫-এর বইটিতে লেভ গুমিলেভ হয়ে ওঠেন 'লিওভ গুমিলিওভ' (পৃ. ৮)। অবশ্য ১৯৯৬-এর 'পাস্তারনাক' সঠিক ভাবেই হয়ে যান ২০০৫এ 'পাস্তেরনাক'। পেংগুইন প্রকাশে গুমিলেভের 'e'র মাথায় দুটো ফুটকি আছে। আসলে, বুঝতে পারলে বাংলায় রুশ বানান নিয়ে প্রশ্ন তোলা গৌণ, তবে প্রশ্নটা তুলে তারপর ব্লকের 'বারজন'কে 'কুড়িজন' বানিয়ে দিলে (দিবারাত্রির কাব্য, ১৪১১, পৃ. ৪১১) বোঝা যায়, মধ্যস্বত্বভোগী ইংরাজিকে এড়ালেও 'ঝিনাংসোং' হয়ে যেতে পারে 'ঘোয়াংসোং' 'এন'-এর মধ্যপদলোপে। বা, তরুণ সান্যালের অনুবাদ করা রুশ বুলাত্ ওখুদ্জাভা হয়ে যান পূর্ব পাকিস্তানী (তদেব, পৃ ৪৪৬) তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার কাছেও অপরিচয়ের মারে।

১৯৯৬ সালের দীর্ঘ ভূমিকা ছাড়াও বাইশটি কবিতা আছে, ষোলোটির রুশ শিরোনাম ভুল। রিকভিয়েমে তিনটিতে ভুল, গ্রন্থপঞ্জীতে তেরোটিতে। এদের অনেকটাই এড়ানো যেত প্রতিবর্ণীকরণে বা স্রেফ বাদ দিয়ে। বইটির নাম সম্ভব 'কান্নার মানসী তুমি' (পৃ. ৮২)র সঙ্গে তাল রেখে। আখমাতভা রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করেছেন উনত্রিশটি, যার মধ্যে উল্লেখ করা যায় গীতবিতান থেকে 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা' ও 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে', বলাকা থেকে 'এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো' ও 'শঙ্খ', পত্রপুট থেকে 'আফ্রিকা', পুনশ্চ থেকে 'শিশুতীর্থ', রোগশয্যায় থেকে 'খুলে দাও দ্বার' ও 'দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে', 'কান্নাভাঙা গান'-এ খাপ খায় না মদিলিয়ানির ছবি (পৃষ্ঠা বারো। এ নিয়ে আখমাতভার নিজের লেখাটি সঙ্গে অনুবাদ করে দেওয়া হল।), তাতে তো মিশরের রানির মুকুট। কয়েকটি রেখায় শেষ করা এই ছবির মতোই আখমাতভার কবিতা কয়েকটি শব্দের সোজা আঁচড়ে ক্লাসিক ঢঙে দাঁড় করায় একটি কাহিনি। ১৯৬৪ সালে আখমাতভা জানিয়েছেন, গত শতাব্দীর প্রথম দশকে মদিলিয়ানির পারির স্টুডিওতে পুষ্পস্তবক নিয়ে গিয়ে তালা ঝুলছে দেখে ফাঁক দিয়ে এদিক ওদিক ভেতরে ফেলে দেন ফুলগুলি। মদিলিয়ানি পরে মানতেই চাননি যে আখমাতভা সে ঘরে প্রবেশই করেননি, ফুলে এত সুসজ্জিত ছিল মেঝে। ওঁর কবিতাও এরকমই আমাদের মনের বদ্ধতালার এপাশে ওপাশে শব্দগুলিকে ছুঁড়ে দেয়, যাতে ভাষান্তরে বেশ বিপদ ঘটে।

লেখা নির্বাচন নিয়ে রুচির প্রশ্ন ওঠানোই যায়, তবে অনুবাদকের রায়ের ওপর তো এ ব্যাপারে কথা চলে না। মৃত্যুর আগের বছর আখমাতভা নিজে স্বনির্বাচিত সতেরোটি কবিতা প্রকাশ করেন ইউনস্ত পত্রিকায়—তার মাত্র তিনটি কৌশিক অনুবাদ করেছেন ব্লককে নিবেদন বাদ দিলে। মায়াকভস্কিকে নিবেদিত কবিতাটির নাম আসলে '১৯১৩ সালে মায়াকভস্কি', যেখানে 'প্রতিশব্দে তার দণ্ডবিধান'। মধ্যে একসময় বিশের দশকে মায়াকভস্কি তখনকার রুশ কবিদের ধোলাই করেছিলেন। রায় দিয়েছিলেন, আখমাতভার তিন বছর কবিতা না লেখা। কবিভ্রাতার নষ্টামিতে অগ্রজা মুচকি হেসেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে ৎস্ভেতায়েভা ১৯৩০ সালে স্মরণ করেছেন : 'মনে পড়ে—হয়েছিল/মঞ্চের ভরাট গলায়/আমার কম্বল ধোলাই?/—যাক সেসব পালা'।

অনুবাদ কেমন হয়েছে বলতে গেলে মূল কবিতা হাতের কাছে থাকা দরকার। বর্তমান আলোচকের পুঁজি অল্প। তাতে কৌশিককে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া দৃষ্টান্ত রাখা যেতে পারে পৃ. ১৮র চরণগুলির অন্য অনুবাদে : 'আর পাথুরে শব্দ পড়ল/আমার এখনো স্পন্দিত বুকে/'যাক গে', আমি ত তৈরী ছিলাম/যেভাবেই হোক এর করব মুকাবিলা'। পাথরের আঘাত (পাতার তো নয়) কি 'ঝরে যায় দেখো' বলে সারা যায়? 'শরৎ ১৯১৭'র সংক্ষিপ্ত রূপ আছে আখমাতভার নির্বাচনে—অনুবাদও হয়েছে বাংলায়। 'এখানে শুরু হয়েছিল পুশকিনের জীবন' (পৃ. ৪৪) হবে 'পুশকিনের নির্বাসন'। অণুকবিতা : 'শপথ'-এর শেষ তিনটি চরণ অন্য অনুবাদে : 'জোর করে তার বেদনা করুক পার/অংগীকার রাখি শিশুদের কাছে, মৃতদের কাছে/আমাদের দাবাতে কেউ হবে না সমর্থ', ব্লককে নিবেদিত কবিতাটির (পৃ. ৭৩) তৃতীয়

স্তবক মূল থেকে ভীষণ আলাদা। হবে : 'ওঁর চোখদুটি কেমন আয়ত,/প্রত্যেকেরই মনে রাখার মত,/সাবধানী বিচার আমার মানো,/ও দুটিতে একদম না তাকানো'। ব্লক লিখে গেছেন, 'শব্দের গণিত আছে বিশেষ করে কবিতার। তাই ইচ্ছেমতো তা বদলানো, অন্ততঃ কুরুচি' (রচনাবলী, মস্কো ১৯৫৫, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭০৪)।

২০০৫-এর বইটি কম দায়বদ্ধভাবে লেখা। চারটি ভাগে মোট চব্বিশটি কবিতা, রুশ শিরোনামে ভুল এগারোটিতে, 'ভ্ লোব্ চেলোবাৎ' (পৃ. ২৬) হবে 'ভ্ লোব্ ৎসেলাভাত্'—সেটা 'কপালে চুমু', 'মাথার উপরে চুমু' এ কবিতায় বেখাপ্পা, এটা আর 'ঈষৎ' পরিবর্তন নয়। 'নিয়েজনম্ভ' (পৃ. ২২) 'লাবণ্য' নয়, 'মমতা', 'লিওভ' (পৃ. ৮) আসলে 'নিকোলাই'। ৎস্ভিতায়েভাও পাস্তেরনাকের মতো ফ্যাসিবিরোধী সংঘের পারি-অধিবেশনে যোগ দেন গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে, 'রুশ অরফিউস' ভাগের আটটি কবিতাই ১৯২৬ সালের আগে লেখা—তবে কেন রিলকে। তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ তো পরে। রাজনীতিতে স্বতন্ত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই অনুবাদকের আছে, এমনকি যাদবপুরের মানবীচর্চা কেন্দ্র বা মালিনী ভট্টাচার্যের রাজনীতির সঙ্গে তা না মিলতেও পারে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কেন 'পাস্তেরনাককে রিলকের একলব্য—শিষ্য' (পৃ. ৩২) বলা। যখন, পাস্তেরনাক ১৯৫১ সালে জানান, তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন 'বাবার কাজের উদাহরণ, গান ভালবাসা ও স্ক্রিয়াবিন, নিজের লেখার দু-তিনটি সুর, রুশপ্রান্তরে রাত, বিপ্লব, জর্জিয়া' (জর্জীর বন্ধুদের কাছে চিঠি, পেংগুইন ১৯৭১, পৃ. ১২৭)। ১৯২৪ সালে ৎস্তিতায়েভা লেখেন, '১৯১৭র গ্রীষ্মে পাস্তেরনাক কদম বাড়ান বিপ্লবের তালে মন দিয়ে তা শুনে'। শিবনারায়ণ রায়-বুদ্ধদেব বসু-জয় গোস্বামীর পাস্তেরনাকের সঙ্গে হয়তো এর মিল নেই, তবে কৌশিক তো মূল রুশ পড়তে পারেন, যা আগের তিনজন পারেন না। পাস্তেরনাক লিখেছেন 'মারিনা ৎস্তিতায়েভার স্মরণে' নামে কিছু কবিতা, জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কবিদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রাখলে ৎস্তিতায়েভার আত্মহনন এড়ানো যেত।

আলোচকের পুঁজিতে থাকা ৎস্তিতায়েভার কবিতাগুলির মধ্যে কৌশিক অনুবাদ করেছেন পাঁচটি। 'ইজ স্লোগডো স্লোইনডো খ্রামা' (পৃ. ৩৮) অর্থাৎ 'সংযত ঋজু মন্দির হতে' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি মূলে নেই। তৃতীয় স্তবকে 'পাগলি', 'উন্মাদ' আর 'বারে' অবান্তর। পৃ. ৪১-এর গানটির সেপাতার প্রথম চরম হবে 'সবযুগের মেয়েদের কান্না সে যে', দ্বিতীয় স্তবকে হবে 'নিয়েছে টেনে প্রেমিকদের' 'জাহাজদের, নয়, তৃতীয় স্তবকে 'জীবন পড়ে', পঞ্চম স্তবকের শেষ চরণদুটি ঠিক নয়, 'ঈর্ষার প্রচেষ্টা (পৃ. ৪৫)-তে দ্বিতীয় স্তবকে হবে 'আত্মারা ওগো'...'প্রেমিকার মতো', পৃ. ৪৬-এ 'গরিব' হবে 'বেচারা'। সে পাতার তৃতীয় স্তবকে হবে 'কারারা মার্বল নিয়ে...প্লাস্টার ছাঁচ কেমন লাগছে?' চতুর্থ স্তবকে হবে 'পাথর খুদে'...'দশহাজারী সংগ করা মেয়ের সংগে..', এ কবিতাটির তো মণীন্দ্র রায়ের করা অনুবাদ আছে, তবে রুশভাষা থেকে নয়। (নতুন দিনের রুশ কবিতা, মনীষা ১৯৬৭)।

কৌশিকের তথ্যআহরণ প্রশংসনীয়, তবে চৌত্রিশ বৎসরে কি 'মধ্যবয়স্ক' (পৃ. ৫৭) হওয়া যায়? 'গোরদিয়' (পৃ. ৬৩) ব্যাপারটা কী? 'পাস্তেরনাকের প্রতি' (পৃ. ৭৭) পরিষ্কার বোঝায়

অনুবাদের সমস্যা, যখন শব্দের খেলায় একই অক্ষরসমষ্টি কোন সিলেবলে ঝোঁক আছে তার ভিত্তিতে অর্থবদল হয় এবং পাশাপাশি রাখা হয় এরকম দুটি শব্দকে। 'দূরত্ব : ভের্স্তের, মাইলের' মানে না 'কারণ' বা 'আত্মা'। 'খবরের কাগজের পাঠকেরা' (পৃ. ৭৮)র প্রথম চরণে তো উপমা মেট্রোর এসক্যালেটর, যা অনুবাদে অধরা। 'বহুযুগ আগে ভীতিপ্রদ মাতৃতন্ত্র' (পৃ. ৭৯) 'স্তার মাতেরিনস্কি স্ত্রাখ্'-এর উলটো : ভয় মায়ের, সন্তানের নয়। ভারত ৎস্‌ভেতায়েভার লেখায় একেবারে অনুপস্থিত নয় : ১৯১৭ সালে লেখেন, 'ইজ ইনদিই প্রিপ্রিতে কাম্‌নি' 'রত্ন পাঠিও ভারত থেকে'। ১৯২৩ সালে পাই 'হিন্দু বিধবার' কথা তাঁর 'জানালা'তে। আর হ্যাঁ, মায়াকভস্কির প্রতি কবিতা ১৯২১ সালেও লেখেন ৎস্‌ভেতায়েভা। কৌশিকের প্রয়াস রুশ না জানা বাঙালি পাঠকদের দিকে এগোনো—তাঁরাই বলতে পারবেন এ দুই কবির কবিতা সম্পর্কে কী ধারণা হল বইদুটো পড়ে।

শেষ করার আগে আশা রাখব, কৌশিক এবার বেলা আখমাদুলিনার কবিতা অনুবাদ করবেন নিজের মতো, কারণ বাংলা সপ্তর্ষি তারামণ্ডল ইংরাজিতে 'গ্রেট বেয়ার' আর রুশে 'বলশায়া মিদভিদিৎসা' (বড় মাদি ভালুক) হলেও রুশ থেকে অনুবাদে 'বৃহৎ ভালুক' তো করেননি কৌশিক অন্য অনুষঙ্গ না থাকলে। এ প্রসংগ তুললাম, কারণ বছর তিরিশ আগে পরিচয়-সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বর্তমান আলোচককে বলেছিলেন, 'রুশী কবিতার এ রিভিউ আমি ছাপতে পারব না, উনি আমার মাস্টারমশাই'। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদারের করকমলে দেওয়া বইটির আলোচনার শিরোনাম দিয়েছিলাম বইটিরই একটি চরণ বেছে : 'লাল পাহাড়ে চড়ে বেড়ায় ছাগলগুলো'।

'এখন বছর পার/বয়স আমার অন্য/বুঝি ভাবি অন্যভাবে' ইসিয়েনিনের চরণ মনে রেখে। আখমাতভার কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়েছি, ৎস্‌ভেতায়েভার পুরনো আরবাতে আর এখনকার নতুন আরবাতে গত পাঁচ দশকের বিভিন্ন সময়ে রুশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে করতে হেঁটেছি। তাতে জানি, এই দুই কবি সেখানের মানুষের কত আপন জন।

আমেদেও মদিল্লিয়ানি

আনা আখমাতভা, ১৯৫৯-১৯৬৪

(রুশভাষা থেকে অনুবাদ : সঞ্জয় চন্দ্র)

আমি ওকে যেরকম চিনতাম, অন্যভাবে ওকে যারা বর্ণনা করে তাদেরই খুব বিশ্বাস করি। কারণগুলো হল : প্রথমত, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল শুধু ওর স্বভাবের একটা মাত্র দিক (উজ্জ্বল) জানা। আমি তো ছিলাম একেবারে অপরা, সম্ভবত একদিক থেকে খুব একটা বোঝা যায় না বছর কুড়ির এমন এক মহিলা, বিদেশিনী। দ্বিতীয়ত, আমার নিজের চোখেই পড়েছিল ওর বড় পরিবর্তন, যখন ১৯১১ সালে আবার দেখা হল। ওর রং-এ কেমন একটা কালো ছোপ পড়েছিল, আমসি হয়েছিল।

১৯১০ সালে ওর সঙ্গে দেখা হত বেশ কম, সব মিলিয়ে সামান্য ক'বার। এ সত্ত্বেও সমস্ত শীতকাল ও আমাকে লিখত। (ওর চিঠির কিছু বাক্য এখনো মনে আছে, যেমন : 'Vous êtes en moi comme une hantise' (আমার কাছে তুমি যেন এলোমেলো চিন্তা)। ও যে কবিতা লিখত, আমাকে বলেনি।

এখন বুঝি, ওকে সবথেকে আশ্চর্য করত আমার ক্ষমতা অন্যের ভাবনা পড়ার, অন্যের স্বপ্ন দেখার আর যত ছোটখাট ব্যাপার, যাতে অভ্যস্ত ছিল যারা আমাকে অনেকদিন জানত। ও শুধু বারবার বলত : 'On communique' (চালাচালি হয়ে গেছে)। প্রায়ই বলত : 'Il n'y a que vous pour réaliser cela?' (এক তোমার পক্ষেই এটা বোঝা সম্ভব)।

সম্ভবত দুজনেই বুঝতাম না একটা সোজা কথা : যা কিছু ঘটছিল আমাদের দুজনের কাছেই তা ছিল জীবনের প্রাগৈতিহাসিক সময়—ওর খুব অল্পদিন, আমার খুব দীর্ঘদিন। আর্টের শ্বাস এ দুই প্রাণীকে তখনো অঙ্গারে বদলায়নি—এটা ছিল নিশ্চয় আলো-ভরা হাল্কা প্রভাতবেলা। তবে ভবিষ্যৎ, যা নিজের ছায়া ফেলে, জানা কথা, প্রবেশের অনেক আগেই, জানালায় টোকা দিত, দীপের পিছনে লুকোত, স্বপ্ন কাটত আর ভয় দেখাত বোদলেয়রের প্যারির, যা কোথাও একটা কাছেই গাঢাকা দিয়ে। আর মদিল্লিয়ানির সব ঐশ্বরিকতা শুধু ফুলকি দিয়ে বেরত কোনো এক আঁধারের মাঝে। পৃথিবীতে কারো সঙ্গে ওর মিল ছিল না। ওর স্বর কেন যেন চিরকালের জন্য স্মৃতিতে গেঁথে গেল। ওকে চিনতাম কপর্দকহীন, বোঝা যেত না কীভাবে দিন চলে। শিল্পী হিসেবে এতটুকু খ্যাতিও ওর ছিল না।

তখন ১৯১১ সালে ও থাকত Impasse Falguièreতে। গরিব এতটাই ছিল যে লুক্সেমবুর্গ উদ্যানে আমরা সবসময় বসতাম বেঞ্চে, পয়সা দিয়ে চেয়ারে নয় যেমনটা রেওয়াজ ছিল। নিজের বেলায় দৈন্য নিয়ে কখনো আপশোশ করত না, খ্যাতির অভাব নিয়েও না, শুধু একবার ১৯১১ সালে ও বলেছিল, গত শীতে ওর দুরবস্থা এতটাই ছিল যে নিজের সব থেকে প্রেয় নিয়েও ভাবতে পারত না।

আমার মনে হয়েছিল, ও ঘেরা নিঃসঙ্গতার এক জমাট বৃত্তে। মনে পড়ে না, কারো সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করতে লুক্সেমবুর্গ উদ্যানে বা লাতিন কোয়ার্টারে, যেখানে তো সবাই

সবাইকে মোটামুটি চিনত। ওর কাছে শুনিনি কোনো পরিচিত বন্ধু বা শিল্পীর নাম, শুনিনি কোনো ঠাট্টা। কোনোদিন ওকে মাতাল হতে দেখিনি, মদের গন্ধ পাওয়া যেত না ওর থেকে। মনে হয়, মদ খেতে শুরু ও করেছিল পরে, তবে কেন জানি না কথাবার্তায় কাপের কথা এসে পড়ত। তখন ওর ছিল না চিহ্নিত কোনো জীবনসঙ্গিনী। ও কখনো আগের ভালোবাসার নভেল বলে যেত না (যা, হায়, সবাই করে)। আমার সঙ্গে পার্থিব কিছু নিয়ে কথা হত না। ও ছিল সংযত, তবে তা বাড়ির শিক্ষার ফল না, বরং ওর আত্মিক উচ্চতার কারণে।

এ সময় ভাস্কর্য নিয়ে কাটাত, নিজের কর্মশালার পাশের উঠানে খাঁ খাঁ করা কোণে শোনা যেত ওর ছেনি-হাতুড়ির শব্দ। কর্মশালার দেওয়ালে ঝোলানো ছিল অসম্ভব দৈর্ঘ্যের প্রতিকৃতিরা (যতদূর মনে পড়ছে, মেঝে থেকে ছাত অবধি)। ওদের কপি আমি দেখিনি— নষ্ট হয়ে যায়নি তো? নিজের ভাস্কর্যের নাম দিয়েছিল la chose (জিনিস), যা প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯১১ সালে, মনে হয়, Independants-এ। আমাকে আসতে অনুরোধ করেছিল সেখানে, তবে প্রদর্শনীতে ধারে-কাছে ঘেঁসেনি, কারণ একা ছিলাম না, সঙ্গে বন্ধুরা ছিল। আমার লম্বা গাঢাকা দেবার সময় হারিয়ে গেছে ওর উপহার দেওয়া ফটো এই জিনিসের।

এ সময়ে মদিলিয়ানি আবিষ্ট ছিল মিশর নিয়ে। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল লুভ্‌রে মিশর বিভাগ দেখাতে এই বলে যে বাকি সব (tout la reste) মনোযোগের অযোগ্য। আমার মাথা এঁকেছিল মিশর রানি আর নটীদের অলংকারে। মিশরীয় মহান আর্ট ওকে পুরো দখল করেছিল। বোঝাই যেত, মিশর ছিল ওর শেষ নেশা। অল্পকাল পরেই ও হবে এমন আত্মগত, যে ওর ছবিতে তাকালে কিছুই মনে রাখতে ইচ্ছে করে না। এখন মদিলিয়ানির সৃষ্টির এই কালখণ্ডকে বলা হয় periode nègre।

ও বলত : 'Les bijoux doivent êtres sauvages' (মণি হতেই হবে জংলী) (আমার আফ্রিকান মালা প্রসঙ্গে) আর সেটা পরা অবস্থায় আমাকে আঁকল। আমাকে নিয়ে যেত দেখাতে le vieux Paris derriére le Panthéon (প্যানথিয়নের পেছনের পুরনো পারি) চাঁদনি রাতে। শহর চিনত ভালো, তবু একবার আমরা পথ হারালাম। ও বলল : 'J'ai oublié, qvailxa lelv a milieu' (ভুলেই গিয়েছিলাম, মাঝে দ্বীপটা আছে)। ওই আমাকে দেখিয়েছিল স ত্যি কা রে র পারি।

মিলোসের ভেনাস নিয়ে বলত, সুগঠিতা নারীরা, যাদের আঁকা চলে, মূর্তি গড়া চলে, জামাকাপড়ে সদাই মনে হবে অস্বস্তিতে।

বৃষ্টির সময় (পারিতে বৃষ্টি প্রায়শ) মদিলিয়ানি ঘুরত বিশাল বেশ পুরনো এক কালো ছাতা নিয়ে। আমরা সময়ে সময়ে এ ছাতার তলায় বসতাম বেঞ্চে লুক্সেমবুর্গ উদ্যানে, গ্রীষ্মের বৃষ্টি ঝরত উষ্ণতায়, কাছেই আবছা হত le vieux palais l'Italienne (পুরনো ইতালিয়ান প্রাসাদ) আর আমরা দুই স্বরে আবৃত্তি করতাম ভের্লেন, স্মৃতিতে যা ছিল অটুট আর খুশি হতাম, একই জিনিস স্মরণে আসত বলে।

কোনো এক আমেরিকান বই-এ পড়েছি, যে সম্ভবত মদিলিয়ানির ওপর বড় প্রভাব ফেলেছিল বিয়াত্রিচে এস্ক (সার্কাসের খেলুড়ে, ট্রান্সভাল থেকে। এ নিয়ে লেখা আছে P Guillaume-এর Les arts à Paris. 1920. no 6. p. 1-2তে)। ইঙ্গিত, বোঝা যায়,

এরকম : মফস্বলের ইহুদির ব্যাটার কোথা থেকে আসবে পরিশীলিত বৈদগ্ধ্য, যদি না থাকতো সেই মহিলা যে ওকে অভিহিত করত 'perle et porcean' (মণি শুয়োরছানা) বলে। সাক্ষ্য হাজির করতে পারি এবং মনে করি করা দরকারও, যে বিয়াব্রিচে এক্সর সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগেই মদিলিয়ানি ততটাই বিদগ্ধ ছিল, অর্থাৎ ১৯১০ সালেই। আর যে মহিলা মহান শিল্পীকে শুয়োরের বাচ্চা ডাকতে পারে কাউকে কি আলো দিতে পারে?

আমাদের থেকে বয়সে বড়রা দেখাত, লুক্সেমবুর্গ উদ্যানের কোন পথ দিয়ে যেতেন ভের্লেন তাঁর মুগ্ধ জনতা নিয়ে 'নিজের কাফে' থেকে, যেখানে প্রতিদিন বক্তৃতা ঝাড়তেন, 'নিজের রেস্তরাঁ'য় মধ্যাহ্নভোজে। তবে ১৯১১ সালে সে-পথ দিয়ে যেতেন ভের্লেন না, যেতেন দীর্ঘদেহী এক মহাশয় সাফ ফ্রককোটে আর লিজিয়ঁ দ্য অনর ব্যাজ মারা সিল্কহ্যাটে। আর প্রতিবেশীরা ফিসফিস করত 'আঁরি দ্য রেনিয়ে!'।

দুজনের কাছেই এ নামের কোনো প্রতিক্রিয়া হত না। মদিলিয়ানি (যেমন অন্য শিক্ষিত-পারিবাসীরাও) শুনতেই চাইত না আনাতোল ফ্রাঁসের নাম। আমিও ওঁকে পছন্দ করতাম না। আর লুক্সেমবুর্গ উদ্যানে ভের্লেন ছিলেন শুধু স্মৃতিফলকে, যা উদ্‌ঘাটন করা হয়েছিল সে বছরই। আর হ্যাঁ, হুগো সম্পর্কে মদিলিয়ানি সোজা বলত 'Mais Hugo–c'est declamatoire?' (তবে হুগো—সে তো বকবক করে?)

* * *

একবার আমাদের ঠিকমতো কথা না হওয়ায় মদিলিয়ানির জন্য পৌঁছে আর না পেয়ে ক'মিনিট অপেক্ষা করা সাব্যস্ত করলাম। হাতে ছিল লাল গোলাপের তোড়া। কর্মশালার বন্ধ দরজার ওপর জানালা ছিল খোলা। কিছু করবার ছিল না বলে ফুল ছুঁড়তে লাগলাম কর্মশালায়। মদিলিয়ানির জন্য আর প্রতীক্ষায় না থেকে শেষে চলে গেলাম।

যখন দেখা হল, ও বিস্ময় প্রকাশ করল কীভাবে আমি বন্ধঘরে ঢুকতে পারলাম, চাবি তো ওর কাছে। বোঝালাম, কীভাবে। 'হতেই পারে না,—ওরা এত সুন্দর সাজানো ছিল...'

মদিলিয়ানি পছন্দ করত রাতের পারিতে চলতে আর প্রায়ই ওর পায়ের শব্দ শুনে রাস্তার তন্দ্রাভরা নীরবতায় জানালায় বেতাম আর জাফরির পাশ থেকে ওর ছায়া অনুসরণ করতাম, যা আমার জানালার নীচে ধীরগতি হত।

তখনকার পারি বিশের দশকের প্রথমেই আখ্যা পেয়েছিল 'Vieux Paris' বা 'Paris avant guerre' (যুদ্ধপূর্বের পারি)। তখনও অনেক fiacre (গাড়ির আড্ডা) ঝলমল করত। কোচোয়ানদের ছিল নিজেদের জমায়েত, যার নাম ছিল 'Au rendez-voux des cochers'. আর তখনও বেঁচেছিল আমার যুবা সমবয়সিরা, শীঘ্রই যারা মারা যাবে মার্নে আর ভের্দেনের উপকণ্ঠে। মদিলিয়ানি ছাড়া অন্য সব বাম মতের শিল্পীদের ডাক পড়েছিল যুদ্ধে। আজকের মতোই সেদিনও পিকাসো ছিল ততটাই খ্যাত আর তখন বলা হত 'পিকাসো আর বিয়ে', ইদা রুবিনস্টাইন অভিনয় করতেন শাহজাদীর, দিয়াগিলেভের রুশ ব্যালে ঐতিহ্যে চমকাত (স্ত্রাভিনস্কি, নিঝিনস্কি, পাভলোভা, কার্সাভিনা, বাক্‌স্ট্)।

এখন জানি, স্ত্রাভিনস্কির ভাগ্য থেমে থাকেনি প্রথম দশকে। তাঁর কৃতি বিংশ শতাব্দীর আত্মার শ্রেষ্ঠ সংগীতরূপ হিসেবে গণিত। তখনও এটা জানতাম না, ১৯১০ সালের ২০শে

জুন মঞ্চস্থ হল 'আগুন-পাখি'। ১৯১১ সালের ১৩ই জুন ফোকিন মঞ্চস্থ করলেন দিয়াগিলেভের ওখানে 'পেত্রুশ্‌কা'।

পারির জীবন্ত দেহে নতুন সড়ক পাতা তখনো শেষ হয়নি, যেমন Raspail বুলভার। জোলা তা বর্ণনা করেছেন। এডিসনের বন্ধু ভের্নের Taverne de Panthéon-এ আমাকে দুটি টেবিল দেখিয়ে বলেছিল, 'এটা তোমাদের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা—এদিকে বলশেভিকরা আর ওদিকে মেনশেভিকরা'। কখনো সফল কখনো বা না মহিলাদের পরিধানে Jupes-cullotes (ইজের), বা প্রায় পদপ্রান্তে পুরো ঢেউ খেলানো jupes-entravées। কবিতার পুরো আকাল ছিল আর তা বিক্রি হত কেবল মোটের ওপর চেনা শিল্পীর ভিঁয়েতগুলোর জন্য। তখনই বুঝেছিলাম, পারিসের ছবি গিলে ফেলেছে ফরাসি কবিতাকে।

রেনে হিল 'মগজের কবিতা' প্রচার করতেন আর ওঁর তথাকথিত শিষ্যরা অত্যন্ত অনিচ্ছায় কাছে আসত ছন্দের।

ক্যাথলিকরা জানা দার্ককে সন্ত ঘোষণা করল।

Et Jehanne la bonne loraine
Qu'Anglois brulerent a Rouen

(লোরেনের বালিকা জেহানকে ইংরাজরা রুয়াঁতে পুড়িয়েছিল)।

অমর গাথার এই চরণগুলি আমার মনে পড়ত নতুন সন্তের মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে। এগুলোর রুচি বিশেষ সুবিধের ছিল না আর চার্চপ্লেটের দোকানগুলোয় এগুলো বিক্রি আরম্ভ হয়েছিল।

* * *

মদিলিয়ানির খুব খেদ ছিল, আমার কবিতা বুঝতে পারে না আর মনে করত তাতে লুকোনো কী সব জাদু। আর এগুলো তো শুধু প্রথম ভিরু প্রয়াস তখনো (যথা, ১৯১১ সালের 'আপোলোনে')। 'অ্যাপোলোনে'র ছবিগুলো ('শিল্পের জগৎ') নিয়ে মদিলিয়ানি খোলাখুলি হাসাহাসি করত।

আমায় অবাক করেছিল, যখন কোনো এক কুৎসিত চেহারার মানুষকে মদিলিয়ানি সুন্দর মানল আর এ নিয়ে খুব জেদ করেছিল। তখনই ভেবে নিয়েছিলাম : 'ও, বোধহয়, সব দেখে আমাদের থেকে ভিন্ন ভাবে'।

যাই হোক, পারিতে যাকে ফ্যাশন বলা হয়, শব্দটাতে নানান রঙ চড়িয়ে, মদিলিয়ানি একদম লক্ষই করত না।

আমার ছবি ও আঁকত সামনে বসে। নিজের বাড়িতে এই ছবিগুলো উপহার দিয়েছিল। ষোলোটি ছিল, অনুরোধ করেছিল ফ্রেমবদ্ধ করে ৎসারস্কোয়ে সেলোয় আমার ঘরে টাঙিয়ে রাখতে। সে বাড়িতেই এগুলো শেষ হয়েছিল বিপ্লবের প্রথম বছরগুলোয়। বেঁচে গিয়েছিল একটাই, যাতে অন্যদের তুলনায় পূর্বাভাব পাওয়া যায় কম ওর ভবিষ্যতের 'ইউ'র (আমার বন্ধু খ্যাতনামা শিল্পজ্ঞ এন. ই. খারজিয়েভ এই ছবিটার ওপর লিখেছেন বেশ; তা সঙ্গে দেওয়া হল)।

ওর সঙ্গে কথায় সবথেকে বেশি থাকত কবিতা। দুজনেই জানতাম অনেক ফরাসি কবিতা

: ভের্লেন, লাফর্গ, মালার্মে, বোদলের।

দান্তে ও কখনো আমায় শোনায়নি। হতে পারে, তখনও ইতালীয় ভাষা জানতাম না বলে।

একদিন বলেছিল : 'j'ai oublié de vous dire. que je suis juif' (তোমাকে বলতে ভুলেছি, আমি ইহুদি)। ওর জন্ম হয়েছিল লিভর্নোর কাছে, বলত প্রথমেই, আর ওর বয়স চব্বিশ, যদিও আসলে তখন ছাব্বিশ।

বলত, ওকে আকর্ষণ করে আভিয়াতরেরা (এখনকার ভাষায় পাইলটরা)। তবে এদের কারোর সঙ্গে আলাপ হলেই নিরাশ হত : দেখা গেল, ওরা শুধু স্পোর্টসমেন। (কী আশা করেছিল?)।

এ সময় প্রথম দিককার হাল্কা (স্মরণ করুন গুমিলেভের 'না তিজোলিখ ই গুলকিখ মাশিনাখ/প্রজোতীয়ে প্রলত্তাৎ অবলাকা' (শব্দভরা ভারী যন্ত্রে/ফুঁরে ঝড়ের বাদল) আর বুকস্ট্যান্ডের মতো এরোপ্লেন চক্কোর কাটত আমার সমবয়সি (১৮৮৯) মরচেধরা বাঁকাটে এইফেল টাওয়ারের ওপর দিয়ে।

সেটাকে আমার মনে হত বিশাল বাতিদান, যা দানবেরা ভুলে রেখে গেছে বামনদের রাজধানীতে। তবে এ তো গালিভারের ব্যাপার।

* * *

...চারদিকে নতুন কিউবিজমের জয়জয়কার, যা মদিলিয়ানিকে স্পর্শও করত না।

মার্ক শাগাল পারিতে নিয়ে এসেছিল তার জাদু ভিতেবস্ক আর পারির বুলেভারে ঘুরে বেড়াত অজানা যুবক, যার সূর্য তখনো অনুদিত,—চার্লি চ্যাপলিন। 'মহান বোবা' (সিনেমাকে এ নামেই তখন ডাকা হত) তখনও চুপ করে ছিল ইংগিতে ভরে।

* * *

'আর দূরে উত্তরে'...রুশে মারা গেলেন লেভ তলস্তয়, ভ্রুবেল, ভেরা কমিসারঝেভস্কায়া, সিম্বলিস্টরা ঘোষণা করল আপৎকাল আর আলেকসান্দর ব্লক ভবিষ্যদ্বাণী করলেন :

> 'ও ইয়েসলি জ্নালি, দিয়েতি. ভী,
> খোলদ ই ম্রাক গ্রিদুশ্চিখ্ দ্নিয়েই'...
> (যদি জানতে, বাছারা,
> আগামী দিনের শৈত্য আর আঁধার...)

তিন স্তম্ভ, যাঁদের ওপর নির্ভর বিংশশতাব্দী—প্রুস্ত, জয়েস আর কাফকা তখনও কিংবদন্তী হয়ে যাননি, যদিও বেঁচেবর্তে ছিলেন মানুষ হিসেবে।

* * *

এ বিশ্বাস নিয়ে যে এরকম মানুষের প্রতিভা উদ্ভাসিত হবেই, পরের বছরগুলোয় যখন প্রশ্ন করতাম পারি-প্রত্যাগতদের মদিলিয়ানি সম্পর্কে, উত্তর বরাবর একটাই ছিল : জানি না, শুনিনি! (ওকে জানত না আ. এক্সটের (মহিলা, কিয়েভের সব 'বাম' শিল্পীদের গুরু), ব. আন্‌রেপ (খ্যাতনামা মোজেকচিত্রী), বা এন. অল্টমান, যিনি এ সময় (১৯১৪-১৯১৫) আমার প্রতিকৃতি আঁকতেন)।

একবার শুধু এন. এস. গুমিলেভ, যখন আমরা শেষবার একসাথে গিয়েছিলাম ছেলের কাছে বেঝেৎস্কে (১৯১৮র মে তে), মদিলিয়ানির নাম করতেই ওকে আখ্যাত করেছিল, 'মাতাল অদ্ভুত' বা এরকম কিছু। বলেছিল, পারিতে ওদের সংঘর্ষ হয়েছিল এ কারণে, যে গুমিলেভ কোনো এক আসরে রুশভাষায় কথা বলছিল আর মদিলিয়ানি আপত্তি করেছিল। আর দুজনেরই বেঁচে থাকা তো আর তিন বছর, দুজনেরই ভাগ্যে ছিল মরণোত্তর বিপুল খ্যাতি।

মদিলিয়ানি বেশ অপছন্দ করত টুরিস্টদের। মনে করত, দেশভ্রমণ এটা সৎভাবে বাঁচার বিরুদ্ধে। 'Les chants de Maldoro' পকেটে সবসময় নিয়ে ঘুরত, যখন বইটা বেশ দুর্লভই ছিল, গল্প করেছিল, কীভাবে রুশগির্জায় গিয়ে পড়েছিল ইস্টারের প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় ক্রুশ নিয়ে যাত্রা দেখতে, কলমলে উৎসব পছন্দের ছিল বলে। আর কীভাবে কেউ একটা 'সম্ভব বেশ জাঁদরেল লোক' (ভাবতে হবে, দূতাবাস থেকে) ওর সঙ্গে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকা আদানপ্রদান করতে চেয়েছিল। মদিলিয়ানি, মনে হয়, বুঝেই ওঠেনি এর অর্থ...

বহুদিন মনে হত, আর ওর সম্বন্ধে কিছু শুনতে পাব না। অথচ শুনলাম ওর সম্পর্কে অনেক বেশি...

* * *

নেপের শুরুতে তখনকার লেখকসংঘের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে সাধারণত বসতাম আলেকসান্দর নিকোলায়েভিচ তিখোনভের অফিসে (লেনিনগ্রাদ, মোখোভায়া ৩৬, প্রকাশনা 'বিশ্বসাহিত্য')। তখন আবার ডাকসংযোগ ফিরে এসেছিল বিদেশের সঙ্গে। তিখোনভ পেতেন অনেক বিদেশী বই আর পত্রিকা। কেউ একটা (মিটিং-এর মধ্যে) আমাকে দিল ফরাসি শিল্পপত্রিকার একটি সংখ্যা, খুলেই দেখি, মদিলিয়ানির ছবি...ক্রুশ...বড় লেখা নেক্রোলগ ধরনের। জানলাম, ও ছিল বিংশ শতাব্দীর মহান শিল্পী (মনে আছে, সেখানে ওর তুলনা হয়েছিল বত্তিচেল্লির সঙ্গে), ওর ওপর বই আছে ইংরাজিতে, ইতালিয়ানে। পরে তিরিশের দশকে আমাকে ওর অনেক কথা বলেছে এরেনবুর্গ, যে ওকে উৎসর্গ করেছিল 'স্তিখি অ কানুনাখ্' (পূর্বাভাসের কবিতা) বইতে কবিতা। পারিতে ওদের পরিচয় হয়েছিল আমার পরে। পড়লাম মদিলিয়ানি নিয়ে লেখা কারকোর 'মঁমার্ত্র হতে লাতিন কোয়ার্টার' আর বুলভারের উপন্যাস, যাতে লেখক ওকে যুক্ত করেছিল উত্রিল্লোর সঙ্গে। আস্থা নিয়ে বলতে পারি, এই দো-আঁশলা উনিশশ দশ-এগারোর মদিলিয়ানির সঙ্গে একদম মেলে না, আর লেখক যা করেছে তা পড়ে নিষিদ্ধ পদ্ধতির ঘেরাটোপে।

আর এই সেদিন মদিলিয়ানিকে পাওয়া গেল হিরো হিসেবে যথেষ্ট বাজে ফরাসি ফিল্ম 'মঁমার্ত্র ১৯'-তে। এটা বেশ তিক্ততায় ভরে।

বলশেভো, ১৯৫৯—মস্কো, ১৯৬৪।

আ. মদিলিয়ানির একটি ছবি

এন. ই. খারজিয়েভ। ৪ঠা মে, ১৯৬৪

কিছু বলতে চাই একটি ছবি নিয়ে, যা আমার মনকে প্রথম নাড়া দিয়েছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। আনা আখমাতভার প্রতিকৃতির লম্বা সারিতে। আঁকা ছবি, গ্রাফিক আর ভাস্কর্য, মদিলিয়ানির ছবি নিঃসন্দেহে প্রথম স্থান অধিকার করবে। প্রকাশের ক্ষমতায় এর সঙ্গে তুলনীয় শুধু সংযতবাক কবিতা ওসিপ মান্দেলস্তামের।

অপ্রাসংগিক নয় বলা যে মদিলিয়ানির 'আখমাতভা' আকস্মিক কিন্তু প্রায় প্রতিকৃতিগত মিল রাখে ওঁরই প্রথম ছবির সঙ্গে, যা আছে ড. পল আলেকসান্দরের সংগ্রহে "Maud Abrantes écrivants au lit" (শয্যায় লিখছেন মড্ আব্রান্তেস)। স্টাইলের দিক থেকে এই সৃষ্টি দুটি বিপরীতধর্মী আর শিল্পীর বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন পর্বের। ভাস্কর কনস্তান্তেন ব্রানকুজির সংগে দেখা হওয়ার বছর খানেক আগে মদিলিয়ানি আঁকেন সত্ত আব্রান্তেসের প্রতিকৃতি (১৯০৮) সামনাসামনি তাড়াতাড়ি, যা তুলুজ-লোত্রেকের প্রতিভাশালী তুলির কথা মনে করতে বাধ্য করে। জানা আছে, ব্রানকুজির প্রভাবে মদিলিয়ানি ঝোঁকেন নিগ্রো আর্টে আর ক'বছর ধরেই ব্যস্ত থাকেন ভাস্কর্য নিয়ে। আখমাতভার প্রতিকৃতি এই সময়েরই। শিল্পী তা এঁকেছেন কম্পোজিশন হিসেবে, যা বেশ মনে পড়ায় ভাস্কর্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ছবি, এখানে মদিলিয়ানির আয়ত্তে এসে পড়ে রেখাছন্দের অদ্ভুত প্রকাশ, ধীর আর সমতুল। মনুমেন্টাল স্টাইলের আর্ট ফর্মে এই ছোট ছবি পারে যে কোনো মাত্রা পরিবর্তন সামলে নিতে।

বিমূর্ত শিল্পের আধারশিলা রাখেন যে কজন, ব্রানকুজি তাঁদের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব কিন্তু মদিলিয়ানিকে নিয়ে যায়নি ফর্মাল এক্সপেরিমেন্টের দূরত্বে। কিউবিজমের রমরমার কালেও মদিলিয়ানি মানুষী মূর্তিতে আস্থা রাখেন, ট্রাডিশনবাদের শিকার এই অনুযোগের তোয়াক্কা না করে সমকালীনদের প্রতিকৃতির বিখ্যাত সারি সৃষ্টি করে যান। সমস্ত শিল্পজীবন উনি বজায় রাখেন ইতালিয়ান রেনেশাঁসের শিল্পসংস্কৃতির সঙ্গে জীবন্ত যোগ। অন্য শিল্পীদের স্মৃতিচারণায় একথা পড়া যায়, ওঁর শিল্পকৃতির অনুসন্ধানকার্যও।

তাই একটুও অপ্রত্যাশিত নয়, যে আখমাতভার প্রতিকৃতি মনে পড়াবে ষোড়শ শতাব্দীর স্থাপত্য-ভাস্কর্যের একটি বেশ বিখ্যাত মূর্তিকে। আমি বলছি জুলিয়ানো মেদিচির কবরের ঢাকনায় আঁকা রূপক মূর্তি 'রাত্রি'র কথা। মিকেলাঞ্জেলোর আঁকা স্ত্রীমূর্তির এটাই তো সবচেয়ে খ্যাত ও রহস্যময়ী ('রাত্রি'কে উৎসর্গ করেছেন চৌপদী মিকেলাঞ্জেলো, যা রুশভাষায় অনুবাদ করেছেন তিউত্‌চেভ)। মদিলিয়ানির ছবির কমপোজিশন মনে করায় 'রাত্রি'কে। 'রাত্রি'র মতোই আখমাতভার মূর্তি হেলান দেওয়া। আসন, যার সঙ্গে আসীন মূর্তি একাঙ্গ, মেদিচির দুই শকুনিওয়ালা সারকোফাগের ঢাকনির জ্যারেখা (দুভাগে ভাগ করা) মনে করায়। 'রাত্রি'র টানটান চেহারায় যেন নিজের হেলান-দেওয়া শয্যাত্যাগের ইংগিত, আর মদিলিয়ানির ছবিতে মূর্তি স্থির আর স্থাণু, যেন মিশরের স্ফিংকস। তবে এটার তো ব্যাখ্যা দুটো ভিন্নকালের

আরকিটেক্টনিক ধরনের নীতিগত ভিন্নতায় (এ লাইনগুলো পড়ে আ. আ. আখমাতভা স্মরণ করলেন, তাঁর সংগে এক কথোপকথনে মদিলিয়ানি মিকেলাঞ্জেলোর কথা পেড়েছিলেন। বলেছিলেন, 'C'est ridicule d'être le fils de Michel-Ange' (মহান লোকদের সন্তান থাকা অনুচিত)।

আখমাতভার সাক্ষ্য অনুযায়ী মদিলিয়ানির খুবই অস্বচ্ছ ধারণা ছিল ওঁর কবিত্ব সম্পর্কে। বিশেষ করে তখন তো উনি সবে শুরু করেছেন সাহিত্যজীবন। এ সত্ত্বেও এটার চোখ শিল্পীকে ফাঁকি দেয়নি, সৃজনশীল ব্যক্তির অন্তরের কথা উঠে এসেছে ছবিতে।

আমাদের সামনে ১৯১১ সালের আনা আন্দ্রেইয়েভনা আখমাতভার প্রতিকৃতি নয়, "সময়হীন" মূর্তি কবির—নিজের আন্তরিক স্বরে কান পাতা।

এভাবেই তন্দ্রায় আছে ফ্লোরেন্সের সারকোফাগে মর্মরের 'রাত্রি'। তন্দ্রাচ্ছন্না, তবে এ তো স্বপ্নদ্রষ্টার অর্ধনিদ্রা।

ফিরে এল 'লেনিন শতাব্দী' কবি ও কবিতায়

সুস্নাত দাশ

বিগত শতক 'লেনিন শতাব্দী' ছিল না 'লেনিনের যুগ' তা নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন, তবে অস্বীকারের কোনোই উপায় নেই যে বিংশ শতাব্দী ছিল নানা অর্থে, নানা কর্মে ও নানা ভাবনায় লেনিন-প্রভাবিত। বাঙালি বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক, কবি, শিল্পীদের বিভিন্ন সৃজনশীলতায় ও নানা অনুষঙ্গে লেনিনের উপস্থিতি ক্রমশই উজ্জ্বলরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে থাকে ১৯২০-এর দশক থেকে এবং তা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে লেনিন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। বাংলা ভাষায় লেনিন সম্পর্কিত রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়, যতদূর জানা গেছে, বিস্ময়করভাবে 'সৎসঙ্গী' নামক ধর্মবিষয়ক একটি মাসিকপত্রে। এখানে 'লেনিন' নামক রচনাটি ১৩২৮ সালের বৈশাখ (১৯২১) থেকে শুরু করে ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অবশ্য লেখকের নামবিহীন রচনাটিতে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। অনুমিত হয় তৎকালীন বাঙলার গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিরই কেউ গোপনে এই রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। কারণ ১৯২১-২২ সাল থেকেই 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' বিপ্লবী সমিতির কেউ কেউ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেনিন বিষয়ে লিখতে শুরু করেন। ১৯২১ সালে এমনই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ফণীভূষণ ঘোষের রচিত 'লেনিন' শীর্ষক জীবনীগ্রন্থের প্রকাশ। নিঃসন্দেহে বাংলাভাষায় এটিই লেনিনের জীবনী রচনার প্রথম প্রয়াস। ফণীভূষণের পুস্তকের মুখবন্ধ থেকে জানা যায় যে তিনি জি. ভি. কৃষ্ণ রাও কর্তৃক ইংরাজিতে প্রণীত লেনিন-জীবনী এবং এস. এ. ডাঙ্গের সুবিখ্যাত পুস্তিকা 'গান্ধী ভার্সেস লেনিন' থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। তথ্যগত ভ্রান্তি থাকলেও গোড়ার দিকের লেনিন চর্চার সূচনা রূপে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর 'বিজলী' পত্রিকায় শ্রীফণীভূষণ ঘোষের 'লেনিন' পুস্তকের সমালোচনা মুদ্রিত হয়েছিল।

অনুশীলন দলের তরুণ বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 'শঙ্খ' পত্রিকায়। 'লেনিন ও সমসাময়িক রুষিয়া' শীর্ষক রচনাটি শঙ্খ-তে প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে ১৩ চৈত্র (১৩২৮) থেকে ৭ ফাল্গুন (১৩২৯) পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সংখ্যায়। রচনাটি আজও নানা কারণে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়। যাহোক ১৯১৮ সালে জনৈক নৈরাজ্যবাদীর দ্বারা গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরিণতিতে ১৯২৩ সাল থেকে লেনিন ক্রমশই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এবং পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সংবাদমাধ্যম যখন অহর্নিশি তাঁর কাল্পনিক মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করে পরক্ষণেই প্রত্যাহার করছে—সেই সময়কালে লেনিন সম্পর্কিত আগ্রহ ও কৌতূহল বাঙলা তথা ভারতে শিখর স্পর্শ করেছিল। অবশ্য এটিই একমাত্র কারণ ছিল না। দেশের শহর ও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ (বিশেষত বাঙলা, বোম্বে ও যুক্তপ্রদেশে) এবং সর্বোপরি গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা—দেশের বুদ্ধিজীবী ও যুবসমাজ অথবা বলা

চলে শত্রু-মিত্র সকলের মধ্যেই লেনিন, সোভিয়েত রাশিয়া ও বলশেভিকবাদের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। ১৯২৩ সাল থেকেই তাই দেখা যায় 'মোহাম্মদী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'আত্মশক্তি', 'সংহতি' থেকে শুরু করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পর্যন্ত নানা বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় লেনিন ও রুশ-বিপ্লব সম্পর্কে অসংখ্য না হলেও অনেক রচনাই প্রকাশ পেতে শুরু করে। ক্রমশ লেনিনের প্রকৃত ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ্ নামটিও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তৎকালীন তরুণ লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর অভিনব প্রবন্ধ সংকলন 'আজ এবং আগামীকাল'-এর অন্তর্ভুক্ত 'সুপারম্যানিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে (সংকলনটি পরবর্তীকালে পুনরায় 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' নামে প্রকাশিত হয়) সপাটে বলা হয়েছিল :

"বুদ্ধ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত প্রত্যেক মহাত্মাই মানুষকে আত্মার মুক্তি দিতে এসে ব্যর্থকাম হয়েচেন, কিন্তু লেনিন এই জন্যই কৃতার্থ যে তিনি জেনেছিলেন ও-জিনিস কারু হাতে তুলে দেওয়া যায় না, যেহেতু ও সবার হাতেই রয়েচে। তিনি ক'রে গেছেন সবার ভাতের ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন না খেয়ে শুকিয়ে ম'লেও ভেবো না, কেন না ওতে দেহই শুকোবে; তোমার আত্মার শুষ্কতা নেই। কিন্তু লেনিনই প্রথম এসে বল্লেন, দেহই বা শুকোবে কেন? তারই আত্মস্থ হওয়ার দরকার—হওয়ার সার্থকতা যে দেহী, যে-বিদেহী তার নয়।"

।। ২ ।।

সাহিত্য-গবেষক অবিনাশ দাশগুপ্ত তাঁর মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ *লেনিন, রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ-সাহিত্য*-তে লেনিন সম্পর্কিত কবিতার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন : শুধু রাজনীতি সংবাদ এবং প্রবন্ধই নয়, লেনিন সম্পর্কে বাংলা পত্র-পত্রিকায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাগুলোর মধ্যে কোথাও লেনিনের নাম সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত, আবার কোথাও বা লেনিনের নামের কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু তাঁর মতাদর্শ, বিপ্লবী নেতৃত্ব, কর্মদক্ষতা প্রভৃতির জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। বাংলা কাব্যে সম্ভবত শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যই প্রথম লেনিনের নামে কবিতা রচনা (১৯২৪) করেছিলেন। এই কবিতাটির জন্য কবিকে পুলিসের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর এই সুদীর্ঘ কবিতাটি বঙ্গবাণীতে ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাটিতে লেনিনের প্রতি কবির অপরিসীম শ্রদ্ধা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই দুষ্প্রাপ্য দীর্ঘ কবিতাটির প্রথম কয়েকটি পংক্তি এই প্রকার—

লেনিন

বারম্বার মৃত্যুবার্তা রটায়েছে বিশ্বদূত
হয়নি সে কাল-অঙ্গে লীন;
এইবার মরেছে লেনিন্।

রুশের গগন-সূর্য্য অস্তমিত আজ।
জনগণ-মনঃ-অধিরাজ।
পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিচ্ছুরিয়া রশ্মি তার,
নাশি' অন্ধকার,
জাগ্রত করেছে কোটি উপেক্ষিত নর-নারী,
অন্ন দিয়া, মুছাইয়া নয়নের বারি।

লেনিন-কে নিয়ে রচিত আর কোনো কবিতা কেন এর পরে ১৮ বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি—তা খুবই বিস্ময়কর। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *লেনিন শতাব্দী*-র প্রস্তাবনায় সম্পাদক লিখেছিলেন, "১৯৬৯-৭০ সাল জুড়ে বাংলাদেশে লেনিন-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ব্যাপকতা ভবিষ্যতের গবেষককে নিঃসন্দেহে বিস্মিত করবে।" ঠিক কথা। কিন্তু আজকের গবেষককে এটাও বিস্মিত করে যে কেন 'পরিচয়' বা অন্যান্য মননশীল সাময়িক পত্রিকা এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাসের মতন কবিরা থাকলেও যতীন্দ্রপ্রসাদের পরে দেড়যুগ বাঙালি পাঠককে অপেক্ষা করতে হল ১৯৪২ সালে 'অরণি'-র পৃষ্ঠায় লেনিন বিষয়ে কবিতা পাঠের জন্য। এটা কি শুধু সরকারি দমননীতির ভয়ে—না কি অন্য কারণে।

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিতেও দেখি প্রায় ত্রিশ হাজার শব্দের এই পুস্তকে দু'একবার স্তালিন নামের উল্লেখ থাকলেও লেনিন শব্দটির উল্লেখ নেই কোথাও (জানি না আমার ভুল হচ্ছে কি-না!)। অবশ্য লেনিনকে বাংলা সাহিত্যে তুলে ধরার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের হতে পারে না। কিন্তু অদ্ভুত লাগে ১৯২৯-৩৩-এ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৩১-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন, ১৯৩৫-এর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও আমাদের দেশের কবিদের মনের কোথাও কেন লেনিন সম্পর্কে কোনও আবেগ জাগলো না।

নাৎসী-জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরেই শুধু দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি'-র পৃষ্ঠায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের শরৎকাল থেকে প্রথমে গোলাম কুদ্দুস এবং তারপরে একে একে নবেন্দু রায়, বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবির কবিতা প্রকাশিত হয়। লেনিন প্রসঙ্গ অবশ্য তার আগে অন্তত একবারই এসেছিল ছাত্র-কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সম্ভবত ১৯৩৯ কিংবা ১৯৪০ সালে। 'দলভুক্ত' কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন :

"শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা; লেনিন দিবস; লাল পাগড়ি মোতায়েন;
আতঙ্কিত অন্তরাত্মা; ইষ্টনাম জপে রক্তচক্ষু মাড়োয়ারী;
নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন;"

[পদাতিক]

কবিতাটি ভোলা যায় না তার শেষাংশের দুটি অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তির জন্য :

"ধনতন্ত্রে নাভিশ্বাস; পরিচ্ছন্ন স্থান তার প্রস্তুত ভাগাড়ে;
(সাবাস বল্লভভাই, প্রকাশ্যেই নেড়ে দিলে গান্ধীর চিবুক!)"

॥ ৩ ॥

পশ্চিমবঙ্গে লেনিন শতবর্ষ উপলক্ষে যে তিনটি বাংলা কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয় তাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাটি স্থান পেয়েছে তরুণ সান্যাল ও গণেশ বসু সম্পাদিত *লেনিনের যুগ* (জুলাই, ১৯৬৯, সারস্বত) কাব্য সঙ্কলনে। এরপর দ্বিতীয় কাব্যসংকলন সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ক্ষীণকায় হলেও *খাড়া পাহাড় বেয়ে* নামক এই সংকলনে যতীন্দ্রপ্রসাদের প্রায়-বিস্মৃত কবিতাটি পুনর্মুদ্রণ করে সম্পাদক লেনিন-অনুরাগী কাব্য-পাঠকদের আরো প্রিয় হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন স্বয়ং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দীপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত *লেনিন শতাব্দী* নামক কাব্য-সংকলনটি (সেপ্টেম্বর, ১৯৭০; মনীষা গ্রন্থালয়) ছিল লেনিনের জন্মশতবর্ষে নিবেদিত বাঙালি কবিদের তৃতীয় প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ। নিঃসন্দেহে বলা চলে আকারে, প্রকারে, চরিত্রে ও গুরুত্বে এটিই ছিল শ্রেষ্ঠতম।

'পরিচয়' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে যুগ্মভাবে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীপেন্দ্রনাথ যখন দায়িত্ব নেন (আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭২) তখন গোপাল হালদার ছিলেন সম্পাদক। ১৯৬৭ সালে দীর্ঘ সম্পাদনা পর্বের পর তিনি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। পরিচয়ের বয়স তখন ৩৬ বছর। ১৯৬৮তে বছরখানেক সম্পাদক রূপে কাজ করেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তারপরেই যুগ্মভাবে পরিচয়ের সম্পাদনায় আসেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি-অধ্যাপক তরুণ সান্যাল। শ্রীসান্যাল ইতিপূর্বে সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন না—তাঁর নাম ছিল নবতম সংযোজন।

বন্দ্যোপাধ্যায়-সান্যাল-এর যৌথ সম্পাদনায় পরবর্তী কয়েক বছর ধরে পরিচয় (কোনও সম্পাদকমণ্ডলী এ সময় ছিল না) বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুসম্পাদিত সংখ্যা প্রকাশ করে যার অন্যতম ১৯৭৫ সালে দুটি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংখ্যা (একটি শারদীয় সংখ্যার সঙ্গে)। ১৯৭৬ থেকে যখন দীপেন্দ্রনাথ এককভাবে পরিচয় সম্পাদনা করেছেন তখনও দেখা গেছে এই অসাধারণ ছোটগল্পকার ও গদ্যলেখক কত বড় মাপের সম্পাদক। বস্তুত পরিচয়ের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংখ্যার মূল পরিকল্পনা ও আয়োজন যতদূর জানি দীপেন্দ্রনাথেরই।

লেনিন শতাব্দী কাব্য সংকলন যে সময়ে প্রকাশিত হয় তখন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন নানা গোষ্ঠী, মতবাদ ও দ্বন্দ্বে প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন। লেনিনকে কেন্দ্র করেই এই মহামানবের জন্মশতবর্ষে বামপন্থী কমিউনিস্টদের ভাঙা বুক যে জোড়া লাগানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে নানাভাবে ও নানা ধারায় লেনিন শতাব্দী উদ্‌যাপন। দীপেন্দ্রনাথ এই কাব্যসংকলনের প্রস্তাবনা অংশে বলেছিলেন, "এক মহৎ জন্মের শতবর্ষপূর্তি বাঙলাদেশের বিপুল সংখ্যক কবিকে অমোঘ কারণে আলোড়িত করেছে। আমাদের মহীয়সী ভাষায় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির উদ্দেশে এত কবিতা নিবেদিত হয়নি। পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন সেগুলি অধিকাংশই লেখা হয়েছে বিশুদ্ধ আবেগ ও অন্তরজাত প্রেরণা থেকে।"

কেন *লেনিন শতাব্দী* সংকলনটিকে লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত অন্যান্য কাব্য সংকলনের

মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলা হল তার সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, এটি এই বিষয়ে প্রকাশিত এখনও পর্যন্ত সর্ববৃহৎ সংকলন। ১৩৮ পৃষ্ঠায় সর্বমোট একশত কবির কবিতা এতে স্থান পেয়েছে দলমত, রঙ বিচার না করেই। অনেকেই আছেন যাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না—তারা কবি এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত, সম্পাদকের দীর্ঘ প্রস্তাবনা অংশ। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ গদ্য, পরিশীলিত চিন্তাধারা, সুবিবেচনাপ্রসূত তথ্যের সন্নিবেশ দ্বারা কাব্যসংকলনটির ভূমিকাংশটি একশোটি কবিতার মর্মবাণীকেই যেন স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল একটি মানুষ জন্মেছিলেন—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। নচিকেতার মতো 'নরক'-এ গিয়ে তিনি জীবনের রহস্য উপলব্ধি করলেন। ১৯০০ সালে লেনিন হয়ে জ্বাললেন নচিকেত অগ্নি 'ইস্ক্রা'। তারপর ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে একটি রাষ্ট্র জন্ম নিল—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র।...

..."লেনা থেকে লেনিন। নদী বয়। নদী অন্বয় সৃষ্টি করে। লেনিন এক মহান উৎস থেকে এক অনির্বাণ প্রবাহ।" দীপেন্দ্রনাথ ছাড়া এ কথা উচ্চারণের মেধা সেদিন কার ছিল জানি না : "গর্কির লেখা প্লেখানভ ও লেনিনের প্রতিতুলনা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই বুঝবেন নামের জন্য কেন প্লেখানভ ভলগাকে বাছলেন, আর কেনই বা ভলগার তীরে জন্মেও উলিয়ানভ 'অভিশপ্ত' সাইবেরিয়ার একটি নদীর নাম গ্রহণ না করে পারলেন না।" সংকলন শেষের নির্দেশিকা অংশটি দীপেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেই বা করতেন।

তৃতীয়ত, দীপেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন "লেনিনের ওপর বাঙলা ভাবায় লেখা প্রথম কবিতা এবং সুকান্তর "বিপ্লব স্পন্দিত বুকে"র দীপ্ত উচ্চারণকে বাদ দিয়ে লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত কোনো কাব্যসংকলন হতে পারে না।" এ ছাড়া সংকলনটির বড় সম্পদ হল কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য এই ৬টি মাত্র কবিতা ছাড়া আর সব কবিতাই কবিদের সাম্প্রতিক রচনা। লেনিন-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষেই সেগুলি রচিত। অবশ্য আক্ষেপ জাগে বাঙলার সেরা শতকবির উপস্থিতি সত্ত্বেও (আজকের শিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী বা কথাসাহিত্যিক মিহির সেনের মতন কেউ কেউ অবশ্য কাব্যজগতে বেশিদিন ছিলেন না) নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতন প্রতিষ্ঠিত কবিদের (যেখানে স্বয়ং শক্তি চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন) কাছ থেকে এই সংকলনের জন্য কোনো কবিতা লিখিয়ে নেওয়া যায়নি বলে!

শেষত, একটি নোটবুক সাইজের (সহজেই যা বুকপকেটে রাখা সম্ভব) প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী (লেনিনের সেই বিখ্যাত ভাষণদানকারী প্রতিকৃতি) প্রচ্ছদসহ কাব্যসংকলনের পরিকল্পনাটি অভিনব ছিল। এ যেন হাতে হাতে ফেরা বিপ্লবের ইস্তাহারের কবিকৃত দলিল—যা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

* * *

ছত্রিশ বছর পূর্বে প্রকাশিত অমূল্য সংকলনটি দীপেন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত হয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে এই নবীন লেখকের হেফাজতে আছে বলে গর্বিত হৃদয়ে এত কথা বলা গেল। সংকলনটির

প্রকাশনায় দীপেন্দ্রনাথের সহযোদ্ধা ছিলেন প্রভাত চৌধুরী। তাঁর উদ্যোগে ও কবিতা পাক্ষিকের আনুকুল্যে সম্প্রতি (জানুয়ারি ২০০৬) সংকলনটির একটি পুনঃমুদ্রণ ঘটেছে একই আকারে ও প্রকারে। যদিও প্রচ্ছদ পাল্টেছে এবং 'কেন দ্বিতীয় প্রকাশ' সে বিষয়ে প্রভাতবাবু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেছেন। এই পুনর্মুদ্রণের জন্য কবিতা ও লেনিনপ্রেমী সকলে আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। তবে মুদ্রণ প্রমাদগুলি না থাকলে ছিল ভাল—বিশেষ করে তরুণ সান্যালের কবিতার নামটাই এর ফলে পাল্টে গেছে। তবে ভুল হয়নি উৎসর্গপত্রে মার্কস ও এঙ্গেলসের নাম উল্লেখে। কারণ লেনিনের অস্তিত্বের সবটুকুতেই তো এঁরাই জড়িত ছিলেন।

সামনে সমুদ্র

আশিস ঘোষ

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বারবার সামনে সমুদ্র আর পেছনের হোটেলের দিকে তাকাতে থাকে মনোজ। ঘর থেকে বেরুনোর সময় মোবাইলটা আনতে ভুলে গেছে। অন্যদিন এ সময়ে বিচে বেশ ভীড় থাকে। কিন্তু দুপুর থেকেই আজ আকাশের অবস্থা ভাল নয়। থেকে থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি হচ্ছে।

সি বিচের দোকানগুলোও সব বন্ধ। বাইরে এখন না বেরুলেই হতো। কিন্তু প্যাকেটে মাত্র একটা সিগারেট থাকায় বাধ্য হয়ে বেরুতে হলো। আর যাই হোক মাঝে মধ্যে এক আধটা না ধরালে, মেজাজ ঠিক থাকে না।

মনোজ সামনের দিকে এগুতে থাকে। সমুদ্রের ধার ঘেঁসে কী যেন পড়ে আছে। মানুষ নয় তো? থমকে দাঁড়ায় মনোজ। বেঁচে আছে, নাকি কোনও লাশ? কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে, ভাল করে দেখার চেষ্টা করে। প্রায় সন্ধে হয়ে এলো। আবছা অন্ধকারে সাবধানে এগুতে থাকে মনোজ। কিন্তু এ কি এ তো একজন মহিলা। এখানে এল কোথা থেকে? বিবস্ত্র অবস্থা দেখে বোঝা যায় সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে এসেছে। মাথার চুল এলোমেলো। জট পাকানো। ব্লাউজটা ছেঁড়া। শাড়িটা হাঁটুর ওপর পর্যন্ত বিশ্রীভাবে তোলা। জোরে ঢেউ এলেই, শরীরটা জলে ভেসে উঠছে। যে-কোনও মুহূর্তে আবার সমুদ্রের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। একটু ইতস্তত করে মনোজ। পেছন ফিরে তাকায়। আশে পাশে কারুর দেখা নেই। গোটা 'বিচটাই' ফাঁকা। ওপাশের হোটেলগুলো কিন্তু আলোয় ঝলমল করছে। সামনের রাস্তায় ছাতা মাথায় দু' চারজনে। কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। কী করা যায়? মোবাইলটা সঙ্গে থাকলে এখান থেকে হোটেলে ফোন করে ব্যাপারটা জানানো যেত।

আরও কিছুটা এগিয়ে যায় মনোজ। নিজে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করে। বেঁচে যে নেই বোঝাই যাচ্ছে। কতক্ষণ আগে ঘটনাটা ঘটেছে কে জানে। চারদিকটা আবার ভাল করে দেখে নেয় মনোজ। না, কোথাও কেউ নেই। আরও কিছুটা এগিয়ে যায়। হঠাৎ বড় মাপের একটা ঢেউ এসে পড়ায় হাঁটু পর্যন্ত জলে ভিজে যায়। সামনে পড়ে থাকা লাশটা জলে ভাসতে থাকে। সতর্ক হয় মনোজ। এখনই টেনে সরিয়ে আনা দরকার। যে-কোনও মুহূর্তে জলের টানে ভেসে যেতে পারে। নিজে ঝুঁকে দুটো পা ধরে লাশটা দিকে অনেকটা টেনে আনে। ওপর দিকে জড়ানো শাড়িটা খানিকটা সরে যেতেই, জিনিসটা চোখে পড়ে। সোনার হার একটা। এই আবছা অন্ধকারেও চকচক করছে। মনোজ এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কী করা যায়? চারপাশটা আর একবার দেখে নেয়। হঠাৎই আবার বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়তেই কেঁপে ওঠে। এই দুর্যোগ আর অন্ধকারে কেউ হয়তো এদিকে আসবে না কিন্তু কাল সকালে? যে কেউ হারটা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একটু ইতস্তত করে মনোজ। সামনে এখন ঢেউ

ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। কালো সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে। হাত বাড়িয়ে হারটা ধরে ফেলে মনোজ। একবার টানতেই হাতের মুঠোয় চলে আসে। চেনটা বোধহয় আগেই কেটে গিয়েছিল। চুলে বা কিছুতে জড়িয়ে যাওয়ার জলে ভেসে যায়নি। ভাল করে পরীক্ষা করে মনোজ। লকেটে একটা লাল পাথর বসানো। পাথরটা অন্ধকারেও চকচক করছে। লাশটার দিকে আর একবার তাকায় মনোজ। সাবধানে হারটা প্যান্টের পকেটে রেখে দেয়। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। সামনে সমুদ্র। অন্ধকার যত ঘন হচ্ছে, ঢেউ তত উত্তাল হয়ে উঠছে। বারবার ঢেউ গড়িয়ে এসে পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিচ্ছে। লাশের ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। এভাবে এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? পেছনের হোটেলগুলোর দিকে তাকায় মনোজ। আলোয় ঝলমল করছে। পকেটে হাত দিয়ে হারটা বের করে আনে। আবার পকেটেই রেখে হোটেলের দিকে পা বাড়ায়।

মনোজ এখন হোটেলের ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি না থাকলেও হাওয়ার দাপট সামনে চলছে। যে-কোনও মুহূর্তে আবার বৃষ্টি শুরু হতে পারে। একটা পুলিশের জীপ আর অ্যামবুলেন্স হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে। তখন হোটেলে ঢুকে প্রথমেই ব্যাপারটা অফিসে জানিয়েছিল মনোজ। যে লোকটা কাউন্টারে বসেছিল সে তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায় না। অবিশ্বাসের চোখে মনোজকে দেখেছিল। ঠিক দেখেছেন তো? অন্তত পাঁচবার এই প্রশ্ন করেছে।

—আমি কি মজা করছি? মনোজের ধমক খেয়ে লোকটা থতমত খেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ম্যানেজারকে ডেকে আনে। সব শুনে ম্যানেজার বলে—আপনি ঘরে যান। একেবারেই তো ভিজে গেছেন—লোকাল থানায় ফোন করছি। যা করার ওরাই করবে।

আর দাঁড়ায়নি মনোজ। ঘরে এসে প্রথমেই ভেজা জামাপ্যান্ট খুলে ফেলে। সবগুলো বারান্দার দড়িতে দিতে গিয়েই হারটার কথা মনে পড়ে। প্যান্টের পকেট থেকে হারটা বের করে নেয়। মনেই ছিল না। ম্যানেজারকেও বলা হয়নি। কী করা যায়? কোথায় রাখা যাবে? জানলার দিকে ঘরের কোণে শ্বেতপাথরের নিচু স্ট্যান্ডে পিতলের একটা ফুলদানি চোখে পড়ে। খালি ফুলদানিটার গায়ে ধুলো জমা। ফুলদানিটার ভেতরেই হারটা ফেলে দেয় মনোজ। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। প্রায় অন্ধকার সি বিচে পড়ে থাকা লাশ। অচেনা এক মহিলার। গলায় লাল পাথর বসানো সোনার হার। সেটা এখন নিজের কাছে থাকায় বেশ অস্বস্তি হচ্ছে মনোজের। হারটা নিয়ে এসে অন্যায় করেনি তো?

কী করবে এখন? ঘরবার করতে থাকে মনোজ। ঘরের আলো নেভায় জ্বালায়। বারান্দায় গিয়ে বাইরেটা দেখে আসে। হঠাৎ দরজার বেল বেজে ওঠে দরজা খুলতেই—

—আপনি মনোজবাবু? একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে।

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—দরকার ছিল। নিচের অফিসে আসবেন, নাকি আপনার ঘরেই বসবো?

—এখানেই আসুন না—দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ায় মনোজ।

ঘরে ঢুকে সোজাসুজি চেয়ারে বসে অফিসার। বসুন আপনি—উল্টো দিকের চেয়ারটা দেখায়।

—সি বিচে যে ডেডবডিটা পাওয়া গেছে তার একমাত্র সাক্ষী আপনি—আপনিই প্রথমে দেখেছেন। হোটেলে জানিয়েছেন।

—এছাড়া আমার আর কী করার ছিল বলুন?

—তা ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এত খারাপ ওয়েদারে আপনি বিচে গিয়েছিলেন কেন?

প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক। এ প্রশ্ন যে তাকে করা হতে পারে, মনোজ সেটা আগেই ভেবেছে। উত্তরটাও ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু পুলিশ অফিসার প্রথমেই প্রশ্নটা করে বসায়, কী ভাবে শুরু করবে ঠিক বুঝতে পারছে না মনোজ। চটপট নিজের যুক্তিটা গুছিয়ে নিয়ে এবার বলতে শুরু করে। কেন সি বিচে গিয়েছিল, গিয়ে কী দেখেছে, কী করেছে সব বলে যায়। অফিসার ডাইরিতে লিখে নিতে থাকে।

—কিছু যদি মনে না করেন তো, একটা প্রশ্ন করি—

—বলুন না—

—এখানে কবে এসেছেন?

—এই তো দিন পাঁচেক—

—একা?

—দেখতেই তো পাচ্ছেন।

খুব দ্রুত ডাইরিতে লিখতে থাকে অফিসার। এক সময় লেখা থামিয়ে মনোজের দিকে তাকায়। —ডেডবডিটা সমুদ্রের ধার থেকে সরিয়ে এনে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন—

মনোজ মাথা নাড়ে—এ ছাড়া উপায় কী। না হলে তো ঢেউয়ে আবার টেনে নিয়ে যেত কোথায় ভেসে যেত ঠিক নেই।

—তা ঠিক। আচ্ছা এই ক'দিনে এই মহিলাকে কি এখানে কোথাও দেখেছেন?

হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্ন আশা করেনি মনোজ। কিছুক্ষণ অফিসারের দিকে চেয়ে থেকে—বলে—আবছা অন্ধকারে তখন মুখটা ভাল করে দেখতে পাইনি। এমন একটা পরিস্থিতি হলো যে মহিলার মুখটা মুখটা চেনা কি অচেনা সি বিচে তাকে দেখেছি কিনা এসব চিন্তা তখন মাথায়ও আসেনি—

—স্বাভাবিক—গার্ডার জড়িয়ে হাতের ডাইরিটা বন্ধ করে অফিসার—

—আসলে কী জানেন, কিছু ছকে বাঁধা প্রশ্ন আমাদের করতেই হয়। ডাইরিটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায় অফিসার। চলি এবার। ডেডবডি নিয়ে যেতে হবে। আর কদিন আছেন এখানে?

—ইচ্ছে তো ছিল আরও কয়েকটা দিন থেকে যাব। কিন্তু এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার হলো—

—ওসব ছাড়ুন। দরকার হলে আবার হয়তো আসতে পারি।—

—ঠিক আছে—উঠে দাঁড়ায় মনোজ। অফিসার বেরিয়ে যেতেই, দিড়জা বন্ধ করে ঘরের সব আলো নিভিয়ে বাইরের বারান্দায় যায়। এ্যামবুলেন্স স্টার্ট নিতেই অফিসার জিপে উঠে বসল। আগে জীপ পরে এ্যামবুলেন্স। গাড়ি দুটো প্রায় একই সঙ্গে চলতে শুরু করে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে মনোজ। হাওয়ার দাপট খানিকটা কমে এলেও ঝিরঝিরে বৃষ্টি

চলছেই। আশপাশের হোটেল আর দোকানের আলোয় যতটা দেখা যায় তারপরই অন্ধকার। সমুদ্রের দিকে শুধু ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ। অন্ধকারে ওদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

জোলো হাওয়ায় বেশ শীত করছে। বারান্দা থেকে চলে আসে মনোজ। ক্লান্ত লাগছে মাথাটাও ভার। জানলা বন্ধ থাকলেও বাইরে থেকে আবছা আলোর আভাস ঘরময় ছড়িয়ে আছে। মনোজ জানলার দিকে যায়। পিতলের ফুলদানিটা উপুড় করতেই কয়েকটা দেশলাই কাঠি সিগারেটের টুকরোর সঙ্গে সোনার হারটা বেরিয়ে আসে। হারটা হাতে নিয়ে সোফায় বসে মনোজ। গা এলিয়ে দেয়। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সে তো কনফার্মড ব্যাচিলার। তার কোনও বান্ধবীও নেই। এ হেন মনোজ সেন, যার বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই তার হাতের মুঠোয় এমন একজন মহিলার সোনার হার, যে বেঁচে নেই, যাকে সে আদৌ চেনে না। সেই অচেনা সুন্দরীর গলায় ছিল হারটা।

দুই স্তনের মধ্যবর্তী জমিতে লাল পাথর বসানো লকেটটা ঝুলে থাকত। হারটা নাকের কাছে ধরে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করে মনোজ। হাল্কা মিষ্টি গন্ধ যেন। মনের ভুল নয়তো? হারটা আঙুলে জড়াতে থাকে। উচিত ছিল এই দামি হারটা পুলিশকে দেয়া। এই অস্বস্তিটা তাহলে আর হতো না। কী দরকার ছিল নিজের কাছে রাখার? উঠে দাঁড়ায় মনোজ। প্রায় অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে থাকে। জানলা দরজা বন্ধ থাকায় গুমোট হয়ে আছে ঘরটা। জানলা খুলতেই ঠাণ্ডা জোলো হাওয়ার ঝাপটা ভেতরে ঢুকতে থাকে। হারটা নিয়েই জানলার ধারে যায় মনোজ। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। হারটা আবার ফুলদানিতেই রেখে দেয়। বেশ রাত হয়েছে। নিচের ডাইনিং হল এতক্ষণে বোধহয় ফাঁকা হয়ে এলো।

মনোজ বুঝতেই পারেনি, রাতারাতি সে এতো পরিচিত হয়ে গেছে। পরের দিন দুপুরে ডাইনিং হলে গিয়ে বসতেই অনেকে তাকে দেখতে থাকে। উল্টো দিকে বসা মাঝবয়সী একজন বারবার তাকে দেখছে। টেবিলে অন্যদের ফিসফিসিয়ে কিছু একটা বলতেই সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। অস্বস্তিকর। সমুদ্রের ধারে অচেনা কাউকে পড়ে থাকতে দেখে, সে এগিয়ে যায়। তখন অন্ধকার আর ঝড় বৃষ্টিতে ধারে কাছে কেউ ছিল না। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে না যায় বডিটা তাই টেনে সরিয়ে এনেছিল। ব্যাপারটা হোটেলে জানানো হয়েছিল। পুলিশও এসেছিল। এখন যা করার ওরাই করবে। তার ভূমিকা কী? সবাই তাকে দেখছে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় মনোজ। সামনের রাস্তায় পায়চারি করতে থাকে। একেবারেই রোদ নেই। আকাশটা মেঘে ক্রমশ কালো হয়ে আসছে। মনোজ সমুদ্রের দিকে এগুতে থাকে। মেঘ জমতে থাকায় সমুদ্রের রং পাল্টাচ্ছে। কালো আবার ঘন নীল। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠছে। ঢেউ গড়িয়ে অনেকটা ভেতরে চলে আসছে। ঠিক কোথায় যে কাল বডিটা পড়েছিল এখন আন্দাজ করা যাচ্ছে না। সমুদ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মনোজ। অনেক কিছুই তো ঢেউয়ে ভেসে আসে। জলের বোতল জুতো ডাব ছেঁড়া জামা প্যান্ট শাড়ি আরও কত কী। ভেসে আসে আবার জলের টানে চলে যায়। কতদূর কোথায় ভেসে যায়। বডিটা যদি সমুদ্রের ধার থেকে কাল টেনে সরিয়ে না আনতো, কোথায় ভেসে যেত, কে জানে। সামনের সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে মনোজ। ঢেউয়ের মাথায় একটা

বড়ি ভাসছিল। ভাসতে ভাসতে খানিকটা এগিয়ে এসে আবার দূরে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল। রুমালে চশমার ঝাপসা কাচ মুছে নেয় মনোজ। বোধহয় জোয়ার এলো। পর্যন্ত জল উঠে এলেও মনোজ একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

সোনার হারটা এখন পকেটে রয়েছে। দুপুরে ঘর থেকে বেরুনোর সময় ইচ্ছে করেই ওটা নিয়ে বেরিয়েছিল। ভেবেছিল হোটেল কাউন্টারে কিংবা থানায় গিয়ে জমা দেবে। কিন্তু পারেনি। ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয় হোক শেষ পর্যন্ত হারটা নিজের কাছেই থেকে গেছে। সোনার জিনিস বলে নয়। একজন অচেনা মহিলা যে এখন আর বেঁচে নেই, তার গলায় ছিল হারটা। এটা ভাবতেই কেমন অস্বস্তি হতে থাকে। ব্যাপারটা কাউকে বলতে পারলে হতো। এখন কী করা উচিত? হারটা। এটা ভাবতেই কেমন অস্বস্তি হতে থাকে। ব্যাপারটা কাউকে বলতে পারলে হতো। এখন কী করা উচিত? হারটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে সে ভুল বা অন্যায় করেছে কিনা, এ নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে হয়তো এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা আর থাকতো না। হোটেলের সামনে পায়চারি করতে থাকে মনোজ। এখনই ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। একা একা বন্ধ ঘরে বসে থাকলে, হয়তো নানারকম উল্টোপাল্টা কথা মনে হতে থাকবে। গেটে দাঁড়িয়ে রাস্তার গাড়ি লোকজন অন্যমনস্কভাবে দেখতে থাকে মনোজ।

—এই যে স্যার আপনাকেই খুঁজছিলাম—

ঘুরে দাঁড়ায় মনোজ। হোটেলের ম্যানেজার। কী ব্যাপার?

—শুনেছেন কিছু? ম্যানেজার একেবারে মনোজের গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। কথা না বলে, কিছু শোনার অপেক্ষায় থাকে।

—থানা থেকে সেই অফিসার এসেছিল। আপনি ঘরে ছিলেন না।

—উনি কি আমার খোঁজ করেছেন?

—না, আপনার খোঁজ করেননি। আসলে ওই মহিলা সম্পর্কে বলতে এসেছিলেন—

—কী বললেন?

—আসুন না ভেতরে। মনোজ ম্যানেজারের সঙ্গে এগুতে থাকে। লম্বা লনের মাঝখান দিয়ে পিচ বাঁধানো রাস্তা। বাঁ দিকে কার পার্কিং। ডানদিকে নানা রকমের ফুল গাছ। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ম্যানেজার বলতে থাকে—নাম রুবি দত্ত। কাছাকাছিই থাকতেন। কয়েকদিন আগে ওনার স্বামী কী যেন নাম বললো—একটু চুপ করে বোধহয় নামটা মনে করার চেষ্টা করে ম্যানেজার।—হ্যাঁ মনে পড়েছে—হ্যাঁ মনে পড়েছে—শেখর দত্ত। শেখরবাবুর সঙ্গে কী নিয়ে যেন ঝগড়া অশান্তি হয়। বোধহয় এমন কিছু নয়। স্বামী স্ত্রীতে এরকম হয়েই থাকে—মনোজের দিকে চেয়ে হাসে ম্যানেজার।

—যা বলছিলেন বলুন না—মনোজ খানিকটা অধৈর্য। লোকটা একটু বেশি কথা বলে।

—হ্যাঁ যা বলছিলাম—বাড়িতে অশান্তি হওয়ায় রুবি দেবী মার কাছে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরোন। দিন কয়েক পর শেখরবাবু খবর নিয়ে জানতে পারেন, রুবি দেবী আদৌ মার কাছে যাননি। তা হলে? খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। শেখরবাবু থানায় যান ডাইরি করতে

সব শুনে ও সি সাহেবের সন্দেহ হয়। হাতঘড়ি, আংটি এইসব দেখানোর পর শেখরবাবুকে মর্গে নিয়ে যান ফাইনাল আইডেন্টিটির জন্য। আর সেখানেই—

কাউন্টারে ফোন বেজে ওঠে। ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নেয়। মনোজ অপেক্ষা করতে থাকে। চাপা স্বরে হাত নেড়ে কাকে যেন কী বোঝানো হচ্ছে। মাঝে মাঝে আড়চোখে মনোজকে দেখছে ম্যানেজার। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলতে থাকে। কী রকম লোক রে বাবা। একজনকে দাঁড় করিয়ে উনি এখন ফোনে গপ্পো জুড়েছেন। আর দাঁড়িয়ে না থেকে নিজের ঘরের দিকে এগোয় মনোজ।

দুপুরে ভাল ঘুম হলো না। চোখ বুজলেই সমুদ্রের ধারে পড়ে থাকা সেই মহিলার চেহারাটা বার বার ভেসে উঠছিল। অন্ধকারে ভাল করে দেখা হয়নি। কী যেন নাম? রুবি দত্ত। চেনা নয়। অথচ এই নামটাই এখন সব চিন্তা আর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিকেলের দিকে একটু ঝিমুনি এসেছিল। আধো ঘুমে মনোজ দেখতে পাচ্ছিল সমুদ্রের অনেকটা ভেতরে লাইটহাউসের কাছাকাছি কে যেন ভাসছে। গা থেকে খুলে পড়া শাড়ি, মাথার লম্বা চুল জলে ভাসছে। ঢেউয়ের দুলুনিতে দেহটা কখনো ওপরে আবার নিচে ভাসতে ভাসতে পাড়ের দিকে চলে আসছে। আচমকা ঘুম ভেঙে যায় মনোজের। বুকে পিঠে জ্বলুনি। চাপা আগুন জ্বলছে যেন। উঠে বসে মনোজ।

তার নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎ একটা আলোড়ন এসে পড়েছে। ছুটি নিয়ে এখানে না এলেই বোধহয় ভাল হতো। কেন যে সোনার হারটা নিজের কাছে রাখতে গেলাম? ডেড বডিটাই বা কেন টেনে তুলেছিলাম? একা একা ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে সমুদ্রের ধারেই বা গিয়েছিলাম কেন? অনেকগুলো 'কেন'র উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে মনোজ। একটা 'কেন' থেকে আর একটা 'কেন' এসে যায়।

সন্ধে নাগাদ বাইরে বেরুনোর জন্য তৈরি হতে থাকে মনোজ। বন্ধ ঘরে গুমোট লাগছে। বৃষ্টি তো নেই। আকাশেও পরিষ্কার। সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ বসলে বা পায়চারি করলে মাথাটা হয়তো একটু হালকা হতে পারে। মনোজ দরজার দিকে এগুতেই হঠাৎ বেল বেজে ওঠে।

—কে? কোনও উত্তর নেই। আবার বেল।

দরজা খুলতেই মাঝবয়সি একজনকে দেখা যায়।—নমস্কার আপনি তো মনোজবাবু?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—আমি শেখর—

মনোজ বিরক্ত হয়। পুরো নামটা বললো না। কেউ নাম বললে পদবি সমেত পুরো নামটাই বলে থাকে। এই লোকটা এমন ভাব দেখাচ্ছে, মনোজ যেন কত পরিচিত। ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই সে জানে। দরজা থেকে সরে দাঁড়ায় মনোজ।—আসুন, ভেতরে আসুন—কী ব্যাপার?

—অসময়ে বিরক্ত করছি। ভদ্রলোককে একটু যেন বিব্রত দেখাচ্ছে। চেয়ারে বসতে বসতে ঘরের চারদিকটা একবার দেখে নেন ভদ্রলোক। যে মহিলার ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে আমি তার হাসব্যান্ড। থানায় খবর পেলাম।

—বলুন কী ব্যাপার—ঘরের একমাত্র জানলা খুলে দেয় মনোজ। জোলো ঠাণ্ডা হাওয়া। বাইরের দিকের এই জানলাটা খুললে সমুদ্র দেখা যায় না, কিন্তু ঢেউ ভাঙার শব্দ শোনা যায়। চাপা গর্জন। মনোজ ভদ্রলোকের কাছাকাছি বসে। অন্যমনস্কভাবে কী যেন চিন্তা করছিলেন ভদ্রলোক। মনোজ বসতেই—

—কয়েকটা ব্যাপার জানার ছিল। তাই আপনার কাছে এসেছি—

—বেশ তো বলুন না।

—আমার স্ত্রী মানে রুবির বডিটা কোথায় দেখেছিলেন?

—ওই তো সমুদ্রের একেবারে ধার ঘেঁসে পড়েছিল। আমি তো একাই ছিলাম। আসলে খারাপ ওয়েদারে সমুদ্রের চেহারাটা কেমন হয় দেখতে গিয়েছিলাম। সিগারেট কিনতে যাওয়ার কথাটা ইচ্ছে করেই বলে না মনোজ। হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হওয়ায় গুমোট লাগছে। জানলার দিকে চেয়েই মনোজ বলতে থাকে—

এই হোটেলের উত্তর দিকে খানিকটা এগুলে, জেলেদের একটা ছোট জেটি আছে। ওদিকেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, কে যেন সমুদ্রের ধারে পড়ে আছে। ঢেউয়ের ঝাপটায় বারবার ভেসে উঠছে। তাড়াতাড়ি এগুলাম। দেখি, একজন মহিলা। তখন প্রায় সন্ধে। সমুদ্র ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠছিল। বডিটা হয়তো ভেসে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি টেনে খানিকটা উঁচু জায়গায় নিয়ে এলাম।

ভদ্রলোক স্থির চোখে মনোজকে দেখছিলেন। ওর কথা শুনছিলেন। মনোজ থামতেই—

—আচ্ছা একটা ব্যাপার জানার ছিস। থানায় আমাকে ওর হাত ঘড়ি, আংটি এইসব দেখানো হয়। ওগুলো আইডেনটিফাই করার পর 'মর্গে যাই বডি আইডেনটিফাই করতে কিন্তু একটা জিনিস দেখানো হয়নি।

—কী সেটা?

—সোনার বিছে হার একটা। লাল পাথর বসানো—

—সোনার হার? গলায় ছিল?

—তাই তো থাকার কথা। বছর খানেক আগে ওকে দিয়েছিলাম। জানি না, জলে ভেসে গিয়েছে কিনা। অবশ্য বডি নিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কেউ—

প্রবলভাবে মাথা নাড়তে থাকে মনোজ। না না আমি কোনও হার ফার দেখিনি। তাছাড় আবছা অন্ধকারে ওই অবস্থায় কিছু চোখে পড়ার কথাও নয়।

—তা ঠিক। এটাই জানার ছিল। জিজ্ঞেস করলাম বলে কিছু মনে করলেন না তো

—না না মনে করার কী আছে। আমিই তো প্রথম দেখেছিলাম। আমার কাছে জানতে চাইতেই পারেন—মনোজ বললো বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে চাপা একটা উত্তেজনা, অস্বস্তি হতে থাকে। একটু আগেই সোনার হারটা ফুলদানিতে রেখেছে। সোফার সামনের নিচু কাচের টেবিলে রাখতে গিয়েও রাখেনি। ভাগ্যিস রাখেনি—

শেখর দত্তকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে যায় মনোজ। রুবি দত্ত যেখানে পড়েছিল, সেই জায়গাটা দেখায়।—এই যে এখানে ছিল। দুজনেই থমকে দাঁড়ায়। সেদিনের মতোই অন্ধকার। আ

অবশ্য সি বিচের দোকানগুলো খোলা। কিছুটা আলোর আভাস থাকায় অন্ধকার ততটা গাঢ় হতে পারেনি। লোকজনের যাতায়াত, অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দে এদিকটা অত নির্জন নয়। শেখর দত্ত জেটির দিকে এগুতে থাকে। মনোজ ওখানেই দাঁড়িয়ে।

অন্ধকারে সমুদ্র আরও উত্তাল হয়ে উঠেছে। ফ্রাকারগুলো ছুটে এসে পাড়ে পড়ছে। হাঁটু পর্যন্ত জলে বালিতে ভিজে একাকার। জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা শেখর দত্তকে ছায়ামূর্তির মতো মনে হচ্ছে। ওদিকে এগুতে গিয়েও এগোয় না মনোজ। কী ভাবছে লোকটা? স্ত্রীর কথা নাকি সোনার হার? এতক্ষণ সঙ্গে ছিল, একবারও কিন্তু স্ত্রীর জন্য কোনওরকম দুঃখপ্রকাশ করেনি। চেহারা বা কথাবার্তায় একটুও বিমর্ষ মনে হয়নি। তবে কি শুধুমাত্র সোনার হারটার খোঁজ করতেই এসেছিল? জেটিতে দাঁড়ায়ে থাকা ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে মনোজ। ভেতরে ভেতরে চাপা একটা বিরক্তি হচ্ছে। বিরক্তি থেকেই রাগ আর বিতৃষ্ণা। তোমার স্ত্রী বাড়ি থেকে ঝগড়া করে চলে যায়। সমুদ্রে ডুবে মারা গেল। কেন সমুদ্রে গেল, কী ভাবে ডুবল—সে সব নিয়ে কোনও প্রশ্ন বা আলোচনা নয়। তুমি সোনার হারটার খোঁজ করছো। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে মনোজের। নোনা জলের ছিটেয় চোখ জ্বালা করছে। হোটেলের দিকে পা বাড়ায় মনোজ।—থাকো অন্ধকার জেটিতে একাকী দাঁড়িয়ে। আমার কোনও দায় নেই।

তাড়াতাড়ি হেঁটে হোটেলের সামনের রাস্তায় উঠে আসে মনোজ। সোনার হারটা ফেরত না দিয়ে ভালই হয়েছে। আমার কাছেই থাক। জীবনে এমন কিছু অভিজ্ঞতা হয়ে যায়, যা ভোলা যায় না। সেইরকম একটা অভিজ্ঞতার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে সোনার হারটা আমার কাছেই থাকবে।

হোটেলের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে মনোজ। মাথা ভার হয়ে আছে। জিভটা তেতো লাগছে। ঘরে ফিরে এখন শুধু চুপচাপ শুয়ে থাকা। ফুলদানিতে হারটা রাখা আছে। লোকটা আবার আসবে না তো? সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে থাকে মনোজ। হারটা এবার অ্যাটাচিতে রাখতে হবে।

দ্বীপবাস

অভিজিৎ তরফদার

(১)

দৃশ্যটা এইরকম :

গভীর সমুদ্রে একা একটা নৌকো; বড় বড় ঢেউ নৌকোকে সদ্যোজাত শিশুর মতো দোল খাওয়াচ্ছে; নৌকোর দু-খানা সুটকেশ সমেত সুপ্রিয়, পাশে ভয়ে ফ্যাকাশে ঠোঁট মিষ্টি; অদূরে এম ভি শাহজাহান, যার মুখ দ্বীপ ছাড়িয়ে ফিরে যাবার জন্য তৈরি; জাহাজের ডেকে সৌমী। একপাশের ছোট দরজা খুলে গিয়েছে। সেখান দিয়েই দড়ি ধরে একে একে নৌকোয় নেমেছে সুপ্রিয় এবং মিষ্টি। জিনিস নামিয়ে দিয়েছে পোর্টার। সৌমী নামলেই জাহাজ ফিরে যাবে মেইনল্যান্ড-এ। অথচ ডেক-এর কিনারায় দাঁড়িয়ে সৌমী, এবং উদভ্রান্ত একদল জাহাজী।

চোখে জল, ফুঁপিয়ে কাঁদছে সৌমী।

আগে বলতে পারতে। এইভাবে বেড়াতে নিয়ে এসে মাঝসমুদ্রে ফেলে দেবে ঘুণাক্ষরেও তো জানাওনি। জানলে কখনোই আসতাম না। এর চেয়ে কলকাতার ঘুপচি ঘরে দমবন্ধ হয়ে মরে যাওয়াও ভালো। তোমরা যাও। বাপে-মেয়েতে ফূর্তি করে এসো। আমি নামছি না। ওইভাবে ঝাঁপাতে পারব না আমি। নামতে গেলেই নৌকোটা সরে যাবে, আর জলে পড়ে যাব। আমি ফিরে যাচ্ছি। যে করে হোক বাড়ি চলে যেতে পারব। আমাকে নিয়ে ভেবো না।

শেষ অবধি নামতে পেরেছিল সৌমী। নেমেছিল না বলে পড়েছিল বলাই ভালো। যেভাবে সুটকেশ দু-খানা জাহাজের খোল থেকে আছড়ে পড়েছিল নৌকোর পেটে, সেইভাবেই পোর্টারদের আনুকূল্যে, মাল-এর মতো সৌমীকে লোড করে দেওয়া হয়েছিল ডটভটির খোপে। এবং ভটভটি দ্বীপ-এর কাছাকাছি হওয়ামাত্র, জলের আশ্চর্য সবুজ রং দেখে সুপ্রিয় এবং মিষ্টির সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠেছিল সৌমীও।

ততক্ষণে অবশ্য সৌমীর হাত-পায়ের কাঁপুনি প্রশমিত হয়ে এসেছে। বেঁচে আছি এই বোধই মানুষকে যতখানি মনুষ্যত্বে ফিরিয়ে আনে সৌমীর ভেতরে তাও সঞ্চারিত হয়ে গেছে পুরোমাত্রায়। মিষ্টিও মায়ের বুকে মুখ রেখে ধাতস্থ।

সুপ্রিয় সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করেছে, আচ্ছা, আমাদের মধ্যে তুমিই তো একা সাঁতার জানো। অত ভয় পেলে কেন?

মৃদু হেসে সৌমী বলেছে, জানি বলেই তো। গভীর সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ। ডুবতে দু-মিনিটের বেশি লাগবে না। ডোবার আগে এই দুঃখেই বুক ফেটে যাবে যে, কষ্ট করে শেখা সাঁতারটা কোনও কাজে লাগল না। তোমাদের তো ডুবে মরা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও আক্ষেপ থাকবে না।

হো হো করে হেসে উঠেছিল সুপ্রিয়। হু হু হাওয়ায় হাসির শব্দ মুছে গিয়েছিল দ্রুত। মুছে গিয়েছিল একটু আগের জমে থাকা বরফ-ঠান্ডা আতঙ্কও।

(২)

ছোট দ্বীপ, দৈর্ঘ্যে মাইল দুই, প্রস্থে আধমাইলও হবে কিনা সন্দেহ। দ্বীপের শিরদাঁড়া বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে টানা রাস্তা, দু-পাশে নারকেল গাছ সমুদ্রের কিনারায় বালিয়াড়িতে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে। হাজার চারেক মানুষ নিজেদের বলে আইল্যান্ডার, তার মধ্যে অহংকার প্রচ্ছন্ন থাকে। অহংকারের কারণও আছে। প্রতিকূল সমুদ্র, তার মর্জি ও খেয়াল, ভয়ংকরতা ও বিরূপতা প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও দ্বীপের মধ্যে জনবসতি, একটি হাইস্কুল, পোস্টঅফিস এবং হাসপাতাল কেন্দ্র করে দিব্যি টিকে রয়েছে।

তবে সবকিছুরই কেন্দ্রে সেই সমুদ্র। সমুদ্রের জন্যই টুরিস্ট, টুরিস্টদের লক্ষ্য করেই জনপদ, তার বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি, কিছু মানুষের জীবিকা মৎস্যশিকার। স্বভাবতই বড় বড় নৌকো এবং জাল বেলাভূমির শোভা নষ্ট করেছে। নারকেলগাছও অবশ্য কিছু সংখ্যক মানুষের জীবিকার সংস্থান।

জলের এমন আশ্চর্য সবুজ রং এখানকার নিজস্ব। জলতল খুব গভীর নয়, সেখানে ফুটে রয়েছে অজস্র প্রবাল। মিষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়দিন সুপ্রিয় সমুদ্রবিহারে বের হল। সেই ভটভটি, তক্তাতের মধ্যে নৌকোর মেঝেতে কাঠের বদলে কাচ। কাচের মধ্য দিয়ে সমুদ্র তলদেশের উদ্ভিদ-প্রবাল-মাছ সবই দৃশ্যমান। প্রবালের রংবাহার, এক অনন্ত অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছের সমারোহ, মস্তবড় কাছিমের সন্তরণপ্রয়াস সবই মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিল মিষ্টি। ফিরে আসতে ইচ্ছে করছিল না সুপ্রিয়রও। কিন্তু মাঝসমুদ্রে ভটভটি হঠাৎ আওয়াজ থামিয়ে দিল।

বড় বড় ঢেউয়ের মাথায় দুলতে দুলতে শব্দহীন নৌকোয় বসে সুপ্রিয় দেখল দূরে দ্বীপের আভাসটুকু ছাড়া দিগন্ত অবধি মানুষ বলতে শুধু তারা তিনজন। কী হবে জানতে চাওয়ায় চওড়া হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলল মাঝি। তার নিজস্ব ভাষায় কিছু বলল। এক বর্ণও বুঝতে পারল না ওরা। অবশ্য মাঝিও ওদের ভাষা বুঝতে পারছিল না। তবে আতঙ্কের কোনও ভাষা হয় না, সুপ্রিয় ও মিষ্টির মুখমণ্ডলেই আতঙ্ক লিপিবদ্ধ ছিল। সেটুকু পড়ে ফেলতে মাঝির কষ্ট হবার কথা নয়।

একটা লেত্তির মতো কাপড় যন্ত্রে জড়িয়ে টান মারল মাঝি। যন্ত্র দু-বার ভটভট করেই থেমে গেল। আবার চেষ্টা। একই ফল। আবার, আবার, যন্ত্র সাড়া দেবে না যেন ঠিকই করে ফেলেছে। দূরে দ্বীপের দিকে তাকাল সুপ্রিয়। ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকো যেন দ্বীপ থেকে ক্রমশ গভীর সমুদ্রের দিকে সরে যাচ্ছে। জামা খুলে ফেলল মাঝি। যন্ত্রের ঢাকনা সরিয়ে দিল। তারপর যন্ত্রের গলায় দড়ি পরিয়ে মারল এক হ্যাঁচকা টান। গরগর করে রাগে ফুঁসে উঠল মেশিন। তারপরই ভটভট করে চলতে শুরু করল।

মিষ্টির হাত চেপে বসেছিল সুপ্রিয়র ওপর। সুপ্রিয় আড়চোখে দেখল, মেয়েটা ঘেমে গিয়েছে। দ্বীপে পৌঁছে সুপ্রিয় কানে কানে বলল, মাকে বলিস না যেন!

মেয়ের চোখে প্রশ্ন দেখে প্রাঞ্জল করল, ওই যে, নৌকোর বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা।

(৩)

পরদিন সকালে মিষ্টির ঘুম ভাঙল জ্বর নিয়ে। 'সমুদ্রে স্নান করেছে অতক্ষণ, হাওয়ায় গা শুকিয়েছে, ঠান্ডা লেগে গিয়েছে নিশ্চয়', সৌমীর কথাগুলো ভুল প্রমাণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল পেটব্যথা। তারপর রক্তআমাশা, এবং বমি। তিনচারবার বমির পরই নেতিয়ে পড়ল মিষ্টি।

সঙ্গে কিছু ওষুধপত্র এনেছিল। ওষুধ পেটে থাকছে না একেবারেই। যা খাচ্ছে তা-ই বমি হয়ে যাচ্ছে। নুনচিনির জল গুলে একটু একটু করে খাওয়াচ্ছিল সৌমী। তাও উঠে আসছে।

হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল সুপ্রিয়র। সৌমীও কাতরে উঠল, কিছু একটা করো। রিসর্ট-এর ম্যানেজারের কাছে দৌড়ল সুপ্রিয়। ম্যানেজার ওষুধপত্র সঙ্গে রাখে। একটা বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে পরামর্শও, ফেলে- না রেখে হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতাল। মনে পড়ল, দ্বীপের মাঝবরাবর একটা হাসপাতাল চোখে পড়েছিল বটে। কিন্তু অতদূর, যাবে কী করে? ম্যানেজার অভয় দিল, চিন্তা নেই, রিসর্ট-এর নিজস্ব জিপ আছে, তাতেই ধরে যাবে ক'জন।

সৌমীর কোলে মাথা রেখে বসল মিষ্টি, ড্রাইভারের পাশে সুপ্রিয়। ঝোপঝাড় ভেদ করে নারকেল গাছে ধাক্কা খেতে খেতে ক'মিনিটের মধ্যেই হাসপাতাল পৌঁছে গেল ওরা।

হাসপাতালে গিয়ে কিন্তু অবাক। ঝকঝকে তকতকে হাসপাতাল। আউটডোরে দাঁড়াতেই কার্ড পাওয়া গেল, দক্ষিণা শূন্য। গোনাগুনতি রোগী। দুজন ডাক্তার দুটো ঘরে আলাদা করে রোগী দেখছেন। একজন মহিলা অন্যজন পুরুষ। মেয়েরা যে পুরুষদের সমকক্ষ এই ইসুতে সৌমী গলা ফাটায়। এখানে কিন্তু ডাক্তারের নামের আগে মিসেস দেখে ছিটকে ফিরে এল। দৃশ্যটা মনে মনে টুকে রাখল সুপ্রিয়।

ডাক্তার সুপ্রিয়দেরই বয়সি। মিষ্টিকে ভালো করে দেখে বিধান দিলেন, ভর্তি করে দিন, স্যালাইন দিতে হবে।

মুখ শুকিয়ে গেল সৌমীর। ঠোঁট চেটে সুপ্রিয় বলল, অতখানিই খারাপ?

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, আমার তো সেইরকমই মনে হচ্ছে।

এসব ক্ষেত্রে সৌমীরই মাথা পরিষ্কার। বলল, আমরা একটু কথা বলে নেব?

ডাক্তার ঘাড় নাড়লেন।

বাইরে এসে সৌমী বলল, গাড়িতে ওঠা থেকে এই অবধি একবারও বমি করেনি মিষ্টি। বাথরুমেও যেতে চায়নি। পেটব্যথাটাও কম। বলে দেখো না, যদি দরকার হয় পরে ভর্তি করা যাবে কি না।

ভেতরে ঢুকে সেই কথাই বলল সুপ্রিয়। ডাক্তার খসখস করে ওষুধ লিখে দিলেন। টিকিট-এ লিখে দিলেন, নির্দেশ অমান্য করে ভর্তি না করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অবশ্য এটুকু অভয় দিলেন, অবস্থার অবনতি হলে নিয়ে এসে ভর্তি করা হবে।

বাইরে বেরিয়ে সুপ্রিয় দেখল একটা বাচ্চা হামা দিতে দিতে উলটে গেছে, তাই দেখে

হাসছে মিষ্টি। মিষ্টির হাসিটুকু সম্বল করে ওষুধ নিয়ে ফিরে এল ওরা।

ফেরার পথে কথায় কথায় জানা গেল জাহাজ ছাড়াও মেইনল্যান্ড-এর সঙ্গে প্লেন-যোগাযোগও আছে দ্বীপের। প্রতিদিন সকালে একটি প্লেন আসে, লোক নামায়, প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফিরে যায়। সুপ্রিয়দের ফেরার জাহাজ দু-দিন পর। এই দুটো দিন অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে কীভাবে পড়ে থাকবে, সেই চিন্তাতেই আধমরা সৌমী বলল, দ্যাখো না খোঁজ করে, প্লেন-এ যদি টিকিট পাওয়া যায়।

সুপ্রিয় চোখ কপালে তুলল, খেপেছ? এক-একজনের টিকিটের দামই কয়েকহাজার টাকা। অত টাকা আছে নাকি সঙ্গে?

সৌমী টলল না,—সব জায়গাতেই অসুস্থ মানুষকে এয়ারড্রপ করার বন্দোবস্ত থাকে। আর এ তো একটা শিশু। রোগীর সঙ্গে তার মাকেও নিয়ে যাবে। সে-রকম হলে আমি প্লেন-এ চলে গেলাম, তুমি না হয় জাহাজে এলে পেছন পেছন।

সুপ্রিয়র মনে হল, জাহাজে ওঠার ভয়টা সৌমীর এখনও যায়নি। তবে সৌমীর কথায় যে একেবারে যুক্তি নেই তা তো নয়। তাছাড়া মিষ্টি এতটাই অসুস্থ, যে বাবা হিসাবে যতখানি সম্ভব চেষ্টা তার করা উচিত।

ছোট এয়ারপোর্ট, লোকজন খুবই কম। একটাই কাউন্টার। গিয়ে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক বললেন, ক্যানসেলেশন তো, ওইপাশে চলে যান।

অবাক হয়ে সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করল, ক্যানসেলেশন মানে?

ভদ্রলোক বললেন, আপনি টিকিট ক্যানসেল করতে আসেননি?

সুপ্রিয় বলল, না, আমি বুকিং-এর খোঁজ নিতে এসেছি।

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, প্লেন-এ যান্ত্রিক গোলযোগ আছে। সারাই করে তবে ছাড়বে। পরে খোঁজ নেবেন।

কতক্ষণ লাগবে?

সুপ্রিয়র প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না ভদ্রলোক।

জবাব পাওয়া গেল সিকিউরিটির একজনের কাছ থেকে। সাদাসিধে ফৌজি, খোলাখুলিই বলল, কতক্ষণ নয়, কতদিন। একবার বসে গেলে সারাই হয়ে প্লেন উড়তে সপ্তাহখানেক, তার বেশিও লেগে যেতে পারে। আবার উড়তে শুরু করলেই যে পৌঁছবে তারও কোনও মানে নেই। দু-চক্কোর মেরে প্লেন কুলায়-এ ফিরে আসবে এমন ঘটে আকছার। মাসের মধ্যে গড়পড়তা সাতদিনও বিমান চললে লোকে ভাগ্যবান মনে করে।

ফেরার পথে কী মনে করে ম্যানেজারের কাছে ঢুঁ মারল সুপ্রিয়। ফেরার জাহাজ পরশু, টিকিটও কাটা। তবু ম্যানেজার বলে দিয়েছিল, আগের দিন জেনে নিতে, মেইনল্যান্ড থেকে জাহাজ ছেড়েছে কিনা। সেই হিসেবেই জানতে চাইল, কালকের জাহাজের কী খবর। জায়গা থাকলে কালই ফিরে যাবে।

ম্যানেজার বলল, আজ কোনও জাহাজ ছাড়েনি। সুতরাং কাল কোনও জাহাজই নেই ফিরে যাবার। পরশুর জাহাজও অনিশ্চিত। কাজেই কাল বিকেলের আগে ঠিকঠাক কিছু

বলা সম্ভব নয়। সঙ্গে উপদেশ দিল, মেয়ের বাড়াবাড়ি হলে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়াই সঙ্গত। দরকার হলে সে আবার জিপ চালাতে তৈরি।

(৪)

মিষ্টি কিন্তু বিকেল থেকেই সেরে উঠতে লাগল। পেট ধরে এল, বমি বন্ধ হয়ে গেল, নুনচিনির জলের বদলে ডাব খাওয়ানো হচ্ছিল, সেটাই পেটে থাকতে লাগল। সন্ধের দিকে খিদে পেল, ভয়ে ভয়ে একবাটি দই আর ভাত ছাড়া কিছুই খাওয়াল না সৌমী। সারাদিনের ধকলে মেয়েটা যখন সন্ধ্যাবেলাই ঘুমিয়ে পড়ল, সৌমী আর সুপ্রিয় দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

শুরু থেকেই যা যাচ্ছে!

শুরু থেকে মানে?

জাহাজ থেকে লাফিয়ে নামা, নীচে উত্তাল সমুদ্র। একটা অভিজ্ঞতা বটে।

অসুস্থ বাচ্চাকে নিয়ে ছুটোছুটি, সেটাই বা কম কী?

যা ভয় পেয়েছিলাম। কীসে ধরল বলো তো? আমার মনে হয় ম্যানেজারের দেওয়া টোটকা। ওরা তো এখানেই থাকে, জানে কীসে কাজ হয়।

ডাবের জলেও হতে পারে। ডাবের নাকি অনেক গুণ। ভাগ্যিস এখানে একটা জিনিস অঢেল।

ভালোয় ভালোয় ফিরে যেতে পারলে বাঁচি। প্রেনের যা হাল শোনালে।

চুপ করে রইল সুপ্রিয়। প্রেনের হালটুকুই শুনিয়েছে, জাহাজের খবরটা খোলসা করেনি। আজ জাহাজ মূল ভূখণ্ড থেকে ছাড়েনি, এবং কাল ছাড়বে কিনা ঠিক নেই, সেটা জানলে সৌমীর মুখের হাসিটুকু মুছে যেতে এক লহমাও লাগবে না। তার চেয়ে সমুদ্রের গর্জন, গাছের ফাঁকে বয়ে আসা বাতাসের হাহাকার এবং নিদ্রিত সন্তান, এর চেয়ে উপযুক্ত অনুষঙ্গ আর কী হতে পারে?...পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারে মন দিল সুপ্রিয়।

ঘুমোতে যাবার আগে নিজেকে শুনিয়ে শুধু বলল, ছোটবেলা থেকে শুনেই এসেছি দ্বীপান্তর। দ্বীপবাস কী জিনিস এতদিনে বুঝলাম।

পরদিন, ঝকঝকে সকাল। চনমনে মুখ আর পেটভর্তি খিদে নিয়ে ঘুম ভাঙল মিষ্টির। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সাবধানে রাখল সৌমী। সমুদ্রের ধারে ঘোরাঘুরি করল তিনজনে। আশপাশে স্নানও সেরে নিল। ঝিনুক কুড়িয়ে মায়ের আঁচল ভরিয়ে ফেলল মিষ্টি। সন্ধ্যায় ম্যানেজারের কাছে পরীক্ষার রেজাল্ট জানতে গেল সুপ্রিয়। ফিরে এল যুদ্ধজয় করে। সৌমী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, অত খুশি যে!

জাহাজ ছেড়েছে।

তার মানে?

কাল জাহাজ আসছে। যে জাহাজে আমরা ফিরে যাব।

জাহাজ তো আসবেই। টিকিট বুক করে এসেছি না।

আজ জাহাজ আসেনি। কাল আসবেই সেটার কোনও স্থিরতা ছিল না। তোমাকে আগে বলিনি, ভয় পেয়ে যাবে বলে। এইমাত্র খবর পেলাম, মেইনল্যান্ড থেকে ছেড়েছে জাহাজ, পথে বিপদে না পড়লে কাল ঠিকঠাক এসে যাবে।

আর পথে কোনও বিপদ ঘটলে?

আসবে না, থেকে যাব আমরা এই দ্বীপে।

সৌমীর মুখ দেখে মনে হল এখুনি কেঁদে ফেলবে। মিষ্টিকে ডেকে বলল, আয় তো মা, দেখি, কতগুলো ঝিনুক কুড়োলি।

(৫)

দু-দিন সমুদ্র ছিল শান্ত, ঢেউয়েরা বিশ্রাম নিতে গিয়েছিল। আজ, সৌমীরা ফিরছে জেনেই কিনা কে জানে, শুকনো ডেরা থেকে বেরিয়ে নিজমূর্তি ধরেছে, আসার দিনের চেয়েও ঢেউ আরও উঁচু, আরও ভয়ংকর। মোটরবোটটা মাঝে মাঝে এমন লাফিয়ে উঠছে, শক্ত করে ধরে না বসলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। ডানপিটে মিষ্টিও চুপচাপ বসে আছে। সৌমীর চোখ বন্ধ। ওর বাবা-মা দীক্ষা নিয়েছেন হালে, সৌমী একমনে গুরুর নাম স্মরণ করছে, সুপ্রিয় নিশ্চিত।

জাহাজ আজও পাড়ের কাছে আসার সাহস পায়নি। মাঝসমুদ্রে দাঁড়িয়ে আছে। তবে স্থির নয়, ঢেউয়ের টানে জায়গা বদল করছে অবিরাম। আজ আকাশে মেঘ, হাওয়ার টান আছে, অমাবস্যা-পূর্ণিমাও হতে পারে, সুপ্রিয়দের হিসেব নেই।

আরও দুটো মোটরবোট সুপ্রিয়দের সঙ্গেই দ্বীপ ছেড়েছে। গতকালের আটকে থাকা প্যাসেঞ্জাররাও এই জাহাজে ফিরবে। অতগুলো লোক, উল্টে যাবে না? সৌমী একবার জিজ্ঞেস করেই থেমে গিয়েছিল। নিয়মকানুন প্রত্যাশা ও আশঙ্কার হিসাব মেইনল্যান্ড ও আইল্যান্ড-এ যে সম্পূর্ণ আলাদা, ক'দিনেই সে জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছে সৌমী।

আজ জিনিসপত্রের সঙ্গে কিছু খাবারও প্যাক করে নিয়ে যাচ্ছে সৌমী। সৌমীর সন্দেহ, জাহাজের বাসি খাবার খেয়েই মিষ্টির ওই হাল হয়েছিল। ফেরার সময় কোনও রিস্ক নেয়নি সৌমী। স্যান্ডউইচ বানিয়ে এনেছে। যাওয়ার পথে ওই খাবারই ভরসা।

সেই জাহাজ, সেই দড়ি, সেই ঢেউ, সেই নৌকো। সুপ্রিয়দের আগের দুটো নৌকো জাহাজের একপাশে লাগল। দড়ি ধরে একে একে উঠে গেল প্যাসেঞ্জাররা। নৌকোদুটোও চলে গেল আইল্যান্ডের দিকে। এবার সুপ্রিয়দের পালা।

ওদের নৌকোর আজ বয়স্ক একজন মাঝি, দেখলেই বোঝা যায়, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। আজ ঠিকই করা ছিল, প্রথম সৌমী উঠবে। নীচ থেকে মাঝি আর সুপ্রিয় দুজনে মিলে ঠেলে ধরল, ওপর থেকে একজন পোর্টার শক্ত হাতে টেনে নিল সৌমীকে। পোর্টারের চওড়া বুকে আছড়ে পড়ল সৌমী। তারপরই বিজয়ীর মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল, চলে এসো তোমরা, ভয় পাবার কিছু নেই।

এবারে মিষ্টি, হালকা, ফুরফুরে মিষ্টি, পালকের মতো উঠে পড়ল জাহাজের ডেকে।

বাবা, এবার তুমি, মিষ্টির কণাগুলো সুপ্রিয়র কানে পৌঁছল হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে।

পেছন ফিরে দেখল সুপ্রিয়।

স্কুলমাস্টার বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলেকে ঘিরে, ছেলে ডাক্তার হবে। জয়েন্ট-এ বসেছিল সুপ্রিয়। একবার নয়, পরপর দু-বার। প্রথমবার দুশো চার, দুশো বারোয় এসে সেবার ফুরিয়ে গেছল লিস্ট-এর লেজ। দ্বিতীয়বার দুশোর গণ্ডী পেরোতে পারল না সুপ্রিয়। ডাক্তারি হল না, কিন্তু বায়োসায়েন্স ছাড়ল না। জুলজিতে অনার্স, তারপর এম এসসি। ছানি-পড়া চোখে বাবা তখনও স্বপ্ন দ্যাখে, স্কুলমাস্টারের ছেলে অধ্যাপক, সেখানেও হোঁচট খেল সুপ্রিয়। অবশেষে সেই স্কুলের চাকরি। রোখ চেপে গিয়েছিল সুপ্রিয়র। নিজের হল না, সেই খেদ অন্যদের দিয়ে মিটিয়ে নিল। প্রথম ব্যাচেই তিনটে ছেলে জয়েন্ট, মেডিক্যাল। রটে যেতে দেরি হল না। ব্যাচ-এর সংখ্যাও ফুলতে লাগল বেলুনের মতো। একটা, দুটো, তিনটে। ব্যাচ-এ কুলোয় না, গ্যালারি। গলা খেলিয়ে অতদূর উঠতে পারে না, মাইক্রোফোন। ছবি এঁকে পোষায় না, স্লাইড। নিজের ফ্ল্যাট আগেই কিনেছে সুপ্রিয়, এবারে শুধু ছাত্র-পড়াবার জন্যই নিতে হল টু-রুমড ফ্ল্যাট। মাসে দু-দিন আগরতলা, একদিন শিলিগুড়ি। সান্ত্রো কিনল সুপ্রিয়। ডজন ডজন ডাক্তার বেরোতে লাগল, সুপ্রিয়র গোয়ালে জাবর না কেটে ডাক্তারিতে যারা ঢুকতেই পারত না।

নীল জল যেখানে ফিকে হতে হতে সবুজে মিশেছে সেইদিকে তাকিয়ে সুপ্রিয়র মনে হল, ফিরে কোথায় পৌঁছবে সুপ্রিয়? সেই কেঁচোর পৌষ্টিকতন্ত্র, ব্যাঙের রেচন, গাছের পত্রবিন্যাস, রূপান্তরিত মূল। একই কথা, এক ছবি, এক ক্লাশ, এক প্রশ্ন, এক উত্তর। জীবনটা জয়েন্ট-এর ছকে সাইজ করে ফেলেছে সুপ্রিয়, মুক্তি নেই।

হাত বাড়ান, দড়িটা ধরুন।

মাঝির ডাকে সংবিত ফেরে সুপ্রিয়র। হ্যাঁ, দড়ি না ধরলে উঠবে কী করে? ঢেউয়ের দোলায় সরে গিয়েছে জাহাজ। কাছে এলে এবার ধরতেই হবে দড়ি। নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় সুপ্রিয়।

মায়ের তো আপত্তি ছিলই, বাবা যে বাবা, সে-ও মুখ ফুটে হ্যাঁ বলেনি। তা সত্ত্বেও সুপ্রিয় যে গোঁ ধরে বসেছিল, তার কারণ তো সুপ্রিয় নিজের জীবন দিয়েই বুঝেছে, কী দেয়নি সৌমী? সংসারে রাজার মতো থাকে সুপ্রিয়, কুটোটাও নাড়তে হয় না। বিছানার চাদর থেকে কাজের লোকের মাইনে সবই সৌমী। গাড়ি থাকলে যে শুধু সময় নয়, শরীর-আয়ু-সামর্থ্য সবই সাশ্রয় হয়, মোটোবুদ্ধিতে সুপ্রিয় কি কোনওদিন বুঝত? সৌমীরই পরামর্শে পড়ানোর চেম্বারও এসি করেছে সুপ্রিয়। ইনভেস্টমেন্ট মানে শুধু একগাদা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স নয়, প্রপার্টিতেও যে ইনভেস্ট করা যায় সৌমীই শিখিয়েছে সুপ্রিয়কে। মফস্‌সলের গন্ধ ছাড়িয়ে কলকাতার রাজপথে দাঁড় করিয়ে সুপ্রিয়কে আজকের সুপ্রিয় কে করল, সৌমীই না? সৌমীর কাছে গলা-অবধি কৃতজ্ঞ সুপ্রিয়।

কী করছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? হাত বাড়াও, দড়িটা ধরো।

সৌমীর চিৎকারে হুঁশ ফেরে সুপ্রিয়র। জাহাজের ডেক-এ ওই তো দাঁড়িয়ে সৌমী। শাড়ি

নয়, উঠতে সুবিধা বলে সালোয়ার-কামিজ পরেছে আজ, হাল্কা-নীল কামিজ আর গাঢ় নীল ওড়নায় আকাশের মতো দেখাচ্ছে সৌমীকে। সৌমীর কাছে পৌঁছতেই হবে সুপ্রিয়কে, এখনই।

দূরে তাকায় সুপ্রিয়। আকাশের নীচে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে জল, সমুদ্র। জলের মধ্যে মুকুটের মতো সাদা ফেনার রাশ একটু এগিয়েই হারিয়ে গেছে। নীল ক্রমশ হালকা হতে হতে সবুজে গিয়ে মিশেছে। জলের নীচে প্রবালের এক আশ্চর্য জগৎ, সেখানে রংয়ের জয়জয়ন্তী।

সব ছেড়ে চলে যাবে? কেবলমাত্র সৌমী, তার আসঙ্গ, তার সাহচর্যই ভরিয়ে রাখবে সুপ্রিয়র বাকি জীবনটা? এবং সৌমীর উচ্চাশাও? স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে সৌমী। কিন্তু সে স্বপ্নের সীমানা? মারুতি নয় সান্ত্রো, ফ্যানের বদলে এসি, রাতজাগা ট্রেনের জায়গায় সময়-বাঁচানো প্লেন। সেখানেই থেমে থাকবে তো সৌমী? আজ না হয় কাল, বলবে না তো ফ্ল্যাটের বদলে ফার্ম হাউস, হিরের বদলে প্লাটিনাম? পারবে সুপ্রিয়? যদি না পারে? সৌমী যদি তার উচ্চাশার সঙ্গে সুপ্রিয়র সামর্থ্য মিলিয়ে নিতে না পারে? সুপ্রিয়-সৌমীর সম্পর্ক কি থেকে যাবে একই জায়গায়?

হাত ঘামতে থাকে সুপ্রিয়র, জিভ শুকিয়ে আসে। দড়িটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়। ভয়ংকর পিচ্ছল সর্পিল চেহারা দড়ির। হাত রাখলেই সরে যাবে, পড়ে যাবে সুপ্রিয়। নীচে উত্তাল সমুদ্র তার লকলকে জিভ মেলে আছড়ে পড়ছে নৌকোর পেটে। কী তার আক্রোশ! আজ শিকার না পেলে তার শান্তি হবে না।

বাবা, তুমি কি আসবে না? দড়িটা ধরতে পারছ না?

কচিগলার মিষ্টির ডাক সুপ্রিয়কে সজাগ করে তোলে। ঠিকই তো, সামান্য একটা দড়ি, সেটাও ধরে উঠতে পারছে না সুপ্রিয়?

মিষ্টিই কি সুপ্রিয়র মনের মতো হয়ে উঠছে? ভর্তির সময়েই মতান্তর হয়েছিল। সুপ্রিয় চেয়েছিল, বাংলা মিডিয়ামেই পড়ুক মেয়ে। সৌমীর মতের কাছে ভেসে গিয়েছিল সুপ্রিয়র ইচ্ছা,—বলছ কী? স্কুলমাস্টারের মেয়ে স্কুলমাস্টার? বিদেশে পড়তে যাবে আমাদের মেয়ে, আইটি কিংবা ম্যানেজমেন্ট, ইংরিজি ছাড়া এক পাও চলবে না। বাড়িতেও ইংরিজিতে মেয়ের সঙ্গে কথা বলে সৌমী, সুপ্রিয় বাংলা বললে তেড়ে আসে। উইকএন্ড কাটাতে সৌমীর বাবা-মায়ের কাছে যায় মিষ্টি, সেখানে গল্পের বই থেকে গানের ক্যাসেট, সিডিতে সিনেমা, সবই ইংরিজি। সৌমীর বাবার সঙ্গে সুইমিং কিংবা জিম। জিনস্-টপ ছাড়া পরে না, রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনে না, বাড়িতে একটিমাত্র সংবাদপত্র দ্য স্টেট্সম্যান।

মিষ্টি কি সুপ্রিয়র মেয়ে?

ফিরে তাকায় সুপ্রিয়। মেঘের নীচে গাছের ছায়ায় শান্ত একটা দ্বীপ। দিনে একবার, কখনও দুদিনে একবার ছুঁয়ে যাওয়া জাহাজ ছাড়া পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন, কেরিয়ার নেই, উচ্চাশা নেই, হিংসা নেই, কলহ নেই। জীবনের অনলস নিস্তরঙ্গ বয়ে যাওয়া আছে। পৃথিবী যে এত নিরুপদ্রব, এত অনাবিল হতে পারে আগে কখনও ভেবেছে?

ঝড় উঠেছিল আগেই, এবারে শুরু হল বৃষ্টি। প্রবল বৃষ্টিতে চরাচর মুছে যাচ্ছে, চোখের

সামনে সমস্ত সাদা, জাহাজ-দড়ি-মিষ্টি-সৌমী কিছুই আর দেখতে পাচ্ছে না সুপ্রিয়।

কেউ কি কেঁদে উঠল? বাবা বলে ডেকে উঠল কেউ?

হঠাৎ ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল একটা। ওপর থেকে কে যেন বলল, জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। ঝাঁপান, নইলে আপনাকে রেখেই জাহাজ চলে যাবে।

চোখের কোণায় একঝলক দড়িটা ঝলসে উঠল। কিছু না ভেবেই ঝাঁপ মারল সুপ্রিয়। দু-হাতের ফাঁক দিয়ে দড়িটা গলে যাচ্ছে টের পেল। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। অনেক মানুষের সমবেত আর্তনাদ শুনল যেন আবছা, তারপরই সবল একটা হাত শূন্য থেকে তুলে জাহাজের ডেকে আছড়ে ফেলল সুপ্রিয়কে।

ঠকঠক করে কাঁপছিল সুপ্রিয়। কথা বলতে পারছিল না। সকলে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। একটা তোয়ালে এগিয়ে দিল কেউ। গা-মাথা মুছিয়ে দিল একজন। কে যেন বলল, বাথরুমে গিয়ে শুকনো কিছু পরে আসুন। সুপ্রিয় দেখল, ওদের পৌঁছে দিয়ে মোটরবোট ফিরে যাচ্ছে দূরে, যেখানে দ্বীপ, যেখানে জলের রং কাচের মতো সবুজ।

অনেক পরে জাহাজের রিক্লাইনিং সিটে গা এলিয়ে মা-মেয়ের কথোপকথন শুনল সুপ্রিয়।

কী ভিতু বাবা তুমি? আমরা পারলাম, আর তুমিই দড়িটা ধরতে পারলে না? এত ইঞ্চি টাস্ক, তাও তুমি ফেল?

সৌমী হিসহিস করল, তোর বাবা থেকে যেতেই চেয়েছিল, একলা, ওই দ্বীপে। লোকটাকে তো তুই চিনিস না?

জবাব না দিয়ে জাহাজের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়। সমুদ্র এখন শান্ত ও নীল। দূরে মুছে গিয়েছে দিগন্ত, মুছে গিয়েছে দ্বীপ।

সীমান্ত রেখা
শচীন দাশ

হাওয়া ছিল, অল্প অল্প। এখন সে হাওয়ার পাশাপাশি হাড় কনকনে এক হিমেল বাতাস। মাঝে মধ্যে ধারালো ছুরির মতোই ঝটকা মেরে তা উড়ে আসছে। আর ওই তখনই অজস্র তুলো। ফুঁ দিয়ে দিয়ে যেন কেউ তা উড়িয়ে দিচ্ছে। যেন কোনো অদৃশ্য ধুনুরি। আকাশের কোনো প্রান্তে বসে শব্দ না করেই চালিয়ে যাচ্ছে তার ধুন-খারাটি। আর তাতেই ওই তুলোর ঝড়। উড়ছে। এবং উড়তে উড়তে ঠাণ্ডা হয়ে জমতে জমতে একসময় তা ঝিরঝির। ঝরে পড়ছে রাস্তায়। ঘর-বাড়ি ও চার্চের মাথায়। বাইরের পৃথিবীটা এই মুহূর্তে তাই একটা বেছানো চাদর যেন ; যেন কেউ সারারাত ধরে একটু একটু করে একটা ধবধবে চাদর খুলতে খুলতে কখন বিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ কি আর রোদ উঠবে? গত দু'দিন এক আধটু বরফ পড়ার পাশাপাশি রোদও উঁকি দিয়েছিল কখনো কখনো। আর এতেই বরফ গলে গিয়ে জল। আইস-কাটারদের বরফ সরাতেও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আজ।

জানালার কাঁচে চোখ রাখতে রাখতে একসময় বিড়বিড় করে ওঠে জুলিয়া। এরপর ঘাড় ফিরিয়ে তার অনুচ্চ গলাটি তোলে।

লসিয়া, লুসিয়া—

সাড়া না পেয়ে জুলিয়া এগিয়ে যায়। বাহ্, চমৎকার। বাবুরা সব ঘুমিয়ে কাদা। অথচ বেলা যে বেড়ে চলল সে খেয়াল আছে। খেয়াল কি আর থাকে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে খেলা দেখেছে সবাই। ওয়ার্ল্ড কাপ সকার। পর্তুগালের সঙ্গে খেলা ছিল। তাই দেশের হয়ে টিভির সামনে বসে গলা ফাটিয়েছে ওরা তিন ভাইবোন। কিন্তু এত করেও বুঝি শেষ রক্ষা হয়নি। দু-এক গোলে হারিয়ে দিয়েছে ওই নাছোড়বান্দা পর্তুগালগুলো। তবুও তো গ্যালারির সমর্থকদের মতোই টিভির কাছে বসে ওরাও দেশের হয়ে চেঁচিয়েছে। দেশের হয়ে লাফিয়েছে।

তা লাফানোই সার। এবং ওটাই শুধু আছে। নাহলে পরভূমে পরবাসী হয় দেশ বলতে এখন কিছুই তো নেই আর তেমন। আর থাকেই বা কী করে। যে দেশে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আছে কেবল বছর বছর বাচ্চা বানাবার একটা মসৃণ যন্ত্র সে দেশের গরীব-গুর্বোদের দেশ সম্পর্কিত ধারণা তো বস্তাপচা ওই ক্যাবেজ-লীফের মতোই। জুলিয়ারও তাই হয়েছিল। তিন তিনটে বাচ্চা উপহার দিয়ে ও একটা পেটে ধরিয়ে সেই যে কেটে পড়ল আম্রিয়ানো, আর দেখা নেই। শুনেছে, এক ক্যাবারে ডান্সারের পাল্লায় পড়ে তারই যৌন ক্ষুধা মেটাতে সেখানেই পচ্ছিত হয়ে রয়েছে সে। কিন্তু কোথায় ও কোন ক্যাবারে সেটা চেষ্টা করেও বার করতে পারেনি জুলিয়া। হয়তো পারত, কিন্তু তিন তিনটে বাচ্চা ও পেটের একটাকে নিয়ে সে ততদিনে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কী করবে কী খাওয়াবে ভেবে ভেবে প্রায় দিশাহারা তখন জুলিয়া। তবু এদিক ওদিক চেষ্টা করে, একে ওকে ধরে চাকরি একটা জুটিয়েছিল কোনো ক্রমে। একটা গ্রোসারি-কাম-স্টেশনারি শপের সেল্‌স-এ। চাকরিটা মন্দ নয়। বাড়ির

কাছাকাছিই। যদিও মালিকের নেক-নজরে পড়ে ভরদুপুরে রোজই একবার করে ওর সামনে প্যান্টি নামিয়ে দিতে বাধ্য হত জুলিয়া। কিন্তু হলেও খাওয়া পড়ার কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। বাচ্চাগুলোরও পেটে দুটো দানা পড়ছিল। কিন্তু এক দুপুরে প্যান্টি নামাতে গিয়ে স্ফীত পেটটা আবিষ্কার করেই আচমকা খেপে লাল মানুষটি। ফলে চাকরিটা আর রইল না। পরে খালাস হতেই ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু চাকরি ফিরে পায়নি। ওই তখন থেকেই খুঁদকুড়নির জীবন তার। এটা আনতে ওটা ফুরোর, ওটা ফুরোয় তো এটা। শেষে অবস্থা যখন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে সেইসময়েই একদিন মারিয়া। ওরই প্রতিবেশী।

জুলিয়া, কী করছিস।

কী করব। ওই মরাটাই যা বাকি আছে। তুই? তুই কিছু পেলি—

নাহ্। মাথা নাড়ে মারিয়া, তবে—

তবে। জুলিয়া চোখ তোলে, খবর পেয়েছিস কিছু একটা মনে হয়।

হ্যাঁ পেয়েছি একটা। আর সেটা তোর খবরও হতে পারে—

আমারও। জুলিয়া অবাক হয়, কী ব্যাপার রে?

যাবি নাকি রে। মারিয়া প্রস্তাব একটা রাখে।

জুলিয়ার চোখ নেচে ওঠে, কোথায়?

নিউ মেক্সিকো।

নিউ মেক্সিকো। জুলিয়া অবাক, সে তো আমেরিকায়।

হ্যাঁ তাই তো। ওদেশে খাওয়া পরার অভাব নেই বুঝলি। খাবার বাড়ন্ত। কাজও জোটে খুব। সুপার মার্কেট আছে ঘনঘন। ওখানে শিফটে কাজও পাওয়া যায়। পাওয়া যায় বাড়ি বাড়ি ক্লিনিং-এর কাজ। কাজের কী আর অভাব আছে নাকি। আমি তো ভাবছি...

কী ভাবছিস। জুলিয়া ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করে। সে জানে, মারিয়ার হালহকিকত তার চেয়েও খারাপ। ঘরের মরদটা ওকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু দিয়ে গেছে পাঁচপাঁচটা ছেলেমেয়ে। আর একটা খারাপ অসুখ। অসুখটা তবু সেরেছে। কিন্তু উপযুক্ত খাওয়াপরা ও পরিবেশ না পেয়ে ছেলেমেয়েগুলো বিগড়েছে। বড় ছেলেটা তো মারিজুয়ানা পাচার করতে গিয়ে বার দুই জুভেনাইল কোর্ট ঘুরে এসেছে। আর বছর বারোর মেয়েটা এরই মধ্যে যৌন অপরাধের শিকার। এমন চললে ছেলেমেয়েগুলো তো বাঁচবে না, নিজেও না খেতে পেয়ে মরে যাবে। অগত্যা রাজিই হয়ে গিয়েছিল বুঝি মারিয়া। আর যাবার আগে কী মনে হওয়ার জুলিয়াকেও দলে টানতে চাইছে, যদি জুলিয়া রাজি হয়।

কিন্তু রাজি হবে কী, নিজের কানকেও বুঝি বিশ্বাস হচ্ছিল না জুলিয়ার। মারিয়া বলছেটা কী। কাজ না হয় আছে সেখানে, কিন্তু যাবে কী করে। বেটে কাগজ লাগবে না? কাগজ না থাকলে তো আটকাবে বর্ডারে। তাছাড়া গিয়ে থাকবেই বা কোথায়? এমনি নানারকম ভাবনা ও দ্বন্দ্বে যখন টালমাটাল ভেতরটা, সেই সময়ে মারিয়াই সাহস জোগাল। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে চাপা গলায়ই জানাল, শোন চিন্তার কিছু নেই। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তার আগে ঠিক কর তুই যাবি কিনা। আমি তো একরকম ঠিক করেই ফেলেছি যাব—

যাবি। জুলিয়া উদ্দিপিত, যেতে তো আমারও ইচ্ছে কিন্তু কাগজ! কাগজ না থাকলে র্ডার পেরোব কী করে। এরপর আছে থাকার সমস্যা। অন্তত ঘর একখানা না থাকলে—

সেসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। যা করার ওই কয়োটরা করবে। এমনকি ওখানে াথার ওপরে ছাদের দায়িত্বও ওরা নিচ্ছে—

নিচ্ছে। জুলিয়া প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল। কিন্তু মারিয়াই তাকে থামিয়ে দেয়।

আহ্ আস্তে। এত চেঁচাচ্ছিস কেন। মারিয়ার গলায় সতর্কতা।

মারিয়া এদিকে ওদিকে তাকায়। এবং এর পরেই বলে, শোন এত ভাবছিস কেন। আমিও তো যাচ্ছি। তা আমার থাকার ব্যবস্থা হলে তোরও হবে নিশ্চয়ই।

চাপা গলায় বলতে থাকে মারিয়া, যা করার ওই কয়োটই সব করে দেবে—

দেবে তো।

দেবে না? মোটা একটা পেসো নিচ্ছে—

জুলিয়া হঠাৎই চুপসে যায়, কত নিচ্ছে?

সেটা এখনও ফাইনাল হয়নি। আজ সন্ধেয় এক কয়োট আসবে। তবে সাবধান, কেউ যন না-জানে এখন। ঠিক আছে, আমি আসছি এখন। আস্তা লুয়েগো...

বলতে বলতেই মারিয়া হাওয়া। জুলিয়াদের গ্রামের পেছনের সরু গলিটা দিয়ে ভাঙা াড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডটা পার হয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই উধাও হয়ে ায়। আর তারপরেই সেই সন্ধেয় এক কয়োট আসে। কথা হয়। কথা পাকাও হয়ে যায়। ার তারপর....

জুলিয়া চমকে ওঠে। শব্দ যেন একটা হল দরজায়। জুলিয়া ভয় পায়। ভয়ের অবশ্য ছু নেই। তবু বুকের ভেতরটা কেন যে চমকে ওঠে মাঝে মধ্যে তা বুঝতে পারে না লিয়া। জুলিয়া ঘুরে দাঁড়ায়।

দরজায় কেউ একজন টোকা দিচ্ছে। কিন্তু এই ওয়েদারে কে এল আবার এখন। তাছাড়া াজ তো ছুটির দিন। দরকার খুব একটা না থাকলে কেউ কি আসে ছুটির দিনে। জুলিয়া গিয়ে যায়।

কে।

আমি। আমি পেদ্রো—

পেদ্রো। জুলিয়ার দু'চোখে একটা নরম হাসি। বুকের ভেতরে কী একটা নিমেষেই সরে য়। রক্তে যেন মুহূর্তেই কীসের নাচন লাগে। এখানে এসে মারিয়া আর ও, দু'জন দুদিকে কে যাওয়ায় যখন একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল জুলিয়া, যখন বিদেশ বিভুঁইয়ে ভয়ে য়েই দিন কাটাছিল একরকম জড়সড়ো হয়ে, ওই তখনই পেদ্রোর সঙ্গে পরিচয়। পেদ্রো ই দেশোয়ালি, মেক্সিকান। এক কয়োটকে ধরে বাচ্চা-বউ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কী এক নানা জ্বরে বাচ্চাটা হঠাৎই একদিন মরে যায়। বউটা এরপর থেকেই বড় খিটখিটে। কিন্তু ও পেদ্রো তাকে আগলে রাখার চেষ্টা করে। কেবল তাই-ই নয়, এখানে এসে উড়ে া মেক্সিকানদের পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে ও। সবার খবরাখবর নেয়। তাদের পাশে এসে

দাঁড়াবার চেষ্টা করে। এবং এভাবেই একদিন জুলিয়ার সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়ের পরে ঘনিষ্ঠতা।

খুট করে একটা শব্দ তুলে দরজাটা খোলে জুলিয়া।

আজ বাইরের অবস্থাটা খুবই খারাপ। এত বরফ পড়ছে—

ভেতরে এসে শরীর থেকে ওভার কোটটা সরিয়ে রাখতে রাখতে পেদ্রো চোখ তোলে।

জুলিয়া অবশ্য খুশিই হয়। এমন ওয়েদারে বউয়ের কোল ছেড়েও যে তার কাছে এসেছে পেদ্রো, সেজন্য জুলিয়া একরকম কৃতজ্ঞই ওর কাছে। কিন্তু মানুষটা যেন কী! এতটাই সরল যে মানবমনের জটিলতা একটুও বুঝি ধরতে পারে না। নাহলে জুলিয়ার চোখ দেখেও কি পড়তে পারছে না পেদ্রোর জন্য সে কতটা আকুল?

জুলিয়া হাসে, ঠিক আছে। আগে তো ভেতরে এসে বোসো। কফি খাও—

আর কফি। শুনেছ তো?

কী! জুলিয়া থমকে দাঁড়ায়।

পেদ্রোর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। আমরা নাকি ক্রিমিনাল, রেপিস্ট, লুটেরা। পুলিশ এবার ধরে ধরে নাকি আমাদের বর্ডার পার করে দেবে?

কেন! জুলিয়ার মুখে ভয়।

কেন কী, কাগজ নেই আমাদের। আমরা বে-আইনী ভাবে ঢুকে পড়েছি এদেশে—

কিন্তু ঢুকে তো ওদের সাহায্যই করছি—

জুলিয়া চুপসে যায়। আর ওই তখনই মনের ভেতরের সেই ভয়টা, একটু একটু করে আবার অঙ্কুরিত হতে থাকে। যদি সত্যিই কথাটা ঠিক হয়, যদি সত্যিই ওদের ধরে ধরে বর্ডারে নিয়ে বেড়াল পার করে দেয়? ভাবতে ভাবতেই একসময় আবার স্থির জুলিয়া, কিন্তু তা কি করবে! করলে এ-দেশটাই তো প্রায় অচল। সুপার মার্কেটগুলো চলবে কী করে, বাড়ির ক্লিনিং-ই বা হবে কী করে। তাছাড়া বাড়ি বাড়ি বাগান পরিষ্কার আছে না, আগাছা কাটা আছে না, ছেলেমেয়েগুলোকে দিয়ে ফলের বাগানে আপেল-লেবু-খোরাশ কুড়োনো আছে না, কারখানাগুলোর কাজ করবার আছে না।

জল বসানোই ছিল। বড় একটা মগে কফি দিয়ে তাতে পরিমাণমতো দুধ চিনি দিতে থাকে জুলিয়া, তবে যে বুশ বলছিলেন, গেস্ট-ওয়ার্কার নাম দিয়ে আমাদের এ-দেশে থাকতে দেবে। কাগজও নাকি দিয়ে দেবে—

কিন্তু সেটা করলে কী হবে, বুঝেছ তো? জীবনে কখনও আর এ-দেশের নাগরিকত্ব পারে না। এখানকার সিটিজেনদের দয়ারই সারাটা জীবন তোমার কেটে যাবে। তোমার শু? নয়, তোমার ছেলেরও, তারও ছেলের। এমনি বংশ পরম্পরায়।

তাহলে।

তাহলে আর কী! পুলিশ দেখলেই দৌড়ও। চোরের মতো লুকিয়ে থাকো—

জুলিয়া ভয়ে কেঁপে ওঠে। যদি সত্যিই পুলিশ এসে ধরে ওদের, ধরে পাচার করে দে? বর্ডারের ওপারে, তবে তো ছেলেমেয়েগুলো নিয়ে দাঁড়াতে হবে রাস্তায়। রাস্তায়ই তো ন খেতে পেয়ে মরবে। জুলিয়ার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায়। ভয়ে সে আর নড়তেও পারে

না। পেত্রোর সামনেই নিশ্চুপ একরকম দাঁড়িয়ে থাকে।

॥ দুই ॥

শেষ বেলার দিকে, গাঁয়ের রাস্তায় হঠাৎই কখন বুটের শব্দ। এক জোড়া নয়, সম্ভবত পাঁচ। কারণ কিনা, সামান্য পরেই গাছ পাছালির ফাঁকে, ধুলোর রাস্তায় পাঁচপাঁচটি রাইফেল, যেন বা হাওয়ার টানেই ভেসে এল। এবং ভাসতে ভাসতে যেখানে, ওই ওখানেই একটা বড় শিরিশ। আর তারই ধার থেকে গাঁয়ের শুরু। দু'চারটে করে ঘরবাড়ি। কোনো কোনো ঘরের মাথায় দো-চালাও রয়েছে ঢেউ খেলানো টিনের। তারই ওপরে আবার লাউয়ের ডগা। লাউও বুঝি হচ্ছে সবে ফুলটি ছেড়ে।

এক বুড়ো আসছিল। হঠাৎই কী দেখে সে থমকে দাঁড়াল। আর ওই তখনই সেখানে থামল এসে জোড়া বুটের শব্দ।

হেই—

জোড়া বুটের একজন তাকায় এখন বুড়োর দিকে, তুমি কোন গাঁয়ের আছো?

বুড়ো উত্তর দেয়। এবং ভয়ে ভয়ে সে গাঁয়ের নামটিও জানায়। তখন জওয়ান দু'জনের আর একজন তার হাতটি তোলে, এক আদমি ঘুষা ইধর। বাংলাদেশি। তুম দেখা?

বুড়ো মাথাটি নাড়ায় তার হাড় জেগে ওঠা প্রাচীন কাঁধের ওপরে, না দেখি নাই তো—

দেখলেই খবর দেবে। ও আদমি বর্ডার পার হুয়া কাল। ওই দালালগুলো পাইসা খাইয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। খেয়াল রাখনা।

আইচ্ছা, খেয়াল রাখুম—

বলতে বলতে বুড়ো ওর মুখটা নামায়।

জুতোর শব্দ তুলে জওয়ান দু'জন এরপর এগিয়ে যায়। তখন বুড়োও হাপ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু বাঁচলেও বুকের ভেতরে একটা অস্বস্তি। একটা চাপা আতঙ্ক। কাল লোকটা ঢুকেছে এ-পারে। যদি এর মধ্যে ব্যবস্থা করে অন্য কোথায়ও চলে না যায় তাহলে ধরা সে পড়বেই। আর ধরা পড়ে যদি পালাতে চায় তাহলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। বি.এস.এফের হাতে গুলি খেয়ে মরবে। এবং তা না হলে রাতের অন্ধকারে বর্ডারে নিয়ে গিয়ে এক ধাক্কায় আবার ওপারে। কিন্তু ওপারে পৌছুলেও তো শান্তি নেই। বি.ডি.আর-এর চোখে পড়লেই আবারও এক লাথিতে এপারে।

যা হালায় যা। যা না। এমুন খাড়াইয়া রইলি ক্যান—

মানুষটা তবু দাঁড়িয়ে, ভয়ে ও আতঙ্কে। কিন্তু সে বুঝি একটু সময়। আর সে সময়েই পেছনে আবারও কখন বন্দুকের গুঁতো।

এমুন খাড়াইয়া থাকলে মিটার কিন্তু বাড়ব কইলাম। যা দিছস হেয়র ওপর আরও চাপব চররাইয়া। যা যা টুইক্যা পড় আবার।

কিন্তু—

কিন্তুর কী আছে। বি.এস.এ্যাফ্রে নাকি ডরাস। ডরানের কাম কি? ওই তো পচাশি

নম্বরের পিলারখান। ওই পিলারের পাশ দিয়ে হান্দাইয়া যা। বি.এস.এ্যাফের বাপেরও সাধ্যি নাই অহনে তরে ধরে। যা যা—

বলতে বলতেই বন্দুকের গুঁতো। আর সে গুঁতোরই একবারে পঁচাশি পিলারের গায়ে। তারপর পায়ে পায়ে সে এগিয়েছে। বগলে পুটলিটা নিয়ে এদিক ওদিক করে একবারে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে। ঝোপজঙ্গলের ধারে। নদী বাঁধের নীচে। এবং আস্তে আস্তে মাথা গোঁজার ঝুপড়ি একটা সেখানেই। পরে ঝুপড়ি থেকে গাঁয়েরই উত্তরপাড়ায় একটা বাড়ি। ব্যবস্থা করে আবমাটি চরিয়ে চরিয়ে কোনো রকমে তুলতে পেরেছে। এবং এরপরেই বউ ছেলেমেয়েকে নিয়ে এসে একদিন। আনতে কি আর পারে? পেরেছে অনেক কষ্টে, দালাল লাগিয়ে।

না লাগিয়ে উপায় কী। কাজ নেই, দিনের পর দিন। কাজ নাই তাই দানা নাই। এবং প্যাটে নাই দানা তো শরীরে নাই তেনা। কী যে করবে তখন মণিরাম। সংসার চালাতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে তাকে। এরই ওপর আবার নতুন এক উৎপাত। বাস্তুটুকু দখলের জন্যই যেন এ-আসছে ও-আসছে। আর এসেই শুধু কানে মন্ত্র, ইন্ডিয়ায় যাও ইন্ডিয়ায় যাও। ইন্ডিয়ায়ই তো তোমগো দ্যাশ। এহানে আর পইড়্যা আছ ক্যান। অগত্যা ভয়ে ও অভাবের তাড়নায় নাম মাত্র দামে বাধ্য হয়ে বাস্তুটুকু তুলে দিয়ে একদিন এপারে। এরপর দেশ হল বাস্তু হল। ঘর হল বস্ত্র হল। প্যাটে পড়ল দানা, শরীরে উঠল তেনা। শরীর যদি চায়, কাজের খোঁজে যায়। এবং খুঁজে খুঁজে কাজও জোটাল মণিরাম। এরপর দিন গেল, রাত কাটল। আর এভাবেই দেখতে দেখতে একদিন প্রায় বছর পনের পার। এবং পার হয়ে এসে একি শুনছে এখন। বর্ডার এলাকায় পরিচয়পত্র নাকি দেওয়া হবে গাঁয়ের মানুষদের। আর দেওয়া হবে তাদেরই, যারা একাত্তরের আগে ওপার থেকে এসেছে?

একাত্তর। মণিরাম মনে মনে বিড়বিড় করে। সেকি এল একাত্তরের আগে, না পরেই এল বোধহয়। মণিরাম ভয়ে ভয়ে হাঁটে। যদি পরেই আসে তাহলে। তাহলে কি উৎখাত হতে হবে নাকি সমূলে। কিন্তু তাহলে তো....

ও মণিরাম—।

মণিরাম থমকে দাঁড়ায়। কেউ যেন ডাকছে। কে, কে ডাকে। মণিরাম ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। আর তাকাতেই শ্রীপতি। শ্রীপতিচরণ।

হুনছ তো?

কী কও তো—

রেশনকাড নাকি পরীক্ষা হইব অখন জনে জনে। দিল্লি থন নাকি লোকজন আইতে আছে—

ক্যান?

এই দেখ, ভোট আইতে আছে না!

হেইয়া তো জানি। দিয়াও তো আইতে আছি যখন যেমুন কয়—

হ, তা দিয়া আইছ। কিন্তু অহনে আর তা হইব না। পরিচয়পত্র দিব হগলের। তবে ওই রেশনকাড যা গো ঠিক আছে হেরাই পাইব পরিচয়পত্র।

শ্রীপতির কথায় অবাক মণিরাম, ঠিক আছে মানে রেশনকার্ডে আবার কী হইল?

হইব আবার কী! কোপটা তো পড়ল আম্‌গো উপুর। আমরা নাকি বুয়া ভোটার। আম্‌গো কাড ঠিক নাই। বুয়া কাড।

বুয়া কাড!

হ। তয় আর কই কী।

তইলে। মণিরামের মুখ শুকিয়ে যায়।

শ্রীপতি ঘাড় নাড়ে, বড় ডর লাগতাছে মণিরাম। এহানে আইয়া তবু তো দুইডা খাইয়া পইরা বাইচ্যা আছি, অহনে যদি আবার বডার পার কইর‍্যা দেয়...

কও কী! মণিরামের পায়ের তলা যেন একটু টাল খায়। এবং মাথার ভেতরে অন্ধকার। সে অন্ধকারে যেন পড়েই যাচ্ছিল মণিরাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেয়। নিয়েই সে নীচে তাকায় একবার। যেন পায়ের তলার জমিটাই খোঁজে।

॥ তিন ॥

এখন এদিকে, লস এঞ্জেলেস, সান ফ্রানসিস্‌কো, কালিফোর্নিয়া থেকে ওই ওদিকে মিসিসিপির মোহনা হয়ে পানামা সিটি, ফ্লোরিডা ও হলিউডে কত কত যে মেক্সিকো-হেইতি-কোস্টারিকার মানুষ। দলে দলে এসে ভিড়েছে। না এসে আর উপায় কী। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। দেশে থেকে না-খেতে পেয়ে মরার চাইতে ঝুঁকি নেওয়া অনেক ভালো। নাই বা থাকুক তাদের কাগজ। হোক না তারা ইল্‌লিগাল ইমিগ্রান্ট? তাই বলে কারো দরাজ বা ভিক্ষে করে তো কাটাচ্ছে না? এ দেশিদের থেকে অনেক অনেক বেশি পরিশ্রম করে। তাছাড়া লোকই বা এরা পায় কোথায়? কাজের লোকের দরকার হয় না বুঝি। এবং হয় বলেই তো ছুটির দিনে এসে যোগাযোগ করে একজন মেক্সিকান, কোস্টারিকান বা হেইতি পিপলের সঙ্গে। বাগানে আগাছা হয়েছে, পরিষ্কার করে দিতে হবে ভাই! তুমি কি ক্লিনিং-এর কাজ করবে বাড়িতে? হে ম্যান, হেই—

কী বলছ!

তুমি কী কর?

কেন একটা গাড়ি তৈরির কারখানায় কাজ করি—

বলতে বলতে সাত-আট বছরের দুটো ছেলেকে দু'হাতে ধরে টানতে টানতে লোকটি এগিয়ে যায়। আর ওই তখনই সেই মানুষের প্রস্তাবটা ছুঁড়ে দেওয়া, তা তোমার ওই ছেলে দুটোকে দাও না কেন। সবজি প্যাকিং করবে। আপেল বাগানেরও কাজ আছে।

কাজ, কাজ আর শুধু কাজ। কাজের ওপরেই তো ওদের রেখেছে ওরা। কাজ করবে, খাটবে, অথচ পরিচয়ের বেলায় ইল্‌লিগাল ইমিগ্রান্ট। ক্রিমিন্যাল ও রেপিস্ট। ন্যূনতম যে অধিকার, সেটুকুও দিতে তাদের বড় ভয়। না হলে গাড়ি চালাবে, কিন্তু চালাবার লাইসেন্স দেবে না। ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তে পারে কিন্তু কলেজে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। এ এক অদ্ভুত বন্ধনে এদের রেখে দিয়েছে তারা। দিয়েওছিল। কিন্তু এখন? এখন যে ওদের

বে-আইনী অনুপ্রবিষ্ট বলে তাড়াতে চাইছে।

ভাবতে ভাবতে ভয়ে ও আশঙ্কায় কুঁকড়েই গিয়েছিল একরকম, এই সময়েই কখন যে সানতোলাইয়া। গালে নরম সোনালি দাড়ি। অল্প অল্প কোঁকড়ানো। চোখের নীচে নীল আভা। এখানে এসে দু'চারদিন ঘোরাঘুরি করার পরই কারখানার চাকরিটা পেয়ে যায় সে। আর তারপরেই কী শান্ত এখন। অথচ এই ছেলেই না একদিন মারিজুয়ানা পাচার করতে গিয়ে জুভেনাইল কোর্ট ঘুরে এসেছিল দু'চারবার।

মারিয়া জিজ্ঞেস করে, কী রে কারখানায় যাবি না আজ?

না। মাথা নাড়ে সানতোলাইয়া, আজ টোকেন স্ট্রাইক। করাখানায় ধর্মঘট।

সেকি। মারিয়া অবাক হয়, এ-দেশে ধর্মঘট। কেন, ইস্যু কী।

সানতোলাইয়া চমকে ওঠে, কেন তুমি জানো না। এদেশ থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবার চক্রান্ত চলছে যে—

বাহ্ তা জানব না। কিন্তু—

কিন্তুর কিছু নেই মাম্‌মি। আমাদের তাড়াবার ব্যাপারে এদেশে একদলের মত আছে আর একদলের নেই। যাদের নেই, ওই দলেই আমাদের কারখানার মালিক। সে নিজেই তো আমাদের কাজ বয়কট করতে বলেছে। কেননা আমাদের মতো লেবার তার কারখানায় প্রায় শতকরা আশি ভাগ। এইট্টি পারসেন্ট। তা আমাদের তাড়ালে তার ফ্যাক্টরিটা চলবে কী করে।

ও এই ব্যাপার। সরল সত্যটা আবিষ্কার করতে গিয়ে মারিয়ার বুক থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।—তাহলে কী হবে তোলাইয়া? সত্যিই কি আমাদের বর্ডার পার করে দেবে?

নানা, এত ভাবছ কেন। আমাদের মতো লক্ষলক্ষ মানুষ এবার মিছিলে নামবে। আমিও যাব। আর তোমাকেও নিয়ে যাব আমি মাম্‌মি। ইয়ার্কি নাকি, আমাদের তাড়ালেই হল? আর কারা তাড়াবে। আমেরিকানরা? কিন্তু আজ যারা আমেরিকান তারাও তো কেউ এদেশের নয়। সবাইই তো বাইরে থেকে এসেছে একদিন—

মারিয়া চমকে ওঠে। এ যেন এক নতুন কথা। কিন্তু এ-কথা আবিষ্কার করল কী করে সানতোলাইয়া। একি তার মারিজুয়ানা পাচারকারী সেই ছেলেটা?

মারিয়া বুক ভরে বাতাস নেয়। —এক কাজ করবি তোলাইয়া। একবার জুলিয়াদের ওখানে যাবি। এদেশে এসেছি এক সঙ্গে। কিন্তু প্রথম থেকেই দু'জন দুদিকে। একবার গিয়ে বলবি জুলিয়াকে, ভয় নেই। আমরা সবাই আছি, সবাইই থাকব।

সানতোলাইয়া মাথা নাড়ে, নিশ্চয়ই যাব মা। আজই যাব—

বলতে গিয়েই বুকের ভেতরে কোথায়ও যেন একটা বিদ্যুৎ ঝলক। লুসিয়াটা ভারী সুন্দর হয়েছে। কতদিন দেখে না লুসিয়াকে। আজ যাবার আগে এখানকার পর্কচপ নিয়ে যাবে লুসিয়ার জন্য। মেয়েটা বড় ভালোবাসে।

॥ চার ॥

সকাল থেকেই কাল, এদিকে বড় কুয়াশা। এমন যে দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট নয়। যেন চরাচর জুড়ে কুয়াশার পর কুয়াশাই এখন। উড়ে উড়ে ও উড়তে উড়তে, ঘুরে ঘুরে ও ঘুরতে ঘুরতে জমাট বেঁধে গোটা দেশটাকেই বুঝি গ্রাস করে ফেলবে এখন। চানারুল এগোবার চেষ্টা করে। অনুমানে খানিকটা এগিয়েও যায়। কিন্তু পা ফেলতে গিয়েও একটু থমকে দাঁড়ায় আবার।

সামনে কী আছে! ফাঁকা মাঠ, নাকি শস্যপ্রান্তর। না কোনো জলাভূমি? কিংবা নদীখাতও হতে পারে। খাত হলে ঠিক আছে। হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলেও উঠে দাঁড়াতে পারবে সে। কিন্তু যদি বিল হয়, অথবা বাওর। আন্দাজে পা ফেলে ফেলে একটু একটু করে এগিয়ে যায় চানারুল।

কাল এই কুয়াশাকে কাজে লাগিয়েই দালাল লোকটা ওকে টাকা নিয়ে বর্ডার পার করিয়ে দিয়েছিল। আর পার করাবার সময়ই জানিয়েছিল, যান এই মাঠ পার হইয়াই একখান রাস্তা। আর ওই রাস্তা থিকা বাস ধইরাই সোজা বারসই। হেয়েরপর বারসই দিয়া বিহার। আর বিহারে একবার ঢুকতে পারলে আর পায় কে! একারে চুপচাপ বিশটা বছর। যান, চইল্যা যান তো সোজা—

তা সোজাই ঢুকে পড়েছিল চানারুল। কিন্তু এই কুয়াশাটাই সব গোলমাল করে দিল। ফলে সারাটা দিন এক গভীর কুয়াশার ভেতরে। দুপুরের দিকে, রোদ সামান্য ওঠায় কুয়াশা যদিও কেটে গিয়েছিল, কিন্তু গেলেও সামনের ঘন আমবাগানেই তাকে লুকিয়ে থাকতে হয়। এবং প্রায় সারাদিন। শেষে ক্লান্ত ও অভুক্ত অবস্থায় দিন শেষে যখন আবার বেরিয়েছে ওই তখনই সেই কুয়াশা পুনরায়। চোখে যেন ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। আর নাকে মুখে উড়ে আসছিল কুয়াশার হিমগুঁড়ি। কিন্তু এই হিমগুঁড়ির ভেতরে যাবে এখন কোথায় সে। অথচ না এগোলেও চলবে না। সেই পীচ রাস্তাটা তো পেতে হবে চানারুলকে। তারপর না হয় বারসই দিয়ে বিহার। আর বিহারে গেলে দু'চারজন যারা আছে কাজ কিছু না কিছু একটা জুটিয়ে দেবেই। কিন্তু তার আগে রাস্তাটা তো খুঁজে পাওয়া দরকার।

চানারুল এগোল। আর এগোতে গিয়েই আচমকা এক ধাক্কা। হোঁচট খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু পড়তে গিয়েও হাতটা বাড়িয়ে দিল। এবং বাড়াতেই অনুভব করে একটা গাছ। চানারুল হাতের স্পর্শে গুঁড়িটা বোঝার চেষ্টা করে। বোঝে, গুঁড়ির গায়ে গাছেরই শুকনো বাকলে এখন হিমের ছোঁয়া। হিম ঝরছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। একটু উঠে, প্রায় দাঁড়িয়েই বাঁদিকে পা রাখল চানারুল। আর সেই সময়েই ঝপ করে একটা হলদে আলো। কুয়াশা ভেদ করে চানারুলেরই গায়ে ছিটকে পড়ল। এবং পড়তেই চানারুল হতচকিত। আর তারপরেই চকিতে সে বাঁদিকে সরল। কিন্তু সরতে না সরতেই চিৎকার একটা : হল্ট্। একবার নয়, দুতিনবার। কিন্তু কানে গেলেও চিৎকারটা কানে নিতে চাইল না চানারুল। আর ওই তখনই তীব্র এক সুতীক্ষ্ণ শব্দ আচমকা। শব্দটা যেন একটা আগুনের বিন্দু হয়ে ওর পিঠের ভেতরে আশ্রয় নিল। এবং ঠিক সেসময়েই সামনে কে। কে, কে ওখানে! পরনে ওভারকোট, কনকনে হাওয়ায় ও হিমের

পরশে তার সোনালি চুল উড়ছে।

কে। কে ওখানে। কিছু বলতে গিয়েও চানারুল স্থির। বলতে আর পারল না। আচমকা পাদুটো যেন ভেঙে এল আস্তে আস্তে।

॥ পাঁচ ॥

এই মুহূর্তে, বুকের ভেতরে কোথায়ও একটা অস্বস্তি। বাইরে যেমন ঠাণ্ডা ঘরের ভেতরটাও ঠাণ্ডায় জমে বরফ। অথচ ঠাণ্ডা যে তাড়াবে সে টাকা কোথায়। টাকা থাকলে না হয় ঠাণ্ডা তাড়াবার গ্যাস আনত ঘরে। তবু যা হোক কষ্ট করে, জড়িয়ে মড়িয়ে ঠাণ্ডাটা একরকম সহ্য করতে পারছে; কিন্তু এ অপমান। আজ কাজে গিয়ে শুনেছে, দু'একদিনের মধ্যেই নাকি পুলিশি অভিযান শুরু হবে। ধরে ধরে সব বর্ডারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে।

জুলিয়া উঠে দাঁড়ায়। ক্যাবিনেট খোলে। খুলে আবারও ওয়াইনের বোতল একটা নামায়। এতক্ষণ কাজ থেকে ফিরেই পরপর দু'তিন পেগ মেরে দিয়েছে। কিন্তু মাথাটা তবুও হালকা হচ্ছে না যেন। ভেতরের ঠাণ্ডাটাও মরছে না।

বোতলটা হাতে নিয়ে খুলতে যাবে এই সময়েই তার চোখ যায় জানালার দিকে। ভারী কাচের জানালার বাইরের সন্ধেটা চোখে পড়ে। দূরে একটা বার-কাম-রেস্তোরার আলো। জ্বলছে-নিভছে ও জ্বলছে। জুলিয়া এগিয়ে যায়। বোতলটা রেখে জানালার কাচে চোখ রাখে।

আজ আর বাইরে তুষারপাত নেই। তবে অদ্ভুত এক কুয়াশা। তাই রাস্তাঘাট ভিজে। আর সে ভেজা রাস্তায়ই একটা দুটো গাড়ি। হুসহাস চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে যেন রেস্তোঁরার পেছনের দিকেই ; যেখানে সোনালি গমের খেতের পরে আশ্চর্য সেই নদী। এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে। আর নদীর ওপারেই সীমান্ত। বর্ডার। কিন্তু কে ও। কাকে যেন নামিয়ে দিল না ওখানে। পরনে পাতলুন গায়ে একটা ছেঁড়া ময়লা চাদর। মাথার চুল ঝাঁকড়া। ও কে? কোন দেশের ওই মানুষটা।

জুলিয়া বোতলটা খুলে ফেলল। এবং এরপরেই গলার ভেতরে বোতলটা উপুড় করে ঢেলে দিল খানিকটা। আর তারপরই খুট করে দরজা খোলার শব্দ। দরজাটা খুলেই জুলিয়া বেরিয়ে এল। ওই তো, ওই তো সেই মানুষ।

হে ম্যান। হেই—

জুলিয়া দৌড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু দৌড়ুতে গিয়েই হঠাৎই চমকে ওঠে। একি রক্ত! রক্ত কেন। গুলি করেছে বুঝি? কে গুলি করল ম্যান।

ছেলেটি কিছু বলার চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা করেও পারে না। হাত একটা তুলে দেখায়। আর ওই তখনই জুলিয়া ঝুঁকে পড়ে, তোমার ঘর। ঘর ছিল কোথায়?

এবং জুলিয়া শোনে, নদীর ওই পাড়ে। ওই যে দেখা যাচ্ছে নদীটা—

যাচ্ছিলে কোথায়?

বডার পার হইয়া ইণ্ডিয়াতে ঢুকতে গেছিলাম। প্যাটের জ্বালায়। কিন্তু—

কিন্তু? কিন্তু কী—!

জুলিয়া আর সাড়া পায় না মানুষটির। এবং ওই সময়ে হঠাৎই চিৎকার একটা।

জুলিয়া থমকে দাঁড়ায়। আর দাঁড়াতেই অবাক। পেছনে কখন সানতোলাইয়া ও লুসিয়া। আর সানতোলাইয়াই যেন জিজ্ঞেস করে, ওদিকে যাচ্ছিলে কোথায়।

একটা লোক। বর্ডার পার হতে গিয়ে গুলি খেয়েছে । জুলিয়া উঠে দাঁড়ায়।

গুলি। সানতোলাইয়া অবাক।

ইয়েস। ওই তো।

কোথায়? সানতোলাইয়া ও লুসিয়া চারপাশে লক্ষ করে। এবং জুলিয়াও তাকায়। কিন্তু তাকাতেই অবাক। সেই মানুষটি তো আর এখন নেই এখানে। ছিল কিন্তু একটু আগেও। বর্ডারের কাছে। জুলিয়া থরথর করে কেঁপে ওঠে।

কী হল। কী হয়েছে আন্টি—

জুলিয়া চোখ তোলে, আমার আজকাল বড় ভয় সানতোলাইয়া। ঘুমের ভেতরেও এক-একসময় ভয়ে কেঁপে উঠি।

না না। ধুস। ভয় কী? সানতোলাইয়া হাসে, আমাদের কেউ তাড়াতে পারবে না আন্টি। আমরা আছি। আমরা থাকব—

কিন্তু যদি গুলি করে। ওই যে মানুষটাকে...

কে। কোন মানুষ—?

জুলিয়া বিড়বিড় করে, এই পৃথিবীরই কোনও সীমান্ত প্রদেশের বর্ডার পার হচ্ছিল সে। খিদের জ্বালায় সে ভূমি পাল্টাচ্ছিল। এমনই সময়ে...

বিড়বিড় করতে করতে জুলিয়ার বুক থেকে হঠাৎই গভীর শ্বাস পড়ে, আচ্ছা পৃথিবীর সব সীমান্ত প্রদেশের সীমান্ত রেখাগুলো যদি তুলে দেওয়া যায়। যায় না সানতোলাইয়া?

সানতোলাইয়া চমকে ওঠে। কী যেন বলল। কীসের যেন একটা ইঙ্গিত দিল না জুলিয়া আন্টি। কীসের।

জুলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতবহ কথাটা নিয়ে আবারও নতুন করে ভাবতে থাকে সানতোলাইয়া।

ছিন্নভিন্ন

অজয় চট্টোপাধ্যায়

রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম, কত মুহূর্ত
শ্রান্ত হয়ে এল অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন
তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।

—সমর সেন

এক্সপ্রেস, নামে, কাজে মালগাড়ির অধম। চলার ছলনা আছে, গতি নেই। সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে গড়িমসি। যে আলস্য আসে নারীর গর্ভিনী হলে। দুরন্ত বেগে ছুটবে কথা দিয়ে ভাড়া নিয়েছে বেশি। কথা দিয়ে কথা রাখছে না। যাত্রী পৌঁছে দেওয়া নয় যাত্রী বোঝাই একমাত্র ধান্ধা। যাত্রীরা ক্ষিপ্ত হচ্ছে। ক্ষিপ্ত এক যাত্রী গলাবাজি করে। —এ্যাই বাসে তো আচ্ছা করে লটকে দিয়েছ দিচ্ছি দিচ্ছি করবেন না। ভাড়াটা দিয়ে দিন, তা যাচ্ছি যাচ্ছি না করে গাড়িটা চালা না বাপ।

হেল্পার হাওয়া, যাত্রী গাঁথার উৎসাহ এমন তুঙ্গে, নেমে পড়েছে আলপথে। আলের ওপর পা রেখে এক মা তার ছেলে ও ননদকে বগল তুলে ডাকছে। শিগ্রি আয়,—তাদের তুলতে হেল্পার অপেক্ষায়, কনডাক্টর ড্রাইভার নির্বিকার। কোনো মন্তব্য গায়ে মাখে না। প্রতিবাদী যাত্রীদের তোল্লাই দিতে বিশ্বনাথ উদ্যত হয়ে মুহূর্তে অবসন্ন। দু-টো সিট আগে ডান দিকের কোণে যে লোকটি বসে আছে তাকে নজর পড়তে মুখ বোবায় ধরে। চোখাচোখি হলেই কেলো। অকসরী শিক্ষক, যাবতীয় সংলাপ শীডস টু আফসোস, সব ছিল। এখন শুধু নাই। খুড়োর পেটে সরস্বতী হাম্বা হাম্বা করে। জগৎ সংসারকে মনে করে ছাত্রসমাজ। শিক্ষা পরিবেষা ওর কাজ। আস্কারা পেলেই বিদ্যের যাই মারে। মুখ খুললেই হে অতীত কথা কও, কথা কও। আছে ক্রাই প্যানে। যেচে কাম্নারে ঝাঁপ দেয় কোন কালিদাস। অগত্যা সম্বল উদাসীন আশ্রয়। বাতাসে বিবাগী হাওয়ার প্রচ্ছন্ন মদত, দৃষ্টিহীন অবস্থায় এলোমেলো বাতাসে মাখামাখি হতে থাকে বিশ্ব।

শ্রান্তিতে থেকে থেকে ঢুল নামছে। ঘুম ঘুম ভাব, ঝাঁকুনি এবং কোলাহলে ঘুম নষ্ট। নিমেষে বন্দি হয়ে যায় শব্দের খাঁচায়। আছড়ে পড়া শব্দতরঙ্গে কান ঝাঁ ঝাঁ করে। তার পাশে বসে আছে এক পড়তি যুবক। কোলের ওপর প্যাকিং বাক্স। পায়ের কাছেও রাখা ছোট-বড়। বচসা শুরু হয়েছে। যুবকটি বলছে,—বাস খালি, এর আবার ভাড়া কী।

কনডাক্টার খেঁকি হয়,—বাস লোডেড থাক আর না থাক মালের একস্ট্রা ভাড়া লাগবে।

বচসা স্থানীয় থাকছে না, ছড়িয়ে পড়ছে অন্য প্রান্তে। কান খাড়া হয়। একবার এ পাশে। একবার ওপাশে। শব্দ এবং ঘটনা বিশ্বকে আকৃষ্ট করে। হয়েছে কী, বিশ্ব দেখল সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ বাসের কনডাক্টর। যার গাল কচি বাঁশপাতার মতো দাড়ির উল্লাসে আচ্ছন্ন। টিকিটের

বাড়িল বুড়ো আঙুলে বাজিয়ে হাঁকছে জনে জনে, ·দিচ্ছি দিচ্ছি করবেন না। দিয়ে দিন জেঠু।

হতে পারত হাস্যরসের খোরাক। হল রাগের উৎপাদক। একজন যাত্রী ভীষণ খচল। অবশেষে ফাটল। —এই ছোকরা তখন থেকে দেখছি সব্বাইকে জেঠু জেঠু করছ। তোর কোন কেলে জেঠু রে আমরা—। বলে অন্য যাত্রীদের দিকে তাকায়। তারিফ চায়, ভোট চায়। তারিফ এবং ভোট জোটে। দুয়ো দের যাত্রীরা,—যা বলেছেন, দাদা কাকা ক্রমবিকাশ বলে কিছু থাকবে না। কচ্চ বখাটে। সমবেত ভর্ৎসনা। দমে যাবে এমন কাঁচা বান্দা ছোকরা নয়। তার হেলদোল নেই। একইভাবে জনে জনে সে চাইতে থাকে—জেঠু টিকিট। জেঠু টিকিট—, যাত্রীকুল ফুটছিল ক্রোধে। এবার ফাটল, প্রতিনিধিসুলভ একজন ফস করে খেয়ে গেল, ছোকরার কলার চেপে ধরল। আর একজন ওসকার।—আচ্ছা করে ক্যালান। হারামজাদার মুখ থেকে দাদা ডাক আপসে আসবে।

সমঝোতা করে ছোকরা, না দাদা না কাকা না জেঠু। কোনো ডাক না ডেকে টিকিটে আঙুল বাজিয়ে ভাড়া চাইতে থাকে। আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হচ্ছে। শেষ হয়ে আসছে যাত্রাপথ। বাসস্ট্যান্ডে ভিড়বে ভিড়বে কনডাক্টর ফাঁস করল, দাদা-কাকুর চালু ধারা এড়িয়ে কেন সে জেঠু ডাক-এর শরণ নিয়েছে,—আমি জয়েন করেছি কাল। পরশু বাবা রিটার করেছে, রিটার করার দিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনিং দিয়েছে কী করে কী ভাবে ভাড়া চাইতে হয়। কী ভাবে নজর রাখতে হয় কে ফাঁকি দেওয়ার তাল করেছে। কে স্টপেজ নিয়ে কারচুপি করছে। আমি শিখছি। কান খাঁড়া রাখছি। শুনতে পাচ্ছি বাবা একে একে যাত্রীদের কাছে গিয়ে টিকিট চাইছে, দাদা টিকিট-দাদা টিকিট...। বলে, বাবা যাদের দাদা নামে ডাকছে আমি কি পারি তাদের দাদা ডাকতে? বাবার দাদা কি আমার জেঠু নয়?

ধারাভাষ্য শুনতে শুনতে বিশ্বর চোখ ঠিকরে যায় অদূরে। মহিলা সিটে চোখ পড়তে চোখ চমকায়, ঝাপসা হয় দৃষ্টি। বিভ্রম আসে, চোখ কচলায় বিশ্ব। স্বচ্ছতা এলে প্রত্যক্ষ করে ভুল সে দেখেনি। একজোড়া প্রশ্নকাতর অকসন্ন দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ। এতদিন কোথায় ছিলে? কৌতূহল আর ঘৃণার আক্রোশে বিদ্ধ করছে চাহনি।

বিশ্ব আমূল আলোড়িত হয়। গভীর অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত; আমাকে কেন জাগাতে চাও?

হাতে গোনা যায় যাত্রী। এত কম যাত্রী। চলছিল মন্দ লয়ে। স্টপেজ আসতে থেমে গেল। বিষণ্ণ করুণ পরিশ্রান্ত গার্হস্থ্য কাঠাম সিট ছেড়ে উঠল। পায়ে পায়ে দরজা অভিমুখী। বিশ্ব দেখল খামচি ক্লিপে সংহত চুলের রাশ। সিনথেটিক শাড়িতে মোড়া কাঠাম শরীরে ভাঁজ ফেলে ফেলে এগোচ্ছে, বাসের ধাপিতে পা রেখে টুপ করে খসল। স্টপেজটা গেঁথে থাকল বিশ্বর মনে। দুটো স্টপেজ পার করে বিশ্ব নামল।

জীবিকার হলাহল বড় ক্লান্ত করে। আজকের দিনটা সে স্বেচ্ছা অবসর নেয়। পথ তাকে টেনে নিয়ে চলে এপথ ওপথ সে পথে। চারপাশে প্রবহমান জীবন, কথা-হাসি-উদ্দামতার ঢল। প্রসন্নতার জোয়ার বইছে। কিন্তু বিশ্ব এর আস্বাদ নিতে পারছে না। একপ্রকার দুঃখ ওকে এ খোঁড় ও খোঁড় করে দিচ্ছে। অথচ কেন যে এত দুঃখ জন্ম নেয় তার হদিস পায়

না। কী নেই ওর! সংসার সমৃদ্ধি আছে। পণ্য সুখ আছে, শরীর সুস্থ আছে। তবু কেন যে এমন মনে হয়! জীবনের স্বাভাবিক চাহিদাগুলো অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই কি চরিত্রে বুনন হয়ে যাচ্ছে একাকিত্বের বীজ; কে জানে। এসব নিয়ে গবেষণা মানেই যুক্তি তর্কের ভুলভুলাইয়া। আলাপ বিস্তার তানকারির কত্ত লীলা। ব্যাখ্যা মিলবে। নিঃসঙ্গতার অবসান রয়ে যাবে বিশ বাঁও জলে। এই মুহূর্তে বিশ্ব অতিশয় হাহাকারী, আরোগ্যের খোঁজে সন্তান স্ত্রী বন্ধু-সংসর্গের প্রত্যেকটি ঠেকে একে একে হানা দেয়। কেউ উপশমের আশ্রয় হয় না। বসুন্ধরার কয়েকটি চরণে খুঁজে পায় নিঃসঙ্গ মনের অবস্থান :

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল তলে, ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে এই;
... সেথায় ফিরায়ে লহ
মোরে আরবার দূর কর সে বিরহ
সে বিরহ থেকে জেগে ওঠে মনে...
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত...

বিশ্ব পদব্রজী, থেকে থেকে উদাসীনতার গ্রাসে। ফলে ধাক্কা খাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, হুঁশ নেই। সহসা একজন কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিল,—আর একটু হলে মায়ের ভোগে যাচ্ছিলেন। জোর বাঁচলেন মশাই—, একই বলে হরি যাকে রাখে।

সম্বিত আসে বিশ্বর, প্রচণ্ড গতিতে একটা বাস ঘাড়ে এসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। বিশ্ব তাকায়, উদ্ধারকের প্রতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ঝরে।

উপকারী পথিক শুধোন : এ্যাতো আনমনা। কী খুঁজছেন মনে মনে। রসিকতায় প্রণোদিত হয় বিশ্ব, আমি তো কোন ছার, দুদিনের গেঁয়ো যোগী। এমন যে জীবনানন্দ তিনিও খুঁজে পাননি জীবনের অর্থ। খুঁড়ে খুঁড়ে আবিষ্কার করতে গিয়ে খুঁজে পেলেন শুধু এক বিপন্ন বিস্ময়। পথিক হতবাক। বলে কী। মাথায় কি ছিট আছে, না-কি কবি। সে পালিয়ে বাঁচে।

বিশ্ব ভাবল খোঁজ সেও করত, তবে অন্য খোঁজ। চাকরির খোঁজ। সাদামাটা চাকরি নয়। মোটা অঙ্কের মাসকাবারি বন্দোবস্ত। যে পোক্ত বন্দোবস্ত প্রণয়ীর চোখে এনে দেবে সম্ভ্রম আস্থা কড়া নিরাপত্তা বলয়। সেই দিন ছিল না তো কিছু। কী করে দেবে গ্রাহক পরিষেবা! মোটা অঙ্কের চাকরি মগডালে। পাড়ে কার সাধ্য। অতএব যা হবার তাই হয়েছে। কনকচাঁপা নিজেকে করেছে গুটিসুটি। এ নিয়ে আমি কোনো উচ্চবাক্য করিনি। মান-অভিমান আশাঘাতক আশা নিয়ে দড়ি টানাটানিতে যাইনি। কিছুই ছিল না অবলম্বন স্বরূপ। তবু এসেছিলে কেন—প্রশ্নটা ঠোকরায় বৈকি। উত্তরও একটা যেন তেন টুঁ মারে। আমার এ পথে তুমি এসেছিলে—বলেছিলে কত কথা,

কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন।

এসেছিলে, তবু আস নাই। জীবনে আস নাই। নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই। তাই নামবার আগে চকিত কটাক্ষ; প্রাথমিকভাবে বিশ্বকে বিহ্বল করে, সয়ে এলে বুকটা হা-হা করে। ভরাট গার্হস্থ্য কাঠাম জন্ম দেয় দুঃখ : আমারে চাও না তুমি আজ আর,—জানি;

তোমার শরীর ছানি
মিটাও পিপাসা
কে সে আজ—তোমার রক্তের ভালবাসা
দিয়েছ কাহারে।

।। ২।।

যারা খায় পেট পুরে হাভাতেদের তারাই শেখায়
দারুণ সময় আসছে হে

—ব্রেখট

গ্রাহক পরিষেবায় ছুটি, এবার গৃহস্থালী পর্ব। ঘর গোছগাছ করার তোড়জোড়। হাউস কিপিং-এর কাজ চলছে। এই সময় কর্মীদের মধ্যে ঢিলে ঢালা ভাব ভর করে। হাত চলে। মুখ চলে। গ্রাহক বিরলে বাইরেটা শুনশান, ভেতরটায় গড়ে উঠেছে গল্প দাদুর আসর। পিসির দল গালে পান-দোক্তা-জর্দা ফেলে জাবর কাটছে। দুপুর যায় যায়। গিন্নিরা জলে যাওয়ার তাড়ায় উসখুস করছে। দহনক্লান্ত অপরাহ্নে অফিসের অন্দর মহলে শব্দের খই ফুটছে। কলম-চোখ শানিত ক্রিয়ায় সংখ্যা ফুটছে। সংখ্যা নিয়ে কাটাকুটি এবং টিক মার্ক চলছে। চেয়ার টেবিল ছড়ানো আছে বিভিন্ন অবস্থানে। কিন্তু স্বগঠিত এক প্রথায় এই সময় কর্মীসমবায় কাছাকাছি হয়। কে কতটা বিজ্ঞ জাহির করে। কেউ কেউ ছাত্র। সমাবেশ উসখুস করছে। ব্যানার্জী আক্ষেপ ছুঁড়ল।

—ছুঁচ সুতোর রোল কিনলাম। দেখি তাও বিদেশি। স্বদেশি টেকনোলজি বেপাত্তা। দেশটা সিঙ্গাপুর হয়ে গেল।

শ্যামল সংগত করে।—টাটা বিড়লা সিংহানিয়ার কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না।

—যায় না। যাবে না, পুঁজিপতিদের কোনো বিগ্রহ এখন আর চোখের ওপর ভর করে না। সব আড়ালে। অদৃশ্য মুখ। অদৃশ্য সত্তা। মালিকানা বোধ চারিয়ে গেছে মধ্যবিত্ত সমাজে। শেয়ার সূত্রে। দীপক প্রাবন্ধিক। অনেকে এ খবর রাখে। কেউ কেউ তার লেখা পড়ে। লেখক সুবাদে কাজের ভাগ এবং নিয়ম শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে তার কিছু ছাড় আছে। প্রাবন্ধিক মানে চিন্তাবিদ। চিন্তক হিসেবে ভাবমূর্তি জিইয়ে রাখার স্বার্থগত দিকটাও প্রখর। এ বিষয়ে ও সচেতন। কাজেই সমাজতত্ত্বের বিষয় ঘেঁসে তর্ক অথচ ও নিছক শ্রোতা; ভাবা যায়, সুতরাং ও বক্তা বনে যায়।—আসলে অবক্ষয় চরম পর্বে। নিগ্রহ অবিচার বৈষম্য আগেও ছিল। সমাজ গঠনের শুরু থেকেই আছে, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল অরাজক ব্যবস্থাপনার

পাশাপাশি লঘু শক্তিশালী পৌর সমাজ ছিল। যে প্রতিবাদ বিদ্রোহ খারিজ—ইত্যাদি প্রেরণা জোগাত। আজ সেই পৌর সমাজ নেই। আছে ভগ্নস্তূপ। তাই সামগ্রিকভাবে গোটা বুদ্ধিজীবী অংশটাই খাড়া হয়ে হাঁটতে পারছে না। তাদের পথ চলা অল নীডস টু নন্দন চত্বর। প্রার্থী, নতজানু, প্রসারিত হাত। মুঠি খোলা। বাবাগো কিছু দাও—। ভিখ মাঙছে। আর্তনাদে দীর্ণ করি বসুধারে। আর এ ব্যাপারে ধুতি-পাজামা-প্যান্ট ভাই ভাই এক ঠাঁই। অথচ ফ্রান্স ইতালি প্রভৃতি দেশের চেহারাটা অন্য। সেখানে পৌর সমাজ প্রচণ্ড শক্তিশালী। রাজা আসে, রাজা যায়। সমাজের কোনো হেলদোল নেই। টিকে থাকে মূল্যবোধ, প্রথা। গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়া। পৌর সমাজের ভিত পোক্ত। কিন্তু এখানে উলটা পুরাণ। উনবিংশ শতাব্দীর পৌর সমাজ পাপোষ। রাজনৈতিক সমাজ গ্রাস করেছে সমাজ বিন্যাস। আর পৌর সমাজও নিজস্বতা বিক্রি করে দিয়েছে রাজনীতিক সমাজের কাছে।

দীর্ঘভাষ্য। সকলে মন দিয়ে শুনল। কারণ কথনের গুণ। ততোধিক নাম-ডাকের ভার। কিন্তু ফাঁকা মাঠে গোল দেবে তা হবে না। চিত্ত গল্পকার, ছাপা হয়েছে ২টো। লেখা পড়ে আছে বিস্তর। ওত পেতে আছে একদিন তার চাহিদা হবে। সে প্রয়োগবাদী গল্পকার। মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ তত্ত্ব সে বিচিত্র বিন্যাসে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে তৎপর। আশাপ্রকাশ এবং প্রাধান্য কাঙাল। ও ধাক্কা খায়, দীপক যা বলছে তা একপেশে। এবং বর্তমান সমাজের বিধি ব্যবস্থা নিয়ে ঠেস আছে। যেটা অধিক শঙ্কার তা হচ্ছে সভা দীপক আসক্ত হয়ে পড়ছে। ও উপস্থিত অথচ নৈরাশ্যবাদ খাপ খুলবে; হতে পারে না। ও মুখ খুলল,—সংকট সমস্যা আছে। প্রত্যয়ের দিকও আছে। সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে যে বুদ্ধিজীবী সমাজ তারা সকলেই নতজানু—ওই যে দাঁড়াবে নতশির ছবিটা নিরঙ্কুশ নয়। কিছু বুদ্ধিজীবী এখনও মাথা উঁচু করে হাঁটছে। দীপক অনেকদিন ধরে ছানি কাটাবে করছে। কাটালে ঠিক দেখতে পাবে প্রগতির দিকচক্রবাল।

বোসদা ফোঁস করে,—থো তোর কচকচি। যাদের দেখছিস খাড়া হয়ে হাঁটছে খোঁজ নে দেখবি কোমরে জানুতে বাত। রক্তবাহী নালিতে চর্বির বাস। সব শালা প্রসাদ ভিক্ষু। নইলে লগ্নি পুঁজি গোঁদ মেরে মেরে পেছন খাল করে দিচ্ছে আর আঁতেলদের মুখে রা নেই। নিজের বেলায় আঁটিসাঁটি গুটি তৈরিতে ব্যস্ত। পান্নালাল দাশগুপ্ত মেধা পাটেকর কোল পায় না। কাছা লুটিয়ে উন্নয়নের পো ধরে ছুটছে। পুঁজি চাই। পুঁজি ঢালবে কে? বিদেশিরা। তা পুঁজি ঢেলে কি বাল ছিঁড়বে। শিল্পায়ন মানেই আধুনিক প্রযুক্তির ঘরকন্না। কায়িক শ্রম পাপোষ। আদর যন্ত্র শ্রমের। যন্ত্র শ্রমে একান্নবর্তিতার ঠাঁই নেই। কর্মী সমবায় নেই। দাবি দাওয়া নেই। ধর্মঘট নেই। অবসর নেই। ভাবুকতা নেই। আদান প্রদান নেই। ইউজ এ্যান্ড থ্রো পলিসি। গোষ্ঠী পরিবার সুখী পরিবার। খাও দাও জীবন লোটো। ফল? এক ব্যাপক মানবসমাজ মানবসমাজে বাড়তি। নগরায়নের উৎসবে বাস্তুভিটে-লোকাচার-পাব্বন-চাকরি সব ডকে। দরিদ্র মানুষের আশ্রয় নেই। তরী বড্ড ছোটো। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী। আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি। শূন্য নদীতীরে সে একলা প্রতীক্ষায়। ডাক আসে ভোটের বাদ্যি বাজলে।

সমাবেশের সদস্যবৃন্দ প্রত্যেকে যুগপৎ বক্তা এবং শ্রোতা। অসীম সমর্থনে এগিয়ে আসে। —জনগণ হচ্ছে উলুখাগড়া, কেবল ভোট এলে শক্তির উৎস, বাবা ভোটেশ্বরের চরণে সেবা লাগে। পার্টিগুলো মর্মে তা জানে বলে দরিদ্রের পাশে এগিয়ে আসে। কাড়াকাড়ি করে ভোট কুড়োনির দল। পাদ্রীসুলভ বরাভয় দেয় আমার নিকট আইস। আমি তোমাদিগকে চাকরি দিব। আশ্রয় দিব। উন্নয়ন দিব। বিনিময়ে তোমরা আমাকে আনুগত্য দাও। গোদা বাংলায় ঢাক পেটায় আমরা ঘুচাব তিমির রাত। আমরা আনিব রাঙা প্রভাত। পিট একটা, পিট খুলতেই আসা—বড় আশা করে এসেছি গো কোলে তুলে নাও। কোনো একটা দলকে মানুষ কোল দেয়। কিন্তু কিছুই ঘোচে না। কী করে ঘুচবে? দল এডসে আক্রান্ত।

সমীর আঁতকে ওঠে,—এডস? মানে কুলাদি কেস? জনগণ এখানে অসহায়।

বোসদা : কারেক্ট, বিরাট মারণযজ্ঞে তুই আমি সঞ্জয় মাত্র। যাকগে ঝাঁপ ফেলার সময় ঘনাচ্ছে। হাত চালা। মেশিনে ঘোমটা পরা।

কোয়ো নাকো কথা। সারকুল্লার জারি হলে কী হয় তা চোতা পদ্যে বাতিল। কথা বিরাম মাগে না। তর্ক সংস্কৃতিতে অমিয় অংশ নেয়,—ভুবনায়নের তাৎপর্য হিসেবে হাজিরে করা হচ্ছে বিশ্বকে একসূত্রে গাঁথার তত্ত্ব। কিন্তু ইতিহাসে এক অর্থনীতি এক সমাজনীতি এক মূল্যবোধ বিফল। বৈচিত্র্য এবং বহুত্ববাদ আছে বলেই মানবসমাজ এত সুন্দর। নিজস্ব রাজনীতি নিজস্ব অর্থনীতি দিয়ে যারা অন্য ধারাকে গিলতে চায় তারা আত্মধ্বংসী হয় এবং পোষ্যদেরও সর্বনাশ করে। প্রভুত্ববাদী ধারার নবজাতক লগ্নী পুঁজি। লক্ষ বাণিজ্য বিস্তার। চলো যাই বাণিজ্য তরীতে বৈঠা বাই—একরোখা অভিমুখে মূল্যবোধ—কৃষ্টি-ভিটেমাটি-লোকশিল্প—কারুশিল্প-সারল্য—দিনমজুরি-লোকাচার যাবতীয় নিজস্বতা উৎসর্গে। উন্নয়নের বলি। বুঝলি সব খোয়া যাবে। থাকবে শুধু হাহাকার।

পার্থর মনটা বিশ্বাসপ্রবণ। যখন যার কথা শোনে সেইক্ষণে সেটাই মনে করে হক কথা। সে বলে,—চমৎকার বলেছেন অমিয়দা। এমন যুক্তি আছে জিরো আওয়ারে আলোচনার যোগ্য।

ব্রত : বৃন্দাবনে যেমন কৃষ্ণ ছাড়া নাম নেই। ভারতবর্ষের অবস্থা এই মুহূর্তে ঠিক তাই। বাণিজ্য ছাড়া বিষয় নেই প্রতিবাদ। অবশ্য প্রত্যেক শক্তি যে বাণিজ্য নাম জপছে তা নয়, উঠে এসেছে জঙ্গিবাদ। যা একপ্রকার বঞ্চিতের প্রতিবাদ। প্রতিরোধের কর্মকাণ্ড। প্রতিরোধের অভিব্যক্তি।

মিহির : উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপছে না। জঙ্গিদের হাতে সংহার হচ্ছে শত শত মানুষ। ওদের কোনো স্পষ্টতা নেই। না লক্ষ্যে না কর্মপদ্ধতিতে। ওরা কি হতে পারে বঞ্চিতের প্রতিনিধি—।

বোসদা : ছেঁদো বুলি। আসলে হালাল করে মারা হল কি-না পোচ দিয়ে ওসব তর্ক বাঁজা তর্ক। লাইফ নিরাপদ কি-না সেটাই প্রশ্ন। জীবন বিমা জঙ্গিদের হাতে নেই। গণতান্ত্রিকদের হাতে নেই। জনগণ চিরকাল বটপাতা চিবোয়।

ব্রত কিন্তু কিন্তু করে—আচমকা যেভাবে মানুষ মরছে বেড়াতে গিয়ে অফিসে বসে জঙ্গি

দের হাতে গণতান্ত্রিকরা কি অতটা নিষ্ঠুর।

দীপক—নিষ্ঠুরতায় উভয় শক্তি এক; গণতান্ত্রিকরা ধোয়া তুলসী নয়। ইন্দিরা গান্ধী মারা গেলে ১ দিনে ৩ হাজার শিখ খুন হয়েছিল। ঘাতক কারা? গণতান্ত্রিকরা। গোধরায় যারা খুন করে তারা গণতান্ত্রিক। সবরমতী এক্সপ্রেসে যারা খুন করে তারাও গণতান্ত্রিক। মিহির এ যুক্তি মানতে দ্বিধাগ্রস্ত। সে প্রতিবাদ করে। —পদ্মফুল তেরঙা ঘাসফুল কাস্তে হাতুড়ি যে দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণ করো না কেন জঙ্গিবাদ আর গণতন্ত্র একাকার করা যায় না। একটার মন্ত্র চোরাগোপ্তা। আর একটার পদ্ধতি স্বচ্ছতা। মানুষের লগে লগে দোলায়িত। ভাই ভাই হয়। মুড়ি মুড়কির এক দর হয়ে যাচ্ছে না।

বোসদা : ওই হল আর কী। গ্রাম গঞ্জে একটা ছড়া চালু আছে। শুনিসনি?

জননী জায়ার মাঝে ভেদাভেদ নাই,
একজন স্তনদায়ী অন্যজন মাই

সমাবেশ টাল খায়, রাত হানা দিচ্ছে। সন্ধ্যা ক্ষীন হচ্ছে। নীড় প্রেম প্রবল হচ্ছে। কাজ সারতে তাড়া আসে। অগত্যা অনর্গলতার শীর্ণ ধারা—। হাত চলছিল ক্ষিপ্র, সহসা কপালে অনেক ভাঁজ পড়ে। উদ্বেগ চিহ্ন। সি সি লেজারে চোখ পড়তে দেখে ঢাউস লেজারে পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভাউচার পতপত করছে। রিলিজ হবে লেখা হবে চেকিং হবে। বিস্তর প্রক্রিয়া বকেয়া। সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায়—। ডি ফ্যাক্টো ম্যানেজার বোসদা দৃষ্টি ছোঁড়ে চেম্বারে। নির্জন চেম্বার, এস্ত বোসদা গলা চড়ায়।—হ্যাঁরে মালটা গেল কোথায়? অফিস গেজেট অসীম ত্বরিতে উত্তর ভাসিয়ে দিল।—মালদার পার্টির খোঁজ মিলেছে। মোটা ডিপোজিট বাগাতে মক্কেলটিকে গাঁথতে হবে। সেই ধান্ধায় গেছে। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে যা রেষারেষি দেরি হলেই ফস্কে যাবে।

একজন ফোড়ন কাটল। —তা যা বলেছ। খদ্দের নিয়ে যেভাবে টানাটানি চলছে বেশ্যারাও লজ্জা পাবে। ঠাট্টা মসকরায় বোসদার মন নেই। তার স্বগতোক্তি : যা শা-লা-। ও কেটে পড়েছে। মানে কাজটা আমার ঘাড়ে চাপল। বিরক্তিতে ফাটল বোসদা,—ওসব ঢপের কেত্তন আমায় শোনাস না। এখনকার সাহেবদের ধ্যানই হচ্ছে ট্যুর কনফারেন্স ইনসপেকসন। কাজের নামে কারচুপি। স্রেফ গ্যাঁড়াবার ফন্দি। অফিস ছাড়ার সময় ভাব করে যেন পাড়ি দিচ্ছে। বাণিজ্যেতে চলি আমি—। রাস্তায় পা পড়লেই আপনা কামসারি। বলে বায়োডাটা নিয়ে পড়ে।—মালটা কোন লটের রে?

প্রলয়ের ঠোঁটে যাবতীয় তথ্য ঝুলে থাকে। প্রশ্নমাত্র খসল।—নাইনটি নাইনের। —তাই বল, সিনিয়রিটির পয়দা, প্রমোটি। ব্যাঙ্কের ভূমিপুত্র, রক্তে বইছে কেরানি কালচার, খালি বারমুখো ছোঁকছোঁক।

মন্তব্য আলপটকা, তাহলেও সত্যের পাইল আছে। সেটা হচ্ছে কাজের চাপ এমন যে ব্যক্তিগত অবসর বলে কিছু থাকে না। এই সত্যের পাশাপাশি আর এক ছোট্ট সত্য লেপটে আছে। সেটা সুবিধের দিক। ম্যানেজার সুবাদে ব্যক্তিগত কিছু কাজ অফিস কাজের মধ্যে মিশে যায়। বিশ্ব মাঝে মধ্যে সুযোগটা নেয়। ক্যাশ চেক পাশ করতে করতে আঙুলে ধনুষ্টংকার।

কলমচঞ্চলতা স্থির। দৃষ্টি হয়ে যায় অন্যমনস্ক, গোটা গোটা বাংলায় সই করেছে। কনকচাঁপা—। নামটা মুখস্থ। রক্তে অহরহ তার সুর বাজে। ঠিকানাটা মুখস্থ করে রাখল। এরপর আর কি ডেবিট ক্রেডিটে বন্দি থাকা যায়! বিশ্ব এখন মনফকিরা।

॥ ৩॥

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে
ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ব পথে নামল। উদাসী হাওয়ার পথে পথে বিশ্ব রাখাল বনে যায়। পথ চললে অনেককিছু চোখ টানবে। এটাই পথিকের ধর্ম। পথ চলার মজা। পণ্য কাতরতা বিশ্বকে জর্জর করে না। কিন্তু চোখেও পড়বেই। উন্নয়ন মানেই বিপণন। পথ জুড়ে হাট ও বাজার। ক্রেতা না হক পর্যবেক্ষণে তৃপ্তি ও মজা পায়। ওর নজর কাড়ল একটা জুতোর দোকান। থরে থরে সাজানো বাহারি জুতো আলোয় ঝলমল করছে। প্ররোচনামূলক আহ্বান। বিশ্ব ভেতরে ঢোকে। শরীর জুড়োন এক ঝলক ঠান্ডায় স্বাগত হয়। ঝাঁ তকতকে পরিবেশে আরামদায়ক একটা চেয়ারে সে বসে। তার চাহিদা একটা চটি। থৈ থৈ করছে ভিড়। বসে বসে বিশ্ব দেখল দাঁড়িয়ে থাকা এক সেলসম্যান এক মহিলা খদ্দেরকে দেখভাল করতে ব্যস্ত। মহিলার পা জুতোর গহ্বরে টেনে নিচ্ছে সেলসম্যান। পা ভরতে অতখানি কাপড় তোলা কি খুবই জরুরি? আর সেলসম্যানটাও বলিহারি—জুতো পরাচ্ছে না পদসেবা করছে। মহিলাও কি বেহায়া কম। পদসেবা গ্রহণ এবং পদশোভা প্রদর্শনে কী ঝোঁক। মহিলা পর্ব সেরে সেলসম্যান তার কাছে এল। এটা ওটা সেটা নাড়াচাড়া করে একটা বাছাই হল। দাম শুনে আঁতকে ওঠার জোগাড়। —বলেন কী। লেদার তো এইটুকু। তার দাম চারশো—

—কম লেদার বলেই এমন গেট আপ। লেটেস্ট স্টাইল।

দরে বনল না। বের হয়ে এসে কিছুক্ষণ এলোমেলো হাঁটাহাঁটি। কিছু একটা মনে পড়তে ফের এক স্টেশনারি দোকানে হাজির। বিদেশি পারফিউম দেখলে কনকচাঁপার নিতম্বে হিল্লোল উঠত। মনে আছে ঢের। বিশ্ব একটা বিদেশি সেন্টের শিশি কিনল।

ঘড়ি দেখতেই বিশ্ব সময় শাসিত হয়। দ্রুত লয়ে পাড়ার কাছাকাছি হয়। ঠিক ঠিকানার দিশা মিলছে না। উলটে পাল্টা প্রশ্ন ধেয়ে আসে। নমোপাড়া? না দাদা শুনিনি। আগে বাড়ুন।

আগে বেড়ে ক্ষান্ত নয় বিশ্ব। আগে বেড়ে কিছু হঠে ডাইনে বাঁয়ে সে অনেক প্রদক্ষিণ। আশাঘাতক হতাশা তুঙ্গে। কনকচাঁপা তোমার দেখা নাই রে; অনুভবে ক্লান্ত। ফিরে যাব কি যাব না সিদ্ধান্তের সন্ধিক্ষণ...। একজন বললেন আঙুল দেখিয়ে ওই যে বসে আছে মাচায়। ওরা বলতে পারবে। ওরা ভোট করে।

বিশ্ব এগিয়ে যায় ভোটকুড়নিদের কাছে। জিজ্ঞেস করতেই হাবভাবে মনে হয় দলপতি,

মাচার ওপর বসে পা নাচাচ্ছিল; টুক করে নেমে পড়ল। গা ঝেড়ে বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে কড়া স্বরে বল্ল; আমার নাম ভোট বাবা পার করে—। চারটে ভোট এই মিয়া পার করে দিয়েছে পার্টিকে। এলাকা আমার তাঁবুতে। নমোপাড়া? এখন ভূত, চলে যান সোজা। একটা বটগাছ পাবেন। গুড়িতে ঠেস দেওয়া আছে দু-ফুট লম্বা জিদানের ফটো। গলায় টাটকা জবার মালা ঝুলছে। তাকে ডাইনে রেখে কয়েক পা বাড়ালে পাবেন ওই পাড়া। বলে, এ্যাই বাবলু যা তো স্যারকে পৌঁছে দে...।

পাড়ার কাছাকাছি সে এতক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছে, কেউ চিনল না পাড়া। আশ্চর্য বৈকি। হাবলু রহস্য উন্মোচন করে,—আসলে নমোপাড়া নামে একটা পাড়া ছিল। এখন নেই। আদিতে নমোশূদ্ররাই বাসিন্দা ছিল। বলবো কি স্যার যে রেটে উন্নয়ন হচ্ছে তার চক্করে গরিবরা খাবি খাচ্ছে। জমির দাম হু হু বাড়ছে। লোভ দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে বড়লোকরা গরিবদের পোঁদে লাগছে। একদিকে পুলিশ-মাস্তান-প্রশাসন মহাজোট, বিপক্ষ টিমে ঢাল নেই তলোয়ার নেই কিছু নিধিরাম সর্দার, পারে। ভিটে মাটি বিকিয়ে পালিয়েছে। কয়েকটা পরিবার টিকে আছে। বাবলু থামল। তার স্মৃতিকথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে পাড়ার ইতিবৃত্ত—বাবুসমাজ বসতি পোক্ত করেই কর্মসূচি নিল পাড়াটার নাম পাল্টাতে হবে। এ্যাসোসিয়েশন প্রথমে সাব্যস্ত করে নাম হক "নেতাজী মার্গ"। নেতাজীকে নিয়ে কোনো ডিসপুট নেই। সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা। সাইনবোর্ড হয় হয়। গেরো পড়ল। বাগড়া দিল অন্য পার্টি। এর মধ্যে তারা রাজনীতির গন্ধ পেল। হয়েছে কি কমিটির দু-এক মাথা সিংহপার্টি করে। অতএব হল্ট। পাল্টা প্রস্তাব দিল নাম হক "রবীন্দ্র নগর", মাকু পার্টি বনাম সিংহ পার্টি লেগে গেল। নেতাজী ভার্সেস রবীন্দ্রনাথ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। রফাসূত্র হিসেবে খাপ খুলল চিত্তরঞ্জন। নেতাজী এবং রবীন্দ্রনাথে কাটাকুটি। নেপো হয়ে চিত্তরঞ্জন মেরে দিল দই। "চিত্তরঞ্জন মার্গ" ধ্বনি ভোটে পাশ। খেলা ড্র। উভয় পক্ষই খুশি। ভাবল পাল্টা পার্টির জেদ ভোঁতা হয়েছে। এই যে এসে গেছি। ঢুকে পড়ুন।

চিহ্নিত পাড়ায় ঢুকে বিশ্ব হাঁটছে। স্বভাবে পর্যবেক্ষক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কোঠা বাড়ির সমাহার। উচ্ছেদের ভগ্নস্তূপে জাঁকজমকপূর্ণ নির্মাণ। হলে কী হয় অন্ত্যজ ছোঁয়াছুঁয়ি গা ঘেঁসে বস্তির সুলভ সংস্করণ। আদি বাসিন্দারা প্রবাসে। উৎখাত আছে মেধা পাটেকর নেই। তার মানে এই নয় ঝেঁটিয়ে দরিদ্র বিদায়...। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। সবংশ টিকে থাকার মূলে বাবুদের নিজস্ব প্রয়োজনও প্রচ্ছন্ন, ধোপা নাপিত ভাড়ি সবজিওয়ালা মুদি প্রভৃতি ছোটলোকদের অবস্থান অমোঘ। কাঁচা ড্রেন কাঁচা টয়লেট কাঁচা বাড়ি নিয়ে উপপাড়া গড়ে দিব্যি মাখামাখি। সুন্দর ও কুৎসিতের সহনশীল সহাবস্থান। বৈভবে এই চোখ টাটায় কটু দুর্গন্ধে এই নাক সিটকোয়। পাড়া সনাক্ত। বাড়ি চিহ্নিত, যা দেখে বিশ্বর প্রত্যয় হয় এর চেয়ে রামায়ণের নির্বাসন পর্বে সীতার অবস্থা ছিল অনেক উন্নত, সে সোয়ামির পিছু পিছু সেখানে ঠাঁই নিয়েছিল সেখানে অরণ্য পাহাড় এবং নদীর মনোজ্ঞ পটভূমি ছিল। ছিল পুনর্বাসনের সুন্দর ভূখণ্ড। আর এ কোথায় এসে বাসা বাঁধল কনকচাঁপা। কনকচাঁপার বাড়ি চিনে নিয়েই বুঝল ও এখন সেই গৃহস্থালীতে যাদের বড় কঠিন জীবন। বড় সহজ মরণ...

যেতে যেতে বিশ্ব শুনল কোনো ঘরে কোনো এক পিতা তার বেকার ছেলেকে শাসাচ্ছে : কদ্দিন সার গুষ্টিসুদ্ধু গাণ্ডে পিণ্ডে গেলামু—রোজগার করতে গাঁড় যে ছিঁড়ে যায়।

॥ ৪ ॥

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কে এসেছে জানা নেই। কেউ এসেছে টের পায়। এমন তো কতজন আসে। সকসময় পূর্ণ আরক্তা বিলাস। গলা অবধি ভেজা গামছা জড়ানো, জলজ আদি মুখ। কলঘর থেকে ত্রস্তে বের হয়ে আসে আটপৌরে কনকচাঁপা। হাজিরা দিতেই চোখ ছানাবড়া। একী ঘোর। একী বিস্ময়। অন্তর্গত উল্লাস চোখে মুখে ফাটছে। নারীসুলভ ব্রীড়া আসে, কঠিন অবদমন চলে। কোনোক্রমে মুগ্ধতা গোপনে ঠেলে দেয়। বিমূঢ়তা টেকসই হয়। চোখ কপালে ওঠে,—ও মা তুমি! সুয্যিমামা আজ কোন দিকে উঠল গো—। একটু বোসো। আমি যাব আর আসব।

খুবই তৎপরতায় স্বল্প সময়ে পরিপাটি—তারই মধ্যে আপ্যায়নের ব্যবস্থা, অর্থাৎ চা-বিস্কুটের কাপপ্লেট বয়ে টলমল পায়ে কনকচাঁপা ঘরে ঢুকল। দীন আয়োজন টেবিলে রেখে মুখ জাগাল।

প্রায় ভুলে মেরে দিচ্ছিল। মনে পড়তেই তাড়ায় পকেট থেকে বিশ্ব সেন্টের শিশিটা বার করে। প্রদান ভঙ্গিতে কনকচাঁপার হাতে বাড়িয়ে দেয়। পুরস্কার গ্রহণ ভঙ্গিতে কনকচাঁপা উপহারটা নেয়। নিয়েই কভারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। নাক টেনে গন্ধ শোঁকে। খুশির ঔজ্জ্বল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ। —এই ব্রান্ড যে আমার খুব প্রিয় মনে আছে তোমার—। জবাব চাওয়া বাহুল্য। কনকচাঁপা বিবরণ দিচ্ছে। —টাকা তুলতে গিয়ে একদিন তোমাকে দেখেছি। কাচের মস্ত ঘরে বসে আছ। তোমার ডাকাডাকিতে অনেকে ঢুকছে বার হচ্ছে। উঠছে বসছে। ঢুকব ঢুকব করে ঢুকিনি। সাহস হয়নি, কিছুক্ষণ একলা বসে থাক লক্ষ্মীটি। যা আছে তাই দিয়ে তোমার জন্য কিছু খাবার করে আনি। প্রস্থানে উদ্যোগী হতে প্যাকেট থেকে শিশিটা বের করে কের গন্ধ নিচ্ছে। নাকের পাটা ফুলছে। উদ্ভাসিত হচ্ছে মুখ।

সামান্য উপহার কাউকে যে এমন কৃতজ্ঞ করতে পারে জানা ছিল না। আজ জানল। ফাঁকা ঘর। যাওয়ার আগে কনকচাঁপা টি ভি চালিয়ে দিয়ে গেছে। বিশ্ব পর্দায় চোখ রাখে না। ফাঁকটা ভরাট করতে রত থাকে অবলোকনে। স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনে একটা নিজস্ব ঘর একটা কিচেন একটা বাথরুম জরুরি। দেখে মনে হচ্ছে তা ওর আছে। কিন্তু অধিক সংগ্রহ অধিক নিরাপত্তা যা টুইটুম্বুর মুখের দ্যোতক তা ওর অর্জন হয়নি। তাই কি যে বাহুল্য এবং আতিশয্যের টানে কনকচাঁপা ছিল পরিপূর্ণ—সে সবের বিরলে কেমন যেন ক্লান্ত। শ্রান্ত। সকল প্রার্থনার অন্ত্যেষ্টি হলে যেমন হয়।

বিভোরতা ছিন্ন হয় শব্দপটে। চটির ঘর্ষণ—শাড়ির খসখস-পায়ের ঠোকাঠুকি সর্বপরি

নারী শরীরের ঘ্রাণ; বিশ্ব সচকিত হয়। নজরে আসে মস্থার পদাতিক কনকচাঁপা। দু-হাতে আপ্যায়নের ঘটা। থালা-বাটি টেবিলে রাখতে স্পষ্ট হল আড়ম্বর।

বিশ্ব বলে,—এ্যাতো—। কিন্তু কিন্তু করে।

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি শাসানি। —কোনো কিন্তু নয়। ঘরে যা ছিল তা দিয়ে চটপট বানিয়েছি। খাও—। কোনো পাঁয়তারা না কষে বিশ্ব আস্তিন গুটোয়, বেগুনভাজা লুচিতে ভরে রোল করে মুখে পোরে চিবোতে চিবোতে শুধোয়, —তোমার স্বামীর কথা কিছু বল্লে না। কী নাম তাঁর, পেশা কী—।

—অত তাড়া কীসের। একে একে সবই জানবে, নাম শেখ আনোয়ার আলি। পেশায় কার্পেন্টার। বেশি রাত করে ফেরে না। এসে যাবে। আলাপ হবে।

বুকে চাবুক পড়ল। ঝোলমাখা মাংসের টুকরোয় আগ্রাসী আঙুল তড়িতাহত। জিভে ভর করল বলে; শেষে একজন নেড়ের সঙ্গে নাড়া বাঁধলে—। বল্ল না। গোপন করল, ধারণ করল সাংস্কৃতিক উপবীত। —ধর্ম খোয়ালে। সেটা এমন কিছু নয়। কিন্তু আচার আচরণ, খাদ্যাভাস, প্রথা, পুজো পাব্বন এসব নিয়ে বনিবনা হয়।

—কী যে বলো। ধর্ম আলাদা। তাতে কী। বাঙালি তো, আর ভাবাও এক, জলকে আমরা বলি জল। ওরা বলে পানি। আমাদের দুর্গোৎপুজো ওদের ঈদ। আমরা বলি হাত মুখ ধোও। ওরা বলে ওজু করো। আমরা মন্দিরে যাই। ওরা যায় মসজিদে। আমাদের ঈশ্বর ওদের আল্লা, তফাত বলতে এই। গড়গড় করে বলছিল। সহসা লক্ষ করে বিশ্বর আঙুলে স্পন্দন নেই। সঙ্গে সঙ্গে চেতনার ওপর দিয়ে বয়ে যায় সন্দেহ। সন্দেহভঞ্জনে কনকচাঁপা তৎপর হয়।—মাইরি বলছি খাসি। গোস্ত নয়, খাও।

ব্যাধের কটাক্ষ। বিশ্বর দ্বিধা অস্ত। কনকচাঁপা তখন অন্য তথ্য পেশ করছে। —সেদিন বাড়ি ফিরে কিছুটা চাপাচুপি করে ওকে বলি ম্যানেজারকে আমি চিনি। যাকে বলে আলগা বন্ধুত্ব তাও ছিল। ও গোড়ায় বিশ্বাস করেনি। রজ করেছে, শেষে বল্ল ভালই হয়েছে, আগের ম্যানেজার ছিল খচ্চর। খালি খাওয়ার তাল। লোনের দরখাস্তটা ফেলে রেখে দিল। বলে কী, তুমি বলে কয়ে লোনটা এবার গ্রান্ট করিয়ে দাও না গো—। ও খুব স্বপ্ন দেখে কবে নিজের একটা দোকান হবে। মালিক হবে।

অমাবস্যায় কনকচাঁপার মুখ পূর্ণ মাখামাখি। বিশ্ব দেখল আবছা এক রমণী মুখ লোভের মুখ হয়ে চকচক করছে। দৃষ্টির কাব্যিক ভাষা আস্তাচলে।

প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে কনকচাঁপা চুপ করে যায়। ঈষৎ হতাশ। যে ঘোর এলে যুক্তি নীতি বোধ উবে যায় সেই বিভ্রম চোখে মুখে ব্যাপ্ত নয়। বুঝল অধিক আস্কারা দিতে হবে উষ্ণতা উসকে দিতে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। দু-হাত আশ্লেষে মাথায় তোলে। প্রষ্টব্য হয় অঙ্কোরিত বলল। বিশ্বর কাঁধে বাঁ হাতের বেড় দেয়। ডান হাত লুচি ছিঁড়ে মাংস ঝোলে চুবিয়ে বিশ্বর মুখে ঠাসতে থাকে। মুখও মুখর হয়: —ঝাল ঝাল মশলাদার রগরগে মাংস তোমার খুব পছন্দ, তোমার পছন্দ মাথায় রেখে যত্ন করে রেঁধেছি। খেতেই হবে।

বিশ্বর দ্বিধা ছিন্ন হয় না। বিনিময় প্রথার চক্করে পড়ে যাচ্ছে না-তো। প্রণয় ভূখণ্ডে ফাউ

হচ্ছে। উৎকোচ নেব না—আদর্শের একমাত্র পুঁজি টিকে আছে। এই বোধে শাবল পড়ছে। নীতি না সংস্কার না ভীরুতা; কোন উৎসে নিহিত এই বোধ মার্কস ফ্রয়েড কেইনস কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণে তল পাওয়া যাচ্ছে না। তার একমাত্র সম্বল চুরি যায় যার; টের পেতে নিজেকে গুটিগুটি করার তাড়া আসে। প্রফেসনাল এথিক্স ঘাই মারে। দ্বন্দ্বে দীর্ণ হতে হতে আর্তস্বর ঝরায়। — ঘুষ দিচ্ছ!

কনকচাঁপার নিজেকে মনে হয় অপমানিত। কিছুতেই পোষ মানছে না। প্রভাবিত করে বশ মানাবে এমন যোগ্যতাই বা তার কী আছে। হাতের কাজ জানে না। স্বনিযুক্ত প্রকল্পে যুক্ত নয়। চাকরি করে না। সামাজিক পরিকাঠামোয় কোনো ভূমিকা নেই। নিজেকে কেমন মনে হয় ফেকলু। অদ্ভুত এক কষ্ট ছেয়ে যাচ্ছে চোখের তারায়। গুঞ্জলানো ঠোঁটে। বিষাদ ঝেড়ে প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়। ওর নবজাত উপলব্ধি হচ্ছে শুধু ঘরোয়া কাজে নয়, অর্থনৈতিক ভাবেও স্বামীকে সাহায্যে করতে হবে। নতুবা নিজস্ব সত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

ঈদৃশ বোধে কনকচাঁপা আড়ষ্টতা ঝরায়। নিজস্ব সম্বল নিয়ে প্রস্তুত হয়। সমতল-উঁচু-নীচু বস্তুর গঠন টানটান করে। কোনারক-রাধারাণী-সেবাদাসীর ককটেল আঙ্গিকে বিশ্বর নিকটতম হয়। স্তনবিভাজিকার প্রকাণ্ড পুরুষ মাথাটা নগ্ন করে বলে, —ছি ছি একী কথা। তোমার প্রাপ্য তোমায় মেটাচ্ছি। আমার পাওনা তুমি মেটাবে। কাটাকুটি খেলা।

বিশ্বর সায় আসে না। মনে হয় নয় নয় নয় এ মধুর খেলা। যদিও শরীর ব্যেপে মধুর কাঁপন জাগে। কাম দিয়ে কামানোর তাল। তাও মন্দ লাগছে না। ভগবতীর দেহাংশ উদরস্থ হয়েছে। পাকস্থলীতে জীর্ণ হচ্ছে না খাদ্যকণা। সংস্কারে ধাক্কা লাগছে। অভ্যাসে ধাক্কা লাগছে। থেকে থেকে বমি আসছে। অথচ আশ্চর্য যবনের ত্বক সেবা সঞ্চার করছে অনবদ্য অনুভূতির স্বাদ। জাতপাত ধর্মাধর্ম একস্বরে। উপোসী শরীরে সুখানুভূতির প্লাবন। কোষে কোষে বিবশতার ঢল। একী আকুলতা মোর। কনকচাঁপা লক্ষ করল বিশ্ব ভেঙেছে। পূর্ণ বশ্যতার অধীন। শেষ ঘা দিতে উদ্যোগী হয় কনকচাঁপা। উন্মূল হয়ে লুটোয় বিশ্বর বুকে। অনুনয় করে। —বেচারা নানানভাবে চেষ্টা করছে প্রতিষ্ঠিত হতে। দক্ষ কারিগর। কিন্তু দুর্ভাগ্য যেন পিছু লেগেছে। পেছন ছাড়ছে না। লোনটা পেলে দোকান দেবে। নোকরি পোষায় না ওর। প্রার্থনার আঙ্গিকে ছলছল করে নয়নতারা।

বিশ্ব বিভ্রমের দাস। প্রভু আমি নষ্ট হচ্ছি। আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমি মুক্তি পাচ্ছি। ভালবাসা যাতনাময়। ভালবাসা নিম্নগামী।

লাবণ্যময়ী করপুটে প্রশ্রিত বিশ্বর সুখ। আমোদের খাজনা শোধ দিতে বিশ্ব ঘোষণা করল,—কথা দিচ্ছি তোমার মিয়া লোন পাবে। আগের দরখাস্ত বাতিল। নতুন দরখাস্ত নিয়ে যেন দেখা করে।

তানিয়ার সঞ্চিত নীরবতা

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

এ্যাম্বুলেন্সটা যখন বাড়ির দরোজা পর্যন্ত না আসতে পেরে দু'বার হোঁচট খেয়ে দশগজ দূরে দাঁড়িয়ে গজগজ করছিল, বাধ্য হয়ে ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করে দিল। রোগ-পাতলা দু'জন স্ট্রেচার নিয়ে বাকি দশগজ হেঁটে দরোজা দিয়ে সটান তানিয়ার ঘরে। তানিয়া জ্বরে অচৈতন্য। বিকার বকছে। বিনায়ক ডাক্তারিশাস্ত্রে পারদর্শী নয়। ডাক্তারের পরামর্শেই হাসপাতাল। এলাকার কমিশনারের বদান্যতায় অনতিবিলম্বে এই এ্যাম্বুলেন্সও। এবং তড়িৎগতিতে স্ট্রেচার বহনকারী দুই শীর্ণকায়া তানিয়াকে নিয়ে আবার দশগজ হেঁটে সোজা এ্যাম্বুলেন্সে। বিনায়কও বাড়ির পোশাকেই হাতের কাছে পাওয়া কিছু টাকা বুকপকেটে গুঁজে পেছনে। কুন্তলাও ততোধিক ক্ষিপ্রতার পাশের বাড়ির গিন্নিকে সংসার দেখভাল করার দায়িত্ব সঁপে দিয়ে আবশ্যিক কিছু জিনিস ব্যাগে নিয়ে বিনায়কের পাশে। প্রতিবেশী রথীনবাবু এই নীরতার মধ্যেও নিজের যাওয়া আবশ্যিক বিবেচনা করে এ্যাম্বুলেন্সে। এ্যাম্বুলেন্স আবার স্টার্ট দিল। গন্তব্য হাসপাতাল।

তানিয়া এই প্রথম হাসপাতালে ভর্তি হল এবং এবারই পরীক্ষায় প্রথম হল। ঘটনা দুটির মধ্যে আপাত কোনো সংযোগ না থাকলেও কাকতালীয় বলেও উড়িয়ে দিতে পারেনি সমাজ-বিজ্ঞানীরা। দুটি বাক্যবন্ধেই 'প্রথম' শব্দটি আকৃষ্ট করেছিল গবেষকদের। একটি টেলিভিশন মিডিয়ার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে প্রকাশ :

১১ এপ্রিল' ০৫, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ। তানিয়া সুস্থ।

১১ এপ্রিল' ০৫ যথারীতি 'স্কুল ভ্যান'-এর জন্য রাস্তায় এসেছে ১০টা ০৫ মিনিটে। গাড়ি এসেছে ১০টা ০৯-এ। আরো ছাত্রী তুলতে তুলতে গাড়ি গিয়ে স্কুলে পৌঁছেছে ১০টা ৪৮ মিনিটে। প্রার্থনা শুরু ১০টা ৫৫। তানিয়া তখনও সুস্থ।

স্কুলে গিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে ক্লাসরুমে গিয়ে বসেছে ১১টা ১৫ নাগাদ। তানিয়া তখনও হেসে হেসে কথা বলেছে। ক্লাস টিচার এসেছেন ১১টা ৩৬ মিনিটে। তানিয়ার ঘড়িতে দেখেছে বলে জানিয়েছে পাশে বসা এক ছাত্রী। ক্লাস সেভেন থেকেই তানিয়া ঘড়ি পরে। তারপর মার্কসীট দেবার পালা।'

তানিয়ার বর্তমান ক্রমিক নং ১৩, বিভাগ ক, নবম শ্রেণী। গতবছর অষ্টম থেকে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার সময় সমস্ত ছাত্রীদের মধ্যে অবস্থান ত্রয়োদশতম, নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মার কাছে কটূক্তি শুনেছে অপয়া তেরো। বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও কুন্তলা কুসংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেনি বরং যত বেশি সংসারী হয়েছে, কুসংস্কার তাকে বেশি বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। বিনায়ক বিজ্ঞানের নয়। পিওর আর্টস। তবু বিজ্ঞানমনস্কতা তার মধ্যে অনেক বেশি। সমগ্র জীবনে কোনো কিছু ধারণ না করেও অর্থ-যশ-প্রতিপত্তি তিনটেই যা সামান্য ঘটেছে তার জীবনে, সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এসবই তার রাজনৈতিক জ্ঞানের ফসল। ধান্দাবাজী

নয়, রাজনীতি তাকে ভালো সঙ্গ দিয়েছে। মনের উদারতা, দৃষ্টির প্রসারতা বৃদ্ধি করেছে। যার নিরিখে আজ ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনায় দিকভ্রান্ত হতে হয় না। কুন্তলার এসবের বালাই নেই। অস্বচ্ছ দৃষ্টিকে সামগ্রিক বিচারে আনে হীনমন্যতা। প্রাপ্তিকে সে স্বাভাবিক ভাবে। অপ্রাপ্তি বেদনায় বিমর্ষ হয়ে যায়। তানিয়াকে ঘিরে সে স্বপ্ন দেখে। অপ্রাপ্তির স্বপ্ন। শিখরে পৌঁছনোর স্বপ্ন। অপয়া তেরো-তে তাই বিষণ্ণ বোধ করে।

ক্লাস টিচার মার্কসীট দেওয়া শুরু করে।

রোল নং-১, শ্রেয়া মিত্র।

একী। শ্রেয়া এবার প্রথম হতে পারেনি। কান্নায় ভেঙে পড়ে শ্রেয়া। মার্কসীট হাতে কোনোক্রমে নিজের আসনে ফিরে আসে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না চলতে থাকে তখনও।

রোল নং-২, বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়।

বৃষ্টি যখন এগিয়ে যাচ্ছিল, মনে মনে অনুমান করেছিল, হয়তো সে এবার প্রথম হবে। ক্লাস থ্রী-তে এসে এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। একবারও সে ফার্স্ট হতে পারেনি। সেকেন্ড হতে হতে সে তার ভাবনার অভ্যাসে সেকেন্ড হওয়াটা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবার যখন দেখল ফার্স্ট গার্ল শ্রেয়া ফুঁপিয়ে কাঁদছে তা মনের কোণে এক আনন্দের ঝিলিক বয়ে গেল। সহপাঠীর কান্না আর তাকে এতটুকু ব্যথিত না করে বরং উল্লাসিত করল, আসন্ন প্রথম হওয়ার আনন্দে সে একবার শ্রেয়ার দিকে তীর্যক চাহনি দিয়ে গটগট করে হেঁটে গেল বীরদর্পে। কিন্তু না। মার্কসীট হাতে পেয়ে সে দেখল, গতবারের আরও একধাপ পিছিয়ে সে থার্ড হয়েছে। মায়ের বীভৎস মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে, ভয়ে আঁতকে ওঠে। কিন্তু শ্রেয়ার সেকেন্ড হওয়ার তুলনায় তার থার্ড হওয়াটা যে এক ধাপ পেছনো নয়, ভেবে স্বস্তি পায় মনে মনে। শ্রেয়াকে অনুসরণ করেই তার চলা। বাবা মার কাছে তার মেধা নির্ণীত হয় শ্রেয়ার মাপকাঠিতে। প্রতিবারই রেজাল্টের পর বাবা-মা বিচার করতে বসেন কোন বিষয়ে শ্রেয়ার থেকে কত নম্বর এগিয়ে বা পিছিয়ে। গতবারের তুলনায় ব্যবধান কমেছে না বেড়েছে। অতএব শ্রেয়াই তার নির্ণক। একক সে কিছু নয়। শ্রেয়ার নিরিখে তার থার্ড হওয়াটা নিশ্চয় অধঃপতন বিবেচিত হবে না। না-অতি হর্ষ অতি বিপদ সমীকরণ মুখাবয়বে এনে ধীরে পায়ে নিজের আসনে ফিরে এল বৃষ্টি। এইভাবেই রোল নং-৩...৪...প্রত্যেকেই নিজেদের একধাপ পতন দেখে প্রাথমিকভাবে আশাহত হলেও পরক্ষণে শ্রেয়ার স্থানাঙ্কের নিরেখে নিজেদের স্থান মূল্যায়ণ করে সান্ত্বনা পেল মনে মনে।

একী। এবার তবে ফার্স্ট হল কে? সকলের মধ্যেই একই প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল। তবে নিশ্চয় 'এ' সেকশন থেকে কেউ হয়নি। প্রথম দশজনের পরের কেউ শ্রেয়াকে হারিয়ে, তাদের সকলকে হারিয়ে প্রথম হবে এ এক অবাস্তব কল্পনা। তবে কি 'সি' সেকশন থেকে কেউ হয়েছে? প্রতি বছরই দু'একজন নতুন ছাত্রী 'সি' সেকশনে ভর্তি হয়। তবে তাদের মধ্যে কেউ....? তবে তাই যদি হত, তবে ক্লাসে তাদের নাম আগে নিশ্চয় শুনতে পেত। দিদিমণিরাও নিশ্চয় শ্রেয়াকে বলতেন, খেয়াল রাখিস, সি সেকশনে ওমুক মেয়েটি কিন্তু পড়াশোনায় খুব ভালো। তেমন কথা তো শোনেনি আগে। প্রথম বারো জনের এরকম

গোলমেলে বিচ্ছিন্ন ভাবনার মাঝেই ডাক এক রোল নং ১৩, তানিয়া চক্রবর্তী।

তানিয়া উঠে দাঁড়াল। মার ভাষায় 'অপয়া তেরো' তানিয়া। সে এবার খুব খেটেছে। 'হাফ-ইয়ার্লি' পরীক্ষায় তার ফল যথারীতি ছিল। তারপরই ঘটনার সূত্রপাত। একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের 'এক্সক্লুসিভ' তদন্তে যা উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ ঃ

তানিয়ার পড়াশোনা নিয়ে বাবা মায়ের বিরোধের সূত্রপাত। বিনায়ক শত কাজের মানুষ। মনের প্রসারতাই তাকে শত কাজে বেঁধে ফেলেছে। পরিবারের প্রতি সে যে কম দায়িত্ব পালন করে এমন নয়, তবুও কোথাও যেন ঘাটতি দেখা দেয়, যা কুন্তলা অনুভব করে, হয়তো বিনায়ক করতে পারে না। বিনায়কের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কাজ কুন্তলাকে করতে হয় না। বিনায়ক সে দাবিও করে না কখনও। বিনায়ক সচেতন। তার এই সচেতনতাই তাকে সংসারের কাজে অবহেলা করতে দেয় না, আবার এই চেতনাই তাকে শত কাজে আকৃষ্ট করে। চেতনতার তো কোনো আলাদা মাত্রা নেই, আলাদা আশ্রয় নেই, যা দিয়ে সংসারের কর্তব্য পালনে চেতনাকে গণ্ডীবদ্ধ রেখে বহির্জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে। কুন্তলা পারে। কারণ তার বহির্জগৎ নেই। হয়তো ছিল, সংসারের চাপে হারিয়ে গেছে। অথবা বহির্জগৎ কোনোদিন গড়েই ওঠেনি। বিনায়কের সংস্পর্শে এসে বহির্জগৎ চিনেছে, কিন্তু বেরোতে পারেনি কর্তব্যের টানে। হয়তো এই যুক্তি বিনায়ক দিতে পারে না। তাই কুন্তলার যত ক্ষোভ, যত রাগ-অভিমান।

কুন্তলা-তানিয়া-বিনায়কের এই সংসার আবর্তে বিনায়ক পারে না কুন্তলাকে বহির্জগতে বিচরণের সুযোগ করে দিতে, অথবা বহির্জগতের দায়বদ্ধতাকে চেতনাহীন করে সংসার আবর্তে বিলীন করে দিতে নিজেকে।

বিরোধের সূত্রপাত এখানেই। তানিয়া অনুঘটক মাত্র। তানিয়ার পঠন-পাঠনের পূর্ণ দায়িত্ব কুন্তলার। কিন্তু সময়ের স্বল্পতাহেতু বিনায়কের সাহায্য প্রয়োজন, কুন্তলার দাবি। এ দাবি নস্যাৎ করার মতো যুক্তি বিনায়কের নেই। কারণ এই আর্বতে তানিয়ার অবস্থান তার ও কুন্তলার মাঝে। সংসারের কর্মতালিকায় পেশাগত কর্মসম্পদন নথিভুক্ত হয় না। পেশাগত কর্মসম্পাদন ব্যতিরেক যে কর্মতালিকা প্রস্তুত আছে, তাতে কুন্তলা ও বিনায়কের সমদায়িত্ব, এ কথা সচেতন বিনায়ক অস্বীকার করে না। কিন্তু বিনায়ক যা পারে না তা হল, কুন্তলার বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতার মানসিক অবসাদের কারণে, গৃহমুখী হয়ে অবসাদের অংশীদার হতে।

তানিয়া প্রথম হয়েছে লেখাপড়ার ইঁদুরদৌড়ে পেছন থেকে কালো ঘোড়ার মতো উঠে এসেছে সকলের অলক্ষে। আর তানিয়ার এই প্রথম হওয়ার নিহিতে কতগুলি আনুষঙ্গিক ঘটনা ঘটে গেছে নীরবে।

এক ঃ কুন্তলা বহির্জগৎ থেকে বিনায়ককে বিচ্ছিন্ন করতে পেরে সুখী হয়েছে।

দুই ঃ বিনায়ক পেশাগত কর্মকে কোনোরকমে টিকিয়ে রেখে অবশিষ্ট সময় ও শ্রম তানিয়াতে নিবদ্ধ করতে গিয়ে মস্তিকের স্বাভাবিক বিকাশ-সঞ্চালন নষ্ট করেছে। খিটখটে ও বদমেজাজী হয়ে উঠেছে ক্রমশ।

তিন : বিনায়কের বিমর্ষতা ও খিটখিটে মেজাজ কুন্তলাকেও রাগী ঝগরুটে করে তুলেছে।

চার : তানিয়াও, মা ও বাবা, দুজনের কাছে ক্রমান্বয়ে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাকে ঘিরেই যে বাবা-মার দ্বন্দ্ব, বুঝতে পেরে প্রথম হওয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে মনে মনে। এই লক্ষ্যে পৌছাতে গিয়ে অন্য সমস্ত অনুভূতিগুলি নিজে হাতে হত্যা করেছে। নীরবে ঘটে যাওয়া এই চারটি প্রধান কারণই তানিয়ার প্রথম হওয়ার পেছনে লুকিয়ে আছে, তা টেলিভিশনের 'এক্সক্লুসিভ' অনুসন্ধানকারী দল চিহ্নিত করেছে। আর এই প্রথম হওয়ার পেছনে বাবা-মার বিষাদময় দ্বন্দ্ব তানিয়ার মনে ঘটিয়ে দিয়েছে এক নিঃশব্দ বিপ্লব।

মার্কসীট নিয়ে তানিয়া বাড়ি ফেরে। বিনায়কের কাছে গিয়ে প্রথম দাঁড়ায়। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বিনায়ককে। তানিয়ার চোখের কোণে অশ্রুরেখা দেখতে পায় বিনায়ক, তানিয়া বলে—'তোমার অতোটা সময় কিনে আমি যে প্রথম হলাম, এর দাম আমি কীভাবে শুধবো জানি না।' চোখ ছলছল করে বিনায়কের। কথাটার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। মাথায় হাত রাখে তানিয়ার

—একী! গায়ে এতোটা জ্বর, এতক্ষণ বলিসনি কেন?

—প্রথম হওয়ার আনন্দে।

—তবু...

—তুমি জানো না, ফার্স্ট গার্লদের জ্বর হতে নেই।

—বেশি কথা বলিস না, যা গিয়ে শুয়ে পড়।

—শুয়ে পড়লে চলবে না বাবা, সামনে আবার পরীক্ষা। সেখানেও তো ফার্স্ট হতে হবে।

—থার্মোমিটারটা নিয়ে আসছি দাঁড়া। দেখি কতোটা জ্বর?

—ঠিকই বলেছো বাবা, থার্মোমিটারটা নিয়ে আসি। ওটা দেখিয়ে থার্মোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালী ভালোভাবে বুঝিয়ে দাও। পরীক্ষায় কাজে লাগবে।

—কী আবোল তাবোল বকতে শুরু করেছিস?

—আবোল তাবোল নয় বাবা। এটাই আসল কথা। বারোজনকে টপকে ফার্স্ট হতে হলে এইটুকু ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হবে।

বিনায়কের ভালো লাগে না কথাগুলো। বেশ অভিমানের সুর ধরা পড়ে। তানিয়া যখন ফিরেছে, কুন্তলা ছাদের ওপরে। বিনায়ককে অফিস যেতে দেয়নি তানিয়ার রেজাল্টের জন্য।

কুন্তলার এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিনায়ককে সংসারে আটকে রাখতে পারলেই যেন অপার আনন্দ পায়। কুন্তলার বিশ্বাস, বহির্জগতে শুধুই বাধাহীন উল্লাস, সে উল্লাসে নিজে সামিল হতে না পেরে মনের অবচেতনেই হয়তো ঈর্ষা জন্ম নেয়, আর সেই কারণেই হয়তো তার এই নিষ্ঠুর প্রয়াস। অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয় এরকম একটা সম্ভবনার আভাস দিয়ে।

কুন্তলা ছাদ থেকে নেমে আসে এলোচুলে, যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। মাতৃপ্রতিমা দর্শনেও

যে শিশুরা ভয় পায়, তা তানিয়ার মাতৃদর্শনে বোধ হল। তানিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

অজ্ঞান হওয়ার প্রস্তুতি যদিও ঘটছিল আগে থেকেই। বিনায়ক তানিয়ার কথোপকথনে তার ইঙ্গিত মিলেছে সামান্য। এই কথাগুলি বলার জন্য হয়তো প্রস্তুতি নিচ্ছিল কদিন। বলতে পারেনি। আজ সে প্রথম হয়েছে এবং প্রথমের ঊর্ধ্বে আর কোনো স্থান নেই বলে আজ তার এই বে-পরোয়া ভাব। আজ তার সমস্ত অভিমান মর্যাদা পাচ্ছে। এতদিন তার ফার্স্ট না হওয়ার পেছনে বাবাকে অনর্থক দায়ী করেছে মা। মা-বাবার দ্বন্দ্ব ও বিবাদের মাঝে তানিয়া প্রতিজ্ঞা করে এবার তাকে ফার্স্ট হতেই হবে।

টেলিভিশনের অন্তর্তদন্তের তৃতীয় কিস্তিতে একটি টেলিফোনে কথোপকথনও প্রকাশ করে তদন্তকারী দল।

তানিয়ার ফোন বাবার অফিসে।

—হ্যালো, একটু বিনায়ক চক্রবর্তীকে দিন না।......হ্যালো, বাবা আমি তান্নি বলছি, একটা কথা কদিন ধরেই তোমাকে বলবো বলে ভাবছি, কিন্তু বলা হচ্ছে না...।

—কী এমন কথা যে এক্ষুনি বলতে হবে? বাড়ি গিয়ে শুনবো।

—বাড়িতে এ কথা বলা সম্ভব নয়।

—কী এমন কথা যে বাড়িতে বলা সম্ভব নয়? ঠিক আছে বল।

—এবার থেকে তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসবে।

—সে তো আসি-ই।

—না পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, প্রতিদিন।

—ঠিক আছে, দেখবো এখন।

—দেখবো নয়। কথা দাও, প্রমিস।

—ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, কিন্তু কারণটা বলবি তো।

—বাড়ি এসে আমাকে পড়াতে হবে।

—কেন, মা-তো আছে।

—না, আমি আরো বেশি করে পড়তে চাই।

—কিন্তু দুজনে তো একসঙ্গে পড়ানো যাবে না।

—কেন, মা পড়াতে পড়াতে ক্লান্ত হলে তুমি শুরু করবে।

—আর আমি ক্লান্ত হলে?

—তুমি ক্লান্ত হলে আবার মা।

—তোর কি এভাবে একনাগাড়ে পড়তে ভালো লাগবে?

—সেটা আমার ব্যাপার।

—পাগলের মতো কথা বলিস না।

—পাগলামি নয় বাবা। একবার তুমি...একবার মা...। একবার আমাকে ফার্স্ট হতেই হবে।

—ফার্স্ট না হতে পারলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হবে শুনি?

—না, যে ভাবেই হোক আমাকে এবার ফার্স্ট হতে দাও বাবা। একবারের জন্য ফার্স্ট হতে দাও। আর কোনোদিন তোমার কাছে কিছু আবদার করবো না।

—কিন্তু তুই আর মা দুজনে মিলে আমার কাছ থেকে সমস্ত সময় কেড়ে নিলে আমি যাই কোথায় বল?

—আমি কথা দিচ্ছি বাবা, এবার যদি ফার্স্ট হতে পারি, সুদে আসলে সব ফেরত পাবে?

—কীভাবে?

—তা জানি না, তবে মিলিয়ে নিও ঠিক ফেরত দেবো। টেলিফোনের ওপার থেকে ফোঁপানো কান্নার শব্দ ভেসে আসে। টেলিফোন নামিয়ে রাখে বিনায়ক।

অন্তর্দন্তের চতুর্থ ও শেষ পর্বে দেখানো হয়, বিনায়ক শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় আগামী পরীক্ষা পর্যন্ত সে প্রতিদিন অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসবে।

নিয়মমাফিক বিনায়কের বাড়ি ফেরা শুরু। প্রতিদিন যে তানিয়াকে পড়ানোর সুযোগ পায়, তা নয়, তবে লক্ষ করা যায় গৃহমুখী বিনায়ককে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে কুন্তলা তানিয়াকে পড়িয়ে চলেছে, আর তিনগুণ উৎসাহে তানিয়া পড়ে চলেছে। বেচারা বিনায়ক অগত্যা ঘরকন্নার কাজে মন দেয়। পড়ানোর ফাঁকে মেয়ের জলখাবার, কুন্তলার চা এগিয়ে দেয় হাতের কাছে।

এই তো চেয়েছিল কুন্তলা। এইভাবেই কুন্তলা বিনায়ককে পাশে পেতে চেয়েছে। এতদিনে স্ত্রীর যোগ্য সম্মান পেল বিনায়কের কাছ থেকে। বি.এ পাশ করা কুন্তলা অনেক স্বপ্ন দেখতো বিবাহের পূর্বে। পিতৃগৃহে সম্ভব হয়নি। পতিগৃহেও শুধুমাত্র সন্তানের জননী হয়ে থাকতে থাকতে জীবন বৃথা মনে হয়েছে। কুন্তলার স্বপ্ন ছিল, পতিগৃহে গিয়ে স্বামীর উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে পিতৃগৃহের প্রাক্-বিবাহ পর্বের অভিলাষ আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করবে। স্নেহশীল পতিও নিজের সমস্ত অবদমিত করে স্ত্রীর অভিলাষকে মর্যাদা দিয়ে তার পতি কর্তব্য পালন করবে। কুন্তলার এই অভিলাষ পূরণ হয়নি। অসুখী কুন্তলাকে নিয়ে বিনায়কের ঘর-সংসার যে খুব সুখের এ কথা অন্তর্দন্তে একবারও প্রকাশ পায়নি। অথচ অবিরত চেষ্টা করে গেছে। চেষ্টা করতে করতে যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে বিনায়ক। মস্তিষ্কের স্বাধীন চিন্তাশক্তি লোপ পাচ্ছে। তবু সমাজ ও সভ্যতার কাছে 'ভালো' থাকার আপ্রাণ চেষ্টার ত্রুটি নেই বিনায়কের। বিপরীতে পতিগৃহে অভিলাষ পূরণে ব্যর্থ কুন্তলা বিনায়ককে আঁকড়ে ধরে ঘরবন্দি করতে চায় অসম ঈর্ষায়।

বিগত ক'এক মাস ব্যাপী সহজেই ধরা দিয়েছে বিনায়ক। কুন্তলাও যারপরনাই খুশি পতির গৃহে মতি হওয়ার। তৃপ্তি ধরা পড়েছে কুন্তলার চোখে মুখে, মনে ও শরীরের প্রতিটি অঙ্গে। বিনায়কও ক্রমশ রপ্ত হয়েছে কুন্তলা-তানিয়া-বিনায়ক-সংসারচক্রে চলাচল করতে।

তানিয়ার প্রথমত হওয়ার নেপথ্যে এ কাহিনী প্রথম উঠে আসে টেলিভিশনের অন্তর্দন্তে।

তানিয়া প্রথম হয়েছে।

তানিয়ার জ্বর হয়েছে।

তানিয়া জ্বরের প্রকোপে প্রলাপ বকছে।

মাতৃমূর্তি দেখে তানিয়া অজ্ঞান হয়েছে।

অতি সাধারণ চারটি ঘটনা কখনোই টেলিভিশনের অন্তর্তদন্তের বিষয় হয়ে উঠতো না, যদি না জ্বরে অচৈতন্য হয়ে প্রলাপ বকতে বকতে ক্রমশ মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তো। একজন মেধাবী ছাত্রী মানসিক ভারসাম্য হারানোর নিহিতে শুধুই 'হাই ফিবার' কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান। টেলিভিশন-ওয়ালাদের অন্তর্তদন্তে সে-কথার প্রমাণ হল কিনা সে-বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা হল না। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শুধুই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হল দর্শকদের দিকে—এতক্ষণ আপনারা যা দেখলেন সে বিষয়ে আপনাদের মতামত আমাদের জানান। মতামত পাঠানোর ঠিকানা..............ইত্যাদি। আপনাদের মতামত কম্পিটিশন পোস্টকার্ডে পাঠাবেন। প্রেরকের নাম ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখবেন। আমাদের বিচারে শ্রেষ্ঠ দু'জন পত্রলেখককে পুরস্কৃত করা হবে।

অনুষ্ঠানটি শেষ করা হল অদ্ভুতভাবে। তানিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কুন্তলা দৌড়ে জল নিয়ে এসে ঝাপটা মারে চোখে মুখে। জলের ঝাপটায় চোখ খুলে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তানিয়া। মাও চেয়ে থাকে উদাসীন শূন্যতায়। নেপথ্যে গান ভেসে আসে 'কেন চেয়ে আছো গো মা। মুখোপানে।'

শীত অথবা বৃষ্টি

সৌমনা দাশগুপ্ত

তোমার গলায় বেজে ওঠে দূর।
কাছ ও দূরের এই অগস্ত্যবলয় ভেঙে
হঠাৎ তির্যক বলে ওঠো

আমি তীর চাই
আমি তির খুঁজি
তরুণ খাম্বাজ স্বরে
হয়ে উঠি বিদ্ধকল্প।

আজ আমি ছিপছিপে
ভিজে আছি
কেমন কেমন যেন বৃষ্টিতে।
এখানে নামবেই শীত
তোমার বদ্ধ স্বরের ঋতু
ভেঙে পড়ে
আমার তরাই বনে

আজ গভীর বৃষ্টি এখানে

আমার বাতাসে শুধু ভিজে ঘোর
যেন বা শীতও

অস্থিশলাকার মধ্যে ঘন হচ্ছে
হাওয়া। সেই ভর ছুঁয়ে থাকে
স্নায়ুর অলীক

আজ বৃষ্টি অথবা শীত
কিছু একটা হয়ে ওঠো।

বাড়ি

অরবিন্দ দাশগুপ্ত

লোকটা আসছে কাছে এবং লোকটা যাচ্ছে
দূরে—হাতছানি দেয় চোখের ভেতর
অচিন সমুদ্দুরে

লোকটা কোথাও যাবে? কেন?
কোথায় রে ওর বাড়ি
সন্ধেবেলায় ডাক পাঠালো
সকালবেলার আড়ি

পথ খুঁজছে—খুঁজছে যে পথ
পথের চোরাটানে—হাত বাড়ালেই
বন্ধু ক'জন—পথই সেটা জানে

তাই খুঁজছে বাড়ি
একখানা ঘর, তুলসি, পিদিম
হলুদরঙা শাড়ি
দ্বিধায় কাঁপা বুকের পাঁজর, ঠোঁটের থরো থরো
আপন কাজের পাগলামি-তে
আপনি জড়োসড়ো

বসার ঘরে বিছিয়ে আসন, সরিয়ে
ধুলোবালি
সমর্পণের ডাক পাঠাবে, তার নামই তো বাড়ি

তাই নেমেছে পথে, পথের শেষে
ঝোপ জঙ্গল, মুক্তাঝুরি গাছে
জোনাক জ্বলে, মিঠে আলোর আকাশ জুড়ে
তারার নূপুর বাজে

কপাল ভেজা ঘাম—হাত বুলিয়ে বুঝালো
শেষে, যতই তাড়াতাড়ি—চালাও না পা
অনেক দূরে—অনেক দূরে বাড়ি

হাম্বা, আকাশ

নাসের হোসেন

বিশাল শূন্যতার দিকে মাথা তুলে কয়েকটা গরুর ডাক
শুনতে পাই, কয়েকটা প্রতিধ্বনিও ওঠে, আর চারপাশে
বিশাল বিশাল সব গাছ নানান রঙের ফুলে ভরে ওঠে
হাঁটছি, তুমি কথা বলছো, হাঁটছি, তুমি গান করছো
নদীতে কয়েকটা নৌকা ভাসতে ভাসতে নীলাভ কুয়াশার
ঢুকে যাচ্ছে, তুমি উপরের দিকে মুখ তুলে খুব গভীরভাবে
শ্বাস নিলে, তাইতো এটা তো আমি করিনি, ভেবে আমিও
উপরের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে শ্বাস নিলাম, তুমি মনে
করিয়ে দিলে তুমি যখন শ্বাস নিচ্ছিলে চোখ বন্ধ করে
ছিলে অথচ আমি তা করিনি আমি দেখছিলাম, কোনো
দেখা থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে পারি না জানো, খুব
কষ্ট হয়, আচ্ছা বলো তো সেইসব গরুগুলোকে দেখছি না কেন

ভালোবাসা অন্ধকারে

রেণুকা পাত্র

বাড়িটা পড়ে আছে
চারখানা ঘরের দেওয়াল শূন্য
ছবিগুলো বাতিল চটের থলিতে
জলবিহীন গোলাপের ডালপালা
আর কদিন পরই শুকিয়ে যাবে।

অগ্নিতেরা পিছনে ফেলে রেখে গেছে
ধান আর ফসলের ক্ষেত

এতদিন যার অন্নে লালিত হয়েছে
বারোজনের সংসার।

এখন বড়ই অকুলান চারপাশ
শুধু সরঞ্জাম সুবিন্যস্ত

পুরানো সঞ্চয় ঢালা
শৌখিন বাড়িটার ঝুলবারান্দায়
মাত্র একটি শিশু

কত বেশি ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য
কত বেশি ভাবা
তবু সে লালিত হয় অবহেলায়
মানসিক দৈন্যে,

ভালোবাসা অন্ধকারে
স্থাণু—ক্রীতদাস
দুর্নিবার ঘূর্ণিপাকে

মৃত্যু

মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়

শিকড়ের মৃত্যু মিশে গেছে মাটিতে মানুষে
উদাসীন করতালি থামে, জঙ্গলে, অস্বচ্ছ পোড়াডালে
ফুল নেই, দু'হাতে পরাগ ভরা মেনিকাতরতা
আঁধারের ব্যথা
দু'হাতে কাঁকন খুলে
আঁচল ভাসিয়ে মগ্ন আয়োজন; ব্যর্থ সব আজ,
আমি তাই পাথরের চেয়েও নির্মম
ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদে উৎসাহ আলো নামে, নখে ও গোপনে,
এতে শান্তি ধরা দেবে?
চাঁদ বুঝি সর্বনাশী অভিলাষ
দুরূহ মৃত্যুর ডানা জুড়ে।

সুইসাতে তিনদিন : ইঁদারার জল

মেঘ মুখোপাধ্যায়

কী ঠাণ্ডা তোমার ইঁদারার জল।

আষাঢ় এলেও বৃষ্টি নেই অসহ্য গরম
প্রাণ ওষ্ঠাগত, একে পুরুলিয়া তায় এ বছর
গ্রীষ্মের তাণ্ডব বেশরম
এরই মধ্যে সুইসা এলাম আমরা ক'জন।

কী ঠাণ্ডা তোমার ইঁদারার জল
গায়ে দিলে মীড়ের মতন, মিহি শান্ত নরম
কী লাবণ্য ধরা ছিল মাটির তলায়
পাথরের স্তরে স্তরে ভাঁজে ভাঁজে গলে
তোমরা উঠোন খুঁড়ে পাথর ফাটিয়ে
তুলেছিলে, ভরেছিলে স্নেহধারা এই ইঁদারায়
সে-ও প্রায় হতে চলল একশো বছর।

কী প্রশান্তিময় এই কুয়োতলা আর তার গভীর শরীর
থরে থরে নেমে গেছে দূর অন্ধকারে
দশদিক জোড়া ঝমঝম রোদের দাহনে হাহাকারে
যেন বাঘমুণ্ডির কোলে শালছায়া ঘেরা
সাঁওতালি গাঁয়ের দাওয়া।
আমি বারবার ফিরে আসি, চান করি, কী এক টানে
আঁজলা আঁজলা জল নিয়ে চোখে মুখে ছড়াই, ছুঁড়ি
আকণ্ঠ গিলে খাই, গায়ে মাখি, ঘষি, ঢালি, চটকাই
রোমে রোমে শুষে নিই পাতালের নিবিড় শীতল

এই ইঁদারার পাশ ছেড়ে আমি সরতে চাই না কিছুতেই
এখানে যদিন আছি আমার সম্বল

আবদুস সামাদ-এর দুটি কবিতা

বোনের জন্য এলিজি

চকমকির দিন থেকে আগুন পুড়িয়ে আসছে
ফাঁদের হরিণ।
পাপয়ের বিপরীত মানে
সে পুড়ে জেনেছে কোনো দিন?

অভাগিনী জানে। আর জানে তার ছাই
গায়ে যার নীল কেরোসিন

খুনী দেশলাই।

তবু

অক্ষর নিঃশব্দে চাপে নিরক্ষর ধাতব পাল্লায়।
মিথ্যে এই আয়ুক্ষয়, জেনেশুনে ওঠে সেঁকো বিষ।
জেনে গেছি শেষ দৃশ্য, লিপিবদ্ধ হাহাকারগুলি।
পাল্লা থেকে নেমে এলে কে তাকে কোথায় নিয়ে যায়।

দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে শব্দের পৃথিবী।
নাকে-কানে তুলো গুঁজে ফুটপাথের পায়ের ধুলোয়
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আমাদের কাব্যসমগ্রেরা।
অথচ কোথাও একটা খই নেই, খুচরো পয়সা নেই।

জাগরণে যায় তবু আমাদের নষ্ট বিভাবরী...

গেরুয়া সেলাম

বীথি চট্টোপাধ্যায়

নরেন্দ্র মোদি নিজে দেখা করলেন
আমার সঙ্গে কয়েক সপ্তা আগে,

আমেদাবাদের বিলাসবহুল ঘরে
ভাবলে আমার এখনও বিবশ লাগে।
সাম্প্রদায়িক ঐক্য টৈক্য নিয়ে
এটা কোনো ছিঁচকাঁদুনে গল্প না,
সত্যি আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল
গুজরাতে এক রাজকীয় সন্ধ্যা।
নরেন্দ্রবাবু ধীর স্বরে বললেন;
আপনারা যারা বাঙালি বুদ্ধিজীবী
তাঁরা তো সবাই কুমির হয়ে গিয়েছেন,
প্রত্যেকটাই বামফ্রন্টের শিবির।
আমি বললুম একদম ঠিক কথা
কুমির না হলে কে আর কল্কে পায়?
উনি বললেন, তা বলে সবাই এক
হয়ে গেলে পরে লেখা হেঁদো হয়ে যায়।
স্মিত হেসে উনি ফের যোগ করলেন
বাঙালি কবিরা ইনটেলেকচুয়ালি—
দিন দিন যেন দরিদ্র হয়ে যাচ্ছেন
রসকসহীন নীতি কথা লেখে খালি।
খুন করবো না, ধর্ষণ করবো না
একঘেয়ে কথা আপনারা আওড়ান,
কতটা মূর্খ হলে তবে এটা হয়?
স্কুলের বইতে আপনারা শোভা পান।
খুন ধর্ষণ করা কি খারাপ নাকি?
সে তো আপনারা পিঁপড়ে মশাও মারেন
তাহলে মানুষ মারলে দোষ হবে কেন?
এটুকু আমার গুছিয়ে বলতে পারেন?
আমি বললুম আজ আপনার কাছে
হারবো বলেই এতদূর থেকে এলাম,
আপনার মতো বিদগ্ধ প্রতিভাকে
ভালোবাসাসহ দিচ্ছি গেরুয়া সেলাম।
তারপর উনি খুশি হয়ে ঝুঁকে এসে
কয়েকটা কথা বললেন কানে কানে,
সেই কথাগুলো প্রকাশ্যে লেখা যায় না
বিস্ফোরণের মতন তাদের মানে।

হায়, শৈশব

শ্রাবণী ঘোষ

ঘাসের উপর দিয়ে, একটা শব্দ চলে যায়।
চেনা, চেনা লাগতেই ঘাড় তুলে তাকাই।
দু-একটা গাণ্ড ফড়ি-এর চোখ বেয়ে—
অন্ধকার নামে বনে...।

কালো কালো বাঁশপাতায়, জোনাকির ঝিকিমিকি চোখ
গুবরে পোকার গান, শেফালিকার কলতান,
ধুলোমাটির সোঁদাগন্ধ, সব পাখির মতো উড়ে যায়।

ঘাসের উপর দিয়ে, একটা শব্দ চলে যায়।
দু-একটা গাণ্ড ফড়িং-এর চোখ বেয়ে অন্ধকার
নামে বনে।
শব্দকে ছুঁতে গিয়ে যে হাত বাড়াই,
সময়ের আঘাতে সে ভেঙে চুরমার।
শুধু কিছু শৈশব, থমকে থাকে মনে!

দূষণ

ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো কাজটাই হয়ে ওঠে না শেষমেশ
শুধু ছোটাছুটি, আশ্বাস
কথার পিঠে কথা সাজানো
নষ্ট হয় সময়
নষ্ট হয় সে।

কেউ-ই একান্তভাবে কারোর জন্য
কিছু করে না—।
অথচ, আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায়
তরতর বয়ে চলা

পৃথিবী অনেক বদলেছে।

সবখানেই দূষণ বাড়ছে
কোথায় যাবে—?
কেউ-ই হাত বাড়িয়ে দেবে না বিপদে
ঠেলে দেবে খাদে

পাশবিক মানুষ হায়নার মতো
চেটেপুটে খায়।

রথের মেলায়

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

রথের মেলায় তোমার সঙ্গে যাওয়ার ছিল
ফেরিওয়ালার ডাকের সুরে মহানগর
উল্টোরথে দোলায় ঘুরে ক্লান্ত পেশী
রথের মেলায় বেরিয়ে পড়ো হাওয়া দিচ্ছে।

শান্ত বিকেল কি উদাসীন বৃষ্টি পড়ে
রোদের দোলায় দুপুরবেলায় হারিয়ে যাবো
কেন তোমার বুকের ভেতর এই অনুতাপ
কেন তোমার বুকের ভেতর পাথর নড়ে?

ফিরতে গেলে উলটোরথেই ফিরতে হবে
রথের মেলায় বেরিয়ে পড়ো হাওয়া দিচ্ছে
দস্যু রাতের চোখের নিচে ঘুমের কালি
পায়ের নিচে সব হারাবার চোরাবালি।

নৌকা

রিমি দে

নীল নৌকাগুলো নড়েচড়ে আমার ভিতর
রক্তে জেগে ওঠে জল ও জবা
জল কেটে চলি
সে চলায় অলিগলি নেই
শুধু ফেটে পড়ি জল ও জলের গভীরে
মেতে উঠি জলপথে
নৌকার মতো গান তুলি সুর ও বেসুরে

রক্তরঙে ভেসে যায় শ্রাবণের চেলি

ঈশ্বরের গল্প

ঋত্বিক ঠাকুর

ঈশ্বরের সঙ্গে দ্যাখা হচ্ছে না বেশ ক'দিন। কী হয়েছে জানি না।
অসুখ বিসুখ নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বরের অসুখ করে না। মনখারাপ
হয়ত। ঘুম থেকে ওঠে অনেক বেলায়। চুপ করে বসে থাকে পশ্চিমের
মাঠে হেলেপড়া গোলাপখাসের ছায়ায়। মাথার ওপরে বাসা থেকে
নরম হিসি করে বুলবুলির ছানা। ঈশ্বর কিচ্ছু মনে করে না।
মাথাটা একটু নেড়ে নিয়ে আলগা হাসে। অনেকটা দূরে
রোদ্দুরের খোলের মধ্যে সেই হাসি ঈশ্বরের ছেলেবেলা হয়ে যায়।
ঈশ্বর তখন বাঁশি। ফুঁয়ে ফুঁয়ে কুলতলির মেটে দুপুর নদী হয়ে
গড়িয়ে পড়ে নয়ানজুলির আলে, উড়তে ভুলে গিয়ে মৌমাছিরা
ঈশ্বরের ঠোঁটের ভেতরে নেশার আয়োজনে মাতে। সেই ঠোঁটে
দুলে ওঠে ঈশ্বরের পূর্বী গেরস্থালি। সূর্য ততক্ষণে ফিরে গেছে
একটা গোটা আকাশ ও গোধূলি প্রদীপ পাহারায় রেখে।
একপাশে ঈশ্বরী, অন্যপাশে ঝিঁঝির তানপুরা, ঈশ্বর
হাত পাতে মনখারাপের কাছে।

পরী

বিশ্বজিৎ রায়

ফস্ করে কোথাও আগুন জ্বলে উঠলে
আমার কাঠ-সর্বস্ব হৃদয়
জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে—
আমি পুড়তে থাকি, উড়তে থাকি
যেন আগুন পাখার পরী...

ঝিনুক খেলার দিন কবেই শেষ হয়ে গেছে,
ভাঙা আসবাবের মতো
পড়ে থাকে দিন,
পাহাড় থেকে ঝর্না নামতে দেখলেও
মনে হয় দৃষ্টিবিভ্রম...

আকুলতাগুলো পুড়ে গেছে
চুরচুর করে ভেঙে ফেলেছি সব
স্মৃতির আসবাব।
ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে কবে যেন
ঘুমিয়ে পড়েছে স্নায়ুমন্ত্রগুলো—
এখন তাই, এই ভালো,
পুড়তে পুড়তে পরী হয়ে থাকা...

ব্রিষকর্ম

তাপস রায়

শস্যের প্রতি ধাপে স্তবের শিহরণ
মাটি ছুঁয়ে যে সব ভেসে গেছে দূরে
তার শিশুমুখ ফিরে আসছে ছন্দে
বেহুলার পারে

তোমাকে প্রভাবিত করার জন্য নয়

তোমাকে আগলে রাখব বলে নয়
যদি সামান্য অক্ষর, ভাবি, অলৌকিক উৎসেচ

এই নিবিড় ধানের দেশে জলবায়ু
একটি ধানের সুষমা দিয়ে ডাকি—
বিপণন ঘাতকের হাত থেকে রক্ষা করো
প্রান্তিক মা-ভূমি

গ্রামীণ আকাশ ফাটিয়ে ঢুকে পড়ছে
চৌকো চৌকো শহর, শহরে অজানা জ্বর

শূন্য থেকে পেতে হবে

অমিতাভ চক্রবর্তী

আজ আর রাম নেই নেই অযোধ্যাও
নেই কোনও রামায়ণী প্রেক্ষাপট,
অথচ রাম-অযোধ্যা মিথে লেখা রামায়ণ
নিয়ে কত গল্প কথকতা, গাঁথামালা
ইতিহাসে পাতায় পাতায় স্মৃতির ঝাঁপিতে
ওতপ্রোত হয়ে আছে পরতে পরতে।

যত বনেদ বুনট পল্লবিত কাণ্ডের শেকড়
তা কি কালচক্রে ক্রমে ক্রমে অবস্রিয়মান?
এখন আছে কি কোনও চাল আর চুলো?
যাকে নিয়ে সাধে চাঁদে পাড়ি দেওয়া যায়
বা ধাঁধা থেকে খুঁজে নেওয়া যায়
প্রাণভোমরাকে—যাতে হতে পারে মূর্ত কোনও স্পর্ধিত অস্তিত্ব।

একদিন মানুষবিহীন এই ফাঁকা গ্রহে
যেখানে প্রকৃতি ছিল শুধুই সম্বল
তখনও তো দিন হত রাত অবসানে
অথবা বর্ষার ঝরা গ্রীষ্মের প্রস্থানে

আলো আঁধারির চিরকেলে খেলা নিয়ে
কার অপেক্ষায় থাকা আসর সাজিয়ে?

শেষমেশ নানা বিবর্তন থেকে ঘটে উত্তরণ
রীল থেকে রীলে সময়ের অগুন্তি ফুটেজে
আবছা থেকে স্পষ্টতর হিসেবি মস্তাজে
প্রস্ফুটিত হয় দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে
সব সৃষ্টির সেরা আদিগন্তে অতুলন
সেই ইউরেকা—মান আর হুঁশে ভরা বিস্ময় মানুষ।

এক থেকে সামাজিক হয়ে দুরন্ত মানুষ
মস্তিষ্ক প্রয়োগে চিদানন্দ ভেঙে গড়ে সভ্যতাকে
কালচক্র আবর্তনে ইতিহাস ক্রমে ঋদ্ধ হয়
সেই থেকে এগনো সমানে—বিজ্ঞান গতিতে
যে গতি উদ্দাম কোনও থামা জানে না
কারণ শূন্য থেকে পেতে হবে সম্পূর্ণকে।

রাত নারী ট্রেন

কালিদাস সমাজদার

আমি গভীর যে রাত তাকে ভালবাসি
আমি ভালবাসি রাত-অবশেষ নারী
আমি ভালবাসি রাতের ট্রেন যেন ছুটন্ত কাম
কখনও বা উন্মুক্ত কখনও বা সুড়ঙ্গ বাতায়ন
কামার্ত হতে হতে আমি মৃত্যুর কাছে নতজানু হই
এখন মরণাপন্ন দিনভর মুহূর্তসকল

তবুও আশ্চর্য যেসব পেশীবহুল হাত ধরে আছে রাত
অথবা আমার ঝিঁ ঝিঁ ধরা স্নায়ু
সেখানেই রাত নামে ট্রেনে দেহে নারীর ম্যাজিকে
যা কিছু বাহারি পেইন্টিং ঢুকে যায় ট্রেনের গভীরে
অবিরাম ছুটে চলে রাত ছুটে চলে

নারী থেকে ট্রেন থেকে রাত থেকে রাতে

আর সেই গভীর যে রাত তাকে ভালবাসি
রাত-অবশেষ হবে যে নারী তাকে ভালবাসি
ভালবাসি রাতের ছুটন্ত ট্রেন

স্নিগ্ধতা

রজতশুভ্র মজুমদার

সেদিন চলে আসবার সময় আমার চোখে
শূন্যতা পড়েছিলে তুমি, তোমাকে না-ছুঁতে পারার—
কিন্তু ছুঁতে তো চাইনি তোমায়
ঘরময় সারাদিন লুকোচুরি খেলা—
রূপকথা অগণন নক্ষত্র হয়ে ফোটে
অমন প্রতিবিধানহীন দৃষ্টি তোমার
চিবুকের কুয়াশা সরিয়ে
বুকের পাথর ভেঙে আরাধ্য উপত্যকার নামার অমন উদাত্ত হাতছানি
আমি তো চাইনি—
তবু কেন সারারাত ঠোঁট খাওয়াখাওয়ি
তবু কেন নাভিপদ্মে সমস্ত ঘটের জল,
সমস্ত পূর্ণতা, ঢেলে দিই উজাড় করে
শূন্যতা পড়ে থাকে দু'চোখে আমার...

ও আমার রাই, আমার পাতকিনী,
তোমার শতচ্ছিন্ন জঠরে আমি স্নিগ্ধতা লিখে রাখি...।

ঈশ্বরতর

সুনন্দ অধিকারী

ঘোড়া অশ্বমেধ, রুখে দিয়েছিল পুত্ররা।
নিতান্তই অর্বাচীন দুই বালক; ইতিপূর্বে
কোনো যুদ্ধেই অংশ নেয়নি তারা।

ওদিকে ইন্দ্রজিৎ থেকে কুম্ভকর্ণ
অসংখ্য রাক্ষসবীর শেষে লঙ্কাধিপতি দশানন
বিজয়ী সেই লক্ষ্মণও
ত্রিভুবনজয়ী স্বয়ং ঈশ্বর; শ্রীরামচন্দ্র।

অথচ একে একে পরাজিত তারাও
সামান্য দুই বালক, লব ও কুশের নিকটে।

কেননা—মৃতসঞ্জীবনী সুধা
মানে ঘোড়ার শেষ চালটা
হাতছাড়া করেননি, স্বয়ং রচয়িতা।

পথের শিশু

অগ্নি ভৌমিক

পথের-ধারের শিশু
তীব্র চোখে বুঝে নেয়—
আমার বুকের ভিতর
কোনো জায়গা আছে কিনা তার।
পথের-ধারের শিশু
লাথি ছোঁড়ে অনায়াসে
দু-পাশের ছুটে চলা গাড়ির সারিকে
যারা তাকে শুধুমাত্র রক্ত-মাংসপিণ্ড
করে দিতে পারে এক নিমেষে।
পথের-ধারের শিশু

কালো-চিতার-মতো-রাত্রি পেরিয়ে
দু-হাত তুলে দেয় উপরে
রক্তিম আকাশ ছোঁবে বলে।

অধিকার

অলোক সেন

আমাকে অসহায় দেখে ছুঁড়েছে বলদর্পে
আমারই জমি থেকে তুলে নিয়ে অসহিষ্ণু ঢিল।
সেই কবে জেনে গেছি, অশক্ত, ক্ষমতাহীন
অসম্ভব, প্রত্যক্ষে তুলে ধরা বিরোধী পাঁচিল।
ন্যূনতম প্রয়োজনে যদিও হীন যাপন
তবুও সেখেছি জীবনে জেগে থাকবার দারুণ তিতিক্ষা
বোধহয় বেঁচে থাকা ঠিক নয় অনুকম্পা ছাড়া
অধিকারহীন উচ্চারণে তবুও সামান্য ভিক্ষা...
কেউ কি দিয়েছে জল! দুর্বলের প্রার্থনায়
একমুঠো ভাত রোজকার
শ্রম বেদনায় কুঁচকানো মানুষ আজও
ধুলোতে মাটিতে একাকার।

ঈশ্বরী মায়ের থান

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

মধ্যরাত ঘন হচ্ছে। গোটা গ্রামটা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে এখন। ঠিক এই সময় আকাশের আশ্চর্য নক্ষত্রমালারা এক অদ্ভুত নীলচে আলোয় ভরিয়ে দেয় পথঘাট খেতমাঠ প্রান্তর। মানুষ যখন ঘুমোয় প্রকৃতি তখন তার সুষমা বিস্তার করে। মানুষের নিদ্রাকালে প্রকৃতির জেগে ওঠা। কাছে-পিঠে কোথাও রাতচরা পাখিরা ডাকছে। নদীর পাড়ে নৌকা বাঁধার আওয়াজ। শেষ নৌকাটি ঘাটে বেঁধে উঠে আসবে কেউ। আজ শ্মশান সুনসান। নদীপাড়ে জারুল গাছ তলায় নিধু ডোমের আড্ডাঘরও আজ শূন্য। মাঝে মাঝে জোনাকি পোকার জ্বলা-নেভার মতো নিধুর বিড়ির টানে জ্বলে ওঠা আলোক-বিন্দু জানান দিচ্ছে সে আছে। পাহারা দিচ্ছে তার সাম্রাজ্য।

মন্দিরের চাতালে বালিকার মতো পা ছড়িয়ে এইসময় কুলুঙ্গিতে তুলে রাখা নিজের নামটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল ঈশ্বরী। নিজের নাম নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করে ততই তার বালিকাবেলা শৈশবকাল কচি দুব্বোর মতো লাবণ্যে ভরে ওঠা বয়ঃসন্ধি নানারকম সুগন্ধ নিয়ে পরতে পরতে খুলে যায় তার কাছে। ওই নাম যেন এক জাদুকাঠি। শুধু ছুঁয়ে দিলেই হল।

আলের ওপর দিয়ে কখনও জমির নাবাল দিয়ে ছুটছে মেয়ে। বুকে শক্ত করে চেপে ধরা বই খাতা। হালদার জ্যেঠির কাজ সারতে আজ বড্ড দেরি হয়েছে গো। জ্যেঠির যে কী ব্যারাম। জ্ঞান ইস্তক দেখছে শুয়ে থাকে মানুষটা। শরীর থেকে সব লাবণ্য সব বিভা কোন দৈত্যে যে নিংড়ে নিল মানুষটার। অথচ বাপ বলে যৌবনকালে কী রূপ ছিল গিন্নিমার। এই কোমর ছাড়ানো কোঁকড়ানো চুল, সিঁথি ভরতি চওড়া সিঁদুর, কপালে তামার আধুলির মতো বড়ো লাল ফোঁটা। আর পানের রসে রাঙা ঠোঁট। কী কাল রোগ যে বসল শরীরে। এখন হাড় ক'খানা সম্বল। অথচ দেখো গে সেই মানুষটাকে। যে দিনরাত খালি বই মুখে করে থাকে, গেলবার গাজনের মেলায় কোন দেশ থেকে এসেছিল এক সন্নিসি মানুষ, মুখে হালকা দাড়ি ফর্সা ছিপছিপে বড় বড় টানা চোখ অবিকল যেন সেই মানুষ জ্যোতিদাদা। ওর চোখ দুটোতে যেন গাঁয়ের ডুবডুবি নদী বাঁধা পড়ে আছে। তাই অমন ঢেউ খেলানো চাউনি। কাছে গেলে বুক শিরশির করে। আর শরীর থেকে উঠে আসে কী এক বাস— আকাশ ভাঙা বৃষ্টিতে খরার মাঠ যখন ভেজে তখন মাটি থেকে যে গন্ধ উঠে আসে একেবারে সেই সুগন্ধ আর ওইরকমই নরম তাপ। দূরে থেকেও ঠিকই টের পায় পরমেশ্বরী। জ্যেঠিমার সব লাবণ্য সব রূপ সব সুষমা নিয়ে বড়ো হচ্ছে জ্যোতিদাদা—জ্যেঠিমার সাত রাজার ধন এক মাণিক। গেলবার জলপানি পেয়ে পাস দিয়ে এখন শহরের কলেজে পড়তে গেছে। ছুটিছাটায় আসে আর তখন চুপটি করে বসে থাকে জ্যেঠিমার কোল ঘেঁসে। জ্যেঠিমা গায়ে

হাত বুলিয়ে দেয় আর খুব নিচু গলায় কথা বলে। জ্যোতিদাদা জ্যেঠিমার চুলে বিলি কেটে দেয়।

পরমেশ্বরী দেখে আর কাজ সারে। কোনো স্বর্গীয় দৃশ্যের মতো পবিত্র মনে হয় মা-ছেলের ঘনিষ্ঠতার এই ছবি। আসলে জ্যোতিদাদার পাশে জ্যেঠিমাকে দেখলে স্বস্তি লাগে শরীরে। মন বশে থাকে। তা না হলে শুধু জ্যোতিদাদার মুখোমুখি পড়ে গেলে শরীর জুড়ে কী যে ভয়ংকর তোলপাড়। তখন যে কেউ দেখলে বুঝতে পারবে তার শরীরের ভেতরে ভেতরে কোষে কোষে কী কঠিন প্রলয়ংকর ঝড় অপেক্ষা করে থাকে। রক্তকণায় শোঁ শোঁ গর্জন। সব যেন মুখে এসে জমা হয়।

জ্যেঠি আজ জ্যোতিদাদাকে বলছিল তার কথা। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে পরমেশ্বরী। মা মরে ইস্তক সংসারটা ঘাড়ে পড়েছে। সংসার সামলে উচ্চণ্ড রাগী বাপ সামলে ইশকুল যাওয়া। তার ওপর এখানি আবার আমাদের সংসারের কাজ। পারে নাকি অতটুকু মেয়ে? কত আর বয়স? বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়বে বুঝি। এই তো সেদিন জন্মাতে দেখলুম। তারপরেই ডাক—ওমা খেয়েছিস? সুরোদিদিকে বল তোর ভাত বেড়ে দিতে।

লজ্জায় কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যায় পরমেশ্বরী। পায়ে পায়ে জ্যেঠিমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। বলা হয় না এই মানুষটা এ বাড়ি থাকলে ভাতের গরাস গলায় আটকে যায় তার। তাই খাওয়া হয় না কিছু। জ্যোতিদাদা তাকায়—ঠোঁটের কোণে হাসি বুলিয়ে জিগ্যেস করে কোন ক্লাসে পড়ো যেন? লহমায় পৃথিবীটার রং বদলে যায়। পরমেশ্বরী উত্তর দেবে কি, সে তো তখন ফসল ভরা মাঠ পার হচ্ছে মনে মনে। যেমন বিষ্ণুপুরের সাপের মেলায় বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে যাওয়ার সময় পায়ে মল পরে নেয় চুলে রঙিন ফিতে মুখে স্নো-পাউডার কপালে বিন্দি। হলুদ শস্যক্ষেত্রের পাশে পাশে পথ করে করে চলে তারা। কখনও মাথার ওপরকার আকাশ জুড়ে ঘন চাপ বাঁধা মেঘ। শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া। আর দেখতে না দেখতে চরাচর জুড়ে ঝমঝম বৃষ্টি। তালগাছের মাথা হাওয়ায় ওলোট-পালোট। শরীর জুড়ে বৃষ্টির আবেশ। বৃষ্টি যেন এক জাদুকর। এক নিমেষে শরীরের সব উত্তাপ শুষে নিয়ে শীতল করে দেয় শরীর। জ্যোতিদাদা কথা বললে কেন যে সেই অঝোর ধারাবর্ষণ গায়ে মেখে হলুদ শস্যক্ষেত্র পার হয়ে হয়ে মেলায় যাওয়ার ছবিটা মনে উঠে আসে কে বলবে। ওকে চুপ দেখে জ্যেঠি বলে দেয়—এই তো ক্লাস ফোরে পড়ে। ফাইভে উঠবি নারে? লজ্জা কী। জ্যোতিদাদা তো নিজের দাদার মতোন।

ইশকুলে পৌঁছতে দেরি হল। প্রার্থনা শুরু হয়ে গেছে। উঠোনে প্রথমে দিদিমণিরা তারপর তাদের মুখোমুখি বুকে হাত জোড় করে ছেলেমেয়েরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইছে। এই গানটা বড়ো ভালো লাগে পরমেশ্বরীর। যখন বাড়িতে থাকে ছুটে ছুটে সংসারের নানা কাজ সারে তখন মন ভালো থাকলে এক একদিন দু'কলি গেয়ে ওঠে—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...আজ এখন প্রার্থনার সারি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে সে-ও চোখ বুজে সবার সঙ্গে গলা মেলাল—পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখি...কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি গুঞ্জরিয়া ওঠে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে... এই গানের আড়ালে থাকে উড়ন্ত পাখিরা আকাশ ভরতি

তারা, হলুদে হলুদে ছয়লাপ শস্যক্ষেত্র, গাছপালায় সবুজ এক মধুর পৃথিবী...এই গানের আড়ালে থাকে জ্যোতিদাদার মতো নবীন সন্ন্যাসী...

কথায় কথায় লোকের মুখে মুখে জায়গাটার নাম হয়েছে ঈশ্বরীমায়ের থান। থানের উপযুক্ত জায়গা বটে। পাশেই শ্মশান। শ্মশানের গায়ে গাঁয়ের নদী। ডুবডুবি নদী। আগে এখানে শুধু লক্ষ কোটি শিকড় গজিয়ে যাওয়া এই অশ্বত্থ গাছটাই ছিল। তার গায়ে সিঁদুর জমে জমে চাপড়া। চারপাশে বাঁধানো বেদী। আর অশ্বত্থের ঝুরিতে ঢিল বেঁধে মানত করা। মাঝে মাঝে শিরনি পুজো পাঠ। ক্রমে ক্রমে অশ্বত্থের গায়ে পাকা মন্দির স্থাপন করা হল। গাঁয়ের মাতব্বর সম্পন্ন গেরস্থ হালদার মশাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মন্দির নির্মাণ করলেন। সবই মায়ের ইচ্ছা। পরমেশ্বরী ঈশ্বরী হল। ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরী মা। সবই মায়ের ইচ্ছা। অবশ্য সে তো অন্য উপাখ্যান।

বিড়ির আলো নিভে গেছে অনেকক্ষণ। কী একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এদিকে আসছে নিধু। সন্ধের পর থেকেই পেটে সুধা সৌরাষ্ট্র শুরু করলে সুরে পায় তাকে। কোনো সুরই তখন ঘাটে ঘাটে বসে না। কেমন যেন গড়িয়ে পড়ে যায়। ফলে সুর আর কথা মিলেমিশে জট পাকিয়ে একাকার অবস্থা। একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা সুরে গায় নিধু। সে বুঝি গাইছে—নদী ভরা ঢেউ বোঝে না তো কেউ, কেন মায়ার তরী বাও বাও রে... অন্ধকারে ঠাহর হচ্ছে না কিছু তাই গান থামিয়ে ডাকে—ভৈরবী কই গেলি? আমার ভৈরবী। বড়ো বেশি নিঃশব্দ আজ মন্দির প্রাঙ্গণ। বড়ো বেশি নির্জন। এত নৈঃশব্দ্যে ভয় পায় নিধু। তার হাত দিয়ে পরপারে যাওয়া মৃতদেহরা যেন তাকে ঘিরে ফেলে এ সময়। এ সময় দূর দূরান্ত থেকে ভেসে আসে বলহরি হরিবোল বলহরি হরিবোল...

অথচ দিনের বেলা এই নিধুই এই থানের রাজা। সমগ্র সাম্রাজ্য তার। রক্তাম্বর পরে কপালে লাল তিলক কেটে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে তার ঝাঁকড়া চুলগুলিকে দুলিয়ে ঈশ্বরীমায়ের থানে আসা ভক্তদের লাইন ঠিক করে দেওয়া, জায়গাটাকে ধুয়ে মুছে তকতকে করে তোলা, পহরে পহরে ঘণ্টা বাজানো...মায়ের ভর ওঠার সময়ে ভাবের বশে থানে গড়াগড়ি খাওয়া, ভর ছেড়ে যাওয়ার পর অজ্ঞান ঈশ্বরীকে সেবার যত্নে সুস্থ করে তোলা...তখন সে এক অন্য মানুষ। অথচ যেই সন্ধে পার হয়ে রাত নামে জারুলতলায় তার আড্ডাঘরের লোকজন একজন দুজন করে উঠে যায় তখন একা হয়ে যাওয়া নিধুর কী ভয়। সমবেত হরিধ্বনি আর শীতল হয়ে যাওয়া সারি সারি মৃতদেহের মাঝে সে একখানি জ্যান্ত শরীর চায়। শরীরের উত্তাপ চায়। নিবিড় আশ্রয় চায়। এই অন্ধকারে টলোমলো পায়ে মন্দিরের চাতালে উঠে এসেছে নিধু। আভাসে ঈশ্বরীর অস্তিত্ব টের পেয়েছে। এই নিগূঢ় অন্ধকারেও সে টের পায় ঈশ্বরীর অজগরের মতো তীক্ষ্ণ হিংস্র চোখ। তার ঘৃণাভরা চাউনি, প্রতিহিংসাপরায়ণ নিশ্বাস। ঈশ্বরীকে না ছুঁয়েও টের পায় নিধু। আর এই এখন তার সম্বল। এটুকুকেই আঁকড়ে ধরতে চায় নিধু। এই ঘৃণা এই হিংস্রতার ভেতরই নিধু জীবন খুঁজে পায়। জীবনের হাহাকার কান্না। জীবনের চাওয়া পাওয়া। জীবনের উত্তাপ। আকাশ নক্ষত্র সবুজ ঘাস ফলন্ত শস্য।

নিধু এইসময় ঝাপটে ধরে ঈশ্বরীকে। চেটেপুটে সমস্ত উত্তাপটুকু খেয়ে বাঁচে সে। প্রতিরোধহীন নারী হাত পা মেলে শুয়ে থাকে নদীর মতো। অতঃপর নিরাবরণ নিধু ঈশ্বরীর বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। এই খানিক আগে নিজেকে নিঃস্ব করেছে সে। এই মুহূর্ত থেকে পুনরায় পূর্ণ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া চলবে তার। শরীরের অভ্যন্তরেই আছে কি এক জ্বালামুখ—ক্রমাগত পূর্ণ থেকে নিঃস্ব করে, নিঃস্ব থেকে পূর্ণ। এও যেন এক সাধনা। বেঁচে থাকার সাধনা। বীজ বপন এবং চাষাবাদ। ঠিক এই মুহূর্তে ঈশ্বরী নরম থাকে খানিক। ঠেলে সরায় না নিধুকে। তার ঘৃণার উত্তাপও টের পায় না নিধু। এই কোমলতা মিলন-জনিত শৈথিল্য না পৌনপুনিকতার অবসাদ বোঝে না সে। নিধু বোঝে সে কখনও ঈশ্বরীর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেনি। তাই এই সময়ে ঈশ্বরীর বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার কালে তার মনে হয় সে যেন এক আশ্চর্য পৃথিবীতে প্রবেশ করছে। এইভাবেই ঈশ্বরীর বুকে লগ্ন থাকতে থাকতেই সে হয়তো একদিন তার হৃদয়ের প্রবেশপথ খুঁজে পাবে।

নিধু ডাকে স্খলিত গলায়—ভৈরবী। ঈশ্বরী সাড়া দেয় না। নিধু ফের ডাকে—আমার ভৈরবী। ঈশ্বরী জবাব দেয়—আবার কী! যেন এই পর্যন্তই আসার কথা ছিল নিধুর। তোমার শরীর উত্তাপ চায়—নারী শরীর চায়। আমিও সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা নারী। মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত না হলে শস্যশ্যামল ভূমি অনাবাদী রূপ মাঠ হয়ে যায়। তাই এই সমঝোতা। তারপর তো আর কিছু থাকার কথা নয় থাকে না।

নিধু ঈশ্বরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—হেথায় আমরা থাকব না, চল অন্য কোথা যাই। যাবি?

ইদানীং এই কথাটা প্রায়ই বলে থাকে নিধু। এই মড়া পোড়ানোর কাজে তার ক্লান্তি এসে গেছে। সে জানে এই ভৈরবীর জীবন নিয়মমাফিক ভর ওঠা, মানে ভক্ত সমাগম এসবে ঈশ্বরীও হাঁপিয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে জীবন তাদের এই পোশাক পরিয়েছে। আজকাল তার আর পাঁচজন গৃহস্থ মানুষের মতো সংসার করতে সাধ যায়। ভৈরবীর সঙ্গে। ভৈরবীর সঙ্গে তবে ঠিক ভৈরবীর সঙ্গেও নয়। এই ভৈরবীর আড়ালে চাপা পড়ে থাকে যে মেয়েটা তার সঙ্গে। যার নাকি একদিন একখানি জীর্ণ কুটির ছিল হাঁসমুরগি গরু বাছুর ছিল, ন্যায়-অন্যায় ধর্ম অধর্ম পাপবোধ ছিল। আদিগন্ত শস্যভরা মাঠের ওপর দিয়ে বৃষ্টি ভিজতে ভিজতে কোনও এক দূরের মেলায় যাওয়া ছিল। বুকের গোপন জায়গায় শরতের কাশফুলের মতো অতি নির্মল এক ভালোবাসা ছিল। প্রাইমারি স্কুলের উঠোনে বুকের কাছে দু-হাত জড়ো করে চোখ বুজে প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া ছিল—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...

নিধু স্বপ্ন দেখে সে আর তার ভৈরবী পোঁটলা পুঁটলি বোঁচকা বুচকি নিয়ে রোদ ঝলমল শস্যক্ষেত্র পার হয়ে হয়ে চলে যাচ্ছে কোথাও। সেই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের ওপারে অপেক্ষা করে আছে একটি চালাঘর। সেই চালাঘরে রচিত হবে নিধু আর ঈশ্বরীর গার্হস্থ্য জীবন। এইসময় নিধু শুনতে পায় দূর অতি দূরে কোথাও কারও বাড়ির ঠাকুরঘরে মঙ্গলশঙ্খ বাজছে। কাঁসি আর আরতির ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং। এই শব্দতরঙ্গ যতক্ষণ শোনা যায় ততক্ষণ নিধু

নির্ভর থাকে। যেন মাঠ-প্রান্তর পার হয়ে আসা এই শব্দতরঙ্গ নিছক শব্দতরঙ্গ নয়। এর ভেতর অপেক্ষা করে থাকে মানুষের মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা। পৃথ্বী মানুষের এক মায়াজাল।

নিধু নদীর মতো বিস্তারে শরীরে ঢেউ তুলে শুয়ে থাকা নারীকে তার স্বপ্নের কথা বলে—চল না আমরা সংসার করি। বাগানে গাছ পুঁতব। তুই ঘরে ঠাকুর বসাবি। সকাল সন্ধে ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করবি। আমাদের গাছে হলদিবনা পাখি এসে বসবে। চল না যাই?

ঈশ্বরী এতক্ষণে ঠেলে সরায় নিধুকে। সে ঘুম ঘুম গলায় পাশ ফিরতে ফিরতে বলে গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে দে। নিধু পরম মমতায় নগ্ন নারীকে আচ্ছাদন দেয়। অতঃপর মন্দিরের সিঁড়িতে উঠে যায়। কী একটা কথা যেন বুকের ভেতর জমে ছিল অনেকক্ষণ। কে এবার বুকের খাঁচা থেকে সেই জমে থাকা কথাকে সুরে মুক্তি দেয়—বাইতে ছিল তরী পাগলা ভবা, মনচিন্তার তরী ডুবা ডুবা...তখন ঈশ্বরী এই সুর নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছিল কোথাও।

জ্যেঠিমার অসুখ বাড়াতে তাকে শহরে নিয়ে যেতে হয়েছে। সঙ্গে গেছে জ্যোতিদাদা আর তাদের বাড়ির মুনিশ পরমেশ্বরীর বাবা শুক্লাল। অতএব হালদার জ্যাঠাকে দেখাশোনা রেঁধে বেড়ে দেওয়ার কাজ পরমেশ্বরীর। ততদিনে ক্লাস সেভেনে ওঠা পঞ্চদশী সে। শরীরে প্রকৃতি তার তুলি বোলানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। তা নাহলে জ্যোতিদাদার মতো সন্নিসি মানুষও কখনও কখনও তাকিয়ে থাকে? পুরুষের মুগ্ধতার ভাষা পঞ্চদশীদের বড়ো চেনা।

এ বাড়ির কাজ করতে এত সুখ। এ বাড়ির তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখানো, এ বাড়ির হাতা-খুন্তি-কড়াই-উনুন, এ বাড়ির উঠোন বাগান ঘরবাড়ি মায় এ বাড়ির বিড়ালছানাটি পর্যন্ত বড়ো প্রিয় পরমেশ্বরীর। শুধু জ্যেঠিমা ভালো হয়ে ফিরলে হয়। শহরের ডাক্তার বলেছে অপারেশন দরকার। জ্যোতিদাদা অতটুকুনি ছেলে একা পারে না তাই বহুদিনের বিশ্বাসী মানুষ শুক্লাল দাস। প্রতিবেশী বলে কথা। দায়ে অদায়ে একে অন্যের বিপদে না থাকলে চলে! আর হালদার জ্যাঠা তো নিজেরই জ্যাঠা। জ্যোতিদাদার আপনার জনের কাজে লাগাতেও এত সুখ।

জ্যাঠাবাবুকে খাইয়ে দাইয়ে বিছানায় ফর্সা চাদর পেতে শাদা মশারি টানটান গুঁজে পাশের ঘরে মানে জ্যোতিদাদার ঘরে মেঝেয় একটা কিছু বিছিয়ে শুয়ে পড়ে পরমেশ্বরী।

জ্যোতিদাদার বিছানায় শুতে গা ছমছম করে। সুখস্বপ্নের মতো কী সব বুড়বুড়ি কাটে মনে। ওই বিছানায় শুলে কী এক বড়ো রকমের অঘটন যেন ঘটে যাবে জীবনে। কে যেন শিয়রে বসে হলুদ পাখির গল্প শোনাবে। আকাশের নক্ষত্রমালার গল্প শোনাবে আর মুখে একটু একটু করে গলে গলে মিশে যাবে পরমেশ্বরী শিয়রে বসা মানুষটার সঙ্গে। সে বড়ো ভয়ানক সুখ। সে বড়ো ভয়ংকর সুন্দর। লক্ষ করা যায় না। তার থেকে ভালো এই কৃচ্ছ্র সাধন। এই একার ভূমিশয্যা।

আধো ঘুমে বড়ো সুন্দর স্বপ্নে ভেসে ছিল পঞ্চদশী। সে আর জ্যোতিদাদা হাত ধরাধরি করে কোথা যেন যাচ্ছে। কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত ভেসে যাচ্ছে চাঁদের রাহাজানিতে। আলোক-প্লাবনে স্পষ্ট গাঁয়ের নদী অশ্বত্থ গাছ মাঠ প্রান্তর শস্যক্ষেত্র। প্রকৃতিতে তখন নানারকম শব্দ। পোকামাকড়ের আওয়াজ। টুপটাপ পাতা-খসা অথবা কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটে ওঠা।

শিশিরে ভিজে নরম মাঠঘাট। দূরে অনেক দূরে কে যেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছে। পরমেশ্বরীর হাতে প্রসাদের রেকাবি। ওই আলোর কাছে পৌঁছতে হবে মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ নিয়ে। জ্যোতিদাদার নিঃশ্বাসের শব্দ ঘাড়ে এসে লাগছে। ঘাড়ে গলায় বুকে। লণ্ঠনের আলোটা আর দেখা যাচ্ছে না। নিভে গেল নাকি হাওয়ায়। নাকি ওটা মনের ভুল। আলো নয় আলেয়া ছিল। সে শক্ত করে জ্যোতিদাদার হাত ধরতে চায়। কী একটা ঠাণ্ডা মতন শরীরের ওপর দিয়ে বেয়ে যাচ্ছে। সাপ নাকি। কী ঠাণ্ডা। পরমেশ্বরী কি যেন বলতে চাইছে। নিজের কথাই তার কাছে দূরাতীত গ্রহ থেকে ভেসে আসা কথার মতো শোনায়। জ্যোতিদাদা দেখো আজ আমি নতুন কাপড় পরেছি। পায়ে আলতা। দেখো জ্যোতিদাদা আজ আমি লাল টিপ পরেছি। বেলপাতায় রাখা ঠাকুরের সিঁদুর লাল টিপ। জরির কাজ করা নীল আঁচল বাতাসে উড়ছে। দেখো জ্যোতিদাদা। শুধু তোমার জন্য। একপিঠ চুল খুলে রেখেছি। শুধু তোমার জন্য। সেই যে সেদিন তুমি বলেছিলে এতো সুন্দর চুল তোমার বেঁধে রাখো কেন? তাই তো চুল বাঁধা ছেড়ে দিয়েছি একেবারে। আদিগন্ত প্রান্তর। কে যেন হেঁকে যায়। বড়ো কর্কশ কণ্ঠ। যেন ফালা ফালা করে চিরে দিয়ে গেল এই উর্বর শস্যক্ষেত্রকে। তবুও মাথার ওপর সবুজ নক্ষত্র। থালার মতো চাঁদ। পরমেশ্বরীর ভয় করে। কে যেন খুলে দিচ্ছে তার সবটুকু আড়াল। সায়া শাড়ি ব্লাউজ সে বলতে চায়—না জ্যোতিদাদা, এভাবে নয়। প্রসাদের রেকাবি নিয়ে ধানমাঠ পার হয়ে হয়ে ওই লণ্ঠনের আলোর কাছে পৌঁছনোর কথা আমাদের। এভাবে নয়। মা লক্ষ্মী রাগ করবেন যে। অমঙ্গল হবে সংসারের।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে পরমেশ্বরীর। একে হিংস্র উন্মত্ত থাবা তাকে খামচাচ্ছে কামড়াচ্ছে আঁচড়াচ্ছে। তার নরম তুলোর বলের মতো শরীরটাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছে। জ্যোতিদাদার শরীরের সেই আশ্চর্য সুবাস কোথায়? কীরকম কটু একটা গন্ধ। তীব্র ঝাঁঝালো কড়া। পরমেশ্বরী বিস্ফারিত চোখ মেলে দেখে জেঠাবাবু। জবা ফুলের মতো লাল চোখ। হাঁপাচ্ছে জেঠাবাবু। রক্তপথের সন্ধান পেয়ে গেছে মানুষটা।

পরমেশ্বরীর মুখ তার হাতের থাবায় বন্ধ। সে শরীরী ভঙ্গিমায় হাতে পায়ে ধরতে চায়। তার সারা শরীরে যেন কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পুড়ছে শরীর। জ্বলছে। ফাটছে। চিতার কাঠে মড়ার শরীরে আগুন লাগালে যেমন ফাটে।

অন্ধকার ঘরে তখন ধ্বনি প্রতিধ্বনি আর পরমেশ্বরীর চোখের জল। এইমাত্র সব হারিয়ে গেল তার। হলুদ পাখি শস্য ভরা মাঠ তারা ভরা আকাশ, প্রার্থনা সঙ্গীত সব সব।

মানুষটা তখন পরিতৃপ্ত, বলছিল অনেক কথা। বলছিল স্নো-পাউডার ঠোঁটে মাখার রং, নতুন শাড়ি সব সব দেব তোকে। দেখছিস তো তোর জেঠি চিররুগি। আমারও তো নিজের মতো সাঁতার কাটার একটা জলাভূমি চাই। তোদের ঘরের নতুন চাল। তোর বাবার নিজের চাষের জমি সব সব দেব রে মেয়ে। তুই শুধু এটুকু দিস। হালদার মশাইকে সকলে একডাকে চেনে। এসব কথা জানাজানি হলে একরাতে তোদের বাড়িতে আগুন ধরে যাবে। তোর বাবার কাজ যাবে। মা মরেছে বাপটাকেও মারবি? মুখ্যু মেয়ে। আবার কাঁদে।

অথচ তখন কিন্তু একটু একটু করে জল শুকিয়ে আসছিল পরমেশ্বরীর চোখে। খরার

চোখ মেলে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাওয়া প্লাবনের দিকে তাকিয়েছিল সে।

পরদিন ভোররাতে কে যেন প্রথম দেখল পরমেশ্বরী শ্মশানের ধারে অশ্বত্থের বেদীতলে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। তাঁর কেশবাস আলগা। পায়ের কাপড় হাঁটু ছাড়িয়ে ওপরে। কে দেখেছিল প্রথম। নিধু ডোমই বোধহয়। বেহুঁশ মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি। খবর গেল গাঁয়ের অভিভাবক হালদার মশাইয়ের কাছে।

হালদার মশাই নিধু ডোম আর গাঁয়ের পুরোহিত এই তিনজনে কী কথা হল কে জানে। গাঁয়ের লোক জানল মায়ের স্বপ্নের নির্দেশে পরমেশ্বরী এই মায়ের থানে। আর কী আশ্চর্য! একই রাতে স্বপ্ন দেখলেন হালদার মশাই-ও। মা নির্দেশ দিয়েছেন অশ্বত্থের গায়ে পাকা গাঁথনির মন্দির তুলতে হবে। সেই স্বপ্নে পাওয়া দেবীর মুখে একেবারে পরমেশ্বরীর মুখটি বসানো। অবিকল সেই চলন।

গাঁয়ের লোক ভেঙে এল ছদ্মবেশে তাদের গাঁয়ের মেয়ে সেজে থাকা পরমেশ্বরীকে দেখতে। সত্যিই তো, অমন শান্তশিষ্ট মেয়েটির এই চোখ মুখ। এমন ভয়ংকর সুন্দর। তাকিয়ে থাকা যায় না বেশিক্ষণ।

অতঃপর গোধূলিবেলায় যখন আকাশে খেলা করে কনে দেখা আলো তখন গাঁ ঘরের লোক সারবেঁধে পূজার উপাচার নিয়ে এল। নিধু ডোম একদা চুরি-চামারি পরে ডাকাত দলে যোগ দিয়ে বহু রোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়ে পুলিশের ভয়ে কাপালিকের ছদ্মবেশে মড়া পোড়ানোর কাজটা নিয়ে এ গাঁয়ে জুতে গেছে। বহুকাল পরে সে-ও যেন কাজের মতো কাজ পেয়েছে। আহা শ্মশানে এখন জ্যান্ত দেবী। সেই দেবীর সেবার কাজে লাগবে সে। হালদার মশাই বলে দিয়েছেন ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে চাঙ্গা রাখতে। আর জল চাইলেই আফিম গোলা জল খাওয়াতে।

তা সেই জল খাইয়েই হাতে-নাতে ফল। চোখেমুখে যেন সত্যি দেবী ভর করেছেন। কী এক ঘোর যেন সে এই পৃথিবীতে থেকেও নেই। কোন্ দূর গ্রহ থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে এ পৃথিবীতে। এখানকার মানুষের ভাষা বোঝে না। তাই বিড়বিড় করে কী সব বকে যাচ্ছে।

সমাগত মানুষজন হরিধ্বনি দিচ্ছে। ঢাক বাজছে। বাদ্য বাজছে। ধূপ-ধুনো আর কাটা ফলের সুবাস মিলে মিশে জায়গাটা কেমন পবিত্র হয়ে উঠছে। দূর দূর গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে খবর। মানুষের ঢল নামছে অশ্বত্থতলায়। অন্যদিকে ভোর থেকে শুরু হয়েছে মন্দিরের কাজ। দেবীর নির্দেশ। আজ রাত্রেই শেষ করতে হবে মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ। আজই পরমেশ্বরীর অভিষেক ঘটবে।

অতঃপর অতিক্রান্ত সন্ধের পরমেশ্বরী নিজের ঘর পেল। হালদার মশাই ভক্তি গদগদ চিত্তে বুকে হাত জড়ো করে বললেন, আজ থেকে তুই আর পরমেশ্বরী নোস মা। তুই আজ থেকে ঈশ্বরী। সংসার জীবনের নাম বিবর্ণ পোশাকের মতো নামিয়ে রেখে আয় মা। তখন মানুষের ঢল দেখছিল হালদার মশাইয়ের চোখ দিয়ে জল ঝরছে দরদর। জয়ধ্বনি দিতে লাগল মানুষেরা। তেলসিঁদুর ধান দুব্বো দিয়ে বরণ করে নিল তাদের ঈশ্বরী মাকে। কেউ বলল মায়ের ভর উঠছে, ভর উঠছে। সত্যিই তখন টলছিল পরমেশ্বরী। প্রবল ঢাকের গর্জন।

মানুষের জয়ধ্বনি আর পুরোহিতের মন্ত্রপাঠে তার কীরকম তেষ্টা পেয়ে যাচ্ছিল। গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ। বুঝতে পেরে দেবীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা নিধু ডোম সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরীর মুখে জল ঢেলে দিল। আহ্ কী ঘুম নামছে শরীর জুড়ে। ঘুম যেন ওই ডুবডুবি নদীটি। সেই নদীর অতলে তলিয়ে যাচ্ছে মেয়ে। অথচ মুখে এখনও বিড়বিড় করছে কী-সব।

হালদার মশাই বলছেন সব মায়ের মহিমা। আর কোনো ভয় রইল না আমাদের। এবার থেকে ঈশ্বরী মা-ই রক্ষা করবেন আপদে-বিপদে।

ফের তুমুল জয়ধ্বনি। তখন বুঝি জ্ঞান হারাচ্ছিল মেয়ে। লোকেরা হরিধ্বনি দিচ্ছে জয় ঈশ্বরী মায়ের জয়। মেয়ে তখন জ্ঞান হারাতে হারাতে বিড়বিড় করে বলছিল বড়ো চেনা অথচ হারিয়ে যাওয়া প্রার্থনা সঙ্গীত।...এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি...

ভোরবেলা বড়ো মিঠে হাওয়া দিচ্ছে। ঈশ্বরী মা এই সময়টায় মন্দির সংলগ্ন জমির বাগান তদারকি করেন। নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়া খুঁচিয়ে পরিষ্কার করা, মাটিগুলি ভেঙে ভেঙে ঝুরো করে দেওয়া, কাঠকুটো পড়ে থাকলে তা পরিষ্কার করা। এই কাজটা মা নিজে হাতে করতে ভালোবাসেন। আর এইটুকু বাগানে গাছও লাগিয়েছেন কত। গন্ধলেবু, পাতিলেবু, বেল, আম, করমচা, বনতুলসী কী নেই। এছাড়া কিছু ফুলের গাছও আছে। গাছগুলিতে কতরকম পাখি এসে বসে। ডালে নাচানাচি করে। দোল খায়। তাদের নিজেদের ভাষায় কথা কয়। বড়ো ভালো লাগে তাঁর।

এই ভোরে আর একজন মানুষ মন্দিরের পাশ দিয়ে সাইকেল চড়ে স্টেশনে যায়। সেখান থেকে ট্রেন ধরে শহরের কলেজে। জ্যোতিদাদা। শহরের কলেজের মাস্টার।

পুরনো মানুষরা গত হয়েছেন অনেক কাল আগে। হালদার মশাই নেই জ্যেঠিমা নেই, বাবা নেই।

সেবার জ্যেঠির চিকিৎসা করিয়ে ফেরার পর মানুষের ভিড়ের ফাঁকে কোনো এক নির্জন সময়ে দেখা করতে এসেছিল জ্যোতিদাদা। অভিমানের গলায় বলেছিল কেন এমন করলে? কী হয়েছিল? হাত দুটো ধরতে এসেছিল। ছিটকে সরে গেছিল পরমেশ্বরী। তাই কখনও হয়! যে শরীরে সাপে ছোবল দিয়েছে সে শরীর সন্নিসি মানুষটাকে দেওয়া যায়! পরমেশ্বরী বলতে পারেনি তোমার সঙ্গে আমার নির্জন যাত্রা। গভীর নিশীথে। কোজাগরীর রাতে। চাঁদের আলো গায়ে মেখে।

জ্যোতিদাদা বোঝাতে চেষ্টা করেছিল এসব ভুল। ভরটর বলে আসলে কিছু হয় না। সব মানুষের মনের বিকার। তুমি ফিরে এসো পরমেশ্বরী।

নিধু ডোম কাছ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। হয়তো এই বোঝানোর খেসারত দিতে জ্যোতিদাদাকে চিরকালের মতো গাঁ-ছাড়া হতে হবে।

পরমেশ্বরী ছলনাময়ী নারীর গলায় হেসে উঠেছিল। বলেছিল, জ্যোতিদাদা আমাকে ওই নামে ডাকতে আছে? আমি না ঈশ্বরী।

মানুষটা অভিমান আর ঘৃণা শরীরে বহন করে মুখ ফিরিয়ে যেতে যেতে বলে গিয়েছিল—ছিঃ।

আর মানুষটা চোখের আড়াল হলে সে কী হাসি মেয়ের। হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে চোখে জল। কী আশ্চর্য। তখন আবার চোখের জল থামে না। নিধু ডোম কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল। হাসি কান্না কোনোটাই থামানোর চেষ্টা করল না। শুধু ফিরে যাওয়ার সময় গুনগুনিয়ে গেল—নদী ভরা ঢেউ...বোঝে না তো কেউ...কেন মায়াতরী বাও বাও বাওরে...

আর কখনও যেচে কথা বলতে আসেনি মানুষটা। এখন রোজ শুধু এই নির্জন ভোরে তার আলপথ ধরে স্টেশনে যাওয়ার সাক্ষী থাকেন ঈশ্বরী মা।

মানুষটা বিয়ে-শাদি করেছে। ঘরে লক্ষ্মীমন্ত মিষ্টি স্বভাবের বউ। কিন্তু কোল ফাঁকা। স্বামীর কঠিন নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সে চলে আসে ঈশ্বরী মায়ের থানে। মায়ের কৃপায় কত লোকের সন্তান হয়, তার হবে না? বছরের পর বছর ঘুরে যায়। বউয়ের কোল ফাঁকাই থাকে।

কোল ফাঁকা থাকে ঈশ্বরী মায়েরও। আবাদের সময় বড়ো অল্প। সময় চলে গেলে বন্ধ্যা জমি হা হা করবে খরা বুকে নিয়ে। অথচ ঠিক মাটিতে ঠিক বীজটি বপন করা চাই। আজও স্বপ্নে সেই বীজ সন্ধান করেন ঈশ্বরী মা। সময় চলে যাচ্ছে। সময় চলে যায়। ভেতরে ঘন্টাধ্বনি বাজে অবিরাম। কোলজুড়ে কে যেন আসতে চায়। আসা হয় না তার। সঠিক বীজের অভাব।

অথচ প্রতিদিন ঈশ্বরী মায়ের বাগানে ফুল ফোটে। ফল ধরে। প্রজাপতি আর হলুদ বর্ণের পাখিরা খেলাধুলো করে। বীজ জন্মায়। বীজ উড়ে যায়। বড়ো কাছ থেকে এই জীবন সংকেত দেখেন ঈশ্বরী মা। আর কখনও ভেতরে ভেতরে গেয়ে ওঠেন ছেলেবেলার সেই প্রার্থনা সঙ্গীত ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...

শুঁয়োপোকা

প্রদীপ দাশশর্মা

শুঁয়োপোকার একটা সৌন্দর্য আছে। ভালো করে লক্ষ করলে টের পাওয়া যায় কোন্ রঙের প্রজাপতি হবে। বিশেষত, দুই গোল চোখের পাশে হলুদ ও সিপিয়া দেখলে বোঝা যায় বিউটি-কুইনকে। না কী ব্লাই-ডাচেস।

নিচু বারান্দার পাশে শিউলি-গাছ। গাছের গা থেকে নেমে শুঁয়োটা ক্রমে, মার্চ-পাস্ট, বারান্দায় উঠে পড়লে, হাসানের নজরে পড়ে। আসলে বিজলি-বাতি থাকার কারণে নজর। ঝাঁটার লম্বা শলা ভেঙে হাসান শুঁয়োটা অবলীলায় তুলে নেয়। প্রথমে ভাবে, শলা-সমেত, অন্ধকারে, শুঁয়োটাকে ছুঁড়ে ফেলে। কিন্তু, তাতে কি কিছু হয়। ফের, অবধারিত উঠে আসবে। স্লো বাট স্টেডি। হাসান 'স্লো বাট স্টেডি' জানে। বি. এ. পাশ। পাস-কোর্স। শেষ পর্যন্ত ঘোড়া-মুখ দেশলাই থেকে একটা কাঠি বের করে খাকি বিড়ি ধরায় আর জ্বলন্ত কাঠি শুঁয়োর গায়ে দিতেই সারা শরীর পলকে কুঁচকে যায়। নড়ে। সব শুঁয়ো পুড়ে খাক। শুঁয়ো না থাকায় সে এখন পোকা। শলার অক্ষয় আশ্রয় থেকে দেহ টুপ্ করে খসে। এবার, সে আর কাঠি দিয়ে তুলতে পারে না হবু প্রজাপতিকে। এখন আর, কারুর পক্ষে বলা সম্ভব না, বেঁচে থাকলে, সময় হলে, ওর রং কীরকম হত। কাজটা মোটেও ঠিক হয়নি ভেবে, হাসানের মন খারাপ। অন্তত, কয়েক সেকেন্ড তো বটেই। যেন জিভ পুড়ে গেছে। বিস্বাদ। সে ঝাঁট দিয়ে, মালটাকে বারান্দার নীচে ফেলে দেয়। মাটিতে মিশে যাবে। তাছাড়া, বারান্দায় বিছানা হবে। ওরা দুজনে বারান্দায় শোয়। শীত বাড়লে ভেতরে।

রাতে, বউয়ের উদ্‌লা গায়ে হাত রেখে হাসান স্বপ্নে...। অসংখ্য প্রজাপতি। উড়ছে। একতলা, দোতলা, তিনতলা। নানান্ উচ্চতা। কত রং। তবে, প্রত্যেকের জোড়া-ডানায় পোড়া দাগ। তামাটে। ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠলে আঁকুবিবি কয় : 'হায়, আল্লা! জিনে ধরিছে না হি তুমায়!' মাথার কানিতে রাখা জলের ঘটিতে হাত রাখে : 'উঠো আনি মিঞা, পানি খাওসে। এক ঢোক : যইজ্ঞ, দুই ঢোক : সইজ্ঞ।' বিবি কয় আর হাসে। হাসান তখন দেশলাইয়ের ঘোড়ার পিঠে। টগবগায়। এই বয়সেও হাসানের মুখে লালা। অজান্তে, ঘুমঘোরে গড়ায়। আঁকুবিবি ঠেলতে গিয়ে থমকায়। নাহ্, মিঞা ঘুমায়। সে-ও কালবোস-পানা, ঘাই মেরে পাশ ফেরে ও ঘুমের জলতলে খাবি খায়।

হাসান ক্যান্, সিন্দুরের পোলাপান, হানা-নুনারাও জানে, হেয়ার, টাটা আইতাছে, তাগো আস্তাকুঁড়ে। 'আল্লা, ম্যাঘ দে, পানি দে' গাইবার লাগবো না আর। অহন তার প্যাঁচাল না, অনিশ্চিত লয়, কাউয়ার 'কা-কা' না, অহন শুধু গান : টাটা! গাড়ি দে, বাড়ি দে, ট্যাহা দে...'। মন্ত্রী ওইরমই কইছেন। তবে, তার, পুরুষানুক্রমিক, ১৫ বিঘা, টাটার থানে দিবার লাগে। টাটা না হি বড়ো পীর! খ্যাতে আর কাম কইরবার লাগব না। আরে খ্যাত থাইক্‌বে তো খেতে কাম! কাম দিবে টাটা-পীর। তহন হাসানরে দ্যাহে কেডা! তহন, হাসান-মিঞা,

শাহজাহান। মাঝখানেত সিঁতি বানাইয়া, আঙুলের কাঁচিতে গোল্ড-ফেলেক ধরাইয়া, ভট্ কইর‍্যা টাইনতে-টাইনতে, সিধা সেকেন্ড সেতু দিয়া কালীঘাটের বেবুশ্যেদের থানে। আঁকুবিবির মাই বুইল্যা গ্যাছে। আটার লেচি। তয়, সে এগবার যাইবেই। অহন তারে 'জনমজুর' বইলবে না কেউ। 'হাফ-বেকার' কইবার পারব না। সরকার দিব ক্ষেতিপূরণ। টাটা কাম। হালার, দিক। তবু মনে মনে নিজেরে জিগায় : 'সরকার মানে তেনারা কইলেই কি, টাটা কাম দিব। টাটা কি সরকারের সব কতা শুনে?' আঁকুবিবি টাটা-বেত্তান্ত শুইন্যা কয় : 'রতনে রতন চিনে, মিঞা চিনে হাতি!' 'হাতি' কইতে বিবি কি বড়সড় জীব বুঝে। মানে জমি দিয়া বড় দাঁউ মারা। না, ওইসব নয়। 'হাতি' মানে ঘোড়া, ঘোড়ার ডিম, মরে-যাওয়া শুঁয়োপোকা। হাউলা-চাষা সে। অন্য কী আর কাম কইরবে। টাটার গাড়ি মাঝরাস্তায় বন্ধ হইয়া গেলে, স্টার্ট না লিলে, হেয়ার, পাছু থিকা ঠ্যালা মাইরবার পারে। গাড়ি ঝাড়পুছ কইর‍্যা চকচকাইতে পারে, সিনান করাইবার পারে। আর কিছু নয়। হঠাৎ, হাসান পোড়া ডিজেলের গন্ধ পায়। মাঠের সব লম্বা লম্বা তরোয়াল-ঘাস, মরা-ধানের শরীল, ডিজেল ঢ্যাইল্যা জ্বলাইয়া দিতাছে। কিন্তু, অ্যাখ্যে ভোরে! হাসানের মনে পড়ে, পোড়া শুঁয়োপোকার কথা। বারান্দা থেকে নামে। শিউলির খসখসে ডালে সদ্যজাত রোদ। সে নিচু হয়। মাটিতে খোঁজে শুঁয়োপোকার শব। পায় না।

শবের পাশে শুয়ে

মলয় দাশগুপ্ত

এবং সকল জল্পনার অবসান ঘটিয়ে কোম্পানির গেটে তালা ঝুলল। ভারত বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কারখানার সেই তালা আর খুলল না। শ্রমিক আন্দোলন, ট্রাই-পার্টাইট, ট্রাইবুনাল সব কিছুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মালিক তার উৎপাদন বন্ধ করে দিল। সাড়ে চার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে ছাঁটাই করতে করতে শেষ পর্যন্ত হাজার দুয়েক-এ ঠেকেছিল। বনমালী তালুকদার সেই দু'হাজারের একজন।

লক-আউট কারখানার কেরানি ছিল বনমালী। আয় মন্দ ছিল না, কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রাটা বেশি ছিল। ইয়ার-বন্ধু মিলে সান্ধ্য মজলিস আর শৌখিন পানের অভ্যাসটাতেই সংসারের বাড়তি কড়ি উবে যেত, হাতে কিছু রাখতে পারেনি। নইলে তো টোকা-টুনির সংসার, সন্তান না থাকলেও পোষ্য ছিল, ভাইপো নিখিলকে কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছে বনমালীই। লোকটা কৃপণ নয়।

কোম্পানি লক-আউট হওয়ার দরুন পি. এফ. গ্রাচুইটি, কম্পেনশেশন বাবদ যা যা পাওয়ার তা অন্যদের সঙ্গে সেও পেয়েছে। পেয়েছে টানা দশ বছর ঝান্ডা আগলে থাকার পরে, এই দশটা বছর এ দোর থেকে ও দোরে মাথা ঠুকেও আয়ের উপায় কিছু করতে পারেনি। যেখানে হাজার হাজার সমর্থ যুবক হাত গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছে, সেখানে পঞ্চান্ন বছরের আধ-বুড়োকে কে চাকরিতে বহাল করে। কীভাবে যে ওই দশটা বছর কেটেছে, কীভাবে যে সে আর সুধা বেঁচে থেকেছে তা অন্যে বুঝবে না। কিছুটা আঁচ পেয়েছে ভাইপো নিখিল, নিজের সংসার চালিয়েও কাকুর দুর্দিনে পাশে দাঁড়াতে কসুর করেনি। নিখিল ছিল বলেই আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারা। যাদের নিখিল নেই তাদের কেউ নেই, শ্রমিক-ঐক্য এক সময় ফাঁকা বুলিতে এসে দাঁড়ায়। সংগ্রামী তহবিল—হাতে ধরানো ভিক্ষের কৌটো, প্রথম প্রথম করুণাবশে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তরা দু-একটা টাকা ফেলেছে কৌটোয়। তারপর সব ভোঁ ভাঁ, কতদিন আর আবেগ জিইয়ে রাখা যায়।

দশ বছর বাদে বনমালীর বয়স যখন পঁয়ষট্টি, যখন টাকা-কড়ি পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে তখন কানাঘুষায় শুনতে পেল যে কারখানা লোপাট করে প্রোমোটিং করা হবে। আকাশ ছোঁয়া বাড়ি, সুইমিং পুল, পার্ক, খেলার মাঠ নিয়ে একটা উপনগরী গড়া হবে। আধুনিক বাজার বা মল, ব্যাঙ্ক তো থাকবেই পৃথক পোস্ট-অফিসও বসাবার হিম্মত রাখে হিম্মতদার রিয়েল এস্টেট-এর বণিক। নতুনভাবে কাজ শুরুর আগে তাই পুরোনো ঝুটঝামেলা মেটাতে হবে। অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের বোঝা মাথায় নিয়ে কেই-বা নতুন পথে পা ফেলতে চায়। একেবারে মাথা পর্যন্ত ডুবতে বসেছিল, এই গুজব সেই ডোবা মাথা তুলে শ্বাস নেবার সুযোগ দেয়। হিসেব করে দেখে বনমালী টাকাটা পেলে না খেয়ে মরার হাত থেকে রেহাই পাবে। খবরটা শোনার পর সুধার চোখে যে আলো দেখে বনমালী, অনেক

দিন সে প্রসন্নতা দেখেনি সে। সেদিন বিনা কারণেই নানা কথার গল্প করে দু'জনায় বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে হয় না, ঘুমিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি।

টাকাটা হাতে আসার পর বনমালী ভাইপো নিখিলকে চিঠি লেখে, একবার শীঘ্র চলে আসো। কোম্পানী পাওনা মিটায়ে দিয়াছে, টাকাটা লইয়া কী করব—তোমার সঙ্গে পরামর্শ হওয়া দরকার।

সুধাও চাইছিল নিখিল আসুক। টুনি পক্ষীর ধন, এদিক টানতে ওদিক উদলা হয়। বুঝেশুনে না চলতে পারলে আবার উপবাস। উপবাস চায় না সুধা, কেই-বা চায়?

চিঠির পাওয়ার পরে দু'দিন বাদে নিখিল আসে। একাই আসে। দুর্গাপুর থেকে বৌ-ছেলে নিয়ে আসারও তো একটা বাড়তি খরচা আছে। আর এ তো বেড়াতে আসা না, একটা বন্দোবস্ত করে আবার ফিরে যেতে হবে। নিখিল খুব হিসাবী।

বাড়িতে ঢোকার মুখটাতে ঝরঝর করে বৃষ্টি নেমে ভিজিয়ে দিয়েছে নিখিলকে। ভেজা জামা-প্যান্ট খোলার আর সবুর দেয় না সুধা, প্রায় দৌড়ে এসে কাপড়ে আঁচল দিয়ে গা-মুখ মোছাতে থাকে। নিখিল ছটফট করে বলে, 'আহ্ কাকিমণি, ছাড়ো ছাড়ো।'

'তোর কাকিমণির কাছে তুই এখনও বাচ্চাটি।' আনন্দে ভাসতে ভাসতে বলে বনমালী। কতদিন এমন আনন্দ আসেনি ওদের জীবনে।

জুতো ছাড়ে, জামা-প্যান্ট ছেড়ে নিখিল সুধার বুড়িয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, 'একবারে চান করে নিই। বিষ্টির জলের ঠান্ডাটা মরে যাবে।'

কী কথা ঝিলিক দেয় সুধার মনে, 'ছোটবেলায় শতবার বলেও তোকে স্নান করাতে পারতাম না।'

'এখন বড় হয়েছি না?' নিখিল হাসতেই থাকে, 'ব্যাগের চেন খুলে দেখো গামছা, লুঙ্গি -গেঞ্জি আছে। দাও না।'

সুধা ব্যাগ খুলে ওসব বার করতে করতে বলে, 'আমাদের তো বাথরুম নেই তোর অসুবিধা হবে না তো?

শেষ শ্রাবণের বৃষ্টি ধোয়া আকাশে আবার আলোর আভাস। বনমালীর ঘরের এ্যাসবেস্টসের চাল বেয়ে টুপটুপিয়ে জল পড়ছে। নিখিলের চোখ সহসা বেদনাময় দেখালো। বিষাদ, আকস্মিক বিষাদমাখা দৃষ্টি, তুমি কাকিমণি, এমন কথা বলছো কেন। আমি কি পর হয়ে গেছি?'

'নারে, বালাই ষাট। তুই পর হলে আমরা কী নিয়ে বাঁচব?' গাঢ় হয় সুধার কণ্ঠস্বর। বিপাকে পড়ে এবার নিখিলই।

নিখিলের স্নান, সুধা-নিখিলের মান-অভিমানের অবসরে বনমালী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ফেরে ইলিশ মাছ আর বেগুন নিয়ে। দেখে সারা শরীরে আহ্লাদ ছড়িয়ে সুধা বনমালীকে তারিফ করে, 'বাহ্, নিখিল-বেগুন-ইলিশ খেতে ভালবাসে, মনে আছে তো তোমার।'

পা ধুতে ধুতে বনমালী নিখিলকে জানায়, 'শুনলাম এ মাসেই ভাঙতে শুরু করবে।'

দাওয়া ছেড়ে ঘরে তখন নিখিল। কাকার কথা ঠিক ধরতে পারে না তবু উৎসুক তাকায়।

'এতবড় কারখানাটা ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেবে, ভাবতে পারিস?'

'তোমার কারখানার কথা বলছো?'

উদ্বেগ আর হতাশা গোপন রাখতে পারে না বনমালী। যে প্রতিষ্ঠান, যে উৎপাদন কেন্দ্র তার জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল তার এ অপমৃত্যু গভীরভাবে আহত করে তাকে। আকাশের শূন্যতার দিকে চোখ রেখে বলে সে, 'আমরা তো আপন করে নিয়েছিলাম, উৎপাদন বাড়লে আমাদেরও তো আনন্দ হতো।'

নিখিলের মনও খুব খারাপ হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকে কাকার ওই কারখানা তার জীবনেও জীবন্ত ছাপ ফেলেছে। তার কেন, এ এলাকার সবাই এই বিশাল বাড়িটাকে আপনজনই মনে করত। অথচ সব কিছু চুরমার করে কেমন অনায়াসে ভেঙে ফেলা হচ্ছে, নিখিলও চুপ করে থাকে, মনের ভেতরে মন নানা স্মৃতির টানা-পড়েন করেই চলে। সে কাকার ব্যথা বুঝতে পারে, নিজেও তো সে এ রকম একটা কারখানারই কর্মী, প্রতিষ্ঠান যে প্রাণের কতটা জুড়ে থাকে তা সেও অন্তর দিয়েই বোঝে।

টাকা-পয়সা, হিসেব-পত্র নিয়ে বসা হয় রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে।

বনমালীর ছোট্ট বাড়িতে একখানা বড় শোবার ঘর, তার পাশে আর একখানা ছোট ঘর আছে। নিখিল এই ছোট ঘরখানাতে থাকত, পড়াশোনা ঘুম সবই এই পৃথক ঘরটিতে, বিশেষত বনমালীর কারখানার লক-আউট হওয়ার পর থেকে, ছোট ঘরটা অব্যবহারে অবহেলায় বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। মাকড়সার জাল, ধুলোর আস্তরণ, ছোট্ট চৌকির কষ্ট, পরিত্যক্ত করেছে নিখিলের ঘরকে। আজ নিখিল আসায় ঝাড়পোঁছ করে ঘরকে শোয়ার উপযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ও ঘরে আজ নিখিল শোবে না, সুধা জানিয়েছে নিখিল তার সঙ্গে শোবে। নিখিলের কিছু বক্তব্য নেই।

সেই বড় ঘরেই বনমালী, নিখিল, সুধা বসেছে ভবিষ্যৎ নিয়ে ছক কষার কাজে।

দেখা গেল বনমালী সব মিলিয়ে যে অর্থ পেয়েছে তা যদি 'মান্থলি ইনকাম স্কিমে' রাখা হয় তা থেকে যে সুদ আসবে তাতে দু'জনের দু'মুঠো হওয়া সম্ভব নয়। কেবল দু'মুঠো তো নয়, অসুখ আছে, বিসুখ আছে। হঠাৎ আসা বিপদ আছে, সব টাকা আটকে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ না। আবার টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে যে সামান্য সুদ পাওয়া যাবে তাও এতই অপর্যাপ্ত যে জমা টাকায় হাত বসাতে হবে। আর সে হাত যদি দীর্ঘ হয় তো শেষ বয়সে ওদের দুর্গতির সীমা থাকবে না। এ অবস্থায় কী করবে ওরা।

ধীরে ধীরে রাত বাড়ে। বাইরের নীরবতা বয়স বলে দেয়। প্রতিবেশের আওয়াজ নির্দিষ্ট লয় রেখে যেন স্তিমিত হয়। পাহারাওয়ালা ল্যাম্পপোস্টে লাঠি ঠুকে জানিয়ে যায় রাত্রের গভীরতা। অন্ধকার না, নিঝুম নীরবতা এখানে রাত্রি মাপার ইউনিট।

নিখিল হিসেব করে সবকিছু বুঝিয়ে বলে কাকা-কাকিকে। কাকা-কাকিও যে বোঝে না তা তো নয়। নিজেরা বোঝে বলেই না নিখিলকে ডেকে এনেছে চিন্তাকে ভাগ করার জন্য।

নিখিল জিজ্ঞেস করে, 'এখন কী করবে। জমানো টাকা আর তার সুদই তো ভরসা।

টাকাটা খাটানোর কথা তো ভাবাও যায় না।

বনমালী জোরে জোরে মাথা নাড়ে। এত জোরে যে দেয়ালে পড়া তার ছায়ার মাথা নাড়াও স্পষ্ট বোঝা যায়, 'টাকা খাটাবো? এই বয়সে?'

'শেয়ার মার্কেটে, আজকাল অনেকেই ওই পথে—সরকারও চাইছে টাকাটা ওসব দিকে খাটুক।'

সুধা কিছু বুঝতে পারে না। জট পাকিয়ে যায়, বিহ্বল চোখ তার। 'আরে না না। গভ্‌মেন্ট সুদের হার যতই কমাক, এই মরা আগলেই থাকতে হবে আমাদের। অন্য লোভ দেখাস না নিখিল।' এই বিপন্নতা নিখিলকে কেমন বিবশ করে। পুঁজিবাদী পথে চলার এই পরিণতি নিজের কাকাকেও যখন স্পর্শ করে তখন তা আর পুঁথির পাতা বা মগজ-চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ভীষণ বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। যে দেশে বার্ধক্য কেবলই অভিশাপ সে দেশের বিলাসিতা তাকে বিদ্ধ করে, তবে সে এও জানে যে তার কিছু করার নেই। করার নেই, এই বোধ আরও বেশি দুঃসহ এখন।

'তালে যে ধন আছে তা ভাঙিয়ে চলার প্ল্যানই করতে হবে, কী বলো'। ভাইপোর কথায় সায় দেয় বৃদ্ধ। টুনি পাখির এ ধনই আঁকড়ে বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য পথ কোথায়?

সুধা আগেই শুয়ে পড়েছিল, নিখিল এবার তার কোল ঘেঁসে শোয়। অনেক দিন পরে ভারি শান্তি আসে মনে। সুধার শীর্ণ হাত, রোগা রোগা আঙুল নিখিলের বুকের ওপর। যেন বুকের ভেতরটাকে ছুঁতে চায় তা, ভেতরের মনটা যে গহীন অতলে ঘুমিয়ে আছে সেখানে পৌঁছতে চায় সুধার হাত।

নিখিল সে প্রশান্তির মধ্যে বলে, 'তুমি শুনে যাও কাকু, আমি ঠিক পথ বার করবো। আজকের রাতটা ঘুমোলে কাল নির্ঘাত হিসেব মেলাতে পারব।'

ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে বনমালী নিজের বিছানার দিকে যায়। অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে ব্যাপ্ত অন্ধকারে, কাকিমণির হাতের স্পর্শে নিখিল শৈশবে সরতে থাকে। সরতে সরতে সরতে একেবারে ছোট্টটি হয়ে পড়ে মন। হঠাৎই নিখিল একটা সত্য আবিষ্কার করে যেন, বৌ সায়নীর হাত আর কাকিমণির হাতের ভাবায় কত তফাত। একটা শ্বেতপাথরের মতো, তো অন্য হাত আগুন জ্বালার কাঠি—।

পরের দিনের সকালটা বেশ রোদ ঝলমলে। গাছের পাতাগুলির ওপর রাতে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়েছে। এখন সূর্যকণা, তার সাত রঙের বর্ণালি ওই পাতা আর পাতার জলে পড়ে চারদিকটাকে আরও উজ্জ্বল আরও ঝলমলে করেছে। এই উজ্জ্বল সকালেই নিখিল সমস্যার সমাধান করে দেয়। বনমালীর টাকায় তিন ভাগের দু'ভাগ পোস্ট-অফিসে মান্থলি ইনকাম স্কিমে রাখার ব্যবস্থা হয়, বাকি একভাগ থাকবে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ। এখান থেকে প্রতি মাসে কিছু কিছু তুলতে হবে। নিখিল বুঝিয়েছে, ছ'বছর এইভাবে চালাতে পারা যাবে, তারপর মান্থলি ইনকাম স্কিমের টার্ম পিরিয়ড শেষ হলে আবার নতুন ছক, নতুন প্ল্যান করতে হবে। ছ'বছর তো চলুক।

নিখিল আরও বলেছে, খুব হিসেব করে চলতে হবে কাকু। তুমি তোমার আগের অভ্যাস ভুলে যাও।

সুধা যে নিখিলের কথায় উৎসাহী সমর্থন জানাবে তা বলার অবকাশ থাকে না।

বনমালী ভাইপোর দিকে তাকিয়ে নিস্তেজ গলায় বলে, এ দশটা বছর তোর কাকুকে নিংড়ে নিয়ে পোড়া কাঠ করে দিয়েছে। টিঁকে থাকা ছাড়া তার আর কোনো অভ্যাস থাকতে পারে না।

কাকুর দুঃখ অন্য দু'জনকেও ছোঁয়। বাতাসও কি ভারি হয়ে ওঠে?

বনমালীদের চোখের ওপর কারখানার ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকে। বুলডোজার, ক্রেন, হাতুড়ি পুরো কারখানাকে কবরে পরিণত করে। এই ধ্বংসের কাজে কত যে মজুর লাগানো হয়েছে তার হিসেব কেউ করতে চায়নি। এই ভাঙা, কেবলই ভাঙা সকলের মনকে এত বিষাদমগ্ন করে যে চোখ তুলে তাকাতেও ভয় পায়। এই ইন্ডাস্ট্রি, এই কারখানার সঙ্গে যাদের নাড়ির যোগ ছিল তাদের তো চোখ ছলছল করছেই, জড়ো হওয়া অন্যদের মনও ভারাক্রান্ত। প্রথম ক'টা দিন এই ভয়ঙ্কর ধ্বংস দেখার জন্য ভীড় জমেছিল, কিন্তু ক্রমে হাল্কা হতে হতে একটা সময় আর কেউ ফিরেও তাকায় না।

কেবল রাস্তার পাশে মন্টুর রায়ের দোকানে এখনও সরব আলোচনা চলে। এ দোকানের বেশির ভাগ খদ্দেরই এই কারখানার উৎখাত হওয়া শ্রমিক-কর্মচারী। বনমালীও প্রতিদিন এখানে চা খেতে আসে, সকাল বিকেল দু'বেলাই। অভ্যাস। বনমালীর মতো অন্য অনেকেই এ অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। ফলে, জমা হওয়া প্রাক্তন শ্রমিকরা পুরো ব্যাপারটা নিয়ে হল্লা করে, একে অপরের সঙ্গে মত বিনিময় করে মন হালকা করতে চায়। এদের সবার মেজাজ সমান না, কথা বলার ভাবাও এক থাকে না। কিন্তু মালিক আর নতুন প্রোমোটারের ব্যাপারে সকলের মনোভাব এক, ক্রোধের পরিমাণে ঘাটতি থাকে না।

ফলে খিস্তি খেউর চলে।

প্রথম ভাঙা হয় শ্রমিকদের কোয়ার্টার, তাদের রিক্রিয়েশন ক্লাব। দূরে, মন্টুর চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই সবকিছু দেখা যায়। এক একটা দেয়াল খসে পড়া দেখে, পতনের শব্দ শুনে কেমন পাগল হয়ে যায়। বনমালীর বুকের ভেতরেও যেন এক একটা পাঁজর ধরে টান পড়ে। নিঃশ্বাস নিতে কেন তার কষ্ট বুঝতে পারে না। কিন্তু কষ্টটা চাপ বেঁধে বুকের মাঝে থেকেই যায়। লক্ষ্মীকান্ত বাপের সময় থেকে ওই কোয়ার্টারে থেকেছে, সে তো উন্মাদের মতো অশ্রাব্য-গালিগালাজে মনের চাপ কমাতে চায়। সারা অঞ্চল জুড়ে শোকের ছায়া। ডুকরে কাঁদে কেউ, কারখানা হারামিদের বাপের, ওদের একার সম্পত্তি, আমাদের ঘামের কোনো মূল্য নাই?

কে কার কথার উত্তর দেবে? কে কাকে সান্ত্বনা দেবে! তাদের চোখের সামনেই ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। একদা একসময়ে যেখানে দিনরাত আলো জ্বলত এখন তা রাতের আঁধারে ডুবে যায়। একটা কালো দৈত্যের মতো হা হা করতে থাকে কারখানা, সারাটা যৌবন

দিয়েছে যেখানে, যাদের হাতের পেশী আর বুকের জোর না হলে একটি উৎপাদনও হত না, আজ তাদেরই অন্ধকারে রেখে সেখানে মন ভোলানো ফ্ল্যাটের সারি উঠবে?

বাড়ি ফিরেও অস্বস্তিটা দূর হয় না।

সুধা আর একবার চা করে দেয়। তবু বুকের কাছটায় জমে থাকা শ্বাস। একবার ভাবে সুধাকে বলে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে, সুধাকেও উদ্বেগে ফেললে লাভ কী? বাড়তি ঝক্কাট সুধার উদ্বেগটাই।

সুধাকে বলে না। বলে সতীশকে। একই টেবিলের এ পাশ ও পাশে বসে তিরিশটা বছর কাটিয়েছে তারা। সতীশ শুনে যেন অবাক হয়, তোরও বুকে চাপধরা অবস্থা, আমারও তো তাই। ছেলেকে বলি না, বললে হৈচৈ করবে। ডাক্তার দেখাতে বলবে। বল ডাক্তার এর কী বুঝবে?

সতীশেরও একই অবস্থা শুনে বনমালী কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়। দু'জনের মনের ভেতরে একই দানো ঢুকে পড়েছে জেনে স্বজন-সুখের নিশ্চিন্তি।

সতীশ জানায়, খবরের কাগজে বিরাট করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে শালারা। বলছে ড্রিমল্যান্ড বানাবে।

বনমালীও দেখেছে ওই বিজ্ঞাপন। তেতো মুখ করে বসে থাকে সে।

বনমালীর মুখের ভাব দেখে সুধা আন্দাজ করতে পারে। খাচ্ছে-দাচ্ছে, বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে, কিন্তু আগ বাড়িয়ে দু'টো কথা বলছে না। সুধা কিছু জিজ্ঞেস করলে হুঁ, হ্যাঁ—দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছে। ভাল লাগে না সুধার।

বনমালির কাছে পুরো ব্যাপারটাকেই যুদ্ধ বলে মনে হয়। যুদ্ধ মানেই তো ধ্বংস, সভ্যতা গড়ার অছিলায় সভ্যতাকে ধ্বংস করা। যুদ্ধ মানে তো মুনাফার পাহাড়ে ওঠার বাসনা। তাদের মালিকও তো মুনাফার পেছনে ছুটে সভ্যতার অছিলায় সভ্যতা ধ্বংসের কাজে লেগে পড়েছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিদ্রাহীন চোখে এ কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই শান্ত হয় মন। যুদ্ধবাজদের মতো বর্বর তার কারখানার মালিক, এমন ভাবনা ভাবতে পেরে কিছুটা ভার কমে মনের । বনমালী ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন সুধাকে ডেকে কথা বলে। বাজার যাওয়া, সংসারে কী আছে না আছে তার খোঁজ নেওয়া সুধাকে আশ্বস্ত করে।

বনমালী জোর করেই কয়েক দিন মন্টুর দোকানে যায় না। ঘরে বসেই চা খায়। সতীশ ছাড়া তার অন্তরঙ্গ তেমন কেউ নেই, বার্ধক্য তো বাল্য-শৈশব নয় যে সঙ্গীর অভাব হবে না। একদার বন্ধুরাও আজ যে যার নিজের মতো ব্যস্ত, বনমালীর বাড়ি বয়ে এসে খবর নেবার মতো সময় বা ইচ্ছা কারোই নেই। বনমালীও তো কারো বাড়িই যায় না। ফলে ঘরে থাকাটা তার নির্বিঘ্নেই ঘটে।

বনমালীর ঘরে বসে থাকার কারণ সুধা অনুমান করতে পারে, তাই সেও ঘাঁটায় না।

ঘরে থেকে যদি মনে শান্তি পায় পাক না।

চার দিন এভাবে কাটার পর সতীশ আসে।

সতীশকে দেখি কী হয়। বনমালীর তীব্র ইচ্ছা জাগে কারখানার দিকে যাওয়ার। সঙ্গী সতীশ, না যাবার কোনো কারণই খুঁজে পায় না সে।

চারদিন তো কম সময় নয়। মন্টুর চায়ের দোকানের সামনে এসে চোখ যেন ঝলসে যায়। কারখানার শেডগুলি বেবাক উধাও, সারি বাঁধা শেডের বাইরে কত যে গুলমোহর গাছ, কিছু শিশু গাছ ছিল তাও কেটে সাফ করা হয়েছে। জায়গাটা এত ফাঁকা, আকাশ এত ফাঁকা, দূর দিগন্ত পর্যন্ত এত ফাঁকা যে বনমালী তা সইতে পারে না। মনের ভেতরটা হু হু করতে থাকে, এবার বোধহয় কেঁদেই দেবে সে। চারপাশে তাকিয়ে কাঁদা আর হলো না বনমালীর—কী বলবে অন্যরা, আদিখ্যেতা ভাববে না? মন্টুর দেওয়া চায়ের গ্লাস নেড়েচেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জীবনে এই প্রথম মন্টুর চা বিস্বাদ ঠেকে, সতীশকে বলে, চল, এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না।

বনমালীর সেরিব্রাল স্ট্রোকের সঙ্গে তার কারখানার কাণ্ডকারখানার যোগ আছে বলে মনে করেন না ডাক্তাররা। এ্যাবভ সিক্সটি সেভেন বয়স, হাই ব্লাডপ্রেশার, হাই কোলেস্টরেল—এ সবই স্ট্রোকের মোক্ষম কারণ। তাছাড়া এত বয়স অবধি একটা লোক একবারও ব্লাড-প্রেশার চেক করাননি। ভাবা যায়, কলকাতার আজও এমন মানুষ রয়েছে?

রুটি খেতে খেতে বনমালী যখন ঢলে পড়ে তখন সুধা কী করবে ভেবে উঠতে পারেনি। ছুটে কাছে গিয়ে মাথাটা উঁচু করার চেষ্টা করে সে। বনমালীর চোখ দু'টো তখন লাল, নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, গলা দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ। দেখে ভড়কে গেলেও সাময়িক বিহ্বলতা কাটিয়ে সুধা ঘরের বাইরে গিয়ে, নিজেদের বাড়ির বাইরে গিয়ে চিৎকার করে লোক ডাকতে থাকে। তারপর তো হাসপাতাল, টানা পাঁচদিন যমে মানুষে টানাটানি।

নিখিলকে ফোন করেছিল সতীশ। ফোন পেয়ে পরদিনই নিখিল ছুটে আসে। এবার সে-ছেলে -বৌকে সঙ্গে এনেছে, সতীশের কথা শুনে সে বুঝতে পেরেছে এবার আর দু'-একদিনের ব্যাপার নয়। থাকতে হবে বেশিদিন, তার ওপর সুধার একাকিত্বও তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। নিখিলকে পেয়ে সুধাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

বনমালী সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু যা হয় তাই, তার শরীরের ডান-পাশটা পড়ে গেছে, কথাও এত জড়ানো যে বোঝে কার সাধ্য। তবে সকলের সমবেত চেষ্টায় এবারের মতো বেঁচে এসেছে সে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়ার সময় ডাক্তার বলেছেন, ফিজিওথেরাপিতে উন্নতি হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে বয়সটা ফ্যাক্টর, তাছাড়া ওঁর ফিজিক্যাল হেল্থও তো খুব স্ট্রং না, দেখুন কতদূর কী করতে পারেন।

ডাক্তার যেটা বলেননি, ফিজিওথেরাপি ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়া। আমাদের দেশে বিনা-পয়সায় এই ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা নেই। অতএব বনমালীর উঠে দাঁড়ানো সম্ভাবনা খুব একটা নেই।

নিখিল তার সাধ্যের অতিরিক্ত সময়ই কাকা-কাকির সঙ্গে কাটায়। ফিজিওথেরাপিস্ট-এর সঙ্গে কথাও বলে। খরচের বহর শুনে বিস্মিত হয়, কিন্তু কিন্তু হাল ছাড়ে না। সপ্তাহখানেক বাদে আবার এসে ব্যবস্থা করবে বলে ঠিক করে।

দুর্গাপুর যাওয়ার সময় নিখিল সুধাকে ডেকে বলে, কাকিমণি, কাকুর জন্য একটা আয়া রাখো। আমি তো আছি।

সুধা নিখিলের ছেলের সামনেই নিখিলকে কোলে নিয়ে ধমকের সুরে বলে, আয়ার কী দরকার। আমি কি মরে গেছি, দেখিস ঠিক পারব।

'তোমারও শরীর তো—'

'ধুস্, আমি কি ললিপপ খাওয়া মেয়ে, খাটে বসে জীবন কাটাবো? তোরা চিন্তা করিস না, ঠিক চলে যাবে।'

ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে 'অল-আউট' জ্বালিয়ে সুধা বনমালীকে একবার পেচ্ছাপ করিয়ে নেয়। ঘুমের ওষুধও খাওয়াতে হয়, তারপর নিজে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে বনমালীর পাশে শুয়ে পড়ে। সারাদিন তো খাটতেই হয়, খাটনির চেয়েও বেশি ভোগাচ্ছে উদ্বেগ, বনমালীকে ঘিরে একরাশ দুশ্চিন্তার মেঘকে কিছুতেই সরাতে পারে না। লোকটা কেমন হয়ে গিয়েছে, চোখের দৃষ্টিতে ভাষা থাকে কিন্তু ফ্যালফ্যাল করে তাকানো সে দৃষ্টি কিছুই বোঝায় না। খাইয়ে দিলে খাবে, না দিলেও কিছু বলবে না, অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনো কাজ যেন নেই। মাঝে মাঝে কথা বলে, আজকাল কথা কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু গলার স্বর খুব নিচু, দূর থেকে বোঝাই যায় না কথা বলতে চাইছে কিনা।

দরজা-জানালা বন্ধ বলে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। দিন কী রাত ঠাহর করতে কষ্ট হয়। বনমালী তবু চোখ মেলে ঘরের চারপাশে তাকায়। ফাঁক-ফোঁকর গলে রোদ্দুর এসে পড়েছে মেঝেতে, চৌকিতে, তার মানে এখন দিন। তাকিয়ে দেখে সুধা এখনও শুয়ে, সুধা ওঠেনি কেন? বাইরে টুকরো টাকরা শব্দ, দু'চারটে গলার স্বরও কিন্তু এসব সত্ত্বেও সুধা ওঠে না কেন?

বনমালী বুঝতে পারে এর মধ্যেই একবার বিছানায় পেচ্ছাপ হয়ে গেছে। সুধা না উঠলে ভেজা কাপড়ে পাল্টাবে কে? তার তো জল তেষ্টা পাচ্ছে, সুধা ঘুমিয়ে থাকলে জল দেবে কে? নিজে সে একদম উঠতে পারে না, নড়তে পারে না। সুধা না উঠলে জলও তো খেতে পারবে না।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে বনমালী। দিন তখন দুপুর পেরিয়ে বিকেলের দিকে চলছে। বনমালী দেখে—মরে পড়ে আছে তার কারখানা, আকাশে অন্ধকার ঘনাচ্ছে। ঘুম ভাঙতেই মন খারাপ হয়ে যায়। সে এখন কোথায়, বুঝতে সময় লাগে। তাকিয়ে দেখে 'অল-আউট' জ্বলছে, ঘরের অন্যদিক থেকে রোদের কণা ঢুকছে। আরো একবার নিঃসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায়। পাশে শোয়া সুধা নড়েও না, চড়েও না।

কী হলো সুধার? গভীর আতঙ্কে বনমালীর ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ উঠে আসতে

চায়। গলায় ফোটে না সে আর্তবার্তা। এবার বাঁ হাতটা যতদূর প্রসারিত করা যায় তা করে সুধাকে ছোঁয় সে। জড়ানো গলায় ডাকে, সুধা ওঠো। সুধা ওঠে না। নাড়া দেয় সুধাকে, ভারি হওয়া পুরো শরীরটা কাঠের মতো এবং বরফের মতো ঠান্ডা।

বনমালীর বুঝতে অসুবিধা হয় না সুধা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। কুলকুল করে কান্না নেমে আসে শরীর বেয়ে। বনমালী অতিকষ্টে সুধার পাথর ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখে, কণ্ঠে হাত, বক্ষে হাত। যতক্ষণ পারে সুধার জীবন্ত স্মৃতিকে মনে রেখে এক হাতে মৃত শরীর হাতড়েই চলে সে।

সুধার শবকে পাশে রেখে এইভাবে প্রত্যাশায় কাটে তার।

বনমালীর পাশে প্রিয়তমার নিথর দেহ। সে উঠতে পারে না, নড়তে পারে না। গলা ফাটিয়ে ডাকতে চায় ডাকতে পারে না। কান্নায় ভেসে যায় মন, কাঁদতে পারে কই? এইভাবেই দিন ফুরিয়ে রাত আর রাত ফুরিয়ে দিন আসে। কখন শব ফুলে-ফেঁপে গন্ধ ছড়াবে তার প্রতীক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই বনমালীর সামনে।

এভাবেই শবের পাশে কাটাচ্ছে বনমালী, এ সভ্যতাই সে।

ধ্বংসধূলির বাজার

অনিল ঘোষ

বাজারে ঢুকে অর্ণবের চোখ আটকে গেল। আহ্ ইলিশ। রুপোর মতো গা। আলো পড়ে চকচক করছে। অর্ণবের চোখদুটোও চকচক করে উঠল। বর্ষার এই সময়টায় ইলিশ দারুণ জমবে।

অর্ণব পকেটে হাত দিল। মুখটা ব্যাজার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মোটে সত্তর টাকা। এতেই আজকের বাজার। হাতে থলি দেওয়ার সময় মা নামতা পড়ার মতো বলে দিয়েছে, মাছ আলু লঙ্কা নিয়ে যা থাকবে তাতে লেবু পান হলে নিস। আর চালকুমড়ো পেলে দেখিস তো। আর হ্যাঁ, তোর বউদি বলছিল, লাল শাক উঠলে নিস।

অর্ণব হেসে ফেলেছে, তুমি যা বললে মা, তাতে পুরো বাজার তুলে আনলে ভালো হয়। মোটে সত্তর টাকা দিয়েছে দাদা। মাছ নিলেই তো ফক্কা।

মা বলল, ওতে যা হয় তাই নিবি, আমি আর কী বলব।

দাদা বলল, আমার যা ক্ষমতা তাই দিয়েছি। কী করে চালাচ্ছি তা তো বুঝবে না, ওতে পারলে নিবি, না হলে নিবি না, ব্যস।

সত্তর টাকা পকেটে নিয়ে ইলিশের দিকে না তাকানোই ভালো। ছোটো মাছ দেখতে হবে। পারশে, ট্যাংরা, চিংড়ি পেলে ভালো। দুই ভাইঝির খুব প্রিয়।

দাদা অফিস যাবে, ভাইঝিরা স্কুলে। সপ্তাহে তিনদিন বাজার হয়। দাদা বাজার করে রবিবার। সারা সপ্তাহের বাজার আনে যা, তিন দিন না যেতে আবার থলি হাতে নিতে হয়। আর সেটা অর্ণবকেই। সকালে ধড়াচুড়ো পরে এই যে বাজার যাওয়া—এর চেয়ে বিরক্তিকর কাজ বোধহয় আর নেই।

নিজের একটা পার্মানেন্ট চাকরি হলে কি এমন হত! কাজ মানে তো বাবু। ওই যে একটা গান আছে না, 'মেজাজটাই তো আসল রাজা, আমি রাজা নই'। মেজাজ মানে পকেটের মালকড়ি। ওখানে ঢং ঢং মানে তুমি গাধা। অতএব বোঝা টানো। টানবে না কেন? এ বাজারে তুমি কোন কম্মে লাগো! কেন বসে খাবে? হাত আছে, পা আছে, এম এ পাসের ডিগ্রি আছে—যাও, কাজ খোঁজো। না পারলে কার দায়!

সত্যি কথা। দাদা আজ দেখছে। কাল যদি বলে বসে, অনেক তো হল, এবার ভাই তুই তোর ব্যবস্থা করে নে। তবে ওকে দোষ দেওয়া যায় কি। জীবনটাই শালা বরবাদ হয়ে গেল। চেষ্টা তো কম করেনি। সৎপথে সৎভাবে, টাকা দাদা চ্যানেল বাদ দিয়ে স্রেফ নিজের যোগ্যতায়! নাহ্ অশ্বডিম্ব ছাড়া কিছুই প্রসব হয়নি।

অতএব ধুত্তোর বলে নেমে পড়েছে অর্ণব। নেমে পড়া নয়, প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়া। টুইশানি করেছে, খাতা লিখেছে, সাংবাদিকতা করেছে একটা কাগজে। সে কাগজের মালিক কাম এডিটর একটা মাল। তাঁর ছিল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি। নিজের কাগজ থেকে নিজেই টাকা

ঝেড়ে ফাঁক করতেন। শেষে ওঁর কোম্পানি লোকের টাকা মেরে লাটে উঠল, মালিক কাম এডিটর গেলেন জেলে, ভাত মারা গেল অর্ণবের। তারপর এ ঘাট ও ঘাট করতে করতে এখন কলকাতায় কিছু নামী প্রেস ও প্রকাশনীতে এডিটিং ও প্রুফ দেখার কাজ নিয়েছে। কাজের শেষে হাতে যা পায়, বলার মতো না। তবে বাড়িতে দিতে হয় না। বাঁচোয়া। স্রেফ নিজের খরচ চালাও। তাও কত প্যাঁচ পয়জার। আর এই প্যাঁচে পড়ে অর্ণবের অবস্থা এখন জাঁতাকলে পড়া ইঁদুরের মতন। যে যেমন পারছে ঠকাচ্ছে। কাজ করিয়ে টাকা দিচ্ছে না। দাঁত কেলিয়ে বলছে, দু-দিন পরে আসুন। দু-দিন পরে গেলে, এখন ব্যস্ত, সাতদিন পরে দেখছি। এই তো কালই, এক প্রকাশক হাজার টাকার কাজ পাঁচশো দিয়ে বলল, বাকিটা পরে দেখব। এই পরে যে কবে, তার কোনও হদিশ নেই। সর্বশিক্ষা অভিযান-এর জন্য এক প্রকাশকের হয়ে বই লিখে দিল অর্ণব। সে-বই সিলেক্টও হল। হাজার হাজার টাকা বিক্রি। অথচ অর্ণব বইয়ের তিনটি কপি ছাড়া কিছুই পেল না। আর এক লোক, যিনি আবার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। তাঁর খ্যাতনামা দাদুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি সংকলনের কাজ দিলেন অর্ণবকে। বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে দেড় হাজার টাকার কাজ। তার মধ্যে দাদুর অনুবাদ করা কার্ল মার্কস-এর মজুরি শ্রম বইটি আছে। অথচ টাকা দেবার বেলায় অর্ণবকে দেওয়া হল মাত্র তিনশো টাকা। অর্ণব লজ্জার মাথা খেয়ে বাকি টাকার কথা বলতে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বললেন, আপনার হিসেবে তো ঠিক দিয়েছি, এই তো বই। অর্ণবও দেখল, যে বইটা উনি দেখালেন, তাতে তিনশো টাকাই হয়। বাকি প্রুফ গেল কোথায়? বিশেষ করে মার্কসের মজুরি শ্রম-এর অনুবাদ? রহস্যভেদ হল বইমেলায়। মনীষার স্টলে ওই বুদ্ধিজীবী সম্পাদিত নতুন একটি বই দেখতে গিয়ে অর্ণবের চক্ষুস্থির। বাকি বারোশো টাকার কাজের প্রুফ নতুন টাইটেলে বেরিয়েছে। সেখানে মার্কসের মজুরি শ্রম-এর অনুবাদ শোভা পাচ্ছে। বারোশো টাকা বেমালুম গায়েব। হায় মার্কস সাহেব...।

অতএব ইলিশের দফা গয়া। ছোটো মাছ। ট্যাংরা পারশে চারাপোনা। চিংড়ি হলে আরও ভালো। পুঁজি সত্তর টাকা। এর মধ্যে মাছ, এর মধ্যে আলু তরকারি। এ তো লড়াই। এ লড়াই হিসেবের লড়াই। এ লড়াই জিততে হবে।

অর্ণব ধীর পায়ে মাছের বাজারে ঢুকল। মফস্সল শহরের বাজার। সকাল নটাতেই হালকা। দিনের তাপমাত্রার মতো বাজারেরও তাপমাত্রা আছে। ডিগ্রির চড়াও-উঠাও আছে। সকাল আটটা-সাড়ে আটটায় সবচেয়ে হাই ডিগ্রি। তখন সরকারি কর্মচারী, অফিসার, নেতা দাদা মালদার—সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর ডিগ্রি নামতে থাকে। নটা থেকে সাড়ে নটা—এই সময়টাকে কনফিউজিং টাইম নাম দিয়েছে অর্ণব। এ সময় নানা কিসিমের লোক আসে যাদের চেহারা-চরিত্র সম্পর্কে বাজারের লোকজন ধন্দে থাকে। মালদার হতে পারে, নাও পারে। এ সময়ই বেছে নিয়েছে অর্ণব। মাছওয়ালারা এক একজন ঘাগু। মনুষ্য চরিত্র বুঝতে ওস্তাদ। কার পকেটে মালকড়ি আছে, কার নেই—ঠিক বুঝে ফেলে। ট্রিটমেন্টও সেই রকম অবশ্য কনফিউজিং টাইমে ওরাও ধন্দে থাকে, আর সেটাই সুবিধা অর্ণবের।

মাছের বাজারে দাম কেউ কেজিতে বলে না। বলে শ-এ। চিংড়ির গায়ে হাত দিলেই

বলবে বারো টাকা। অর্থাৎ বারো টাকা শ। একশো কুড়ি টাকা বললে খদ্দের যদি ভিরমি খায়। ফোতোবাবুরা দরাদরি করবে। বারো টাকাকে দশ টাকা করতে পারলে বিশ্বজয়ের হাসি ফোটাবে চোখে মুখে। ফোতোবাবু মাছের বাজারে অচল। ওরা শুধু দরদামই করবে না, মাছ টিপবে, ঘাঁটবে। ওদের পাত্তা দেয় না মাছওয়ালারা। দাম জিজ্ঞেস করলে খেঁকিয়ে উত্তর দেয়। মালদার পার্টি হলে এসবের ধার-পাশ দিয়েও যাবে না। দরদাম তো নয়ই। মাছের গায়ে হাতও দেবে না। শুধু 'দাম কত' আর 'দাও'। ব্যস দুটো কথা। বিক্রেতা গদগদ হয়ে মাছ কেটে পিস করে তুলে দেবে থলেয়। পাশের খদ্দেরকে পাত্তাই দেবে না। এই 'দাও' বলা লোকদের জন্য ফোতোবাবু চেনা সুবিধে হয়েছে ওদের।

একবার অমন 'দাও' বলা লোকের মুখোমুখি পড়েছিল অর্ণব। সে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। তখন সবে বাজার করা শুরু করেছে অর্ণব। কিছুই জানে না, বোঝে না। দেদার ঠকছে। ওজনে, নয়তো জিনিসে। সেই সময় একদিন কই মাছের দরদাম করছিল সে, অমনি পাশ থেকে একজন রাশভারী গলায় বললেন, কইগুলো দাও তো দেখি। লোকটাকে দেখে বোঝা যায় বেশ শাঁসালো। চেহারা পোশাক গলার স্বর—সবেতেই শাঁস চকমক করছে। তাঁর হাতে থলি নেই। পাশে অল্পবয়সি একটি ছেলে। থলি তার হাতে। থলিতে মাছগুলো ঢুকে গেল সটাসট। ভদ্রলোক পাঁচশো টাকার নোট প্রায় ছুঁড়ে দিলেন। ফেরত টাকা তিনি হাতে নিলেন না। পাশের ছেলেটি নিল। মাছওয়ালা কী কৃতার্থ! হাত কচলে দাঁত কেলিয়ে বলল, আবার আসবেন। ভদ্রলোক ভ্রূক্ষেপই করলেন না। চলে গেলেন দপদপিয়ে।

গোটা ব্যাপারটা এত দ্রুত আর মসৃণভাবে ঘটে গেল, মনে হল চোখের সামনে নব্বই মিলিমিটারে সিনেমা হচ্ছে। অর্ণব স্তম্ভিত। বলা যায় মোহিত। ভদ্রলোকের পোশাক থেকে শুরু করে কথা বলা, কেনা, টাকা দেওয়ার স্টাইল—সবটাই সম্মোহনের মতন। অর্ণব পরে অনেক ভেবেছে, হ্যাঁ একেই বলে আর্ট। বাজার করাও যে একটা আর্ট, সেটা এই ভদ্রলোককে না দেখলে বোঝাই যেত না। তখন অবশ্য রাগ হয়েছিল। মনে হয়েছিল লোকটা টাকার গরম দেখিয়ে গেল। শালা, টাকা আছে বলে যা খুশি তাই করবে। বাজারের সব ভালো ভালো জিনিস ওরাই ভোগ দখল করবে! আমার কি খাওয়ার অধিকার নেই! বাঁচার অধিকার নেই! রাগটা হচ্ছিল আসলে মাছওয়ালার উপর। ইচ্ছে করছিল টেনে থাপ্পড় দেয় ওর গালে। বাজারে নিয়ম আছে, যখন কেউ জিনিসের দর করবে, তখন অন্য কেউ নেওয়া দূরে থাক, কথাও বলবে না। ভদ্রলোক নিয়ম জানলেও হয়তো পয়সার গরমে তোয়াক্কা করেননি, কিন্তু মাছওয়ালা তো জানত। সে বলল না কেন? ও কি অর্ণবকে ফোতোবাবু ভাবে? ভাবতেই পারে। অর্ণব তো স্টাইললেস। বাজার করার ক্ষেত্রে প্রায় আকাট। আর্ট ব্যাপারটাই বোঝে না। অর্ণব দেখেছিল, মাছওয়ালা পাঁচশো টাকাতেই মশগুল। ওকে পাত্তাই দিচ্ছে না। অর্ণব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এর শোধ যদি না তুলি—।

না, শোধ তোলা আর হয়নি, তবে একটা শিক্ষা পেয়েছিল অর্ণব। বাজারে শ্রেণীচরিত্র আছে। বাজার করার আর্ট আছে, স্টাইল আছে, আর সেটা রপ্ত করতে হয়। ওই যে যুগলকান্তি রায়, নধর ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে বাজারে আসেন। একহাতে পুঁচকে থলি, অন্য হাতের

আঙুলের ডগায় ধরা কড়কড়ে একশো টাকার নোট। তিনি জিনিসের দরদাম কিছুই করেন না। শুধু আঙুল দিয়ে দেখান। একশো টাকা ফুরলো, তিনিও হাঁটা দিলেন বাড়িমুখো। হয়তো এটাই ওঁর স্টাইল। ওই যে কৃষ্ণগোপাল বিশ্বাস, এখানকার বিশাল বস্ত্র ব্যবসায়ী। তিনি বাজারে এসে ঝুড়ির উপর প্রায় উপুড় হয়ে বসেন। প্রতিটি জিনিস হাত দিয়ে পরখ করবেন, নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকবেন। কেনার থেকে দেখায় যেন তাঁর আনন্দ বেশি। কিংবা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হরিপদ বিশ্বাস, তিনি বাজারে ঢোকা মানে একরাশ অভাব অভিযোগ উড়ে আসবে চারদিক থেকে। কার যে কতরকম সমস্যা। সব তিনি হাসিমুখে ট্যাকল করবেন দুটি কথা বলে। এক, আমি তোমার ব্যাপার বলে দিয়েছি তো। দুই, তাহলে ওই কথা রইল। অর্ণব শুনেছে, ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এই শহরে হরিপদ বিশ্বাসের নেতৃত্বে, আর তার প্ল্যান প্রোগ্রাম হয়েছিল এই বাজারে বসে। কিংবা ওই যে সুরঞ্জন ধর। উনি বাজারে ঢোকা মানে একটা গোলমাল অবধারিত। ওঁর ধারণা, পৃথিবীর সেরা ঠকবাজের ঠাঁই বাজারে। জিনিসে ঠকাচ্ছে, দামে ঠকাচ্ছে, ওজনে ঠকাচ্ছে। তাই নিয়ে ক্যাচাল, বাপ চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল। একবার তো দাঙ্গা লেগে যায় আর কী। হয়তো এটাই ওঁর স্টাইল। এভাবে বাজারের ভালো জিনিস থলেয় তোলার ফিকির। অথবা অর্ণবের বন্ধু কালুর বাবা হাবুলদা। হ্যান্ডসাম চেহারা। ধোপদুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবি পরনে। ওঁর স্টাইল হল আট থেকে আশি—সবাইকে খোকা সম্বোধন করা। এটা অনেকেই পছন্দ করে না। একবার তুলকালাম হয়ে গেছে, তবু ওঁর স্বভাব গেল না। বাজারের দোকানদারেরা এখন যথেষ্ট কনশাস। মান-অপমানবোধ ওদের তীব্র।

এইসব নেগেটিভ পজিটিভ নমুনা দেখে, বেছেবুছে অর্ণব আবিষ্কার করেছে নিজস্ব স্টাইল, টেকনিক—দীর্ঘ অভ্যেসে যা একটু একটু করে রপ্ত করেছে।

প্রথমত পোশাক। এটা প্রাইমারি ক্যাপিটাল। অর্ণব বাজারে যায় ফিটফাট হয়ে। সাজপোশাক হাবভাবে কোথাও যেন এতটুকু মালিন্য না থাকে। বাজারের কেউ না বোঝে অর্ণব আসলে ফোতোবাবু, পকেট গড়ের মাঠ। ও বাজারে আসে কনফিউজিং টাইমে। নটা থেকে সাড়ে নটা। কথা কম। দোকানদারের কাছে যায় না, বেশি দূরেও নয়। মুখটা হাসি হাসি। মুখে একটাই পেটেন্ট কথা, দ্যাখো বাবা, তোমরা আমাকে একদিন ঠকাবে, দু-দিন পারবে না। অর্ণব টাকা রাখে হাতের মুঠোয়। ভাবখানা এই, বাকি টাকা আছে পকেটে। দরদাম নয়, মাছ তরকারি ঘাঁটাঘাঁটি টেপাটেপি নয়—স্রেফ দাম জিজ্ঞেস করবে। পোষালে বলবে, দাও। না পোষালে ঠোঁট উল্টে বলবে, রোজ রোজ কাঁটাপোনা ভালো লাগে। বলেই সরে পড়বে। মাছওয়ালা ডাকলেও ভ্রূক্ষেপ করবে না।

অর্ণব টের পেয়েছে, ওর স্টাইল বাজারে খেয়েছে। আলাদা খাতির পাচ্ছে ইদানীং।

মাছ দেখতে দেখতে এগোচ্ছে অর্ণব। সব মাছওয়ালা ওকে চেনে। সবাই ডাকছে গলা তুলে।

অর্ণবের চোখ আটকে আছে ইলিশের দিকে। বেশ বড় সাইজ। এক একটারই ওজন হবে এক-দেড়কিলো। মাছগুলোর ঠিক উপরে দুশো পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। সকাল নটা,

কটকটে আলোয় বাল্‌ব। মাছের বাজারে এমনি বড় মাছের উপর বাল্‌ব জ্বলতে দেখেছে অর্ণব। রহস্যটা বুঝেছে পরে। ওতে নাকি মাছ টাটকা দেখায়। মাছের আঁশে জল দিয়ে তার উপর আলো ফেললে চকচক করে। ওই চকচকেই দাম চড়ে।

ইলিশ যে বিক্রি করছে তার নাম গাব্বি। মাছ বিক্রেতা গাব্বি। অর্ণব যখনই বাজারে আসে, ওর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হেসে ফেলে। হায় ভারতবর্ষ...।

অর্ণব আজও হেসে চলে যাচ্ছিল। গাব্বি অমনি হাঁ হাঁ করে উঠল, ওকি চলে যাচ্ছেন যে। মাছ নেবেন না?

দাঁড়িয়ে পড়ল অর্ণব। হেসে বলল, রোজ রোজ ইলিশ খেয়ে মরব নাকি! তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?

গাব্বি লম্বা জিভ বার করে বলল, ছি-ছি কী যে বলেন। বাংলাদেশের ইলিশ, আজ সকালেই বর্ডার পেরিয়ে এসেছে। এমন মাছ বেশি পাবেন না।

অর্ণব বলল, সেটা তো আমার জানার কথা নয়। আগে জানলে তোমার ইলিশই নিতাম। আজ—।

—আরে আমি কি পয়সা চেয়েছি? নেন তো। খেয়ে বলবেন কেমন হয়েছে।

বলে মাঝারি সাইজের ইলিশ দাঁড়িপাল্লায় তুলে ফেলেছে। অর্ণব হাঁ হাঁ করে উঠল, আজ আমি বেশি টাকা নিয়ে আসিনি। কী যে করো—।

—পাল্লায় যখন তুলেছি, এই মাছই আপনাকে দোবো। পয়সা পরে দেবেন।

—আমি কবে বাজারে আসব ঠিক নেই। রাখো তো—।

—আমরা লোক চিনি দাদা, আজ না হোক কাল, আপনি ঠিক দেবেন।

অর্ণবের মুখে হাসি ফুটল। এমন সার্টিফিকেট পাওয়া মানে বাজারে ওর গুরুত্ব আছে।

গাব্বি ততক্ষণে মাছ ওজন করে ফেলেছে। অর্ণবের হাত থেকে থলে টেনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অর্ণব আর আপত্তি করল না। ও তো এটাই চেয়েছে। ও বারণ করবে, গাব্বি জোর করে দেবে।

অর্ণব কপট বিরক্তি বারিয়ে বলল, ধুস কী যে করো—। বলে হাতের মুঠো থেকে পঁচিশ টাকা বার করে বলল, এটা রাখো আপাতত।

গাব্বি বলল, আমি কি চেয়েছি?

—না বাবা, তুমি রাখো তো। ধার করে খেলে মাছের টেস্ট থাকে না। তোমরা ছটহাট মাছ আনবে, আর ভুগতে হবে আমাদের। পরে যেদিন আসব, চেয়ে নিও কিন্তু—।

গাব্বি হেসে বলল, ঠিক আছে—।

মাছ পর্ব চুকল। যাক বাবা, অর্ণব নিশ্চিন্ত। এটা নিশ্চয়ই ওর স্টাইলের জয়। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা ভালো লাগত না। নিজেকে মনে হত ঠকবাজ। পরে ভেবে দেখেছে, পকেটে পয়সা নেই বলে কি ওর খাওয়ার অধিকার নেই? বাঁচবার অধিকার যখন আছে, তখন ভালো খাওয়ারও অধিকার আছে। দুনিয়াটাই ঠকবাজির। অর্ণব ঠকছে না? যে যেমন পারছে, ঠকাচ্ছে। তারা যদি বাবু সেজে, বুদ্ধিজীবী সেজে ঘুরে বেড়াতে পারে, অর্ণবও নিশ্চয়ই পারে

খেয়ে পরে বাঁচতে। চার্বাক তো বলেইছেন, ঋণ করে ঘি খাওয়াও চলে। তাছাড়া অর্ণব তো ঠকাচ্ছে না, ঠেকিয়ে রাখছে। এ যুগে ধার চাইলে লোকে ভাববে ফেকলু পার্টি, তার ট্রিটমেন্টও হবে অন্যরকম। ধার এ যুগে অচল। তাই ঠেকিয়ে রাখার জন্য এই সাজপোশাক, কেনাকাটির স্টাইল, টেকনিক। নাহ্, ও নিজে ঠকলেও কাউকে ঠকাবে না। গাব্বি নামের মানুষকে ঠকাতেও মন চায় না। পুরো টাকাই সে দেবে, তবে একবারে নয়, আস্তে আস্তে, ধীরে সুস্থে। এরপর যেদিন বাজারে আসবে, গাব্বির সামনেই আসবে না। অর্ণব অনেক পরীক্ষা করে দেখেছে, বাজারের ইয়াং দোকানদারদের মেমরি খুব দুর্বল। লোকজনের ভিড়, চিৎকার চেঁচামেচিতে মাথা বোধহয় তেমন কাজ করে না। পরে কখনও গাব্বির সঙ্গে দেখা হবে। গাব্বি কিছু বলার আগে অর্ণবই বলবে, এই জন্যই বলি, ধার করে মাছ খেতে নেই। আমার মনে থাকে না। এই নাও বাবা পঁচিশ টাকা। গাব্বি সেদিনও হাসবে। নিশ্চিত অর্ণব।

মাছের বাজার থেকে দ্রুত সরে গেল অর্ণব। গাব্বির পিছনে উল্টোমুখে বসে নন্দ। খদ্দের সামলে সবে মুখ ফেরাচ্ছে। ওর চোখে পড়া চলবে না। গত সপ্তাহে বড় সাইজের চিংড়ি দিয়েছে। ষাট টাকা পাবে। অর্ণবকে দেখে যদি মনে পড়ে যায়! যদি চেয়ে বসে! বাজারে টাকা চাওয়া মানে তো প্রেস্টিজ ঢিলা।

মাছের বাজার থেকে বেরিয়ে অর্ণব এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আজ কোনদিকে যাওয়া যায়!

গোটা বাজারকে সাতটা ত্রিভুজ-এ ভাগ করেছে অর্ণব। যেদিন গাব্বির মাছ নেবে, সেদিন রবির তরকারি, আবদারের পান আর আগের কিছু পাওনা শোধ। ব্যস্ এর বাইরে যাবে না। মরে গেলেও না।

সাতটি ত্রিভুজের একটি অন্যটির থেকে আলাদা। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন। অন্য ত্রিভুজের সঙ্গে সংযোগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজ বিকাশ পরেশের সঙ্গে দেখা হবে না। ওরা গত দুটো বাজারের পয়সা পাবে। খারাপ লাগলেও কিছু করার নেই। ত্রিভুজের নিয়মই এই। অনেক মাথা খাটিয়ে ত্রিভুজ তত্ত্ব বার করেছে অর্ণব। এতে লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। নইলে এই বাজারে সত্তর টাকা পুঁজি নিয়ে বাজার করতে হত না।

তরকারি বাজারের দিকটায় ইট কাঠ লোহালক্কড়ের জঙ্গল। ওদিকটা ভাঙা হচ্ছে। পুরো বাজার ভেঙে নতুন করে তৈরি হবে। চারতলা বিল্ডিং হবে। এসি বসবে। আরও কী সব হবে। বাজার ঢোকার মুখে মিউনিসিপ্যালিটির ফলক বসেছে। বেশ সাজো সাজো রব চারদিকে।

বাজারের মধ্যে বুরোর চায়ের দোকান। তক্তপোশে বসে আছে কিছু লোক। সকালের খবরের কাগজ পড়তে পড়তে জোর তর্ক চলছে। বুরোর গলা সবার উঁচুতে। অর্ণব সামনে দাঁড়াতেই বুরো বলল, দ্যাখেন তো কী কাণ্ড! আমি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে সবে বলতে গেছি, স্যার আপনি বাজার ভাঙছেন, ভালো কথা, তবে আমাদের উঠে যেতে হবে কেন? তা উনি শোনার আগেই বলে বসলেন, ও আমি বলে দিয়েছি তো। আমি যত বলি, আপনি কোথায় কী বললেন, আমি তো এখনও কিছুই বলিনি। তা উনি না শুনেই বললেন, তাহলে ওই কথা রইল। বলেই চলে গেলেন। আচ্ছা কী লোক বলেন দিকি!

খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলে একজন বললেন, উনি শুনবেন কেন, আসল ব্যাপারটা জানেন না?

—কী ব্যাপার? অন্যজন প্রশ্ন করলেন।

—মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এবার খুচরো বিক্রিতে আসছে। এসব বাজার ওদের হাতে চলে যাবে। বাজার কি এমনি এমনি মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং হচ্ছে! বুরো-ফুরো নিয়ে ওদের মাথা ঘামাবার সময় কোথায়! এরা থাকল কি গেল কিছু যায় আসে না। চা থেকে মাছ আলু তরকারি সব কোম্পানির লেবেল এঁটে প্যাকেটে বিক্রি হবে। কাগজ পড়েন না নাকি! বাজার-বাজার নিয়ে কী লাফালাফি চলছে দেখছেন না?

অর্ণব হাসল। সবাই মুখচেনা। প্রায়ই দেখে ওদের। বাজার করতে এসে বুরোর দোকানে চা খাবে, রাজা-উজির মারবে, কাগজ পড়ে সরকারের পিণ্ডি চটকাবে। দেশের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে বলে খুব হা-হুতাশ করবে, তারপর বাজারের থলি নিয়ে ফিরবে।

অর্ণব সরে যাচ্ছিল। উল্টোদিকে হাবুলদা। বললেন, কী খোকা, বাজার করছ?

অর্ণব মাথা হেলিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

—ওদিকে শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে, খবর রাখো?

অর্ণব হেসে বলল, তাতে আপনার কী, আপনি তো শেয়ারে টাকা খাটান না।

—দেশের অর্থনীতি ধসে যাচ্ছে জানো না। বাজার অর্থনীতি করে আরও লাফাও। কিছু রাখবে না, সব বেচে দেবে এরা—।

বলতে বলতে চলে গেলেন হাবুলদা। অর্ণব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মনে পড়ল না, কবে ও বাজার অর্থনীতি নিয়ে লাফিয়েছে! ও তো আদার ব্যাপারী, জাহাজ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী। ব্যাপারটাই তো বোঝে না।

অর্ণব ধীর পায়ে বাজারের সরু গলি পেরিয়ে রবির কাছে পৌঁছে গেল। রবির চারপাশে বড় বড় ঝুড়ি সাজানো। কী নেই ওতে! আলু থেকে পালং শাক, পেঁয়াজ থেকে সিম—সব মজুত। বাজারে এসব দোকান এক একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। আনাজপাতির এ টু জেড সব মিলবে। এসব দোকানের একটা সুবিধা, কিছু টাকা বাকি থাকলে দোকানি বলবে, ঠিক আছে পরে দেবেন।

অর্ণব এমনিতে ছোটোখাটো দোকানে যায় না। এ ব্যাপারে ওর থিয়োরি পরিষ্কার। ছোটো দোকান মানে সর্বহারা। ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। তার উপর মেমরি সাংঘাতিক। এক মাস আগের কথা ঠিক বলে দেবে গড়গড় করে। ওসব দোকানে যাওয়া মানে প্রেস্টিজ পাংচার।

অর্ণব রবিকে বলল, আলু দু-কিলো, লঙ্কা একশো।

রবি বলল, চন্দ্রমুখী দেব?

—দাও।

রবির হাত চটপট আলু আর লঙ্কা তুলে দিল ওর থলেয়। বলল, বেগুন নিয়ে যান, ভালো বেগুন।

অর্ণব বলল, আজ বেগুন চলবে না, চালকুমড়ো কত নিচ্ছ?

—আরে নিন না। বলে মাঝারি সাইজের চালকুমড়ো দাঁড়িপাল্লায় তুলে ফেলেছে। অর্ণব বলল, আহা করো কী, অত চালকুমড়ো কে খাবে?

—আরে কচি জিনিস, নিয়ে যান তো।

—না-না এখনও অনেক জিনিস নিতে হবে।

—রাখুন-রাখুন, আমি কি টাকা চাই?

—তা চাও না, তবে আমিই বা নিই কী করে বলো তো? বাজে লাগে না। রোজ তো আসি না।

—পরের বার এসে দেবেন। এটুকু যদি না করি, তবে আমরা আছি কেন?

কচি চালকুমড়ো চলে এল থলেয়। এরপর পটল, ওল পেঁপে টুকটাক ঢুকে গেল থলের মধ্যে। অর্ণব যত বলে, ধুর এবার রাখো, বলো কত হয়েছে?

রবি বল্লে, আরে নেন না।

—না-না, ইলিশে আজ অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে। তার উপর এত সব, আজ পারব না।

ইলিশের কথাটা একটু কায়দা করে বলতে হল। রবি শুনুক। ইলিশ যে কেনে সে যেকল্লু নয়। অর্ণব সরু চোখে তাকিয়ে দেখল, রবির চোখ বড় হয়েছে। তার মানে খেয়েছে। হেসে বলল, ইলিশ যখন নিয়েছেন, কাঁচকলাও নিয়ে যান।

অর্ণব বলল, ইলিশ ভাপা হবে।

—ভাপা হবে, ঝোলও হবে। কাঁচকলা দিয়ে ইলিশ খাবেন, দারুণ। বলে বড় কাঁদি থেকে চারটে বড় কাঁচকলা ছিঁড়ে দিল।

অর্ণব এটাই চাইছিল। কলা আসুক। বর্ষার সময়ে কাঁচকলা দিয়ে ইলিশ দারুণ লাগে। রবি ঠিকই বলেছে। মুখে বলল, ন্যাও এবার খ্যামা দাও, হিসেবটা করো। দেখি কত তোমায় দিতে পারি।

রবি মুখে মুখে হিসেব কষে বলল, একচল্লিশ টাকা।

অর্ণবের মাথায় চটপট টাইপ হয়ে চলেছে, রবিকে কত দেওয়া যায়। পুরো টাকা দেওয়া চলবে না। রবির ত্রিভুজে বংশী আছে। আগের মিষ্টি কুমড়ো, কলা আর নারকেলের দাম পাবে। ওকে কিছু দিতে হবে। নইলে এই ত্রিভুজ নষ্ট হয়ে যাবে।

অর্ণব মুঠো খুলে টাকা বার করে বলল, আজ পঁচিশ টাকা রাখো। পরের বার যখন আসব, মনে করে চেয়ে নেবে।

রবি হেসে বলল, আচ্ছা—ঠিক আছে।

অর্ণব ঘুরতেই দেখল, বংশীর সামনে নীল চুড়িদার মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। বংশী ওকে নিয়েই ব্যস্ত। সহজে চলে যাওয়া যায়। অর্ণব মাথা নাড়ল, নাহ্ সেটা ফেয়ার হবে না।

অর্ণব তীক্ষ্ণ চোখে দেখল নীল চুড়িদারকে। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার দেখা হল। বয়েস অল্প। রং ফর্সা। লম্বা। বেশ আকর্ষণীয় চেহারা। দেখলেই মনে হয় বড় ঘরের মেয়ে। মুখের

উপর চাপা অহংকারের ছাপ আছে, সাধারণত যা পয়সাওলা লোকদের দেখা যায়। অর্ণব দেখেছে মেয়েটা একাই আসে, আর এ সময়েই। মনে হয় এ শহরের বাসিন্দা নয়, কিংবা নতুন এসেছে। মফস্সল শহরে এই বয়েসের মেয়েরা সচরাচর একা বাজারে আসে না। সঙ্গে কেউ না কেউ থাকে। গত পনেরোদিনে অন্তত বার পাঁচেক বাজারে এসেছে অর্ণব। প্রতিবারই দেখেছে মেয়েটিকে। সেই এক পোশাক। নীল চুড়িদার। হয়তো ওটা ওর বাজার করার পোশাক। বাজারে ঢোকে গম্ভীর মুখে। কথা বলার থেকে আঙুল দিয়ে জিনিস দেখায়, ব্যাগ খুলে টাকা দেয়। তারপর রিক্সা করে বাড়ি ফেরে।

অর্ণব মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে বংশীর সামনে দাঁড়াল। বেশ জোরেই বলল, কী টাকাটা নিতে হবে না?

বংশী অবাক হয়ে বলল, কীসের বাবু?

—আরে বাবা সেদিন কুমড়ো কলা নারকোল দিলে, তখনই বলেছিলাম, দিও না। আমি রোজ বাজারে আসি না। মনে থাকে না। এভাবে আমাকে ঋণের ফাঁদে জড়াও কেন? ভাগ্যিস মনে পড়ল আজ। নাও বাবা, তোমার টাকা নাও।

বংশী থতমত খেয়ে গেছে। মাথা চুলকে বলল, কত ছিল যেন।

—কত ছিল-টিল আমার মনে নেই। মালও নেব, আবার মনেও রাখব—তা হবে না। তবে মনে আছে, দশ টাকা দিয়েছিলাম।

—তবে আর দশ টাকা দিন। হয়ে যাবে।

—হবে তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ হবে।

—দেখো বাবা আমাকে আবার ঋণের জালে জড়িও না, মরেও শান্তি পাব না।

বংশী যেভাবে টাকাটা নিল, অর্ণব নিশ্চিত ওর কিছুই মনে ছিল না। ফালতু দশ টাকা গচ্চা গেল।

বংশী বলল, আজ ভালো করলা আছে, নিয়ে যান।

—তুমি খাও। রোজ রোজ আমাদের খেতে হবে কেন? একদিন নিজে খেয়ে দ্যাখো আমাদের কী জিনিস খাওয়াচ্ছ।

বংশী হেসে ফেলল।

পুরো সংলাপ পর্বে অর্ণব আড়চোখে দেখছিল নীল চুড়িদারকে। প্রথমে গম্ভীর থাকলেও শেষ কথায় হেসে ফেলেছিল। অর্ণবও হাসছে। এটা ইনভেস্টমেন্ট। আজ দশটাকা ইনভেস্ট করা হল। এর ফায়দা বিশ টাকা উঠবে পরে। তা যদি না হয়, তবে এই থড়াচুড়ো, সাজপোশাক, অ্যাকটিং কীসের জন্য। আরও বড় ইনভেস্টমেন্ট পাশে দাঁড়িয়ে। ওকে ইমপ্রেস করার জন্যই তো দশটাকা গেল। তা যাক। ইমপ্রেসনও তো একধরনের ইনভেস্টমেন্ট। অর্ণব সরাসরি তাকায়নি, কিন্তু সমস্ত অনুভূতি দিয়ে টের পাচ্ছে, মেয়েটি ওকে দেখছে। নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছে।

এটাই তো চায় অর্ণব। ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। শোল মাছ

নেবে বলে ঠিক করেছিল। দর শুনে ঘাবড়ে যায়। হেসে বলেছিল, তোমার শোল কি আমার বাড়িতে যেতে চায়?

দোকানি হেসে ফেললেও দামের ব্যাপারে কড়া। বলল, কেনা দামই বলছি, আমার উপায় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে বলে উঠল, ওটা আমাকে দিন।

ব্যাপারটা বেমানান। অন্য কেউ হলে অর্ণব কড়া কথা শুনিয়ে দিত। নীল চুড়িদারকে সেদিনই প্রথম দেখল। দেখেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল বুকে। এ তো অদ্ভুত মেয়ে।

অর্ণবের বদলে দোকানিই বলল, উনি না নিলে আপনি বলবেন।

অর্ণবের মাথায় তখনই বিদ্যুৎ চিড়িক মেরেছিল। বুকের গভীরে কোথাও নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের আভাস। সমগ্র পৃথিবী তখনই নীল হয়ে যায়।

অর্ণব তাড়াতাড়ি মাছওয়ালাকে বলেছিল, না-না, মাছটা ওনাকেই দাও।

নীল চুড়িদার বোধহয় বুঝতে পেরেছে ভুলটা। জিভ কেটে বলেছিল, না-না ছি-ছি, আমি ভুল করেছি, আপনি নিন।

কথা তো নয়, যেন জলতরঙ্গ বাজছিল। অর্ণব হেসে বলেছিল, আমার বাড়ি এমনিতেই শোল মাছ ওঠে না। আমি এমনিই দাম জিজ্ঞেস করছিলাম। আপনি নিন, আমি কিছু মনে করছি না। বলে মাছওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, ভাই আমাকে চিংড়ি দাও।

মেয়েটির লজ্জা লজ্জা দৃষ্টির সামনে থেকে দ্রুত সরে যায় অর্ণব।

এর পরেও দেখা হয়েছে। আশা করেছিল নীল চুড়িদার কথা বলবে, কিংবা হাসতেও পারে। কোনওটাই হয়নি। মেয়েটি গম্ভীর মুখে পাশ কাটিয়ে গেছে। যেন কিছুই হয়নি। গোটা ঘটনাটা স্রেফ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। বড়লোকের মেয়ের পক্ষে যা স্বাভাবিক।

অর্ণব বুড়োর চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াল। দোকানটা ফাঁকা। রাজা-উজির মারা বাবুরা চলে গেছে। বুড়োও নেই। হয়তো চা দিতে গেছে কোথাও। বাজারের একটা দিকের ছাদ ভাঙা শুরু হয়েছে। দমাদ্দম শব্দে হাতুড়ি গাঁইতি পড়ছে। জায়গাটা ঘিরে কাজ চলছে শম্বুক গতিতে। পাশ থেকে এক পানওলা বিরক্তির সুরে বলল, ভাঙতে যদি এত সময় নেয়, গড়বে কতদিনে।

অর্ণব লক্ষ রাখছে নীল চুড়িদার কোথায় যায়। দেখল পিছনের গেটের পাশে এক বুড়োর ঝুড়ির সামনে দাঁড়াল। ঝুড়িতে ব্রাহ্মী শাক। চারটে শাকের আঁটি টপাটপ ঢুকে গেল নীল চুড়িদারের থলেয়। অর্ণব চমকে উঠল। তাই তো, ব্রাহ্মী শাক যে নিতে হবে। লাল শাক আজ বাদ। আজ ব্রাহ্মী শাক। ওই শাকে মাথা পরিষ্কার হয়। স্মৃতিশক্তি বাড়ে। অর্ণব প্রুফ দেখে। অতএব ব্রাহ্মী শাক না হলে চলে।

কিন্তু ওখানে যেতে গেলে ত্রিভুজ ভাঙতে হয়। সেটা কি উচিত হবে। অর্ণব দ্রুত ভেবে নিল। নীল চুড়িদারের জন্য এটুকু করা যায় না। নিশ্চয়ই যায়। মানুষ প্রেমের জন্য কী না করে, আর এ তো একটা কল্পিত ত্রিভুজ। এটা ভাঙতে এত দ্বিধা। জীবন কি এত হিসেব করে চলে নাকি।

অর্ণব দ্রুত হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। নীল চুড়িদার থাকতেই পৌঁছতে হবে। ব্রাহ্মী শাক। আহা আগে কেন মনে পড়েনি!

—বাবু লেবুর দামটা দিলে।

থমকে গেল অর্ণব। চোখ সরু হয়ে গেল। বুড়ো লোক। লেবু লঙ্কা পানের ঝুড়ি নিয়ে বসে। চোখদুটো ওর দিকে স্থির।

অর্ণব অবাক হয়ে গেল। এমন তো হওয়ার কথা নয়। বাজারে মাল নিয়েছে, অথচ মনে রাখেনি, এরকম কখনও হয়েছে নাকি। অর্ণব নিজের মাথা ঝাঁকুনি দিল, নাহ্ কখনও হয়নি। কবে ওর কাছ থেকে লেবু নিল।

অর্ণব আবার মাথা ঝাঁকুনি দিল। ব্রাহ্মী শাক না খাওয়ার ফল। এ তো ভালো লক্ষণ নয়।

অর্ণব বলল, তোমার কাছ থেকে কবে লেবু নিয়েছি বলো তো?

বুড়ো লোকটা হেসে বলল, তা হয়েছে, গেল বুধবারের আগের বুধবার। আসলে আপনি তো রোজ বাজারে আসেন না, তাই মনে নেই বোধহয়।

—তুমি কি এখানেই বসো?

—না-না, ওই যে ওখানে—। হাত তুলে যেদিকে ছাদ ভাঙা হচ্ছে, সেদিকটা দেখাল লোকটা, আসলে ভাঙচুরের জন্য জায়গা পাল্টাতে হচ্ছে। আজ এখানে থিতু হলাম।

—ও তাই বলো। অর্ণব এবার হাসল। এবার সব মনে পড়ছে। সেইসঙ্গে রাগও হচ্ছে। এ ব্যাটা ত্যাঁদড় কম না তো। ঠিক মনে রেখেছে। আর ঠিক এই সময়। অর্ণব চোখ তুলে দেখল, নীল চুড়িদার নেই। হয়তো ফলের বাজারে গেছে। বুড়োটার এই সময়ে মনে না পড়লে হচ্ছিল না। এই জন্য পারতপক্ষে বুড়ো দোকানির কাছে যেতে নেই। বুড়ো মানে আগের আমলের দুধ-ঘি খাওয়া লোক। এদের আর কিছু না থাক, মেমরি খুব শার্প।

অর্ণব বলল, আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।

লোকটা অবাক হয়ে গেল। দু-হাত নাড়িয়ে বলল, আরে সেই যে আপনি পান কিনতে এলেন, আর আমি বললাম, আমার গাছের লেবু, নিয়ে যান। পানের দাম দিয়ে গেলেন, লেবুর দামটা পরে যখন আসবেন, চেয়ে নিতে বললেন।

স্ত্রী সাংঘাতিক। প্রতিটি কথা ঠিক বলছে। টু দি পয়েন্ট। অর্ণব রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মী শাক চালায় নিয়মিত।

অর্ণব হেসে বলল, এইজন্য আমি জোর করে দেওয়া জিনিস নিতে চাই না। আমার মনে থাকে না, আর তোমরা ভাবো আমি বোধহয় ইচ্ছে করে—।

—ছি ছি, তা ভাবব কেন। ঠিক আছে, অসুবিধে থাকলে আজ না হয়—।

—তাই নাকি। অর্ণব তাড়াতাড়ি মুঠো খুলে দশটাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও বাবা, আমার উদ্ধার করো তো।

বুড়ো ছ-টাকা ফেরত দিতে দিতে বলল, আবার আসবেন।

অর্ণব মনে মনে বলল, সে তো আসবই। আজ চারটাকা গচ্চা গেল, আটটাকা যদি

উসুল না করি তবে আমি মানুষ কীসে! লোকটাকে সেই বুদ্ধিজীবীর মতো দেখতে না? অর্ণব সরু চোখে দেখল বুড়োকে। হ্যাঁ তাই তো। শালা আমাকে প্রুফ দেখিয়ে বারোশো টাকা মেরেছে, লেবুর দোকানির যদি আট টাকা মারি, ক্ষতি আছে! অর্ণব তো কম ঠকে না। সবাই মিলে ওকে ঠকাচ্ছে। সেটা দোষের নয়। আর আমি দু-পাঁচ টাকা ঠকালে দোষ! আমি শালা একাই ঠকব, আর তোমরা সবাই মৌরসি পাট্টা গাড়বে। দেখো, ঠকার মজা।

হাতে আছে আর ছ-টাকা। ব্রাহ্মী শাকে গেল দু-টাকা। এবার আবদারের লেবু পান। দু-সপ্তাহ আগে পাঁচ টাকা পাবে আবদার। অর্ণব নিশ্চিত আবদারের মনে নেই। মঙ্গল। স্বাভাবিকভাবে পান আর লেবু নিল। বেরিয়ে গেল তিন টাকা। আবদার আগের টাকার কথা তুললই না। যাক বাঁচোয়া। হাতে আর এক টাকার কয়েন। শেষ সম্বল। এটাকে কী করা যায়।

অর্ণব চারদিকে দেখল। বাজার এখনও জমাট। সকালের চাপাচাপি ভিড় নেই, তবে যথেষ্ট লোক আছে। নাহ্ এর মধ্যে কোথাও নীল চুড়িদারকে দেখতে পেল না অর্ণব। চলে গেল নাকি! যেতেই পারে। কেউ অনন্তকাল বসে থাকে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কেউ খরচ করবে না।

হতাশ হয়ে ফেরার পথ ধরল অর্ণব। ডিমের দোকানের সামনে বেশ চেঁচামেচি হচ্ছে। অর্ণব দেখল, হাবুলদা চিৎকার করছেন। প্রতিপক্ষ ডিমওলার গলাও বেশ চড়া। লেগে যায় আর কী! ভিড় জমে গেছে। একটু এগোতেই অর্ণব টের পেল, হাবুলদা আজ কেঁচিয়েছেন। অর্ণব দাঁড়িয়ে পড়ল। হাবুলদা ডিমওলাকে পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছেন। ঘটনা হল এটাই। ছুঁড়ে দেওয়া পয়সা ডিমওলা নেবে না, হাবুলদাও পয়সা তুলে দেবেন না। অন্য দোকানিরাও একজোট হয়ে গেছে। তারা হাবুলদাকে ছাড়বে না।

অর্ণব আস্তে আস্তে পিছনে সরে গেল। হাবুলদা যেন দেখতে না পান। ওনার ম্যাও উনিই সামলান।

অর্ণব ফিরতে গিয়েই দেখল নীল চুড়িদারকে। আবদারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে লেবু পান নেবে। অর্ণবের বুকের মধ্যে ঝংকার দিয়ে উঠল। মাথার মধ্যে টাইপ হয়ে চলেছে, ইনভেস্টমেন্ট—ইনভেস্টমেন্ট।

ডিমের দোকানের সামনে গণ্ডগোল এখন তুঙ্গে। হাবুলদা থলে ফেলে দিয়ে জামার হাতা গোটাচ্ছেন। মারপিটের পূর্ব মুহূর্ত। গোটা বাজার থমকে গেছে। অর্ণব দেখল, আবদার খদ্দের ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে ঝগড়া দেখছে। আর সেই ফাঁকে নীল চুড়িদার চটপট চার-পাঁচটা লেবু থলেয় ঢুকিয়ে ফেলল। একপাশে খোসা ছাড়ানো নারকোল আছে আট-দশটা। একটা তুলে নিয়ে থলের চালান করে দিল। গোটা ব্যাপারটা ঘটল খুব দ্রুত, চোখের পলক ফেলার আগে। তারপর নির্বিকার মুখে ঝগড়া দেখতে লাগল।

দূর থেকে অর্ণব গোটা ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে হতবাক। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। বাহ্ ভারী মজা তো। ওর হাসি পাচ্ছিল, ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে বলে, ও আবদার তোমার ম্যাও সামলাও। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সামলে নিল নিজেকে। মজাটা থাক নিজের জন্য। ওটা

ইনভেস্টমেন্ট। এখন হাতের কয়েনটার একটা গতি করতে হবে। মনে হল, ওর ক্ষতির টোকেন সান্ত্বনা দেওয়া হবে।

অর্ণব টুক করে কয়েনটা গড়িয়ে দিল। যাও বাবা প্রায়শ্চিত্ত করো, আবদারের ক্ষতিপূরণ করো।

কয়েনটা গড়াতে গড়াতে মেয়েটার পায়ের কাছে গিয়ে থেমে গেল। অর্ণব এগিয়ে এসে আবদারকে বলল, ও আবদার তোমার বোধহয় টাকা পড়ে গেছে।

আবদার সামান্য চমকাল। তাকাল অর্ণবের দিকে, তারপর কয়েনের দিকে। হাত বাড়াবে কি বাড়াবে না করছে, নীল চুড়িদার 'ওমা, আমার পয়সা পড়ে গেছে' বলে টুক করে কয়েনটা তুলে নিল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, এক টাকার পান দাও না, সেই কখন থেকে চাইছি—!

কয়েনটা আবদারের দিকে বাড়িয়ে দিল।

অর্ণব দাঁড়িয়ে পড়ল। ও হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না, শুধু অবাক চোখ মেলে দেখছে, নীল চুড়িদার হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওর চোখে নীল আকাশের হাতছানি।

যাহ্ বাবা, এ তো দেখছি ফোতোবিবি, আমার থেকেও অধম! অর্ণব হাসতে চেষ্টা করছে। হাসি আসছে না। চড়চড় শব্দে তরকারি বাজারের ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ল। ধুলো বালিতে ঢেকে যাচ্ছে চারদিক। প্রবল ধ্বংসধূলি ছুটে আসছে ওদের দিকে। অর্ণব সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট উল্টে সরে গেল। ধুস্ শালা, ফোতোবাবুর সঙ্গে ফোতোবিবির প্রেম হয় নাকি!

বাংলা অনুবাদে ভারতীয় কবিতা

আকাশভরা পাখি (উর্দু) ৬০.০০
বলরাজ কোমল/অনুবাদ : জ্যোতিভূষণ চাকী

নতুন এলাকায় (হিন্দি) ৬০.০০
অরুণ কমল/অনুবাদ : অমলকুমার ঘোষ

নির্বাচিত কবিতা (অসমিয়া) ৬০.০০
নীলমণি ফুকন/অনুবাদ : তড়িৎ চৌধুরী

শস্যের মাঠ মানুষ ও অন্যান্য কবিতা (অসমিয়া) ৬০.০০
হীরেন ভট্টাচার্য/অনুবাদ : কবি

সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন ১১০.০০
অনুবাদ ও সম্পাদনা : সুহৃদকুমার ভৌমিক

শ্রীরাধা (ওড়িয়া) ৪০.০০
রমাকান্ত রথ/অনুবাদ : কালীপদ কোঙার

শব্দের আকাশ ও অন্যান্য কবিতা (ওড়িয়া) ৪০.০০
সীতাকান্ত মহাপাত্র/অনুবাদ : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পর্ক (ওড়িয়া) ৫০.০০
জয়ন্ত মহাপাত্র/অনুবাদ : কল্লোল চৌধুরী

আধুনিক দিনের স্তোত্রাবলী (ইংরেজী) ৬৫.০০
নিসিম ইজিকিয়েল/অনুবাদ : অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

দিন ও রাত্রি (কন্নড়) ৯০.০০
আইয়া পানিকর/অনুবাদ : উৎপলকুমার বসু

কবীর বীজক ও অন্যান্য কবিতা (হিন্দি) ৮০.০০
সংকলন ও অনুবাদ : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গালিব : নির্বাচিত কবিতা (উর্দু) ১২৫.০০
সম্পাদনা : জ্যোতিভূষণ চাকী, শঙ্খ ঘোষ

সাহিত্য অকাদেমি
আঞ্চলিক দপ্তর, জীবন তারা, ২৩/এ ৪৪ এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৩ দূরভাষ : ২৪৭৮ ১৮০৬
প্রাপ্তিস্থান : অকাদেমির দপ্তর, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, দিয়া পাবলিশিং, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি।

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৭

পরিচয় মূল্য - ৬০ টাকা